Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের বাংলা কাহিনিকাব্যে গার্হস্থ্যজীবন

ভারতী রানী হালদার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-২০২১

মধ্যযুগের বাংলা কাহিনিকাব্যে গার্হস্থ্যজীবন

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

তত্ত্বাবধায়ক

ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরী
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

গবেষক

ভারতী রানী হালদার
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি ২০২১

ঘোষণাপত্র

আমি, ভারতী রানী হালদার, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, অধ্যাপক ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে সম্পন্নকৃত এই অভিসন্দর্ভ বা অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

(ভারতী রানী হালদার)
খণ্ডকালীন পিএইচ.ডি গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ভারতী রানী হালদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধীনে একজন খণ্ডকালীন পিএইচ.ডি গবেষক হিসেবে বর্তমান অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন। এ গবেষণা- অভিসন্দর্ভটি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি লাভের জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশে উপস্থাপিত হয়নি।

তত্ত্বাবধায়ক

(ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরী)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

২০১১ সালের মার্চ মাসে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরী-এর তত্ত্বাবধানে মধ্যযুগের বাংলা কাহিনিকাব্যে গার্হস্থ্যজীবন বিষয়ে গবেষণার জন্য পিএইচ. ডি. কোর্সে রেজিস্ট্রিভুক্ত হই। অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্ধারণসহ গবেষণার সার্বিক প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়া সম্পাদনে তাঁর মূল্যবান দিকনির্দেশনা আমার জীবনে এক পরম প্রাপ্তি। নানাবিধ পারিবারিক প্রতিবন্ধকতায় বিলম্বিত হওয়া সত্ত্বেও গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি যে রচনা করতে পেরেছি তা মূলত আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়কের সহৃদয় অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতার ফল। গবেষণা বিষয়ে তাঁর আন্তরিক পরামর্শ, নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত আমার গবেষণাকর্মকে সহজ করেছে। তাঁর প্রতি রইল আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। গবেষণা চলাকালীন সময়ে-অসময়ে যাঁর অপত্যস্নেহে আমি মুগ্ধ হয়েছি, তিনি আমার তত্ত্বাবধায়কের সহধর্মিণী সমর্পিতা চৌধুরী। কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ দিয়ে তাঁকে ছোট করব না।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে গ্রন্থ-সাহায্য ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে যাঁরা আমাকে নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেন; প্রফেসর ডক্টর বেগম আকতার কামাল; প্রফেসর ডক্টর মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া; প্রফেসর ডক্টর সিরাজ সালেকীন; সরকারি এম এম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান প্রফেসর শামীম আরা লুনা; যশোর সরকারি মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান প্রফেসর হোসনেয়ারা খাতুন; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোছাঃ সুফিয়া খাতুন; আমার সহকর্মী কবি ও প্রাবন্ধিক সাঈদ আবুবকর; সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, সরকারি সিরাজগঞ্জ কলেজ, সহযোগী অধ্যাপক কারুননাহার; বাংলা বিভাগ, যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, সহকারী অধ্যাপক মহুয়া রায়, বাংলা বিভাগ, সরকারি এম এম কলেজ, সহকারি অধ্যাপক ফেরদৌসী বেগম, বাংলা বিভাগ, যশোর সরকারি কলেজ, নাঈমা ফারহানা, প্রভাষক, সরকারি এম এম কলেজ এবং আমার সেজ জা মাধুরী মল্লিক ও তার ছোট বোন জয়ন্তী মল্লিক। এঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেমিনার, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি, ঢাকা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরি, যশোর রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরি, যশোর পাবলিক লাইব্রেরি, যশোর সরকারি এম এম কলেজ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, এম এম কলেজ, বাংলা বিভাগের সেমিনার, যশোর সরকারি মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের সেমিনার ব্যবহার করেছি। এ সুযোগে আমি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দকে জানাই ধন্যবাদ।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটির সার্বিক সৌষ্ঠব দান করেছেন বিশ্বাস কম্পিউটার্সের কর্ণধার রফিক। আমি ধন্যবাদ জানাই তাকে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ ত্রুটি থেকে গেল। এ জন্য আমি সবিনয় দুঃখ প্রকাশ করছি।

ভারতী রানী হালদার

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা ॥ ১

প্রথম অধ্যায় ॥ পরিপ্রেক্ষিত ৪

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ কাহিনিকাব্যে গার্হস্থ্যজীবন ৩৩

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ মধ্যযুগের বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখা ৩৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ লৌকিক প্রণয়কাব্য : বড়ুচণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ৫৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ নাথসাহিত্য : সেখ ফয়জুল্লা প্রণীত *গোরক্ষ-বিজয়* ৭১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ মঙ্গলকাব্য : ৮০

ক. বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* (*পদ্মাপুরাণ*) ৮২

খ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* ১২৯

গ. রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের *শিব-সঙ্কীর্ত্তন* বা *শিবায়ন* ১৯২

ঘ. মানিকরাম গাঙ্গুলির *ধর্মমঙ্গল* ২১৫

ঙ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের *অন্নদামঙ্গল* ২৩৪

তৃতীয় অধ্যায় ॥ বাংলার মধ্যযুগের কাহিনিকাব্যে রূপায়িত গার্হস্থ্যজীবনের মূল্যায়ন ২৬৭

উপসংহার ২৮৫

পরিশিষ্ট ২৮৮-২৯৪

ক. আকর গ্রন্থ

খ. সহায়ক গ্রন্থ : বাংলা

গ. সহায়ক গ্রন্থ : ইংরেজি

ঘ. অভিধান

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

হাজার বছরের বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে আত্মস্থ করেই কবি সাহিত্যিকগণ গড়ে তুলেছেন বাংলা সাহিত্য যা বাঙালিকে করেছে সম্মানিত ও গর্বিত। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে লিখিত ভাষার এই নিদর্শন অবলম্বন করে সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন দৃষ্টিবিন্দু থেকে সাহিত্যের যুগ-বিভাজন করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক ও বিদগ্ধ পণ্ডিতগণের মতামত বিশ্লেষণের আলোকে বাংলা সাহিত্যের নিম্নলিখিত যুগ-বিভাজনই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত : ক. প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০ খ্রি.) খ. মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০ খ্রি.) গ. আধুনিক যুগ (১৮০১-বর্তমান পর্যন্ত)। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের কালপরিসর বিস্তৃততর, প্রায় ছয়শত বৎসর পরিব্যাপ্ত। এই ছয়শত বৎসরের রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় এখানে ঘন ঘন রাষ্ট্রশক্তির উত্থান-পতন ঘটেছে। ফলে বাংলার সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি-জীবনে যেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি সাহিত্য সাধনায় সৃষ্টি হয়েছিল বিরূপ মনোভাবের। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলে প্রায় দেড়শ বছর (১২০১-১৩৫০ খ্রি.) বাংলা সাহিত্যে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হয়নি। রাজনৈতিক অস্থিরতায় দোদুল্যমান এ সমাজ চাইছিল মুক্তি। নির্জিত জাতি তার মগ্নচৈতন্যে শক্তি প্রার্থনা করছিল। আর তারই উৎসস্থল হয়ে উঠল আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মেলবন্ধনে সৃষ্ট বাংলা কাহিনিকাব্য। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য আলোচনায় প্রধানত দুটি বাধা প্রত্যক্ষ করা যায়, প্রথমটি : সময়ের দীর্ঘসূত্রিতা, দ্বিতীয়টি: তথ্য সংগ্রহে অপ্রতুলতা। তারপরও বলতে হয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ছয়শত বৎসরের ইতিহাসে বিভিন্ন ধারার যে সাহিত্য উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছে তার মধ্যে কাহিনিকাব্যের ধারাটি ছিল সর্বাধিক সচল এবং বিভিন্ন শতকের অসংখ্য কবির রচনাসামর্থ্যে উজ্জ্বল। মধ্যযুগের বাংলার বিশাল পরিসরে রচিত কাহিনিকাব্যগুলো বিভিন্ন ধারায় রচিত——লোক-পৌরাণিক ধারা, নাথ-সাহিত্যের ধারা এবং বিশাল-ভাণ্ডার মঙ্গলকাব্যের ধারা, যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের তথ্য ও উপাত্তের আকর হিসেবে বিবেচ্য। এই কয়টি ধারার নির্ধারিত কিছু সাহিত্য বর্তমান গবেষণায় অবলম্বিত হয়েছে। আমরা জানি যে, বাংলা সাহিত্যে কাহিনিকাব্যের অন্তর্গত রোমান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যান এবং আখ্যানমূলক রামায়ণ-মহাভারতের ধারাও শক্তিশালী দুটি দিগন্ত। কিন্তু ঐ-দুটি ধারাই অনুবাদমূলক বলে, আমরা সেগুলোকে গবেষণার বিষয়ভুক্ত করিনি। আরবি-ফারসি-হিন্দি এবং সংস্কৃত উৎস থেকে ঐ সব সাহিত্য অনূদিত হয়েছিল। এতে বাঙালি জীবনের প্রতিফলন ঘটলেও ঐগুলোতে ভিন্নভাষী সমাজ ও সংস্কৃতির প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্ম সাধনায় চারটি মার্গ বা স্তরের উল্লেখ আছে—— ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস। এর মধ্যে ধর্ম সাধনায় গার্হস্থ্যজীবনকেই সাধনার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকার মনু ধর্ম সাধনার চারটি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 'গৃহস্থ্য উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান বিভর্তি হি' (মনুসংহিতা; পৃ: ৬২) সুতরাং ভারতীয় জীবনধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় অধ্যায় হিসেবে গার্হস্থ্যজীবনের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া মধ্যযুগীয় জীবনধারার স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আমাদের সামাজিক ইতিহাসেরও অনিবার্য অংশ। আমাদের বিদ্যাচর্চায় রাজনৈতিক ও রাজবংশীয় ইতিহাস রচনার ঐতিহ্য থাকলেও, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সামাজিক ইতিহাস প্রণয়নের সমৃদ্ধ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়নি। সামাজিক ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় উপাত্ত ও উপকরণের স্বল্পতা। তবে মধ্যযুগে ছয়শত বছরে রচিত বাংলা কাহিনিকাব্যগুলো উপাত্ত ও উপকরণের আকর স্বরূপ। যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ইতিহাসবিদ

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য-উৎস থেকে সীমিত আকারে উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তবে তাঁরা বিস্তৃতরূপে ওই উপকরণ-উপাত্ত গ্রহণ করেননি। কারণ তাঁদের গ্রন্থ রচনার সমকালে মধ্যযুগের সাহিত্য অধিকাংশই ছিল অনাবিষ্কৃত অথবা মূল পাণ্ডুলিপি হিসেবে গ্রন্থাগারসমূহে রক্ষিত। উত্তরকালে মধ্যযুগে রচিত অনেক কাহিনিকাব্যের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত হয়ে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছে। ফলত সামাজিক ইতিহাসের তথ্যভাণ্ডারও সমৃদ্ধতর হয়েছে। ইতিহাসে দেশের অতীত রাজনৈতিক ঘটনার উত্থান-পতনের সঙ্গে রাজ-রাজড়ার সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের কথা যুক্ত থাকলেও সাধারণ মানুষের অন্তর্লোকের-অন্তর্বেদনার কথা উপস্থাপিত হয় না। কিন্তু সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের অংশ হিসেবে রাজ-রাজড়া থেকে শুরু করে অতি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হতাশা-ব্যর্থতাসহ একেবারে অন্দরমহলের চিত্র প্রতিফলিত হয়। ফলে পাঠক রাজনৈতিক ইতিহাস অপেক্ষা সামাজিক ইতিহাস তথা পারিবারিক চিত্র পাঠে বেশি আগ্রহী হয়। এই বিবেচনা থেকেই বর্তমান অভিসন্দর্ভে বাঙালির মধ্যযুগের কাহিনিকাব্য-নিহিত সামাজিক ইতিহাসকে শনাক্তকরণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এর ফলে মধ্যযুগের বাঙালি নর-নারীর গার্হস্থ্যজীবনের বৈশিষ্ট্যের আলোকে সাহিত্য বিবেচনার পথ যেমন সুগম হবে তেমনি সামাজিক ইতিহাসও একটি সুনির্দিষ্ট অবয়ব-প্রাপ্ত হবে বলে বিশ্বাস করি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ ধারা ধর্মাশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও তার বিচিত্র শাখা-প্রশাখায় মূর্ত হয়ে আছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক উত্থান-পতনের চিত্র। বিশেষ করে পারিবারিক উত্থান-পতনের চিত্র একেবারে সমাজের উচ্চস্তর থেকে শুরু করে নিম্ন-নিম্নস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত যা পাঠককে কখনো আবেগে আপ্লুত করে কখনো-বা করে বেদনায় ভারাক্রান্ত ফলে সামাজিক ইতিহাস পাঠে মানুষের আগ্রহ সব সময় বেশি থাকে। তাই সামগ্রিক দিক বিবেচনায় রেখে আমরা বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য সমগ্র গবেষণাকর্মকে নিম্নরূপ তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি:

প্রথম অধ্যায় : পরিপ্রেক্ষিত ; ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবার ও গার্হস্থ্যজীবন কাঠামো—এই অধ্যায়ে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবার ও গার্হস্থ্যজীবনের গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে একটি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। মনু নির্দেশিত পরিবার ও গার্হস্থ্যজীবনের সংজ্ঞার্থ নিরূপণের জন্য চতুরাশ্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা একান্ত ভাবেই ভারতীয় হিন্দু ধর্মাশ্রয়ীদের জন্য নির্দেশিত বিধান। গার্হস্থ্যজীবন যা সার্বজনীন তাকে সকল ধর্মে সবার ওপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকেও বিষয়টি বিবেচিত হয়েছে। গার্হস্থ্যজীবন আলোচনায় বিভিন্ন যুগের সকল বাঙালির আচার-আচরণ, চাল-চলন, খাওয়া-দাওয়া, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিবাহ, জন্ম-মৃত্যু, সহমরণ প্রথা, অলঙ্কার-প্রসাধনী, উৎসব-পার্বণ, সংস্কার-কুসংস্কার সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদ ; মধ্যযুগের বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখা। এই পরিচ্ছেদে ১২০১ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয় থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদৌল্লার পতন পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক উত্থান-পতনের রূপরেখা ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই বিশ্লেষণে যুক্ত হয়েছে এ-সময়ের বিভিন্ন শাসন আমলের সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য এবং আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের উপাত্ত হিসেবে সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যনীতি বিষয়ক তথ্যাবলি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ; এই অংশে লৌকিক প্রণয়কাব্য বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে বর্ণিত গার্হস্থ্যজীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের ধর্মীয় কাহিনি ও তার অন্তরালে বর্ণিত মানুষের মনোজগতের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত লৌকিক জগৎ ও মানবিক রূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : তৃতীয় পরিচ্ছেদ ; নাথসাহিত্য : এ পরিচ্ছেদে নাথ সাহিত্যের অন্তর্গত সেখ ফয়জুল্লা প্রণীত *গোরক্ষ বিজয়* কাব্য বিশ্লেষিত হয়েছে। এ কাব্যে শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক যোগতত্ত্ব ভ্রষ্ট গুরু মীননাথকে অপরাধ জগৎ থেকে কীভাবে উদ্ধার করা হয়েছে সেই কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। তবে কাব্যটিতে যোগতত্ত্বের অন্তরালে অদ্ভুত এক সংসার জীবনের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। সংসার জীবনের মোহ থেকে মীননাথকে আবার যোগী জীবনে ফিরিয়ে আনার দৃষ্টান্ত এবং মীননাথকে যোগতত্ত্বে স্থিত করার কথা বর্ণিত হলেও গৃহগত জীবনের একটি ভিন্নমাত্রিক রূপ কাব্যটিতে পরিস্ফুট। মীননাথের যোগী জীবনে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, সন্ন্যাসধর্ম ও গার্হস্থ্যধর্ম একই সাথে চলতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায় : চতুর্থ পরিচ্ছেদ ; এ পরিচ্ছেদে মধ্যযুগের বিশাল-ভাণ্ডার মঙ্গলকাব্যভুক্ত *মনসামঙ্গল*, *চণ্ডীমঙ্গল*, *শিবমঙ্গল*, *ধর্মমঙ্গল* ও *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে বিধৃত বাঙালির গার্হস্থ্যজীবন পৃথক ভাবে আলোচিত হয়েছে। মধ্যযুগের বাঙালি সমাজের বিবাহ, জন্ম-মৃত্যু, সন্তান প্রতিপালন ও তার শিক্ষা, দৈনন্দিন জীবন-পরিচয়, পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ, নারীগণের পতিনিন্দা, বারোমাস্যা, চৌতিশা, ধর্ম-কর্ম, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, প্রসাধনী, সামাজিক উৎসব-পার্বণ, যানবাহন, ঘর-গৃহস্থালি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি-সমরনীতি প্রভৃতি গৃহগত জীবনের বা যাপিত জীবনের আচরিত অপরিহার্য বিষয়াবলি উপাত্ত-উপকরণ ও বিশ্লেষণ সহযোগে উপস্থাপিত হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় আমাদের উদ্দেশ্য বা প্রতিপাদ্য মধ্যযুগের মানুষের জীবন-জীবিকা, চিন্তা-চেতনা, জগৎ-ভাবনা, জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবন পরিবেশ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা এবং সামাজিক ইতিহাস রচনার উপকরণ-উপাত্ত হিসেবে এগুলোর বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করা, তালিকাভুক্ত করা এবং সপ্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পরিপ্রেক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবার ও গার্হস্থ্যজীবন

প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পরিবার একটি অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। পরিবারব্যবস্থা সক্রিয় থাকার জন্যই জনসাধারণের আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি ও বর্ণসমূহের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষিত হয়। নবাগতদের লালন-পালন-ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, শিষ্টাচার, ঐতিহ্যরক্ষা ও মনুষ্যত্ববোধের বিকাশ ঘটানো পরিবারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বলে স্বীকৃত। পরিবারের অন্তর্গত মাতা-পিতার আশ্রয়ে ও স্নেহ-ভালোবাসায় শিশুমনের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। একটি শিশু জন্মগ্রহণের পর পরিবারের ছত্রছায়ায় লালিত পালিত হয়ে ক্রমান্বয়ে শিশু থেকে বালক, বালক থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক ইত্যাদি স্তর অতিক্রমের সময় পারিবারিক উত্তম ব্যবহার, উপযুক্ত আচার-আচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে সমৃদ্ধ করে। শিশু তার পরিবারের মধ্য থেকেই খাদ্যাভ্যাস, পারিবারিক মমত্ববোধ, সত্যবাদিতা, শোভন আচরণ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে এবং মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নির প্রতি নিজ নিজ কর্তব্য ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করে। সৎ পরিবারের অন্তর্গত মানুষ সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে সাহায্য করেন। পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি একই পরিবেশে বাস করার সময়েই যখন একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংস্কৃতির বাতাবরণ সৃষ্টি হয় তখনই একটি সুস্থ পরিবারের জন্ম হয়।

একটি পরিবারে সাধারণত স্বামী এবং স্ত্রী মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। শাস্ত্রকার মনু বলেন—বিয়ের পর স্ত্রী সর্বদা স্বামীর সাথেই অবস্থান করবেন এবং স্বামীরও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা। স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেন বলেই স্বামীর অপর নাম ভর্তা। 'ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্'। (মনুসংহিতা : ২০১৬ ; পৃ : ৭৯) মনুর মতে নারী কখনো স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারেন না। আধুনিক অনেক বিপ্লবী সমালোচক মনুর এ উক্তির কঠোর সমালোচনা করেছেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করলে বোঝা যায় এ উক্তির মধ্যদিয়ে স্ত্রীজাতির তথা নারীর অবমাননা করেননি বরং তাদের নিরাপত্তার দিকটি ভেবেই মনু উক্তিটি করেছেন। মনু মনে করতেন বিশেষ কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন না হলে নারী কখনো পিতা, স্বামী বা পুত্রের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। শাস্ত্রে আছে—বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে স্বামী এমন ব্যবহার করবেন, যাতে স্ত্রী ইহকাল ও পরকালে সুখ লাভ করেন। সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে তিনি কখনোই স্বামীর অপ্রিয় কোনো কাজ করবেন না এবং কোনো পর-পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন না। স্বামীকেও এমন গুণের অধিকারী হতে হবে যাতে স্ত্রী তাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন। যে পরিবারে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা নারীগণ সম্মানিত হন সেখানে দেবতারাও সন্তুষ্ট হন আর যে পরিবারে নারীরা অসম্মানিত হন সেখানে পুণ্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠানও নিষ্ফল হয়। যে কুলে ভগিনী এবং অন্যান্য নারী অসম্মানিত হন, সেই কুল সর্বতোভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আর যে পরিবারে পত্নী স্বামীর প্রতি এবং স্বামী পত্নীর প্রতি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন, সেই বংশের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

মনুর সময়ে সমাজে পিতা মাতার অবস্থান ছিল সবার ওপরে। সন্তান জন্মকালে মাতাকে যে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, শত বছরেও সন্তান মায়ের সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। সন্তান পিতা-মাতা কর্তৃক কঠোর ভাবে ভর্ৎসিত হলেও তাঁদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা কোনো সন্তানেরই উচিত নয়। মনুর মতে পিতা মাতাকে যথাক্রমে প্রজাপতি ও পৃথিবীর মূর্তি বিবেচনা করা উচিত। আর আচার্য হলেন পরমাত্মার মূর্তি এবং সহোদর ভ্রাতা সাক্ষাৎ নিজের মূর্তি। মাতা-পিতার ন্যায় আচার্য তাঁর শিষ্যের আধ্যাত্মিক ব্যাপারে এবং বেদাধ্যয়নাদি বিষয়ে বহু কষ্ট স্বীকার করেন, তাই তিনিও পরিবারস্থ একজন সদস্য। মানুষের কর্তব্য প্রতিদিন মাতা-পিতা ও আচার্যের হিত সাধনের দ্বারা প্রীতি উৎপাদন করা। কারণ এই তিনজন সন্তুষ্ট থাকলে সকল

Dhaka University Institutional Repository

তপস্যার ফল পাওয়া যায়। মনু বলেছেন 'মাতৃভক্তির দ্বারা ভূলোক, পিতৃভক্তির দ্বারা অন্তরিক্ষলোক এবং গুরুভক্তির দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়'। (মনুসংহিতা : ২০১৬ ; পৃ : ৮২) মাতা-পিতাকে সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করাকে সন্তানের সর্বাপেক্ষা মহৎ কাজ বলে শাস্ত্রকারগণ মনে করেন। পরিবারের সদস্যগণের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। ভাইয়ে-ভাইয়ে সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে মনু বলেছেন ভাই সাক্ষাৎ নিজের দ্বিতীয় মূর্তি তাই ভাইকে কখনই নিজের থেকে ভিন্ন মনে করে তাকে অবমাননা ও কলহ করা উচিত নয়। মনু জ্যেষ্ঠ ভাইকে পিতার সমান মনে করতে বলেছেন। তিনি পিতার মতোই পরিবারে পূজিত হন। পরিবারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অবস্থান অন্যান্য সন্তান থেকে একটু ওপরে। এ জন্য পিতা জীবিত থাকা সত্ত্বেও জ্যেষ্ঠ পুত্র বিয়ের সময় তার ছোট ভগিনীকে সম্প্রদান করতে পারেন। বড় ভাই পিতৃধনের প্রধান অধিকারী হলেও অন্যান্য ভাইয়ের মধ্যেও পিতৃসম্পত্তির অংশবিশেষ বিতরণ করার নিয়ম ছিল। পরিবারে অবিবাহিত বোনেরা ভাইয়ের সম্পত্তি থেকে এক চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হন। যদিও উত্তরকালে ভারতীয় সমাজে সম্পত্তির অধিকার থেকে নারীদের বঞ্চিত করা হয়।

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ মানব জীবনের আয়ুষ্কালকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। উনারা এক একটি ভাগকে এক একটি আশ্রম হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই আশ্রমগুলিকে একত্র চতুরাশ্রম বলা হয়। প্রাচীনকালে ভারতীয় হিন্দু শাস্ত্রে চারটি বর্ণ প্রথার মতো চারটি আশ্রমেরও অস্তিত্ব ছিল। মনুর মতানুসারে বর্ণধর্ম এবং আশ্রমধর্ম নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। ভারতীয় শাস্ত্রে মানুষের আয়ুষ্কালকে শতবছর ধরে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরের সময় সীমা পঁচিশ বছর। প্রথম পঁচিশ বছরকে বলা হয় ব্রহ্মচর্য, দ্বিতীয় পঁচিশ বছর গার্হস্থ্য আশ্রম, তৃতীয় পঁচিশ বছর বানপ্রস্থ এবং জীবনের শেষ পঁচিশ বছর সন্ন্যাস আশ্রম।

ব্রহ্মচর্য : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের জীবনে যে চারটি আশ্রম বিদ্যমান ছিল তার মধ্যে প্রথম ধাপটি হচ্ছে ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ বেদচর্যা ও বিদ্যাশিক্ষার কাল। মনু বলেন দ্বিজাতি তার জীবনের প্রথম চতুর্থ ভাগ অর্থাৎ সমগ্র জীবনের চারভাগের একভাগ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে গৃহী হবেন–

চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ॥
(মনুসংহিতা : ২০১৬ ; পৃ : ৫৬)

ব্রহ্মচারীকে ছাত্র বলা হতো। কারণ তিনি গুরুর দোষত্রুটি ছাঁদন করতেন। 'ছত্রং গুরো র্দোষাণামাবরণম। তৎ শীলমস্য ইতি ছাত্রঃ' (মনুসংহিতা : ২০১৬ ; পৃ : ৫৯) ব্রহ্মচারীরা গুরুর কাছেই থাকতেন বলে তাদেরকে 'অন্তেবাসী' বলা হতো। গুরুগৃহে শিক্ষালাভ বিদ্যার্থীদের জন্য সুখকরই ছিল। কারণ গুরুর পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যেই ব্রহ্মচারীরা বর্ধিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হতেন। গুরু নিজেই গায়ত্রী মন্ত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বেদদীক্ষা দিতেন। ব্রহ্মচারী শিষ্যগণকে গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করার পর সমাবর্তন স্নান সমাপ্ত করতে হতো। তারপর তারা স্নাতক ব্রহ্মচারী হয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। ব্রহ্মচর্যে তিন প্রকার স্নাতকের উল্লেখ পাওয়া যায়—'বেদস্নাতক (যাঁরা বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করেছেন), বিদ্যাস্নাতক (যাঁরা বেদ বিদ্যার অর্থজ্ঞান লাভ করে বিদ্যা সমাপ্ত করেছেন।) এবং ব্রতস্নাতক (৩৬ বৎসর ধরে তিনটি অধ্যয়ন ও বেদার্থ বিচার করেছেন)' (মনুসংহিতা : ২০১৬ ; পৃ : ৬২)। যে ব্রহ্মচারী আজীবন গুরুগৃহে বাস করতে ইচ্ছুক হতেন তাঁদেরকে 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী' বলা হতো। যিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হতে চাইতেন, তিনি তাঁর দেহমুক্তি পর্যন্ত গুরুগৃহে বাস করে গুরুর সেবা করতেন। (মনুসংহিতা : ২০১৬ ; পৃ: ৬২) তবে আজীবন ব্রহ্মচারী থাকা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল। ব্রহ্মচারী বিদ্যা সমাপনান্তে যখন ব্রতস্নান করবেন তখন সামর্থ্য-অনুসারে গুরুদক্ষিণা (জমি, সোনা, গরু, ঘোড়া, আসন, ধান) দেবেন। ব্রহ্মচারীরা অত্যন্ত সংযত, সংহত ও সন্নদ্ধ জীবন যাপন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

গার্হস্থ্য : স্নাতক ব্রহ্মচারী তাঁর জীবনের প্রথম পর্ব গুরুগৃহে বেদ ও তার শাখাগুলি অধ্যয়নের পর সমাবর্তনস্নান সমাপ্ত করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করতেন। জীবনের এই দ্বিতীয়ভাগে তিনি সবর্ণা, সুলক্ষণা, সুশ্রীনারীকে বিয়ে করে গৃহস্থ হতেন। মনুর মতে চারটি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। কারণ গৃহস্থাশ্রমই অন্যান্য তিনটি আশ্রমের ধারক ও পোষক। 'গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্তি হি' (মনুসংহিতা : ২০১৬ ; পৃ : ৬২)। ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের পর গার্হস্থ্যজীবনে পদার্পণ করাটাই বিধি। এর অন্যথায় বিঘ্ন ঘটে। চতুরাশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। কেননা এই আশ্রমই অন্য তিন আশ্রমের মানুষকে অন্ন ও শিক্ষা প্রদান করে থাকে। ব্রহ্মচারী উপার্জন করেন না, বানপ্রস্থীও উপার্জন করেন না, সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। একমাত্র গৃহস্থই অর্থ উপার্জন করেন। গৃহস্থগণ উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত থেকে সমগ্র বিশ্বকে প্রতিপালন করেন।

গৃহস্থের গার্হস্থ্যজীবন সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করতে একজন বুদ্ধিমতী সহধর্মিণী প্রয়োজন। গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য জীবিকা অর্জন করা। বিবাহের মাধ্যমে সন্তান-সন্ততি লাভ এবং তাদের ভরণ-পোষণসহ পারিবারিক জীবনে একজন গৃহস্থ প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞ করে থাকেন। পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ঋষিযজ্ঞ। মাতা ও পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করা, তাঁদের সেবা যত্ন করা সন্তানদের একান্ত কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সন্তানের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনের মধ্য দিয়ে একজন সন্তান পিতৃযজ্ঞ পালন করেন। জীবনধারণের জন্য মানুষকে কোনো না কোনো ভাবে প্রকৃতির দান গ্রহণ করতে হয়। এই দানের উৎস হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে স্রষ্টার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। তাই প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তু ভোগ করার সময় মানুষ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্রষ্টার উদ্দেশে তার ভোগ্যবস্তু নিবেদন করে থাকেন। এ কর্মটিকে বলা হয় দৈবযজ্ঞ। ভূতযজ্ঞ হচ্ছে পাখিসহ অন্যান্য জীবজন্তুর আহার প্রদানসহ নানা প্রকার পরিচর্যা। নৃযজ্ঞ হচ্ছে অতিথি সেবা করা। আর পদ্ধতিগত ভাবে বেদসহ প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি পাঠের দ্বারা জ্ঞান ও নৈতিকতা অর্জনের প্রচেষ্টাকে বলা হয় ঋষিযজ্ঞ।

মানুষ সামাজিক জীব। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রয়োজনেই তাকে সমাজ থেকে বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। মানুষকে তার দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য যেমন খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা প্রভৃতি সেবা গ্রহণের জন্য সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকের দ্বারস্থ হতে হয় তেমনি সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষকে বিভিন্ন জনসেবামূলক কাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয়, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, প্যাগোডাসহ বিভিন্ন উপাসনালয় স্থাপনও করতে হয়। এগুলো গার্হস্থ্যধর্ম চর্চার অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মচর্য শেষে বিয়ে করে সংসারধর্ম পালনের সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনও গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্গত।

বানপ্রস্থ : গৃহস্থের আমৃত্যু সংসারে আসক্ত থাকাটা মনু অনুমোদন করেননি। মনু বলেছেন দ্বিজ দারপরিগ্রহ করে তার পরমায়ুর দ্বিতীয় ভাগ গৃহস্থাশ্রমে বাস করবেন—'দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে ভবেৎ' (মনুসংহিতা : ২০১৬ ; পৃ : ১১২) মনু মনে করেন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন দ্বিজাতি যথাশাস্ত্র গৃহস্থাশ্রমের ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করে জিতেন্দ্রিয় ভাবে বিধিমতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন। যখন গৃহস্থ মনে করবেন সাংসারিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণে তার অনুপস্থিতি সংসারে বা সমাজে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না, তার শরীরে চামড়ার শিথিলতা এসেছে, চুলে পাক ধরেছে এবং পুত্রেরও পুত্র জন্ম গ্রহণ করেছে এই রকম একটা বিশেষ বয়স উপস্থিত হলে গৃহস্থের গৃহ ত্যাগ করে বনে প্রস্থান করাকেই বানপ্রস্থ বলা হয়। এখানে গৃহস্থের সংসার জীবনের সঙ্গী তার স্ত্রী সঙ্গে থাকতে পারেন তবে তাদের জীবনাচরণে সংযম, ত্যাগ ও নির্লোভ থাকতে হবে। এ সময় বানপ্রস্থিগণ ব্রীহি ও যব হতে উৎপন্ন অন্ন পরিত্যাগ করবেন। বানপ্রস্থে অবস্থানকারীর জীবনযাত্রা কেমন হবে মনু তার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন- ১. এই সময় তাকে

ইন্দ্রিয়সংযম করতে হবে। ২. গৃহস্থের যে শৌচনিয়ম, ব্রহ্মচারীর পক্ষে তার দ্বিগুণ এবং বানপ্রস্থে তার শৌচনিয়ম হবে তিন গুণ। বানপ্রস্থে দ্বিজ অরণ্যজাত শাক, ফলমূল দিয়ে প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেন, সন্ধ্যায় এবং ভোরে স্নান করবেন, শ্মশ্রু, নখ ও লোম কাটবেন না। তিনি তার ভক্ষ্যদ্রব্য থেকে ভিক্ষুককে সাহায্য করবেন এবং আশ্রমে আগত অতিথিদের অর্চনা করবেন। বানপ্রস্থাশ্রমী বেদাধ্যয়নে সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত করবেন। তিনি হবেন নিরহঙ্কার, মিত্রভাবাপন্ন, পরোপকারী, দানশীল, প্রতিগ্রহনিবৃত্ত ও সমস্ত প্রাণীর প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ। তিনি আশ্রমে হোম যজ্ঞ করবেন। মদ, মাংস বর্জন করবেন। তিনি স্বল্প আহার গ্রহণ করবেন এবং মাঝে মাঝেই উপবাস করবেন। তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপাঃ হবেন অর্থাৎ চারিদিকের অগ্নিতাপের মধ্যে বা প্রখর সূর্যের নিচে দাঁড়িয়ে থাকবেন। বর্ষাকালে বৃষ্টিরধারা সহ্য করবেন, হেমন্তে আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করে কঠোর তপস্যায় মগ্ন থাকবেন। প্রচণ্ড শারীরিক পীড়াদায়ক অবস্থাতেও ব্রত ভাঙবেন না। দেহকে শুষ্ক করে ফেলা বানপ্রস্থাশ্রমীর অবশ্যই করণীয় কাজ। এই সব বাহ্যানুষ্ঠান ছাড়াও বানপ্রস্থাশ্রমীর অন্তরের শুদ্ধিও একান্ত প্রয়োজন এবং এ জন্য তাঁকে আরও কয়েকটি নিয়ম পালন করতে হয়— ১. তিনি সুখকর বস্তুতে যত্নশীল হবেন না। ২. স্ত্রী সম্ভোগ করবেন না। ৩. মাটির ওপর খড়কুটো বিছিয়ে শয়ন করবেন। ৫. ঘর-বাড়ি ও সন্তানাদির প্রতি মায়াশূন্য হবেন। ৬. গাছ তলায় বসত করবেন এবং তাপস ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে ও অন্যান্য বনবাসী গৃহস্থ দ্বিজদের কাছ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করবেন। ৭. ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য উপনিষৎসহ নানা প্রকার শ্রুতি অভ্যাস করবেন। এর ফলে তার শরীরের শুদ্ধি সংঘটিত হবে। এভাবে ভয় ও শোকরহিত হয়ে দ্বিজ (মৃত্যুপ্রাপ্ত না হলে) জীবনের তৃতীয় ভাগ বানপ্রস্থাশ্রমে কাটিয়ে, সকল প্রকার সঙ্গ বিসর্জন দিয়ে জীবনের চতুর্থ ভাগ সন্ন্যাস আশ্রমের অনুষ্ঠান করবেন—

> 'বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ংভাগমায়ুষঃ।
> চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ'॥
> (মনুসংহিতা : ২০১৬ ; পৃ : ১১৩)

মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ এবং অশ্বমেধযজ্ঞের পর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সাথে কুন্তীও সকল রাজ্যসুখ ত্যাগ করে শতযূপের আশ্রমে গমন করেন। বনবাসের প্রাক্কালে তাঁর পুত্রগণ তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কুন্তী সকল বাধা উপেক্ষা করে, সকল আসক্তি থেকে নিবৃত্ত হয়ে মোক্ষ লাভের উদ্দেশে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। কিন্তু *চণ্ডীমঙ্গলে* দেখা যায় ধর্মকেতু এবং নিদয়া পুত্র কালকেতু এবং পুত্রবধূ ফুল্লরার ওপর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে মোক্ষ লাভের উদ্দেশে বারাণসী গমন করলেন এবং সেখানে কালকেতু-ফুল্লরা শ্বশুর-শাশুড়ির জন্য মাসে মাসে মাসোহারা পাঠাতেন এর ইঙ্গিতও আমরা পেয়েছি যা বাংলার মধ্যযুগীয় জীবনধারার নিদর্শন বলে মনে হয়। ধর্মকেতু-নিদয়ার বারাণসী গমনের মধ্য দিয়ে এটাও প্রমাণিত হয় যে বানপ্রস্থে যাওয়ার বিধান থাকলেও সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ বনবাসী না হয়েও গৃহ ত্যাগ করে পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে বৈরাগ্যময় জীবন-যাপন করতে পারেন। একবিংশ শতাব্দীতে এর আরও আধুনিক সংস্করণ হিসেবে মানুষ কখনো স্বেচ্ছায় আবার কখনো পুত্রকর্তৃক বাধ্য হয়ে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নেয়।

সন্ন্যাস : ধর্ম সাধনার চারটি স্তরের প্রথম স্তর অর্থাৎ 'ব্রহ্মচারীর বিশেষ ধর্ম স্বাধ্যায়, দ্বিতীয় স্তর গৃহস্থের যজ্ঞ ও দান, তৃতীয় স্তর বানপ্রস্থ তপস্যার দ্বারা যে পরমাত্মাকে জানতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তাকেই জানার জন্য ঐ বানপ্রস্থাশ্রমী ন্যাস অবলম্বন করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন'। (মনুসংহিতা : ২০১৬ ; পৃ ১১৪) সন্ন্যাস ব্রত আশ্রম জীবনের শেষ পর্যায়। সাধারণত জীবনের শেষ পঁচিশ বছর সন্ন্যাস ব্রত পালন করার নিয়ম শাস্ত্রে নির্দেশিত আছে। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। এই আশ্রমে সন্ন্যাসী একাকী জীবনধারণ করেন। সন্ন্যাসীর সাথে তার জীবনসঙ্গীও অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারবেন না। সন্ন্যাসী জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। মাত্র দুপুরের আহার তিনি লোকালয় হতে সংগ্রহ করবেন। বাকি দু'বেলা ফলমূল ও দুধ সংগ্রহ করে স্বল্প পরিমাণ আহার করবেন। আশ্রয়হীন অবস্থায় মন্দিরে বা কোনো দেবালয়ে ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম নিতে পারেন। পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে অত্যন্ত সাধারণ থাকবেন। অতীত জীবনের স্মৃতি ভুলে একনিষ্ঠ চিত্তে ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন থাকবেন। শাস্ত্রবচনে জানা যায় 'দণ্ডগ্রহণেমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ'—সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই মানুষ নারায়ণ বা দেবতা হয়ে যায়। তবে সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে কর্মফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছে।

অনাশ্রিত কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়॥

অর্থাৎ কর্মফলের বাসনা না করে যিনি কর্তব্যকর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। শাস্ত্রীয় যুগবিভাগ অনুসারে বর্তমান যুগ কলিযুগ। এ যুগে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এ চার আশ্রমের অনুশীলন একত্র সম্ভব নয়। বর্তমানে ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থ আশ্রম নেই বললেই চলে। তবে ব্রহ্মচর্য অধ্যায়টি বর্তমানে ছাত্রজীবনে সংশ্লিষ্ট। বর্তমান সময়ে গার্হস্থ্য আশ্রম-এর চর্চা বেশি, সন্ন্যাস কদাচিৎ লক্ষ করা যায়। বর্তমান সময়ের দাবিতে এবং জীবনভোগের অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও মাতা-পিতা নিয়ে একত্র বসবাস করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং আনন্দ পায় তাই এদেরকে পরিত্যাগ করে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস গ্রহণে ততটা উৎসাহী হতে দেখা যায় না। এছাড়া সকল ধর্মে গার্হস্থ্যধর্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করা হয়। কলিযুগে গার্হস্থ্য আশ্রমে থেকেই ধর্ম সাধন শ্রেয় এবং এতেই মানুষের জীবন সার্থক, কল্যাণময় এবং মঙ্গলময় হয়। মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে—

যথা বায়ু সমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ॥
(মনুসংহিতা : ২০১৬ ; শ্লোক সংখ্যা ৭৭, পৃ : ৩৭৭)

সকল প্রাণী যেমন প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করে জীবনধারণ করে তদ্রূপ গৃহীকে আশ্রয় করেই অন্যান্য আশ্রমের লোকেরা বেঁচে থাকেন। বলা যায় গার্হস্থ্য আশ্রমই অন্যান্য আশ্রমকে জীবনবায়ু সরবরাহ করে বাঁচিয়ে রাখে। অতিথি সৎকার, ভূতবলি ও দেবযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে গৃহস্থ জগতের হিত সাধন করে থাকেন। এই কারণেই গার্হস্থ্য আশ্রম সকল আশ্রমীর প্রাণতুল্য। গার্হস্থ্যজীবনের ওপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে পরিবারতন্ত্র।

সাধারণ অর্থে পরিবার হচ্ছে আত্মা ও আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ যৌথবদ্ধ সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি দল বা সংগঠন। পরিবারের সাথে প্রধানত বাসস্থান, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহনশীলতা, সমঝোতা এবং সন্তান উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী পিটার মার্ডক (Murdock) পরিবারের সনাতন সংজ্ঞার্থে বলেছেন 'পরিবার হচ্ছে একটি সামাজিক গোষ্ঠী যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাধারণ আবাসস্থল, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং প্রজনন। এই পরিবারের সাথে অন্তর্গত থাকে বিপরীত লিঙ্গের প্রাপ্তবয়স্ক দু'জন ব্যক্তি অন্তত যারা সামাজিক ভাবে স্বীকৃত যৌন-সম্পর্ক বজায় রাখে এবং এর সঙ্গে আরও যুক্ত থাকে যৌনসম্পর্কযুক্ত নারী-পুরুষের নিজস্ব বা দত্তক নেওয়া এক বা একাধিক সন্তান'। সুতরাং পরিবার বলতে এমন একটি সামাজিক সংগঠনকে বোঝায় যা সমাজ স্বীকৃত পন্থায় পরিজনসহ নারী-পুরুষের একত্র বসবাসের স্থান হিসেবে বিবেচিত এবং মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পরিপূরণের প্রাথমিক কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত। বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে নারী-পুরুষ একত্র এই কেন্দ্রে বসবাস করে এবং সন্তান-সন্তানাদির জন্ম দেয়। আবার মা-বাবাসহ পূর্ব প্রজন্মসমূহের পরিজনসহ পরিবারের অন্যান্য

সদস্যও পরিবারের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী Sumner and Keller পরিবারের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করেছেন এভাবে–'The family is as a miniature social organization, including at least two generations, and is characteristically formed upon the blood bond' (Koenig : 1969 ; p : 129)

বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী MacIver and Page পরিবারের সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন এভাবে-'The family as a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children.'

পরিবারের সংজ্ঞার্থ বিশ্লেষণ করে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার এবং পেজ পরিবারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেছেন—

ক. বিশ্বজনীনতা : এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। পৃথিবী সৃষ্টির পর হতে সকল দেশে সকল কালে সকল স্তরে পরিবারের অস্তিত্ব বিদ্যমান। প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

খ. পরিবারের ভিত্তি হচ্ছে মানুষের কতগুলি গভীর প্রেরণা ও প্রবণতা। এ প্রবণতার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাথী নির্বাচন ও যৌনক্রিয়া, সন্তান উৎপাদন, মাতৃ ও পিতৃস্নেহ। গৌণক্রিয়ার মধ্যে অন্যতম হলো আবেগ, রোমান্টিক প্রেম, বংশগৌরব, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত মালিকানার ঈর্ষা এবং বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নিভৃত আকাঙ্ক্ষা।

গ. সৃষ্টিকুলের প্রতিটি জীবের প্রাথমিক আশ্রয়স্থল হচ্ছে পরিবার। মানবশিশুও এর ব্যতিক্রম নয়। চরিত্র গঠনে পরিবারের প্রভাব অপরিসীম।

ঘ. সামাজিক সংগঠনের মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংগঠন হচ্ছে পরিবার। জৈব কারণেই এটি আকারে ক্ষুদ্রতর হয়।

ঙ. পরিবার সমাজের কেন্দ্রস্থল। অবশ্য সভ্যতার উচ্চতর স্তরে নানাবিধ সামাজিক সংস্থার সৃষ্টি হয়, কিন্তু এ সংস্থাও একাধিক পরিবারের সমষ্টি।

চ. সভ্যগণের ওপর পরিবারের দাবি নিরবচ্ছিন্ন এবং অন্যান্য সামাজিক সংস্থা থেকেও অধিকতর। সংকটকালে মানুষ দেশের জন্য জীবন দিতে পারে কিন্তু পরিবারের জন্য তারা সারাজীবন পরিশ্রম করে। কারণ পরিবারের প্রতি তাদের গভীর আবেগ থাকায় তারা পরিবারের সকল দায়িত্ব হাসিমুখে গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়।

ছ. পরিবার একটি সামাজিক অনুশাসন। বিবাহচুক্তি যেমন সমাজ অনুমোদিত সেরকম বিবাহবিচ্ছেদও সমাজ নিয়ন্ত্রিত।

জ. পরিবার প্রথা বিশ্বজনীন ও চিরন্তন। কিন্তু পারিবারিক সম্পর্ক কখনও কখনও অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল ও তিক্ততায় রূপ নেয়। (খগেন্দ্রনাথ সেন : ১৯৯৮ ; পৃ : ৫৫–৫৬)

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় যৌথ পরিবার

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে একটি সুবৃহৎ এবং সুপ্রাচীন দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ। আয়তন বিচার ও জনসংখ্যার দিক থেকেও এটি পৃথিবীর একটি অন্যতম জনবহুল দেশ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং ভাষা বিচারেও ভারতবর্ষে ব্যাপক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতভূমিতে বহুভাষী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ পাশাপাশি বসবাস করে। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে ভারতবর্ষে পারিবারিক কাঠামোতেও দেখা দেয় ব্যাপক বৈচিত্র্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গ্রাম, শহর এবং বহুবিধ প্রাদেশিক প্রভাব ভারতবর্ষের পরিবার ব্যবস্থার ওপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। পৃথিবীর যে কোনো দেশের পরিবার ব্যবস্থার সাথে সে–দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক

ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ দেশই অর্থনীতিক বিচারে কৃষিপ্রধান। ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতবর্ষের অর্থনীতিও মূলত কৃষি নির্ভর। এ দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক অভিন্ন পারিবারিক সংগঠন এ উপমহাদেশে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ সকল কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সমাজের পারিবারিক কাঠামোতে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের কৃষিভিত্তিক সমাজের সাবেকি পরিবার ব্যবস্থাও পৃথিবীর বিভিন্ন কৃষিপ্রধান দেশের গ্রামীণ সমাজের পারিবারিক সংগঠনের অনুরূপ। এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থাকে বলা হয় একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবার। এ যৌথ পরিবার গড়ে ওঠে রক্তের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে। যৌথ পরিবার সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধন এবং জাতিগত ঐতিহ্যের প্রতীক। প্রাচীনকালে ভারতের এই যৌথ পরিবারগুলিতে তিন পুরুষ বা কখনো কখনো চার পুরুষের একত্র বসবাস লক্ষ করা যায়। এ পরিবারে পিতা, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র একত্র বসবাস করে। এছাড়াও বংশধরদের সাথে সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়-স্বজনও এ পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য হয় এবং একত্র বসবাস করে। বিবাহিত কন্যারা পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে গেলেও বেশির ভাগ সময়ে বিধবা কন্যা শ্বশুর বাড়ির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে বাপের বাড়ি চলে আসে। এ পরিবারে মাতা-পিতা, ভাই-বোন, সন্তানাদি, ভ্রাতৃবধূ কিংবা পুত্রবধূর সহাবস্থান পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের যৌথ পরিবারের সদস্যরা যৌথ সম্পত্তির অংশীদার হন এবং সদস্যরা থাকেন একান্নবর্তী ও এক কর্তৃত্বাধীন। এ ধরনের পরিবারে বিয়ে একটি পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। পরম্পরা অনুযায়ী যৌথ পরিবারে গৃহদেবতা বা কুলদেবতা অভিন্ন। এ পরিবারের সদস্যরা একই ছাদের নিচে বসবাস করেন, একই হাড়ির অন্ন খান এবং যৌথভাবে পারিবারিক সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করেন। তারা পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। যৌথ পরিবারের সংজ্ঞার্থে Dr. Irawati Karve তাঁর *Kinship Organisation in India* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন—‘A joint family is a group of people, who generally live under one roof, who eat food cooked at one health, who hold property in common and who participate in common worship and are related to each other as some particular type of kindred.’ সমাজ বিজ্ঞানী হেনরী মেইন (Henry Maine) ভারতীয় যৌথ পরিবার ব্যবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—‘The Hindu joint family is a group constituted of known ancestor adopted sons relatives related to these sons through marriage.’ প্রদত্ত সংজ্ঞার্থের আলোকে সমাজ বিজ্ঞানীরা ভারতবর্ষের আদি যৌথপরিবারের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন : ক. পারিবারিক সম্পত্তির যৌথ অধিকার, খ. বাসস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পিতৃবাসস্থানিক,গ. কর্তৃত্বের বিচারে পিতৃশাসিত. ঘ. পিতৃবংশানুসারে বংশ পরিচয় ও উত্তরাধিকার নির্ধারণ, ঙ. সপিণ্ড প্রথা। (অনাদিকুমার মহাপাত্র : ১৯৯৮ ; পৃ. ৩০১- ৩০২)

যৌথ বা বিস্তৃত পরিবার স্বভাবতই একক পরিবার অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী। মাতা-পিতা কিংবা তাদের কেউ একজন মৃত্যুবরণ করলে একক পরিবার অসহায় বোধ করে কারণ তখন পাশে দাঁড়ানোর কেউ থাকে না। তবে যৌথ পরিবারে অসহায়বোধ কিছুটা কম হয় কারণ পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ না কেউ অবস্থান করেন। আর্থিক সংগতির দিক থেকেও যৌথ পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতীয় সমাজ তথা ঐতিহ্যবাহী কৃষি সমাজের মূল ভিত্তি হচ্ছে যৌথ পরিবার। যদিও বর্তমান সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে যৌথ পরিবার প্রথা অবক্ষয়প্রাপ্ত এবং প্রায় বিলুপ্ত। মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিবারতন্ত্র প্রত্যক্ষ করা যায় সেখানে একান্নবর্তী (যৌথ পরিবারই) বেশি, কখনো কখনো বহুপত্নী পরিবারও বিদ্যমান ছিল। কারণ মধ্যযুগে অনেক রাজা-বাদশা বিশেষ করে সামন্তরাজারা একাধিক পত্নী গ্রহণ করতেন। যদিও সামন্তরাজাদের পত্নীরা তাঁদের শ্বশুর, শাশুড়ি, দেবর-ননদ সবাই মিলে একত্র বসবাস করতেন। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে

লাউসেন, *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে হরিহোড় এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার একাধিক স্ত্রী নিয়ে যৌথ পরিবারে বসবাস করতেন।

পরিবার হচ্ছে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় গার্হস্থ্যজীবনের মূলসংগঠন। মানুষের জীবনে পরিবারের স্থান ধর্মস্থানের চেয়েও ওপরে। ভারতীয়রা এখনও পরিবার-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার অনুশাসনে মানুষ। মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় একান্নবর্তী পরিবার মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী, পুত্র-কন্যাসহ পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিকে নিয়ে একত্র শান্তির নীড় তৈরি করেন। 'ঐতিহাসিক যুগের সূত্রপাত থেকেই হিন্দুস্থানের সঙ্ঘবদ্ধ সমাজজীবনের মুখ্য উপাদান পরিবার প্রথা, তারই ক্রমপরিণতি স্বরূপ হিন্দু যৌথ পরিবার প্রথার উদ্ভব। এই যৌথ পরিবারের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য, প্রথমত পরিবারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু থাকে না ; দ্বিতীয়ত ; পিতৃপুরুষাগত এজমালি সম্পত্তিতে পরিবারের প্রতিটি পুরুষ সদস্যের অধিকার স্বীকৃত এবং এই সম্পত্তি থেকেই পরিবারের পুরুষদের ও তাদের স্ত্রী পুত্র-কন্যার ভরণ-পোষণ চলে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে তারা পিতৃ-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।' (কে. এম .আশরাফ : ১৯৯৪ ; পৃ : ১৮৩)

মধ্যযুগের বাংলা কাহিনিকাব্য বিশ্লেষণে আমরা ভারতীয় হিন্দু বাঙালির জীবনাচরণ বিশেষ করে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের বিভিন্ন অধ্যায় যেমন খাদ্যাভ্যাস, বসন-ভূষণ, শিক্ষা, বাসস্থান, বিলাসিতাসহ নানা বর্ণময় চিত্রের পাশাপাশি নানা পার্বণিক অনুষ্ঠানেরও বিবরণ পাই। এ জন্য মানুষকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে। তার এ সংগ্রাম অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। চলার পথে শত সহস্র অন্তরায়কে অতিক্রম করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর নামই জীবন। জীবনের এ উদ্বর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ পায় তার নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্মে ও প্রতিমুহূর্তের ক্রিয়াশীলতায়। জীবন ধারণের প্রয়োজনে সকলকে প্রায় একই রকমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে যেতে হয়, তবে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় প্রত্যেকের ভাবনায় এবং ভাবনা পদ্ধতিতে। সাধারণত বাঙালি চেতনার প্রকাশ ঘটে তার দৈনন্দিন জীবনচর্যায় ; তার কোমলতা, পেলবতা, আবেগ-আনন্দ, ভাল লাগা, খারাপ লাগা, পাওয়া-না-পাওয়া সবই মূর্ত হয়ে ওঠে তার নিত্য দিনের আহার্য, পরিধেয়, আশ্রয়, মনোরঞ্জন পদ্ধতির বিচিত্র প্রকাশে।

অন্ন চিন্তা মানুষের বড় চিন্তা। প্রাণরক্ষার জন্য খাবার অত্যাবশ্যকীয়। আদিম যুগে মানুষ কাঁচা মাংস, ফল-মূল ও লতা-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করত। সভ্যতার ক্রম বিকাশে ধীরে ধীরে মানুষ খাদ্য উৎপাদন ও রন্ধন কৌশল শিখেছে এবং সুস্বাদু খাবার রান্না করে পরিবারের সদস্যদের আপ্যায়ন করে আনন্দ পাচ্ছে। ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া, জলবায়ু, মাটির প্রকৃতি প্রভৃতির ওপর খাদ্যোৎপাদন ও গ্রহণ পদ্ধতি নির্ভর করে। '*রিয়াজ-উস-সলাতীন*-এর লেখক গোলাম হোসায়ন সলীম, *খুলাসাৎ* রচয়িতা সুজন রায় ভাণ্ডারী বাঙালির প্রাথমিক খাবার হিসেবে উল্লেখ করেছেন ভাত ও মাছের। তাঁদের মতে, বাংলায় গমের ফলন অপেক্ষাকৃত কম এবং বাঙালিরা গম বা রুটি খেতে বিশেষ পছন্দ করে না। আবুল ফজল তাঁর *আইন-ই-আকবরী*-তে বাংলায় ধানের বিপুল সমৃদ্ধির কথা জানিয়েছিলেন। তিনি এত দূর পর্যন্ত লিখেছিলেন যে, এখানে উৎপাদিত অজস্র প্রকার ধানের কণা সংগৃহীত হলে একটি মৃৎকলসী ভর্তি হতে পারে'। (সনৎকুমার নস্কর : ১৯৯৫ ; পৃ. ১২৫-২৬) ভারতীয় উপমহাদেশ সেই আদিকাল থেকেই কৃষিতে অনেক উর্বর। এ অঞ্চলের কবি-সাহিত্যিকগণও কৃষিতে অনেক অভিজ্ঞ। তাঁদের রচনায় বিভিন্ন জাতের ধান যেমন- কামিনী, পুণ্যভোগ, পারিজাত, জামাইনাড়ু, নীলাবতী, খয়েরশালী, কনকচূড়, চন্দ্রমণি প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। খাবারের বর্ণনা দিতে গিয়ে মঙ্গলকাব্য রচয়িতাগণ রন্ধন- প্রণালীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা দেখে পাঠক একদিকে যেমন (অভিজাত পরিবারের) খাবারের তালিকা দেখে বিস্মিত হন তেমনি (অন্ত্যজ শ্রেণির) খাবারের তালিকা দেখে হন বেদনায় ব্যথিত। কবি বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* এবং ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের *অন্নদামঙ্গল*, মানিকরাম গাঙ্গুলির *ধর্মমঙ্গল* প্রভৃতি

কাব্যে রান্নার যে রাজকীয় বর্ণনা আছে তা পাঠককে অবাক করে। প্রায় পঞ্চাশ প্রকার খাবারের বর্ণনা এবং তা রান্নার পদ্ধতিও কবিগণ বিবৃত করেছেন। খাবার প্রস্তুতকরণে তিন ধরনের পদ্ধতি ছিল—আমিষ, নিরামিষ এবং মিষ্টান্ন দ্রব্য। মঙ্গলকাব্যে একদিকে যেমন আমরা রাজকীয় রান্নার বর্ণনা তথা খাবারের তালিকা পাই অন্যদিকে হতদরিদ্রের খাবার তালিকা পাঠককে বেদনার্ত করে। *চণ্ডীমঙ্গলে* কালকেতু-ফুল্লরা এবং *অন্নদামঙ্গলে* বিষ্ণুহোড় পত্নীর জীবনযাত্রা হতদরিদ্র মানুষের অবস্থান নির্দেশ করে। একদিকে কবি বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* কাব্যে লক্ষ করি সোনকার সাধভক্ষণের অনুষ্ঠানে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না হচ্ছে অন্যদিকে *চণ্ডীমঙ্গলে* নিদয়ার সাধ অনুষ্ঠানে দেখি সাদামাটা খাবারের আয়োজন। কালকেতুর ভোজনে প্রতিফলিত হয়েছে প্রান্তিক সমাজের প্রতিচ্ছবি।

নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, খাল-বিলে ভরা বাংলা দেশ। ফলে এ অঞ্চলে প্রচুর মাছের সমারোহ। সৃষ্টি থেকেই মাছ বাঙালির খাদ্য তালিকায় প্রথম এবং প্রধান স্থান দখল করে আছে। প্রবাদ আছে মাছে-ভাতে বাঙালি। বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মধ্যে-রুই, কাতলা, মৃগেল, কই, চিতল, মাগুর, ইলিশ, শোল, বোয়াল, রিঠা, পাবদা, পুটি, ইচা, ভেকুট, ফলই, মায়া, সোনাখড়, আড়ি, বাচা, চেলা, টেঙরা, কালবসু, ভেদা, খলিশা, খড়স্বলা প্রভৃতি ছিল বাঙালির নিত্যদিনের খাবারে প্রিয় মাছ। এই সমস্ত মাছ সবজিসহ অথবা সবজি ছাড়া কীভাবে রন্ধন করলে স্বাদ বৃদ্ধি পায় তার একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন কবি দ্বিজ বংশীবদন দাস তাঁর *মনসামঙ্গল* কাব্যে—

বড় বড় কই মৎস্য ঘন ঘন আঞ্জি
… … …
কাতলের কোল ভাজে মাগুরের চাকি
চিতলের কোল ভাজে বসবাস মাখি॥
ইলিশ তলিত করে বাচা ও বাঙ্গনা।
শউল খণ্ড ভাজে আর শউল পোনা॥
রিঠাপুঠা ভাজিলেক তৈলের সহিত॥
বেত আগ পলিয়া চুঁচুরামৎস্য দিয়া।
শুকতা ব্যঞ্জন রান্ধে নালিতার ঝোল।
পুরান কুমড়া দিয়া রোহিতের কোল॥
… … …
বাগুন দ্বিখণ্ড করি তাত লাউ যোগ।
মাগুর মৎস্য সহ রান্ধে কোঞর ভোগ॥
নবীন কুমড়া দিয়া কই মৎস্য সনে।
নিপুল বাইয়া ঝোল রান্ধিল বন্ধনে॥
(জলিল : ১৯৯৬ ; পৃ : ৪৪-৪৫)

মঙ্গলকাব্যে যারা অভিজাত সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন যেমন *মনসামঙ্গলে* চাঁদ সদাগর, *চণ্ডীমঙ্গলে* ধনপতি সদাগর, *অন্নদামঙ্গলে* ভবানন্দ মজুমদার, *ধর্মমঙ্গলে* লাউসেন প্রমুখের পরিবারে খাবারের বর্ণনায় বিভিন্ন প্রকার মাছ, মাংস এবং মিষ্টান্ন দ্রব্যের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় যা অভিসন্দর্ভে সংশ্লিষ্ট কাহিনিকাব্যের আলোচনায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।

নিরামিষ ব্যঞ্জন ছিল বাঙালি হিন্দুর অন্যতম প্রিয় খাবার। বিশেষত বৈষ্ণবেরা ছিলেন নিরামিষভোজী। নিরামিষ রান্নাতেও বাঙালি হিন্দু গৃহবধূরা ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। শ্রীচৈতন্যদেবকে খাওয়ানোর জন্য তাঁর এক ভক্ত শিষ্য কয়েক প্রকার নিরামিষ রান্না করেছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে—

দশ প্রকার শাক নিম্ব সুকুতার ঝোল।

মরিচের ঝাল ছানাবড়া বড়ী ঘোল॥
দুগ্ধতম্বী, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড, বেসারি লাফরা।
মোচা ঘণ্ট মোচা ভাজা বিবিধ শাকরা॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুল বড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার॥
নব নিম্ব পত্রসহ ভৃষ্ট বার্তাকী।
ফুলবড়ী পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
ভৃষ্ট মাষ, মুদগসূপ অমৃতে নিন্দয়।
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়॥
মুদগবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেলী আর যত পুষ্ট॥
(জলিল : ১৯৯৬ ; পৃ : ৪৫)

বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রসার মিষ্টান্ন দ্রব্যের বহুল প্রচলনের কারণ বলে অনেকে মনে করেন। মুকুন্দরামের কাব্য থেকে মোদক শ্রেণির উল্লেখ পায় যারা মিষ্টান্ন দ্রব্য তৈরি এবং বিপণন কাজে সম্পৃক্ত। রায়শেখরের পদাবলিতে বেশ কিছু খাবারের নাম পাওয়া যায়: কর্পূর-মালতি, মনোহরা মতিচূর, পেড়া, চন্দ্রচূড়া, কদম্ব, মণ্ডা ইত্যাদি। ফলমূলের প্রতি বৈষ্ণবেরা ছিলেন বেশ অনুরক্ত। আচার ছিল এদের বেশ পছন্দের খাবার। আমসী, আমসত্ত্ব, আমকাসুন্দি, আদাকাসুন্দি, ঝালকাসুন্দি ইত্যাদি মুখরোচক চাটনি হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। অভিজাত পরিবারে রান্নার তালিকায় বিভিন্ন প্রকার মাছ, মাংস, ডাল, শাক-সবজির বিবরণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার শাকের বর্ণনা এবং রন্ধন-পদ্ধতি এমনকি শাক তোলার বিস্তারিত বর্ণনা মঙ্গলকাব্যে বিধৃত আছে। বিত্তবানের পাশে কবিরা রিক্তের চিত্রও অঙ্কন করেছেন। কবি *কঙ্কণচণ্ডীতে* ফুল্লরার বারোমাসি বর্ণনা এবং কালকেতুর খাবারের তালিকা বর্ণনার মধ্য দিয়ে হতদরিদ্র বাঙালির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ব্যাধ নারী নিদয়ার সাধভক্ষণে তেমন কোনো আড়ম্বর ছিল না। নিদয়ার সাধ অনুষ্ঠানে বাঙালির চির-পরিচিত কিছু সস্তা খাবার রান্না হয় এর সাথে যোগ করা হয় পোড়া মাছ, হাঁসের ডিম ভাজা ও চিংড়ি মাছের বড়া। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে অঙ্কন করেছেন হরিহোড়ের পিতার দারিদ্র্য ও দৈন্যাবস্থা। সমাজের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এমন অভাবী মানুষ, যারা দুবেলা দু-মুঠো ভাত মুখে দিতে পারে না। অন্যদিকে ধনীর আহারে থাকত পঞ্চাশ ব্যঞ্জনসহ খাবারের বিশাল তালিকা। পুষ্টিকর খাবারের তালিকায় আছে ডিমের উল্লেখ। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় হাঁসের ডিম খেতেন। হিন্দুরা কখনো কখনো কচ্ছপের ডিম খেতে পছন্দ করতেন। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের উৎকৃষ্ট খাবারের তালিকায় মাংসের উল্লেখ আছে। হরিণ, পাঁঠা, খাসী, কবুতরের মাংস হিন্দুদের খুব পছন্দ ছিল। কচ্ছপের মাংসও অনেক হিন্দু পছন্দ করতেন। হিন্দুদের খাবারের তালিকায় মাংসের উল্লেখ আমাদের আলোচ্য প্রতিটি কাব্যে পৃথকভাবে উল্লেখিত রয়েছে। এখানে কবি বংশীবদন দাসের *মনসামঙ্গল* কাব্য থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো :

কাউঠার (কচ্ছপ বিশেষ) রান্ধে মাংস তৈল ডিম্ব দিয়া।
তলিত করিয়া তুলে ঘৃতেতে ছাকিয়া॥
কৈতরের বাচ্ছা ভাজে কাউঠার হাতা।
ভাজিছে খাসীর তৈল দিয়া তেজপাতা।
ধনিয়া সলুপা বাটি দারচিনি যত।
মৃগমাংস ঘৃত দিয়া ভাজিলেক কত॥
রান্ধিছে পাঠার মাংস দিয়া খর ঝাল।
পিঠালী বাটিয়া দিল মরিচ বিশাল॥
(জলিল : ১৯৯৬ ; পৃ : ৪৬-৪৭)

অন্ত্যজ শ্রেণি বিশেষ করে ব্যাধ সম্প্রদায় ভক্ষণ করতেন গোসাপ, ইদুর, শূকর প্রভৃতির মাংস। বিত্তবান ও অভিজাত হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় উৎসবের সময় রকমারি খাবারের আয়োজন করতেন। কালিয়া, কোর্মা,

পোলাও, কোপ্তা অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায়ের খাবার ছিল। দুধ থেকে দধি, মাখন, ছানা, ঘোল পায়েস, সন্দেশ, রসগোল্লা, মণ্ডা মিঠাই প্রভৃতি মজাদার খাবার প্রস্তত করা হতো। সম্মানিত অতিথিদের জন্য বিশিষ্ট খাদ্য হিসেবে দুধ, দধি, মণ্ডা, মিঠাই, সন্দেশ, পাটালি, খই, চিড়া, মুড়কি লাডু (লাড্ডু) প্রভৃতি দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। পান্তা ভাত ছিল হতদরিদ্রের নিত্যদিনের খাবার। এ ছাড়া দূরপথযাত্রীদের স্থায়ী এবং শুকনো খাবার হিসেবে মা বোনেরা তৈরি করতেন বিবিধ খাবার—আমসত্ত্ব, নারিকেল নাড়ু, চিড়া, মুড়ি ,খই। কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে নারিকেল, চিড়া, মুড়ি খই-এর তৈরি নাড়ুর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

নারিকেল খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজল ।
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার করিল সকল॥
… … …
শালিকাচটি ধান্যের আতপ চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় থলি সব ভরি॥
কথোক চিড়া, হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
শালি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতে সুক্তা চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া॥
কর্পূর মরিচ লবং এলাচি বসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস॥
শালি ধান্যের খৈ পুন ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে উখরা কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
ফুট কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনি পাকে কর্পূরা দিয়া নাড়ু পাক কৈল॥
(জলিল : ১৯৯৬ ; পৃ : ৪৭-৪৮)

বাঙালি চিরকালই ভোজন বিলাসী। শুধু মাছ ভাত ও পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে তারা পরিতৃপ্ত নন। তারা চাউলের গুড়ার সাথে দুধ, চিনি ও নারকেল মিশ্রিত করে তৈরি করতেন নানা প্রকারের পিঠা পুলি। যেমন তালপিঠা, তিলপিঠা, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরপুলি, নারকেল পুরি, পাতাপিঠা, চিতই পিঠা, দুগ্ধচিড়া প্রভৃতি।

খাদ্য গ্রহণ-বর্জনের একটি সংস্কার উল্লেখিত আছে মধ্যযুগের বাংলায়। আলোচক লিখেছেন : 'খাদ্য গ্রহণের ভিত্তি যেমন অনেক সময় ধর্মীয় আদর্শ ও রীতির ওপর নির্ভর, কখনো-সখনো সেই একই কারণে খাদ্যবর্জনের প্রবণতাও দেখা গেছে মধ্যযুগের বাংলায়। আচারনিষ্ঠতা যে ধর্মের প্রাণবস্তু, তার সঙ্গে খুব সঙ্গত কারণেই দেখা যায় এসব ভক্ষ্য-অভক্ষ্যের সম্পর্ক। তিথি, মাস, বর্ণ, বার ব্রতানুষ্ঠানের বিভিন্নতায় পৃথক পৃথক খাদ্যগ্রহণের অনিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। কখনো তার সাথে জড়িয়ে থাকে বহুকাল প্রচলিত ধারণা, কখনো বা স্মৃতিশাস্ত্রের কঠোর অনুশাসন। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের খণ্ড চিত্র ছিল কোথাও কোথাও'। (সনৎকুমার নস্কর : ১৯৯৫ ; পৃ : ১২৮) হিন্দু সমাজে বিরাজিত এমন একটি সংস্কারের বর্ণনা দিয়েছেন কবি গুণরাজ খাঁ—

'দ্বাদশীরে সুসা খাইলে অধর্ম হএ বড়।
… … …
ত্রয়োদশীরে করমঞ্চা খাইলে পাতকজে হএ।
পূর্ব অর্জিত পূণ্য বিলাসিনী হএ॥
চতুদ্দসিরে আনারস খাইলে বড় সোগ।
অমাবৈস্বারে মৈৎস্য খাইলে বড় রোগ॥
ইসব নির্দেশ দ্রব্য জেইজনে খাএ।
তাহার জে দুক্ষভোগ খণ্ডান না জাএ॥
(সনৎকুমার নস্কর : ১৯৯৫ ; পৃ : ১২৮)

খাদ্যকে সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণ বজায় রাখতে তারা বিভিন্ন মসলা ব্যবহার করতেন তার মধ্যে অন্যতম— মরিচ, তেজপাতা, লবঙ্গ. এলাচি, দারুচিনি, সরিষা ও মেথি।

মধ্যযুগে সৌখিন ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে পান, তামাক ও মদ অন্যতম ছিল। খাদ্য গ্রহণের পর শুধু বৈষ্ণবেরা পান সেবন করতেন তা নয় অনেকে মুখকে সুবাসিত এবং ওষ্ঠকে রঞ্জিত করার জন্য পান সেবন করতেন। পানের সঙ্গে মিশ্রিত হতো চুন, সুপারি, খয়েরসহ বিভিন্ন প্রকার মসলা ও সুগন্ধিদ্রব্য। তামাক খেতেন সাধারণত শ্রমজীবী ও আয়েশি মানুষ। নেশা জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম ছিল ভাঙ,আফিম, ধুতুরা রস ও গাঁজা। মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে দেবাদিদেব মহাদেব ভাঙ, গাঁজা ও মদ খেতেন, *মনসামঙ্গল* কাব্যে চাঁদসদাগরের মদ খাওয়ার উল্লেখ আছে। মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল প্রায় সর্বশ্রেণির মানুষ। গুড় থেকে প্রস্তুত হতো গৌড়ীয় মদ। এ ছাড়া ভাত, মধু, আখ, তালরস পচিয়ে মদ প্রস্তুত করা হতো। সে কালে মদ্যপান করাকে লোকে দোষারোপ মনে করতেন না।

ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর ওপর সংশ্লিষ্ট দেশের মানুষের পরিধেয় অনেকাংশেই নির্ভর করে। বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল হওয়ায় পুরুষেরা সাধারণত ধূতি, পাঞ্জাবি ও চাদর এবং মেয়েরা শাড়ি পরিধান করতেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় পূর্ববঙ্গে ভাল কার্পাস তুলা উৎপন্ন হতো যা দিয়ে সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করা হতো। এ সূক্ষ্ম সূতা দিয়ে তৈরি হতো উন্নত মানের মসলিন শাড়ি। বহির্বিশ্বে যার সুনাম ও চাহিদা ছিল। দেশের অভ্যন্তরে এ মসলিন শাড়ির ব্যবহার ছিল শুধু অভিজাত সমাজে। সামাজিক ইতিহাস ও সাহিত্যে বস্ত্রসম্ভারের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম ছিল-লক্ষ্মীবিলাস, মেঘলাল, খিরবলি, উদয়তারা, আসমানতারা, অগ্নিপাট, পাটের শাড়ি, মেঘডুমুর, ময়ূরপেখম। কোনো কোনো শাড়িতে জরির নক্সা থাকত। লক্ষ্মীবিলাস শাড়িতে বিভিন্ন দেব-দেবীর চিত্র, মাছ ও পাখির ছবি দেয়া হতো সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। পুরুষদের পোশাকেও সৌন্দর্য ও রুচির পরিচয় থাকত। অভিজাত পরিবারের পুরুষেরা পূজা-পার্বণে রেশম ও গরদের পোশাক পরিধান করতেন। কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসে* পুরুষের ধূতি ব্যবহারের উল্লেখ আছে। বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গলে* আছে পুরুষদের তিনখণ্ড কাপড় পরিধানের উল্লেখ : একখণ্ড পরনের, আর এক খণ্ড মাথার পাগড়ি, অন্য খণ্ড গায়ে জড়ানোর। মেয়েদের বক্ষ আবরণী হিসেবে কাঁচুলির উল্লেখ আছে।

সেকালে হিন্দু-মুসলমানের পোশাকে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু পুরুষের পোশাক ছিল ধূতি, চাদর বা উত্তরীয় আর মুসলমান পুরুষের পোশাক ছিল তহবন, কুর্তা বা পাগড়ি। মুসলমানেরা মাথায় চুল ছোট এবং মুখে দাড়ি রাখতেন। কেউ কেউ মাথায় সর্বদা টুপি পরতেন। মুঘল আমলে 'রুমী' ও 'শামী' টুপির বেশ প্রচলন ছিল। দোনাগাজী তাঁর *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল* কাব্যে কুমার ছাইদের পোশাকের বর্ণনায় তৎকালীন উচ্চবিত্ত ও অভিজাত মুসলিম সমাজে ব্যবহৃত পোশাকের এ-রকম পরিচয় দিয়েছেন—

শ্যাম টুপী শিরে দিলা শ্যামল বসন।
শ্যামল ইজার পিন্দী শ্যামল পৈরণ॥
শিরেতে ঘোপট দিয়া ফুলে দৃষ্টি চায়।
লাল আশা হস্তে ধরি দিব্ব গঞ্জি গায়॥
(দোনাগাজী : ১৯৭৫ ; পৃ : ৩১)

হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পুরুষের পোশাকে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও অভিজাত এবং উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজে মহিলাদের পোশাকে কোনো ভিন্নতা ছিল না। বাঙালি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের প্রধান পোশাক ছিল শাড়ি। অভিজাত ও উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজে মহিলারা যে সমস্ত শাড়ি পরিধান করতেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল-গঙ্গাজল, ময়ূরপেখম, পাটেরশাড়ি, মেঘডুম্বুর, নীলাম্বরী, অগ্নিপাট, পীতাম্বর প্রভৃতি। 'কবি আবদুল হাকিমের (সপ্তদশ শতাব্দী) কাব্যে

‘কনক কিনারী’(সোনালী আঁচল বিশিষ্ট) বস্ত্রের উল্লেখ আছে’। (রাজিয়া সুলতানা : ১৯৯৮ ; পৃ : ৬) জমিদার এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণির পুরুষেরা পাদুকা ব্যবহার করতেন। তবে মেয়েদের মধ্যে এ রীতির প্রচলন ছিল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে পদভূষণ হিসেবে চটিজুতো এবং সাধারণ পুরুষেরা খড়ম ব্যবহার করতেন। ‘এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন সাধক বা ধর্মাবলম্বীদের পোশাকের ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল। যেমন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীরা দেহে কন্থা, স্কন্ধে মৃগছাল এবং কটিতে কৌপীন পরিধান করতেন। সিদ্ধাদের পরিধেয় ছিল স্কন্ধে কাপড়ের ছোট থলি, কালো বর্ণের কটিসূত্র, লাউখোল, গলে রুদ্রাক্ষ মালা ও চর্ম। পির দরবেশরা পরতেন কালো রঙের আলখেল্লা। দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে লেংটি পরার রীতিও দুর্লক্ষ্য নয়। সৈনিকদের পোশাকেও ছিল বিশেষত্ব। যেমন তাঁরা মাথায় রঙিন টুপি, দেহে কাবাই, কোমরে ঘাগর, ইজার, পায়ে মোজা এবং নূপুর পরতেন’। (জলিল : ১৯৯৬ ; পৃ : ৫০) দোনাগাজী তাঁর *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল* কাব্যে কুমার ছাইদের পোশাকের বর্ণনায় তৎকালীন উচ্চবিত্ত ও অভিজাত মুসলিম সমাজে ব্যবহৃত পোশাকের এ-রকম পরিচয় দিয়েছেন—

শ্যাম টুপী শিরে দিলা শ্যামল বসন।
শ্যামল ইজার পিন্দী শ্যামল পৈরণ॥
শিরেতে ঘোপট দিয়া ফুলে দৃষ্টি চায়।
লাল আশা হস্তে ধরি দিব্ব গঞ্জি গায়॥
(দোনাগাজী ; সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল ; ১৯৭৫ : পৃ : ৩১)

পরিসংখ্যানে দেখা যায় বস্ত্র পরিধানে মধ্যযুগে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ছিল চরমে। ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি চাঁদসদাগর, সোনকা, লখিন্দর, ধনপতি, ভবানন্দ মজুমদার, চন্দ্রমুখী, পদ্মমুখী, লাউসেন, কলিঙ্গা ও কানড়ার বসন-ভূষণ আভিজাত্যের পরিচয় বহন করে। অপরপক্ষে দরিদ্রদের বিলাসিতার কোনো সুযোগ তো ছিলই না বরং উদরান্নের সংস্থান করতে গিয়ে তাদের আয়ের সমস্ত ব্যয় হতো ফলে ছেঁড়া কাপড়ই ছিল লজ্জা নিবারণের একমাত্র সম্বল। কবিকঙ্কণ ফুল্লরার বারোমাসের দুঃখ বর্ণনার মধ্যে অভাবী মানুষের দৈন্যদশার চরম চিত্র অঙ্কন করেছেন :

নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়।
অভাগি ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৬১)

এ ছাড়া কবি ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গলে* বিষ্ণুহোড়ের স্ত্রী পদ্মিনীর যে পরিচয় তাতে সেখানে এক দুর্ভাগা নারী চরিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়। বসনের অভাবে পদ্ম পাতায় ঢেকে রাখে সে তার অঙ্গ। নিত্যকর্ম সম্পাদনের জন্য এ অবস্থাতেই তাকে বাইরে বেরুতে হয়। হয়ত সব নারীকে এতটা অসহায়ত্ব স্বীকার করতে হয় না তবে যে কয়জনকে এ কষ্ট সহ্য করতে হয় তা দেখেই পাঠক দুঃখ ও বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়। মধ্যবিত্তের তুলনায় শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মান যে কতটা নিম্নে ছিল তার প্রমাণ মেলে মঙ্গলকাব্যের শ্রমজীবী নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনায়। চটের মোটা কাপড়, হরিণের ছড় ও খুঞা বস্ত্র ছিল তাদের পরিধেয়। চটের মোটা কাপড় ও খুঞার বস্ত্রও শ্রমজীবী মানুষের কেনার সামর্থ্য ছিল না। বিদেশিরা এ দেশে এসে বাঙালি জনগণকে প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় দেখতেন। পুরুষের হাঁটুর ওপরে কাপড় পড়ার চিত্র বিদেশি অনভ্যস্তদের চোখে ধরা পড়ে এভাবে-‘The common people go almost naked. They wear nothing but a piece of linen. Wrapped round the Waist. And passed between the legs. (J. S. Stavorinus : Voyages to the East Indies : 1778 ; p : 415)

‘শুধু পাশ্চাত্য চোখেই নয় এ দেশীয় মুসলিম ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে একই ধরনের নগ্নতা এবং বস্ত্রহীনতা। মাত্র একখানি শাড়িতে আবৃত নারীকে দেখে বিস্ময় বোধ করেছেন

রিয়াজ-উস-সলাতীন-এর লেখক গোলাম হোসায়ন সলীম। চন্দ্রাবতীর *রামায়ণ*-এ জেলে দম্পতির যে উল্লেখ পাই সেখানে যেমন পেটে ভাতের অভাব আছে, তেমনি আছে পিন্ধনে কাপড় নাই-এর উল্লেখ'। (সনৎকুমার নস্কর : ১৯৯৫ ; পৃ : ১৩০) রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *শিবায়ন* কাব্যে দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাগদি নারীর যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সেখানে হতদরিদ্র এক নারীকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ বিষয়ে বর্তমান অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

পার্বতী-জননী মেনকাও যখন কৃষক শিবের হাতে স্বীয় কন্যাকে সমর্পণ করেন তখন তাঁর একমাত্র আকুতি ছিল- 'আঁঠু ঢ্যাক্যা বস্ত্র দিবা পেট ভর‍্যা ভাত' (রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৫২) । সাধারণ মানুষের চাওয়া পাওয়া খুব বেশি ছিল না। মোটা ভাত মোটা কাপড়ই ছিল তাদের আরাধ্য। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে দেবী অন্নদা যখন ঈশ্বরী পাটুনিকে বর প্রার্থনা করতে বলেন ঈশ্বরী পাটুনি তখন সমাজের প্রান্তিক মানুষের সাধারণ চাওয়া-'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'-এই বর প্রার্থনা করেছিলেন। সন্তানাদি নিয়ে খেয়ে পরে সাধারণ জীবন যাপনই ছিল তাদের একমাত্র কাম্য।

বস্ত্র যেমন মানব দেহের লজ্জা নিবারণ করে তেমনি অলঙ্কার করে দেহের সৌন্দর্যবর্ধন। মধ্যযুগে নারী-পুরুষ উভয়ে অলঙ্কারে আসক্ত ছিলেন। বাঙালি নারীরা চিরকালই সৌন্দর্য পিপাসু। নানা প্রকার বসন-ভূষণে তারা নিজেদেরকে সজ্জিত করেন। অলঙ্কার নারীর খুব প্রিয়। এ কারণে হিন্দু-মুসলিম উভয় কবি তাঁদের কাব্যে বাঙালি নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারের উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে সামন্ত-জমিদার, ধনিক-বণিক, রাজা-বাদশা তথা অভিজাত সমাজে অলঙ্কারের বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। এ সকল পরিবারের কর্তারা তাঁদের প্রিয়তমাদের দামি অলঙ্কারে বিভূষিতা করাকে আভিজাত্যের প্রতীক মনে করতেন। সাধারণত রাজা-বাদশা, সামন্ত জমিদার এবং অভিজাত সম্প্রদায় নারীকে হীরা-জহরত মণি-মুক্তা খচিত অলঙ্কার উপহার দিতেন। সাধারণ পরিবারের মেয়েরা স্বর্ণালঙ্কার পরিধানকে সৌভাগ্য বিবেচনা করতেন। সাধারণ পরিবারের নারীদের স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়ের সামর্থ্য না থাকায় রূপার অলঙ্কার পরিধান করতেন। ভাগ্যবতী ললনারা প্রতিটি অঙ্গে কোনো না কোনো অলঙ্কার পরিধান করতেন। সেকালের নারীরা মস্তকের মধ্যমণি থেকে শুরু করে পদাঙ্গুলি পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারে বিভূষিতা হতেন। নারীর অঙ্গে যে সমস্ত অলঙ্কার শোভা পেত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- মোতিহার, চন্দ্রহার, সীতাহার, মোহনমালা, শতেশ্বরী হার, গজমুক্তাহার, হাঁসুলি। উচ্চবিত্ত, সামন্ত জমিদার ও রাজা-বাদশারা এসব অলঙ্কার প্রবাল, মণিমুক্তা এবং স্বর্ণদ্বারা নির্মাণ করতেন। কানে পরতেন কর্ণফুল, কুণ্ডল, কানপাশা, ঝুমকো প্রভৃতি। নাকে নথ, বেউলি, নাকচাবি, বেসর, নাকমাছি ; সিঁথিতে সিঁথেপাটি যাতে অভিজাত সম্প্রদায় মণি-মুক্তা ও হীরা-জহরত সংযুক্ত করতেন। হাতে পরতেন কঙ্কণ, বলয়, চুড়ি ও শাঁখা। হিন্দু সধবা নারীরা স্বামীর কল্যাণার্থে লোহার খাড়ু এবং শাঁখা পরিধান করতেন। কাচের চুড়ি ছিল অনভিজাত সম্প্রদায়ের হাতের অলঙ্কার। *শিবায়ন* কাব্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য নারদের মুখে হিন্দু নারীর শঙ্খ পরিধানের যে কারণ ব্যাখ্যা করেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে। নারীরা বাহুতে দিতেন সাধারণত বলায়া, বাহুটি, সোনার বাজু ও সোনার তাড়; আঙ্গুলে অঙ্গুরি এবং কোমরে কিঙ্কিণী, কোমরবিছা ও কোমরপেটি এবং পায়ে সাধারণত নূপুর, পাসুলি ও মল পরিধান করতেন। দরিদ্র নারীর ব্যবহৃত অলঙ্কার সম্পর্কে স্ট্যাভোরিনাস বলেছেন-'The women of the lower classes, wear similar ornaments, which are made from a sort of cowries, brought from the Maldive Islands and called Channels.Which the Bengalese have the art of fawning through, so that every cutting makes a ring. (J.S. Stavorinus : Voyages to the East Indies ; Vol. 1, p : 416)

'অনেক মেয়ে পুষ্পালঙ্কারে দেহ সজ্জিত করতেন। পদাবলী সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের বেশ বর্ণনায় যে সব পুষ্পালঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলো হলো মস্তকে কিরীট, ললাটে ললাটিকে, বাহুতে অংগত, তাড়, কটিদেশে কাঞ্চী, পদভাগে কটক, হংসক ও হস্তে মণিবন্ধনী'। (জলিল : ১৯৯৬ ; পৃ : ৫২) নারীদের মতো মধ্যযুগে পুরুষেরাও বিভিন্ন অলঙ্কারে ভূষিত হতেন। সমস্ত রাজা, ধনিক-বণিক এমনকি গৃহস্থ পরিবারের সন্তানেরাও অলঙ্কার পরিধান করতেন। পুরুষের অলঙ্কারের মধ্যে অন্যতম ছিল হাতে কঙ্কণ, গলায় মতিহার, কটিতে শিকলি এবং পায়ে মগরা। লোচনদাস শ্রীচৈতন্যদেবের পরিধেয় অলঙ্কারের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

পুত্র মহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর।
অলঙ্কারে ভূষিত সোনার কলেবর॥
অঙ্গদ কঙ্কন করে গলে মতিহার।
কটি স্বর্ণ শিকলি মগরা পায় তার॥
(লোচনদাস : ১৩০৮ ; পৃ : ৩৭)

রাজা-মহারাজা, সামন্ত জমিদার, ধনিক-বণিক পুরুষেরা বিভিন্ন উৎসব-পার্বণ ও বিয়ের সাজে সজ্জিত হতে অলঙ্কার ব্যবহার করতেন। লখিন্দরকে বর সাজে সজ্জিত করতে বিবিধ অলঙ্কার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। কোরেশী মাগন ঠাকুর *চন্দ্রাবতী* কাব্যে মনুহরের পরিধেয় অলঙ্কারের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

গাত্রেতে কবচ গলে মাণিক্যের হার।
শিরে ফোঁটকা দিল অতি শোভাকর॥
কোমরে পেটিকা গজ মুক্তার ঝরকা।
কর্ণেতে কুণ্ডল চান্দে দিল দেখা॥
হস্তেতে বলয় শোভে অতি মনুহর।
শাল বিছাইয়া বৈসে রাজার কুমার॥
(জলিল : ১৯৯৬ ; পৃ : ৫৩)

ভারতীয় ললনাগণ সৌন্দর্যবিলাসী না হলেও সৌন্দর্যপিপাসু ছিলেন। নিজেকে সুসজ্জিত করা বাঙালির নারীর চিরন্তন অভ্যাস। তাইতো সৌন্দর্যচর্চায় তারা প্রকৃতির বিশাল ভাণ্ডার হতে উপকরণ সংগ্রহ করে নিজেকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতেন। সেকালের রাজকন্যারা স্নানের পূর্বে প্রকৃতি হতে উপকরণ সংগ্রহ করে অঙ্গ মার্জনা করতেন। এমনি এক রাজকন্যার স্নান-পূর্ববর্তী অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন কবিশেখর বলরাম তাঁর *কালিকামঙ্গল* কাব্যে—

শুনি যত সখিগণ   আনি গন্ধ চন্দন।
অঙ্গে তার করিল লেপন॥
মনি অঙ্গে তুলি তাই   নারায়ণ তৈল গায়।
দিয়া কৈল অঙ্গের মাজন॥
আমলকী গন্ধ শেষে   দিলেন তাহার কেশে।
চলে সবে সরোবর জলে॥
আগে পাছে যত সখী   মাঝে চলে চন্দ্রমুখী।
যেন মেঘে বিজলী বিলোলে॥
(জলিল : ১৯৯৬ : পৃ : ৫৩)

নারীর সৌন্দর্যবর্ধনে কেশ পরিচর্যার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এজন্য তারা কেশবর্ধন এবং কেশ বিন্যাসের নানা পরিচর্যা করে থাকেন। কেশ সুবিন্যস্ত এবং পরিপাটি করার জন্য উন্নতমানের চিরুনি ব্যবহারের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশেষ করে কাহিনিকাব্যগুলোতে বিভিন্ন প্রকার খোঁপা বাঁধার উল্লেখ আছে। নানা ধরনের বেণি বাঁধার প্রচলনও কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। খোঁপায় তারা গুঁজে দিতেন নানা প্রকার ফুল এমন কি নানা ধরনের মণি-মুক্তাও গুঁজে দেওয়ার

উল্লেখ আছে। ধূপের ভাঁপে খোঁপা সুবাসিত করা হতো। খোঁপাতে তারা সোনা, রূপার নকশা করা কাঁটা ব্যবহার করতেন—

মুকুতা গাঁথিয়া   খোপায়ে বান্ধিয়া
পিঠে ফেলে রাঙ্গা খোপা॥
(লোচনদাস : ১৩০৮ ; পৃ : ৮২)

তিল-তৈল, আমলকী, গিলা, হরিদ্রা পিঠালি ইত্যাদি সে-যুগের তরুণীরা কেশ, ত্বক এবং মুখমণ্ডলে প্রলিপ্ত করে অঙ্গচর্চা করতেন। 'দরিদ্র কান্তর অঙ্গরাগ বহু মূল্য ছিল না। তারা ব্যবহার করতেন সামান্য শঙ্খগুড়ো, সিঁদুর, হরিদ্রা। পোশাক-পরিচ্ছদ, বিছানাপত্র, কাঁথা ধৌতকরণে ব্যবহৃত হতো ক্ষার, কলার বাকলের ছাই, চুন, গোমূত্র, মন পবন নামক গাছের ছাই ইত্যাদি'। (রাজিয়া সুলতানা : ১৯৯৮; পৃ: ৩)। উদাহরণ :

খাড় চুন দিয়া আগে খান কত কাচে॥
কাপড় কাচিয়া বেউলা আড় আখে চায়ে।
(বিজয়গুপ্ত : ১৯৬২ ; পৃ : ৪৭৫)

কেশর নামক এক প্রকার গাছের পাতার রস কলপের কাজে ব্যবহার করা হতো। দেহকে সুবাসিত করতে আগর চন্দন, কস্তুরী, আতর ব্যবহারের প্রচলন ছিল। তবে মৃগমদ কস্তুরীর ব্যবহার ছিল শুধু অভিজাত সম্প্রদায়ে। পা রাঙ্গা করার জন্য আলতা এবং ঠোঁট রাঙ্গানোর জন্য পান খাওয়ার বর্ণনা মধ্যযুগের বিভিন্নকাব্যে পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম সমাজে মেহেদি ব্যবহারের প্রচলন ছিল। দরিদ্রদের সুগন্ধি তেল তো দূরের কথা সাধারণ তেলও জুটত না। ধনি-দরিদ্রের ব্যবহৃত বিবিধ প্রসাধনীর বর্ণনা আলোচ্য অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন কাহিনিকাব্যে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

তৎকালে নগর-সভ্যতার চরম বিকাশ না ঘটলেও আমীর-ওমরাহ, সামন্ত-জমিদার, রাজা-বাদশাহ, ধনিক-বণিক সম্প্রদায়ের জীবন-যাপনের ধরন ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। তাঁদের বাসগৃহ ছিল মূল্যবান ইট-পাথর, হীরা-চুনী-পান্না, নীলা-কাঁসা, আকিক-প্রবাল খচিত। কবি আবদুল হাকিমের *লালমতি সয়ফুলমুলক* কাব্যে বর্ণিত রাজপ্রাসাদের বর্ণনায় সবটাই হয়ত কাল্পনিক ছিল না। কবির বর্ণনাটি এমন—

নিলা কাঁসা জমরুদ আকিক প্রবাল।
হিরা এ এয়াকুতে পুরি নিম্ময় বিশাল॥
সুবর্ণের চাল বেড়া দেখি অনুপম।
হিরা মনি মাণিক্ক ঠামেঠাম॥
অধিক প্রচণ্ড জ্যোতি করে ঝলমত।
হিরাচুনী পান্না ইয়াকুত আর লাল॥
স্ফটিকের স্তম্ভ আর মুকুতায় জড়িত।
দেখিতে কনক পুরি পরম শোভিত॥
(সনৎকুমার নস্কর : ১৯৯৫ ; পৃ : ১৩৩)

চণ্ডীমঙ্গলে কবি কালকেতুর গুজরাট নগর স্থাপনায় স্থপতিরা যে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। কালকেতুর গুজরাট নগরকে রামের রাজ্য অযোধ্যা, কংসের রাজ্য মথুরা, কৃষ্ণের দ্বারকা নগর এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রের ইন্দ্রসভার সাথে তুলনা করা চলে। আরামপ্রিয় লোকেরা আরামের জন্য এবং জীবনকে মধুময় করার জন্য দিঘির মাঝখানে জলটুঙ্গি নির্মাণ করতেন। সৌখিন বাসগৃহ প্রধানত চৌচালা ও আটচালা ছিল।

ধনীর অট্টালিকার পাশে দরিদ্রের কুঁড়ে ঘর একালের মত সেকালেও ছিল। দরিদ্রের ঘর তৈরি করা হতো বাঁশ, কাঠ, খড় অথবা তাল পাতা দিয়ে। এ সব ঘর বানাতে ২-৩ দিন সময় লাগত। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে কবি মুকুন্দরাম কালকেতু ও ফুল্লরার বাসস্থান বর্ণনার মধ্য দিয়ে হতদরিদ্রের চিত্র তুলে ধরেছেন।

শয্যা-উপকরণসহ গৃহস্থালী নানা উপকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, ঘনরাম, কেতকাদাস, কৃষ্ণদাস প্রমুখ কবিদের রচনায়। বিত্তশালী পরিবারে নানা প্রকার বিলাস-উপকরণ যেমন খাট-পালঙ্ক, লেপ-তোষক এবং মূল্যবান বস্ত্রের মশারি ব্যবহারেরও উল্লেখ আছে যাতে মূল্যবান কাপড় দিয়ে ঝালর দেয়া থাকত। গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ হাত পাখা ব্যবহার করতেন। বিত্তবানেরা হাত পাখার সাথে শ্বেত চামর ব্যবহার করতেন। বিত্তবানদের সৌখিন দ্রব্য হিসেবে আরও উল্লেখ আছে- ভৃঙ্গার, ডাবর বাটা, পানের ডিবা, দর্পণ, তামার হাড়ি, পিতলের কলস, হাতাবেড়ি, বাটি, বটি ও পাথরের বাসন। ধনিক-বণিক পরিবারে থালা বাসন ছিল সোনা-রূপার তৈরি। বিত্তবান পরিবারের মানুষ সোনার থালায় ভাত খেতেন। আর সাধারণ পরিবারের বাসন ছিল কাঁসা-পিতলের তৈরি। দরিদ্র বা খেটে খাওয়া পরিবারে নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম ছিল-মাটির তৈরি হাঁড়ি পাতিল এবং বাঁশ ও বেতের তৈরি কুলা, ডালা, ধুনচি, ঝুড়ি ও ঢেঁকি।

প্রতিটি মানুষের মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার জন্য বিনোদন ও অবসর একান্ত প্রয়োজন। স্বর্গের দেব-দেবীগণও প্রশস্তির জন্য নর্তক-নর্তকী রাখেন। ধনী বিলাসীদের জন্য বিনোদন অর্থ সময় কাটানোর উপায়। আর শ্রমজীবী মানুষের কাছে বিনোদন অর্থ পরবর্তী কাজের জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে বিনোদনের অবকাশ আসে সন্ধ্যায় এবং তখন তারা উপভোগ করে গান, গল্প, রামায়ণ, পাঁচালি ও নামসংকীর্তন। বিদগ্ধ সমাজে নিয়মিত মনোরঞ্জনের জন্য রাজসভায় নিয়োগ দেওয়া হতো কবি-ভাট-নাট-নৃত্যকরের দল। কৃত্তিবাস তাঁর *রামায়ণে* আত্মপরিচয় অংশে কবি গৌড়েশ্বরের সভার যে বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে পার্ষদগণের সাথে কবি-নাট-ভাট ও নৃত্যকরের পরিচয় দিয়েছেন। পারিবারিক অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে আনন্দ উপভোগ করতেন অন্তঃপুরের নারীরা। মুহাম্মদ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বলেন—'বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যার স্নানের সময় অন্তঃপুরের মেয়েরা মঙ্গলসূচক শুভধ্বনি করিত। হাতে প্রদীপ লইত, মাথায় কলসি বহিত, নাচিত, হাসিত, গান করিত, করতালি দিত, ঘটি হইতে জল লইয়া সিঞ্চন করিত, পান-সুপারির শ্রাদ্ধ করিত, আনন্দে ধামালী (অশ্লীল গান) গাহিত ও নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত হইত'। (রাজিয়া সুলতানা : ১৯৯৮ ; পৃ : ৯) আনুষ্ঠানিক ভাবে মেয়েরা বাদ্যগীত না করলেও কবি-সাহিত্যিকের বর্ণনা থেকে জানা যায় কুল-নারীরা অন্দরমহলে নানা প্রকার নাচ-গান করে আনন্দ উপভোগ করতেন। এর মধ্যে অন্যতম বিয়ে অনুষ্ঠানে সহেলা বা মেয়েলী গান যা বেশ উপভোগ্য ছিল। 'পূর্ববঙ্গের বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে আর এক প্রকার আনুষ্ঠানিক ক্রীড়া প্রচলিত ছিল, যেখানে বর-কনে অংশ গ্রহণ করতেন। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মহিলারা। বিবাহ অনুষ্ঠানে দু পক্ষের সখী, বন্ধু ও আত্মীয়ের উপস্থিতিতে নানা রঙ্গরসের ব্যবস্থা থাকত-তার নাম জুলুয়া বা জোলুয়া। এ সময়ে বর-কনের মধ্যে পাশাদি ক্রীড়ারও ব্যবস্থা হ'ত এর নাম গেরুআ খেলা'। 'বিত্তশালী আত্মীয় কর্তৃক বর-কনের অন্য বাড়িতে অভ্যর্থনা হ'ত যার নাম গস্ত ফেরানো'। (রাজিয়া সুলতানা : ১৯৯৮ ; পৃ : ৯) মধ্যযুগে মেয়েদের অধিকাংশ আনন্দ বিনোদনের চিত্র নিহিত ছিল বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনায়। বরের সাথে হাস্য-রসিকতা করে তারা প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার আনন্দে মেতে উঠতেন।

পুরুষদের আনন্দ-বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের গৃহগত ক্রীড়ার মধ্যে অন্যতম-পাশা, দাবা, জুয়া ও তাস। বিয়ের রাত্রে বর-বধূ মিলে পাশা

খেলার উল্লেখ মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশেষ করে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ প্রথাটি মলুয়া পালাতেও বিদ্যমান। 'সেকালে নৌকার মাঝি-মাল্লারাও নৌকায় বসে পাশা খেলত বলে জানা যায়'। (সনৎকুমার নস্কর : ১৯৯৫ ; পৃ : ১৩৪) জুয়া খেলার উল্লেখ আছে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে। পর্তুগিজ বণিকদের মাধ্যমে তাস খেলার প্রচলন হয় এ দেশে। পুরুষদের শিক্ষা ও বৃত্তিভিত্তিক কিছু খেলার উল্লেখ আছে মঙ্গলকাব্যে এবং অনুবাদ সাহিত্যে। এসব খেলার মধ্যে অন্যতম ছিল অশ্বচালনা, নৌকা বাইচ এবং মল্লযুদ্ধ। তৎকালে রাজপুত্রদের অতিরিক্ত যোগ্যতা ও ক্ষমতা বিবেচিত হতো এসব খেলার মধ্যদিয়ে। গ্রামের লোকেরা ঢাল, সড়কি এবং বল্লম নিয়ে এসব খেলা খেলতেন। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের নায়ক লাউসেন ছিলেন একজন বিশ্বখ্যাত মল্লযোদ্ধা। মুঘল আমলে চৌগান খেলার উল্লেখ করেছেন কবি আলাওল তাঁর *পদ্মাবতী* কাব্যে।

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক উৎসব-পার্বণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং সামাজিকসত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যযুগে ব্যক্তি মানুষের স্বাধীন চিন্তার অবকাশ ছিল না। সংস্কার, লোকাচার, শাস্ত্রাচারে মানুষের বিশ্বাস ছিল প্রকট। প্রকৃতি অনুসারে ব্যক্তির সামাজিক উৎসবকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় ক. জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুকেন্দ্রিক এবং খ. পার্বণিক বা ব্রতমূলক অনুষ্ঠান। বাস্তবিক অর্থেই এ সব উৎসব-পার্বণের মধ্যদিয়ে তৎকালীন বাংলার সমাজ-মানসের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস-সংস্কার ও ধর্ম-কর্মের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

সামাজিকীকরণে প্রথম ও প্রধান শর্তই হলো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুস্থ পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করা। মধ্যযুগে বাঙালি সমাজে বিয়ের পর সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায় স্ত্রীর গর্ভে বিধিপূর্বক যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয় তাই গর্ভাধান। সন্তান লাভের মধ্যদিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রীতি ও অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। সুস্থ, সুন্দর ও সুলক্ষণযুক্ত মঙ্গলময় সন্তান কামনায় মঙ্গলকাব্যের কবিগণ স্বামী-স্ত্রীর নিয়ন্ত্রিত জৈবিক কামনা-বাসনার বর্ণনা দিয়েছেন।

কোনো কুলবধূ প্রথম গর্ভবতী হলে তার অনাগত সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় গর্ভবতীকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি পালন করার রীতি সমাজে প্রচলিত ছিল। চারমাস গর্ভকালীন অবস্থায় সীমান্তোন্নয়ন, পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত, ষষ্ঠ মাসে পরমান্ন ভোজন, সপ্তম মাসে সাধভক্ষণ এবং নবম মাসে নববস্ত্র পরিধানের যে বিধান পণ্ডিতগণ দিয়েছিলেন তার পশ্চাতে নিশ্চয় প্রায়োগিক কোনো না কোনো যুক্তি ছিল। কিন্তু উত্তরকালে তা গতানুগতিক আচারে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে যেমন ঘনরাম চক্রবর্তীর *ধর্মমঙ্গল*, মানিকরামের *শিবমঙ্গল*, কবিকঙ্কণের *চণ্ডীমঙ্গল* ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে গর্ভবতী নারীর পঞ্চামৃত, পরমান্ন ভোজন, নববস্ত্র পরিধান এবং সাধভক্ষণের উল্লেখ আছে। সমাজে অবস্থানরত ব্যক্তির রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সামাজিক অনুষ্ঠানের বর্ণনা মধ্যযুগের কাহিনিকাব্য রচয়িতাগণ সুবিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে চাঁদ সদাগরের এবং কালকেতু-ফুল্লরার পারিবারিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা যেতে পারে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজে নানা ধরনের বৈদিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। এর মধ্যে অন্যতম ছিল জাতকর্ম অনুষ্ঠান। অপশক্তির হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করতে অভিভাবকগণ বিভিন্ন লোকাচার ও সংস্কার পালন করতেন। যেমন শিশুর জন্মগ্রহণের মুহূর্তেই আঁতুড় ঘরের চাল থেকে খড় পেড়ে সূতিকাগৃহে আগুন জ্বালনো, নাড়িচ্ছেদের সময় শঙ্খধ্বনি করা, শিশু সন্তানের রক্ষাকর্ত্রী দেবী ষষ্ঠীদেবীকে পূজার্চনার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা এবং আঁতুড় ঘরের দরজার ডান পার্শ্বে গোমুণ্ড স্থাপন করা। জাতক্ষণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতেন সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠরা। পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত এবং সেই আনন্দ প্রকাশের নিদর্শন স্বরূপ তারা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈষ্ণব, রজক, নাপিতসহ গরীব-দুঃখীদের মধ্যে অর্থ, বস্ত্র এমনকি স্বর্ণালঙ্কার দান করতেন। শ্রী রামচন্দ্রের জন্মোৎসবে

রাজা দশরথ অনেক ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। পুত্র-সন্তানের জন্মোৎসবে এরূপ অর্থ-বস্ত্র দানের রীতি মুসলিম সমাজেও প্রচলিত ছিল। লায়লী-মজনু কাব্যে মজনুর জন্মোৎসবে তার পিতা বহু অর্থ দান এবং নৃত্য-গীতের আয়োজন করেছিলেন—

যথেক ভাণ্ডার ছিল করিলেক দান।
দারিদ্র্য খণ্ডিল যথ দুঃখিত সভান॥
নৃত্যগীত প্রতিনিতি রঙ্গ কুতূহল।
জয় জয় ধ্বনি হৈল আনন্দ মঙ্গল॥
(দৌলত উজির : ২০০৬ ; পৃ : ৯০)

পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণের পর পিতা-মাতার এত আনন্দ-উল্লাস এবং পরিবারে পুরুষের ভূমিকা ও অবস্থান তৎকালীন সমাজে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সন্তান জন্ম গ্রহণের পর বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের উল্লেখ পাই কবিকঙ্কণের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে—

তিন দিনে করে রামা সুপথ্য পাচন।
ছয় দিনে ষ্যাঠারা করিল জাগরণ।
আট দিনে আট কড়াইয়া করিল ধর্ম্মকেতু
নয় দিনে নর্তা কৈলা সুত-শুভহেতু।
ষষ্টিপূজা একতির্সা কৈল একমাসে।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪১)

কন্যা সন্তানকে ঘিরেও যে এমন অনুষ্ঠান পালিত হতো না এমনটি নয়। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পুত্র-কন্যার ক্ষেত্রে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে খুল্লনার জন্মের পর তাঁর পিতা-মাতা অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন এবং নাপিতকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। শিশুর মুখে প্রথম যে দিন ভাত তুলে দেয়া হয় সেই অনুষ্ঠানকে অন্নপ্রাশন বলা হয়। সাধারণত শিশুর ছয় মাস বয়সে অন্নপ্রাশন করা হয়। অন্নপ্রাশনের সঙ্গে শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠানও সম্পৃক্ত। নামকরণ অনুষ্ঠানে অভিভাবক তার সামর্থ্য অনুযায়ী ধনমাল, গাভি দান এমনকি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা দান করে থাকেন। মুসলিম সমাজে এ ধরনের অনুষ্ঠান 'আকিকা' নামে পরিচিত। এ অনুষ্ঠানে শিশুর নামকরণ করা হয়। এ সময় শিশুদের জন্য আশীর্বাদী বা সালামি মিলত অভ্যাগতদের বাচ্চার মুখদর্শনের পর। এরপর আসে শিশুর শিক্ষা ব্যবস্থা। সাধারণত শিশুর বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হলে গুরুগৃহে পাঠানো হতো শিক্ষা লাভের জন্য। গুরুগৃহে যাবার পূর্বে শিশুকে হাতেখড়ি দেয়া হতো। এ অনুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজন আমন্ত্রিত হতেন এবং অতিথিবৃন্দ স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার উপহার দিয়ে শিশুকে আশীর্বাদ করতেন। শিশুকেন্দ্রিক যত উৎসব পালনের নিয়ম সমাজে প্রচলিত তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে আলোচ্য অভিসন্দর্ভের সংশ্লিষ্ট কাহিনিকাব্যগুলিতে।

সাধারণ অর্থে বিয়ে বলতে সমাজ স্বীকৃত পন্থায় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে যুগল নারী-পুরুষের একত্র বসবাস, উত্তরাধিকারী সৃজন তথা সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের সুষম ব্যবস্থাকে বোঝায়। বিয়ের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের যৌন জীবনকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবন পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে পরিবার গঠন, মানসিক প্রশান্তি লাভ এবং ভবিষ্যৎ বংশধর সৃজন করা। পরিবার যেমন সমাজের ভিত্তি, বিয়ে তেমনি পরিবারের ভিত্তি। একটি ছাড়া অপরটি কল্পনা করা যায় না।

বিবাহ হচ্ছে সমাজের এমন একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান যা কিছু আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে দুই বা ততোধিক নারী পুরুষের একত্র বসবাসের বন্দোবস্ত করে। স্থান কাল ভেদে বিয়ের রীতিনীতি ও আনুষ্ঠানিকতায় কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও এটি পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি হিসেবে সর্বত্র স্বীকৃত। 'হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিবাহ তার কাছে শুধু একটি অধিকার নয়, পবিত্র সামাজিক ও নৈতিক

দায়িত্ব। হিন্দুর চিন্তাধারায় গৃহিণীকে বাদ দিয়ে গৃহের কল্পনা স্থান পায়নি। সেজন্য শাস্ত্রকারদের ভাবনায় গৃহ ও গৃহিণী এক হয়ে যায়। 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' (সনৎকুমার নস্কর : ১৯৯৫ ; পৃ : ১৩৮) এ কথার প্রতিধ্বনি করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন॥
(কৃষ্ণদাস : ১৯৭৪ ; পৃ : ১১৪)

বোধ হয় পুত্র সন্তান লাভই ছিল জনসমাজে বিয়ের আসল উদ্দেশ্য। কারণ 'ত্রিতাপ দুঃখে জর্জরিত বাঙালি হিন্দু চাইত মৃত্যুর পর নরক থেকে উদ্ধার'। (সনৎকুমার নস্কর : ১৯৯৫ ; পৃ : ১৩৮) এ জন্য প্রয়োজন পুত্র সন্তান জন্মদান। মনু খুব স্পষ্টই বলেছেন : 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা প্রজনার্থঃ মহাভাগাঃ। (মনুসংহিতা) বাঙালি সমাজে প্রচলিত এ বিশ্বাস সরাসরি উঠে আসে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে—

আর জত উপচার পুত্র বিনু অন্ধকার
নরকে নাহীক পরিত্রাতা॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৮৩)

প্রথম স্ত্রী পুত্র সন্তান জন্মদিতে ব্যর্থ হলে তার কপালে জুটত সতিন। লোকে তাকে সর্বক্ষণ অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা করত এবং আঁটকুড়ো বলে গালি দিত। ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে পুত্রহীন দম্পতির বেদনার চিত্র এঁকেছেন এভাবে—

হাহাকার করে তার পিতৃলোকগণ।
পুত্র বিনা পিণ্ড বাদ প্রধান তর্পণ॥
জীবন বিফল যার পুত্র নাই রায়।
আঁটকুড়া লোকে বলে মুখ নাই চায়॥
(ঘনরাম : ১৯৬২ ; *পৃ* : ২৯)

বিয়ের পূর্বে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে, জাত-পাত, তিথি-নক্ষত্র, বংশ-মর্যাদা, গোত্র-কৌলীন্য প্রভৃতি নিয়ম-কানুন মানা হতো। সে জন্য অসবর্ণ বিয়ে ও স্বগোত্র বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল। গোত্রীয় বিয়ের এ বাধা শুধু হিন্দু সমাজে নয় পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও উপজাতির মধ্যেও কোনো না কোনো ভাবে টিকে আছে। শাস্ত্র মেনে বিয়ে সম্পন্ন হতো বলে কুলের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর সেকালের অভিভাবকগণ বেশ গুরুত্ব দিতেন। বিয়েতে পাত্র-পাত্রীর বয়সের পার্থক্য থাকত প্রায় বারো থেকে আঠারো বছর। পাত্র নির্বাচনে কুল-শীলের সঙ্গে বিদ্যা, রূপ ও গুণের সমন্বয় ঘটলে তা অত্যন্ত সৌভাগ্য বলে গণ্য হতো। মধ্যযুগে মেয়েদের বিয়ে হতো খুব অল্প বয়সে। শাস্ত্রকার মনু যদিও গুণহীন পাত্রে কন্যাদানের বিরোধিতা করেছেন কিন্তু ষোড়শ শতকে স্মৃতিকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তা মানতে পারেননি। কারণ তাঁর সময়ে অর্থাৎ নবাব শাসনামলে বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয়। সেজন্য তিনি সাত থেকে আট বৎসরের মধ্যেই কন্যার বিয়ের বয়সকে সীমাবদ্ধ রাখতে উপদেশ দিয়েছেন এবং প্রাচীন স্মৃতিপণ্ডিতদের মতগুলিকে উদ্ধৃত করে সেগুলিকে অত্যন্ত রক্ষণশীল দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে মিলল তারই জের। ঘনরাম চক্রবর্তী খুব ঘটা করে শোনালেন কন্যাদানের গুপ্ত রহস্য—

তিন বৎসরের কন্যা জেবা করে দান।
সেই কন্যা পতিব্রতা গৌরীর সমান॥
পাঁচ বৎসরে জেবা কন্যা করে দান।

তার এক ফল হয় পুষ্করণী সমান॥
সাত বৎসরের জেবা কন্যা করে দান।
তার এক ফল হয় দেউল সমান॥
নয় বৎসরের জেবা কন্যা করে দান।
তার এক ফল হয় জাঙ্গালের সমান।
এগার বৎসরের জেবা কন্যা করে দান।
পাপ পুণ্য নাহি তায় সমানে সমান॥
(ঘনরাম : ১৩১৮ ; পৃ : ১২৭)

তৎকালে কন্যার বিয়ের বয়স বারো বৎসরের অধিক হলে সেই পিতা-মাতাকে একঘরে করে রাখা হতো এবং তাকে সামাজিক সকল সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত করা হতো। সামাজিক ভাবে তাদেরকে হেয় করা হতো। কবি ময়ূরভট্ট *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে এমনি আভাস দিয়েছেন—

বার বৎসরের কন্যা জেবা রাখে ঘরে।
ব্রাহ্মণে না খায় জল কুটুম্বে ছল ধরে॥
(ময়ূরভট্ট : ১৩৮১ ; পৃ : ১১৩)

হিন্দু সমাজে প্রাক-বৈবাহিক যত অনুষ্ঠান পালিত হয় তার মধ্যে অন্যতম অধিবাস। এরপর নান্দীমুখ, জলভরণ বা গঙ্গাবরণ, গায়ে হলুদ, আইবুড়োভাত। জলভরণ অনুষ্ঠানে এয়োরা কলস কাঁখে সরোবর বা নদীতীরে গিয়ে নৃত্যগীত করতেন এবং এ সময়ে বিভিন্ন বাদ্য বাজানো হতো। গায়েহলুদ অনুষ্ঠানটি স্ত্রী আচার প্রধান প্রাক-বৈবাহিক একটি উল্লেখযোগ্য ও আনন্দমুখর অনুষ্ঠান। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে আত্মীয়-অনাত্মীয় এবং প্রতিবেশীগণ অংশ নিয়ে হাসি-তামাশা ও আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে বিয়ের অঙ্গনকে মুখরিত করে তুলতেন। বর বরণ, শুভদৃষ্টি, মাল্যদান, সপ্তপদীগমন, অগ্নিসাক্ষী প্রভৃতি অনুষ্ঠানের বর্ণনা এবং তাৎপর্য অত্যন্ত সুনিপুণভাবে মধ্যযুগের কাহিনিকাব্যে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে বিধৃত হয়েছে।

প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের দেখাদেখি বাঙালি মুসলিম সমাজেও অনেক শাস্ত্র-অনুশাসন পালনের রীতি প্রত্যক্ষ করা যায়। এ কারণে মুসলিম সমাজেও প্রাক-বৈবাহিক কিছু নিয়ম-কানুন পালিত হয়। গায়ে হলুদ তার মধ্যে অন্যতম। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজের নারী-পুরুষ উৎসবে কিরূপ উন্মত্ত হতো তার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নসরুল্লাহ খোন্দকারের শরীয়তনামা কাব্যগ্রন্থে—

ছিফত খাইয়া অতি হিন মত্তকরী।
উন্মত্ত হয়ে কিবা পুরুষ কি নারী॥
হলদি ক্ষেপন্ত যেন মগও ধরান।
হাসন গাওন্ত নটী নাটকের গণ॥
পুরুষ নারীরে নারী পুরুষের সঙ্গে।
শঙ্কা পরিহরি সবে খেলে মনোরঙ্গে॥
শতে শতে লোক যবে কৌতুকে হেরন্ত।
অসংখ্য অপূর্ব জানি অধিক হাসন্ত'॥
(নসরুল্লাহ : ১৯৭৪ ; পৃ : ১২৫)

হিন্দু সমাজে অধিবাস অনুষ্ঠানের অনুরূপ মুসলিম সমাজে তেলোয়াই অনুষ্ঠান পালিত হতো। কিন্তু অধিবাস এবং তেলোয়াই অনুষ্ঠানের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অধিবাসে বর পক্ষ কনের বাড়িতে উপহার সামগ্রী প্রেরণ করতেন কিন্তু তেলোয়াই অনুষ্ঠানে কনের পিতা বিয়ের কয়েক দিন পূর্বে বরের বাড়িতে উপহার সামগ্রী প্রেরণ করতেন। উপহার সামগ্রীর মধ্যে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যের সাথে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকত একটি পানের ঝাড়ি। সাধারণত একাধিক পত্রযুক্ত একটি আম্রডালের প্রতি পত্রে একটি করে পানের খিলি টাঙ্গিয়ে দেয়া হতো। বরের বাড়ির

সকলে ঐ ঝাড় থেকে পান খেতেন এবং পাড়া-পড়শিদের মাঝে বিতরণ করতেন। হিন্দু সমাজের ন্যায় মুসলিম সমাজেও বিয়েতে নানা প্রকার বাজনার প্রচলন ছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ে বিয়ের অন্যান্য লোকাচারের মধ্যে অন্যতম হলো : জলুয়া, ফাগুয়া ও গস্ত ফেরানো। জলুয়া অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য বর ও বধূর মধ্যে অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ সময় বর বধূকে আংটি পরিয়ে দিতেন। বিনিময়ে বধূ বরকে মালা পরাতেন। অতঃপর সখীরা জোরপূর্বক বধূকে বরের কোলে বসিয়ে হাসি তামাশায় মেতে উঠতেন। কবি আলাওলের *সিকান্দার নামা* কাব্যগ্রন্থে সাতপাকে বাঁধবার কথাও উল্লেখ আছে—

সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া সত্বর।
শাহাব কোলেতে আনি দিলা কন্যাবর॥
(সনৎকুমার নস্কর : ১৯৯৫ ; পৃ : ১৫৯)

সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল এ সহেলার সাথে গেরুয়া খেলার উল্লেখ করেন কবি দোনা গাজী। এ খেলাকে আহমদ শরীফ বিবাহোত্তর ‘কোর্টশিপ’বলেছেন। তাঁর মতে বর-কনের লজ্জা, শরম ভাঙার জন্যই এই খেলার আয়োজন করা হয়। এ খেলাটি হিন্দু সম্প্রদায়ের নবদম্পতিকে নিয়ে তাঁর সখা-সখীসহ বাসর ঘরে যেমন আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠে তার অনুরূপ।

মুসলিম সম্প্রদায়ের বিয়েতে আনন্দ করার মতো আর একটি অনুষ্ঠান হলো ‘ফাগুয়া’। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বর-বধূর চারি চক্ষুর মিলন ঘটানো হতো। আত্মীয় স্বজন পাড়া-পড়শি সকলে মিলে হাসি-তামাশা, রঙ্গ-রসিকতায় মেতে উঠতেন এবং পরস্পর পরস্পরের গায়ে আবির ছিটিয়ে পরিবেশটাকে আরও বেশি আনন্দমুখর করে তুলতেন। সৈয়দ সুলতানের রসুল চরিত কাব্যে ফাগুয়ার’ চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়—

আবীর আম্বর আনি   মিলি যথ নারীগুণী
কৌতুকে লইয়া মুষ্ঠি ভরি
কেহ কার অঙ্গে গিয়া   মনেতে হরিষ হৈয়া
অঙ্গেতে লেপন্ত মায়াধরি॥
মেহের নিগার আসি   আব্বাসের নারী বসি
সহেলা গায়ন্ত নারীগণ
হাসলাস সবে করি   কস্তুরী চন্দনপুরি
উল্লসিত সব নারীগণ’॥
(আহমদ শরীফ : ১৯৭৭ ; পৃ : ২৫৬)

উচ্চবিত্ত মুসলিম সমাজে বৈবাহিক উৎসবে কুলনারীরা নৃত্যগীত তো করতেনই এ ছাড়া বাইজী এনে নাচের আসর জমানোর উল্লেখ আছে মধ্যযুগের অনেক কাহিনিকাব্যে।

ঐতিহাসিকদের মতে মধ্যযুগে পুরুষের বহু বিবাহ নিন্দনীয় ছিল না। সামন্তরাজাদের কাছে বহু বিবাহ অনেকটা আভিজাত্যের প্রতীক এবং স্বেচ্ছাচারের নিদর্শন ছিল। কারো কারো মতে বহু বিবাহের এ পদ্ধতিটা মুসলিম প্রভাবজাত। যদিও প্রাচীন ভারতের আর্য-সমাজ ব্যবস্থায় বহু বিবাহ পদ্ধতির প্রচলন ছিল। সে যুগে বাংলা কাব্যসাহিত্যে বহুবিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায় *চণ্ডীমঙ্গল*, *অন্নদামঙ্গল* এবং *ধর্মমঙ্গলে*। কোনো কোনো পুরুষের ধারণা ‘দুই নারী নাহি বিনা পতির আদর’। (ভারতচন্দ্র : ১৪০৪ ; পৃ : ৯০) বিত্তশালী কৃষক পরিবারে কৃষিকর্মে সাহায্যের জন্য অধিক সন্তান এবং একাধিক স্ত্রী দুইই পুরুষের কাম্য ছিল। কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস* (১১শ-১২শ শতাব্দী) গ্রন্থে লক্ষ করা যায়-দুই বোনকে রাজা একসঙ্গে বিবাহ করে সুখে ঘর করছে’। (রাজিয়া সুলতানা : ১৯৯৮ ; পৃ : ১৯)

মধ্যযুগে বিয়ে পণপ্রথা ও যৌতুক বিহীন ছিল না। পণপ্রথা ঋগ্বেদের কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। অবশ্য সে সব ছিল কন্যাপণের দৃষ্টান্ত। *চণ্ডীমঙ্গলে* হিমালয় কন্যা ও জামাতার কল্যাণে যথাসাধ্য বরপণ দিয়েছিলেন।

উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন যৌতুক প্রদানের কথা স্বীকার করেছেন যেখানে দাস-দাসীসহ ভূমিদান ও অলঙ্কারাদি প্রদানের উল্লেখ আছে—

দাসদাসী দিল তার কেবা জানে নাম।
ভূমিদান দিল সাধু সহস্রেক গ্রাম॥
বানিয়ার কুটুম্ব আর জ্ঞাতি মিত্র ভাই।
সকলে যৌতুক দিল লেখা জোখা নাই॥
মেনকা যৌতুক দিল হস্তের কঙ্কণ।
হিরা চুড়ি মণিময় সুবর্ণ গঠন'॥
(জগজ্জীবন : ১৯৬০ ; পৃ : ২০১)

পণ যে শুধু পুত্রকে (বরকে) দেয়া হতো তা নয়। তৎকালে কন্যাপণ দেওয়ার প্রচলন ছিল সমাজে। কেতকাদাসের *মনসামঙ্গল* কাব্যে কন্যাপণ দেওয়ার উল্লেখ আছে-

কন্যা পণ নাহি চায় দানে কন্যা দিতে চায়
তোমার সুন্দর লখিন্দরে॥
(কেতকাদাস : ১৯৪৯ ; পৃ : ২২৪)

পণ বা যৌতুক প্রদানের উল্লেখ মধ্যযুগের কাব্যে বিরল নয়। দ্বিজ মাধবের *মঙ্গলচণ্ডীর* গীত কাব্যে কনের পিতা বরের পিতার নিকট দু'খানি আটপৌরে শাড়ি মাত্র দাবি করছেন। সেখানে অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর মতো পুত্র কন্যা নিয়ে রীতিমত দর কষাকষি চলত—

পণ নিয়ম করি তুমি যাহ ঘর।
সবথায় দিব বিহা আন গিয়া বর॥
এহা শুনি ধর্ম্মকেতু কহে ত্বরাত্বরি।
নিশ্চয় করিয়া কহ কথ লইবা কড়ি॥
পুষ্পকেতু বলে সখা করি দরাদরি।
দুইখান খুঞিয়া (মোটা শাড়ী) দিবা তের বুড়ি কুড়ি।
ধর্ম্মকেতু বলে সখা করি দরাদরি।
একখান খুঞিয়া দিমু কড়ি নয় বুড়ি॥
(দ্বিজমাধব : ১৯৫২ ; পৃ : ৪২)

শ্বশুর বাড়িতে নববধূর মান-মর্যাদা ও আদর-স্নেহ নির্ধারিত হতো বাপের বাড়ি থেকে কতটা পণ বা যৌতুক এনেছে তার ওপর। মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ প্রথার প্রচলন প্রকট আকার ধারণ করায় সমবর্ণের পাত্র খুঁজে না পাওয়ায় অনেক মেয়েকে সারা জীবন বাবার বাড়িতে কাটাতে হতো অথবা অনূঢ়া কন্যা কোনো মন্দিরে সেবাদাসী হয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। আইবুড়ো নাম ঘুচানোর জন্য কোনো বয়স্ক পাত্রের হাতে পিতা আদরের সন্তানকে (কন্যাকে) তুলে দিতে বাধ্য হতেন।

এ নশ্বর জীবন সমাপ্ত হয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যু জীবনের এক অমোঘ বিধান। এ সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। মৃত ব্যক্তির শারীরিক অস্তিত্বের অন্ত ঘটলেও কাছের মানুষের স্মৃতিতে জাগরূক থাকে তার স্মৃতি। দেহান্তরিত হওয়ার পর তার উদ্দেশে কিছু আচার ও প্রথা মানার উল্লেখ সকল সমাজে বিদ্যমান। প্রথমেই আসে মৃতদেহ সৎকার পদ্ধতি। লোকবিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে সৎকার পদ্ধতিতেও ভিন্নতা আছে। 'যেমন মিশরে রাজাদের মমি থাকত ভূগর্ভস্থ সুরম্যপ্রাসাদে, মুসলমানরা শেষ বিশ্রাম নিতেন কবরে, পার্শীদের নিক্ষেপ করা

হতো গহ্বরে আর হিন্দুদের চিতায় সর্ব গ্লানির মুক্তি। জাপানে ও মেলানেশিয়ায় সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলার রীতি প্রচলিত আছে’। (সনৎকুমার নস্কর ; ১৯৯৫ : পৃ. ১৪৫) হিন্দুরা চিতা সংস্কারকে যেমন অধিকতর বৈজ্ঞানিক মনে করেন তেমনি এর সাথে খাপ খেয়ে গেছে শ্রীমদ্ভগবদ গীতার ‘বাসাংসি জীর্ণানী যথা বিহায়’ এর মতো দেহের নশ্বরতা ও আত্মার অবিনাশত্বের ধারণা। অবশ্য শিশুর মৃত্যু হলে এবং সর্পাঘাতে মৃত্যু হলে মাটিতে প্রোথিত অথবা জলে ভাসিয়ে দেয়া হতো। ‘শ্মশানে মৃতদেহ বহনের ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রমিক হিন্দু সমাজ ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করেছিল। একজন ব্রাহ্মণের চার বর্ণের চার জন পত্নী থাকলেও ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্ররাই সৎকারের অধিকারী হতে’। (সনৎকুমার নস্কর ; ১৯৯৫ : পৃ. ১৪৫) ব্রাহ্মণেরা নীচু জাতের মৃতদেহ স্পর্শ করতেন না। মৃতদেহ অনুগমনের সময় পথে খই, মুড়ি ও পয়সা ছিটানো হতো এই বিশ্বাসে যে পরলোকে তার খাদ্য-বস্ত্রের অভাব না হয়। এ লোকবিশ্বাস শুধু ভারতীয় হিন্দু সমাজে নয় পৃথিবীর আরও অনেক জাতির মধ্যে বিদ্যমান। ‘আরব, পারস্য ও মিশর প্রভৃতি দেশে কবরের মধ্যে পয়সা দেওয়া হতো। অনার্য জাতি বলে পরিচিত খাসিয়ারা শবাধারে অর্থকড়ি রেখে দিত’। (সনৎকুমার নস্কর ; ১৯৯৫ : পৃ. ১৪৫) হিন্দুরা মৃতদেহ চিতায় শোয়ানোর পর তার উত্তরাধিকারীগণ মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যদিয়ে সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করে মুখাগ্নি করে। পোড়ানোর পর দেহের অবশিষ্টাংশ মাটিতে প্রোথিত অথবা দেহভস্ম পবিত্র গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার দায়িত্ব মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারীর। ‘বৌধায়ন পিতৃমেধ যজ্ঞসূত্রে বলা হয়েছে যে, জাতকর্মরূপ সংস্কারের দ্বারা লোক যেমন পৃথিবী লাভ করে থাকে, তেমনি অন্ত্যেষ্টির দ্বারা সে স্বর্গ লাভ করে’। (সনৎকুমার নস্কর : ১৯৯৫ ; পৃ : ১৪৬) মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির উদ্দেশে তার বংশধর অশৌচ পালন করে। এ সময় পরিবারের সদস্যগণ আমিষ ভক্ষণ, তেল, জুতো, ছাতা, শয্যা, চুল, নখ, দাড়ি কাটা, সিঁদুর পরা ইত্যাদি বর্জনের মধ্য দিয়ে কৃচ্ছ্রতা পালন করে থাকে। বর্ণভেদ অনুযায়ী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্রের অশৌচ কাল ভিন্ন হয়ে থাকে। এ সময় উক্ত পরিবার কোন শুভ কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। প্রাচীনকাল থেকে মৃত্যু রহস্য মানুষের মনে গভীর শূন্যতা ও ভীতির সঞ্চার করে আসছে। শ্রাদ্ধক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ এ থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। শ্রাদ্ধক্রিয়া সুসম্পন্ন না হলে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদগতি হয় না। তাই তর্পণের দ্বারা ইহলোক এবং পরলোকের মধ্যবর্তী বৈতরণী পারের ব্যবস্থা, পিতৃলোকে আত্মার অবস্থানের জন্য আহার্য, বস্ত্র প্রভৃতি দানে মৃত ব্যক্তির আত্মার সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা হয়। পুত্র-পৌত্ররাও মনে করেন এ পিণ্ডদানের মধ্য দিয়ে তারা পিতৃঋণ শোধ করছে। শ্রদ্ধা সহকারে এ দান সম্পন হয় বলে এর নাম শ্রাদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের কিছু কিছু বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। কবিকঙ্কণ স্মৃতিশাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত বাঙালি সমাজের নিখুঁত চিত্রকর। তাঁর কলমে শ্রাদ্ধবাসর ধরা পড়ে ছবির মত স্পষ্টতায়—

তিল তুলসী গঙ্গোদক   কুশ বটু রম্ভাত্মক
যব দূর্বা কুসুম চন্দন।
অবধানে পুরোহিত   কর‍্যা দেই নিয়োজিত
শ্রাদ্ধ করে বান্যার নন্দন॥
কপাল জুড়িয়া ফোঁটা   নিবসে পণ্ডিত ঘটা
…   …   …
শত শত দ্বিজবর   জে আইল সাধুর ঘর
পূজে তারে সন্তোষ করিআ’॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৭৯)

মৃত্যুর এক বছর পর অনুষ্ঠেয় সপিণ্ডন শ্রাদ্ধের দ্বারা অশৌচ মুক্ত হয়ে সিংহলরাজ তাঁর কন্যার বিবাহ স্থির করেন—

কি কহিব মনস্তাপ   রণে মৈল খুড়া বাপ
জাবদ না করি পিণ্ডন।
বৎসরেক জদি জায়   তবে শুচি মোর কায়।
বিলম্বে করিব কন্যা দান॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২৭৯)

তীর্থস্থান, নদ-নদী বা গঙ্গার তীর, গোময়লিপ্ত গোয়াল এবং গয়া প্রভৃতি স্থান শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের উপযুক্ত।

মুসলিম সমাজে মৃত্যুর পর মৃতদেহ ইসলামি বিধান অনুযায়ী কবরস্থ করা হয়। প্রথমেই মৃত ব্যক্তিকে গোসল বা স্নান করানো হয়। নাভী থেকে জানু পর্যন্ত আচ্ছাদনের ব্যবস্থা রেখে সমস্ত পরিধেয় তুলে দিতে বলা হয় গোসলকারীকে। প্রথমে বাঁদিক পরে ডানদিকে জল ঢালার নির্দেশ দেয়া হয়। এ সময় মৃতের নখ, চুল ছেদন করা উচিত নয়। শবদেহে প্রসাধনী ব্যবহার করার উল্লেখ আছে নসরুল্লাহের রচনায়—

সুগন্ধি চন্দন শিরে দাঁড়িতে যত্তনে।
সজিদার ঠামে ঠামে কাফুর লাগাইয়া।
ন থাকিলে কাফুর সুগন্ধি তথা দিবা॥
কাকইন ফিরাইয়া মাথাত দাঁড়িত।
নওখ কিবা কেশ ন কাটিবা কদাচিত।
পারিলে কাফন দিবা ন পারিলে নাই॥
(নসরুল্লাহ : ১৯৭৪ ; পৃ : ২২৬)

মৃত ব্যক্তিকে কাফন দান করলে বেহেস্তে নসিব হয় এবং কবরে মাটি দিলে পুণ্য সঞ্চয় হয় এমন আভাস পাওয়া যায় নসরুল্লাহ খোন্দকারের *শরীয়তনামা* কাব্যগ্রন্থে—

সেই এক মুঠিতে আছএ রেনু যত।
প্রভু নিরঞ্জনে তারে পূণ্য দিব তত॥
সেই মাটি প্রসাদে মৃত্যু এ পূণ্য পায়।
গোরের অন্তরে অতি আনন্দে রহয়॥
(নসরুল্লাহ : ১৯৭৪ ; পৃ : ২২৮)

মৃতদেহ কবরস্থ করার পর বাড়িতে এসে মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য পবিত্র কোরান পাঠ করা হয়। অন্ধকার ঘরে বাতি জ্বেলে উজ্জ্বল করাও ছিল বিধান। মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজন দান দক্ষিণা বা পুণ্যকর্ম না করলে মৃতের রুহ বা আত্মা অসন্তুষ্ট হতো বলে সকলে বিশ্বাস করতেন। আত্মার সদগতির জন্য ফাতেহা পাঠ অবশ্য কর্তব্য বিবেচিত হতো। হিন্দু সমাজে অশৌচ পালনের মতো মুসলিম সমাজেও ব্যাপারটা লোকপ্রচলিত সংস্কারে পৌঁছে গিয়েছিল। নাপিতের ক্ষৌরকর্মের পরেই যে শুদ্ধ হওয়া যেত সে ধারণা মুসলমানেরাও বিশ্বাস করতে শুরু করেন। কিন্তু আচারনিষ্ঠ নসরুল্লাহ খোন্দকারের মতে, এ সবই কাফেরের আচার। এসব কুসংস্কারকে সমালোচনা করে তিনি লেখেন—

শুনিয়াছি কাফের মুখে কেহ যদি মরে।
তাহারে দহিয়া যদি ফিরি আইসে ঘরে॥
তিতা ভক্ষি লোহা দেওন্ত ভাণ্ডে করি ছেরান।
যুগ পদ তলে যত্নে রাখন্ত পাষাণ॥
সে সবের দেখাদেখি মুসলমানগণ।
তিতা অন্ন ভক্ষ্য করে কিসের কারণ॥

(নসরুল্লাহ : ১৯৭৪ ; পৃ : ২৩৫-২৩৬)

বরং এ ক্ষেত্রে তার বিধান হচ্ছে—

মৃত্যু ঘরে তিতা অন্ন দিতে অনুচিত।
মধু মিষ্টা ঘৃত লনী খাইতে উচিত॥
(নসরুল্লাহ : ১৯৭৪ ; পৃ : ২৩৫)

জন্ম ও মৃত্যুজনিত অশৌচ কাটানোর জন্য নাপিতের ব্যবহার হিন্দু সমাজের ন্যায় মুসলিম সমাজেও সংক্রমিত হয়েছিল। ইষ্ট কুটুম্বের ঘরে নাপিত না পাঠালে অসন্তোষের সৃষ্টি হতো। নসরুল্লাহ খোন্দকারের *শরীয়তনামায়* এর সাক্ষ্য মেলে—

তৃতীয় দিবস যদি হইলে মরার।
নাপিত আনিয়া বুলে খেউর করিবার॥
আপনে করিয়া খেউর ইষ্ট ঘরে ঘরে।
খেউর হেতু যত্নে পাঠাওন্ত নাপিতারে॥
ইষ্ট কুটুম্বের ঘরে নাপিত না দিলে।
অতি অসন্তোষ হয় সবে তারে বুলে॥
(নসরুল্লাহ : ১৯৭৪ ; পৃ : ২৩৬)

কথিত আছে হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বণ কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ে শুধু বারোা মাসে তেরো পার্বণ নয় বরং প্রতিটি দিনই তাদের কাছে পার্বণিক। কারণ প্রতিটি বাড়িতে প্রতিদিন তারা গৃহদেবতার অর্চনা করেন। তাছাড়া বিশেষ তিথি, বার, মাস, নক্ষত্র কিংবা দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে ব্রতের সূচনা বহুকাল ধরে সমাজে প্রচলিত। এই ব্রতগুলির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নারী সমাজের। ধারণা করা হয়, প্রতিটি নারীর মধ্যে দেবী দুর্গার শক্তি বিদ্যমান। নারী জাতিকে গৃহলক্ষ্মীর সাথে তুলনা করা হয়। অপৌরাণিক দেবীদের স্বীকৃতি কিন্তু নারী সমাজেই মিলেছিল তাদের ঘট পূজার মধ্য দিয়ে। সমষ্টির ভাবনা এবং সামাজিক উৎসবের বড় অংশ হলো পার্বণ। বারো মাসে তেরো পার্বণ বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়কে উৎসবমুখর এবং তাদের অস্তিত্বকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে। প্রতিটি বাংলা মাসের সাথে পার্বণগুলি নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত -বৈশাখে অক্ষয় তৃতীয়া, গোষ্ঠযাত্রা, জ্যৈষ্ঠে অরণ্য ষষ্ঠী, জামাই ষষ্ঠী ; আষাঢ়ে রথযাত্রা ; শ্রাবণে দশহরা, মনসাপূজা, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, বিশ্বকর্মাপূজা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা ; কার্তিকে শ্যামাপূজা, ভাতৃদ্বিতীয়া ; অগ্রহায়ণে নবান্ন ; পৌষে পৌষপার্বণ ; মাঘে সরস্বতী পূজা ; ফাল্গুনে শিবরাত্রি ; চৈত্রে শীতলা, বারুণি অন্নপূর্ণা ; বাসন্তী, নীল ও চড়ক। এ ছাড়া ব্রত হিসেবে পালিত হতো প্রতি মাসের ষষ্ঠী, একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা। অবিবাহিত মেয়েরা আনন্দের সাথে ইতু ও সেঁজুতির ব্রত করতো। সধবারা যেমন পতি ও সন্তানের মঙ্গল, সংসারে ধনৈশ্বর্য ও সন্তানলাভের জন্য ব্রত করে তেমনি বিধবারা ব্রত করে পরলোকে সুখ ও শান্তির প্রত্যাশায় তদ্রূপ কুমারীদের ব্রতের উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে সুখময় দাম্পত্য জীবনলাভ। নারীদের ব্রতের লক্ষ্য কখনই পার্থিব কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্য মনসাব্রত, চণ্ডীব্রত, অন্নদাব্রত, শীতলা, ষষ্ঠীব্রত, শিবব্রত পালিত হয়। আর এসব পাঁচালি যারা লিখতেন তারা পাঁচালির শেষ প্রান্তে প্রাপ্তি তালিকা সেঁটে দিতেন। নানা বর্ণে ও বৃত্তিতে প্রাপ্তি তালিকা থাকতো বলে সাধারণ মানুষ দেবতার প্রতি অনুরক্ত হবেন এটাই স্বাভাবিক। চণ্ডীব্রতে উল্লেখ আছে—

কলিকালে চণ্ডীকার হইল প্রকাশ।
যার যে বা মনোরথ পুরে তার আশ॥
ব্রাহ্মণ শুনিলে ধর্মশ্রাস্ত্রের ভাজন।
যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিবে ক্ষত্রিগণ॥
বৈশ্যেতে শুনিলে হয় বাণিজ্যেতে মতি।

শূদ্রেতে শুনিলে সুখ মোক্ষ পায় গতি॥
(মুকুন্দরাম : ১৯২১ ; পৃ : ৩১৩)

প্রায় সারা বছর ধরেই মেয়েরা অংশ নিত ষষ্ঠীব্রতে। বৈশাখে ধুলা, জ্যৈষ্ঠে অরণ্য, আষাঢ়ে কর্দম, শ্রাবণে লোটন, ভাদ্রে মন্থন, আশ্বিনে দুর্গা, কার্তিকে নাড়ী, অগ্রহায়ণে মূলা, পৌষে অনুরূপা, মাঘে শীতল, ফাল্গুনে অশোক এবং চৈত্রে নীলষষ্ঠী ব্রত উদযাপিত হতো। এ ছাড়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে ষষ্ঠ দিনে, অষ্টম দিনে অথবা একবিংশতম দিনে ষষ্ঠী পূজা করা হয়। মাতা-পিতার বিশ্বাস এ দিনে ষষ্ঠী দেবী নিজে এসে সন্তানের ভাগ্য গণনা করেন। বিধবাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল একাদশীর ব্রত ও উপবাস। চিত্তকে শুদ্ধ এবং সংযত করাই এ ব্রতের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এ কারণেই বোধ হয় সধবাদের এ ব্রত পালনে বিশেষ বাধা ছিল। 'বাইশ কবির *মনসামঙ্গলে* সধবার পতির মৃত্যু ঘটতে পারে বলে সতর্কবাণী আছে'। (সনৎকুমার নস্কর ; ১৯৯৫ : পৃ. ১৪৯) *শূন্যপুরাণেও* একাদশী ব্রতের কথা উল্লেখিত আছে। ব্রত শেষে পারণকালে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, আত্মীয়-স্বজনসহ পাড়া-পড়শিকে খাওয়ানো অধিক পুণ্যের কাজ বলে স্বীকৃত। একাদশীর-মাহাত্ম্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিধান আছে—

একাদশীর দিনে যদি অন্ন নাই খায়।
জন্ম জনননাদি তবে জঞ্জাল এড়ায়॥
যথোক্ত প্রকারে যদি করে একাদশী।
ধন্য ধন্য ধন্য সেই জন পুণ্য-রাশি॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ২১৪)

বিভিন্ন ব্রত পালন যেমন মঙ্গলময়তার প্রতীক তেমনি ব্রতভঙ্গ করা গুরুতর পাপ, অনাচার ও অপরাধ বলে গণ্য হতো। *শূন্যপুরাণে* এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে-'সতি হয়্যা ব্রতভঙ্গ নহে ত উচিত'। (সনৎকুমার নস্কর : ১৯৯৫ ; পৃ : ১৪৮) নারী সমাজে এ ব্রতগুলিতে বেশ কিছুটা নান্দনিক ভূমিকাও ছিল। সব ব্রতেই কম বেশি আলপনা দেওয়ার প্রচলন ছিল। আলপনাতে অতি সহজ উপকরণ ব্যবহার করা হতো। যেমন শুকনো বেলপাতার গুড়া, হলুদ, পোড়া তুঁষ, ইটের গুড়ো, পিটুলিগোলা দিয়ে গাছ, ফুল লতা, পাতা, পশু-পাখি, চন্দ্র-সূর্য, নৌকা, ঢাল-তলোয়ার, কুলো প্রভৃতি অঙ্কন করার রেওয়াজ ছিল। নারীর মনোজগৎ ও পার্থিব বাসনা ফুটে উঠত এ সব আঁকি-বুকির মধ্য দিয়ে। একঘেয়েমি ঘর গৃহস্থালিতে ঠাসা দম বন্ধ হওয়া জীবন থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে তারা এ কাজে ব্যস্ত হতেন। মোট কথা ব্রত হয়ে উঠেছিল নারী সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রাণ ও নিজেকে প্রকাশ করার বলিষ্ঠ মাধ্যম।

সমাজে আর এক ধরনের ব্রতের উল্লেখ আছে সেটি হচ্ছে প্রায়শ্চিত্তমূলক অনুষ্ঠান। মনু তাঁর ধর্মশাস্ত্রে মনুষ্যকৃত পাপকে সাত ভাগে ভাগ করেছেন যেমন মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশকরপাতক, সংকরীকরণ পাতক, অপাত্রীকরণ পাতক এবং মলাবহ পাতক। এইসব পাপস্খলনের জন্য নানা ধরনের বিধানও শাস্ত্রকার সমাজে দিয়ে থাকেন। পাপাচারীর বয়স, যোগ্যতা, লিঙ্গ, জাতি এবং দেশকাল বিবেচনা করেই প্রায়শ্চিত্তের লঘুত্ব ও গুরুত্ব বিবেচিত হতো। গোদান, গঙ্গাস্নান, চান্দ্রায়ণ কিংবা প্রজাপাত্য প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে পাপ বিমোচন করা যেত।

হিন্দুদের আর একটি অন্যতম উৎসব হচ্ছে দোল উৎসব বা হোলি। বিশেষ ঘটা করে ভারতীয় বাঙালিরা এ উৎসবটি পালন করে থাকেন। বিত্তবানরা বাগানবাড়িতে দোলমঞ্চ তৈরি করে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে এ উৎসব পালন করে।

সেকালে হিন্দুদের স্মৃতি-সংহিতার মতো মুসলমান সমাজও নিয়ন্ত্রিত হতো হাদিস ও শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে। গোঁড়া ধর্মশাস্ত্রকাররা আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভ এবং নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে সকলকে নিয়ম অনুসরণ করতে বাধ্য করতেন। ধর্মান্তরিতদের আচরণগত মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে ধর্মযাজকগণ তাদের সংশোধন করে দিতেন। মুসলমাগণ পাঁচটি কর্মকে প্রধান কর্তব্য বা ফরজ বলে মনে করেন। এ পাঁচটি কর্ম হলো কলিমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত। দৈনিক পাঁচ বার নামাজ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। অপবিত্র স্থানে নামাজ পরিত্যাজ্য। রমজান মাসে রোজা রাখা প্রতিদিন নামাজ পড়ার মতই গুরুত্বপূর্ণ। উপবাসের দ্বারা যথেষ্ট কৃচ্ছ্রসাধন হয়। কোনো কারণে রোজা রাখতে না পারলে কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পরিশোধের ব্যবস্থা আছে। বাংলার মুসলিম সমাজে অধিকাংশ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয় চান্দ্রমাসের তারিখ অনুসারে। ইদ, শব-ই বরাত, মুহররম এ সবই চান্দ্রমাসকেন্দ্রিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ইদ অনুষ্ঠান বছরে দু'বার পালিত হয়। এক মাস সিয়াম সাধনের পর শওয়াল মাসের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানকে বলা হয় ইদুল ফিতর। আর জেলহজ্জ মাসের দশম দিবসে কোরবানির মাধ্যমে যে উৎসব পালিত হয় সেটা হলো ইদুল আযহা। বাঙালি মুসলিম সমাজে এ দুটি অনুষ্ঠান অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে পালিত হয়। এ দিনে ধনী দরিদ্র সকলে সাধ্যমতো নববস্ত্র পরিধান করেন।

শাবান মাসের চতুর্দশ দিবসে পালিত হয় 'শব ই বরাত' উৎসব। মুসলমানদের বিশ্বাস 'শব ই বরাত' রজনীতে স্রষ্টা সকল নর-নারীর সাংবাৎসরিক রুজী বরাদ্দ করে থাকেন। এ কারণে মুসলমানেরা এ রজনীতে সারারাত জেগে নামাজ পড়েন, গৃহকে আলোক সজ্জিত করেন, আতসবাজী পোড়ান। 'সেকালে বাঙালি মুসলমানেরা নামাজ বা এবাদতের চেয়ে লোকবিশ্বাসজাত অনুষ্ঠান পালনের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতেন। যেমন শাবান মাসের প্রথম দিনেই পরলোকগত আত্মার শান্তির প্রত্যাশায় প্রত্যেক পরিবারের লোকেরা রুটি তৈরি করে সেগুলি গরীবদের মধ্যে বিতরণ করতো। ... মুহররম মাসকে সেকালের মুসলমানেরা আনন্দের মাস হিসেবেই বরণ করতেন যদিও এর পিছনে আনন্দের চেয়ে বিষাদের স্মৃতিই বেশি। কারণ এ মাসেই মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর দৌহিত্র ইমাম হোসেন ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এজিদের চক্রান্তের শিকার হয়ে কারবালা প্রান্তরে নির্মমভাবে নিহত হন। ইমাম হোসেনের শাহাদৎ বরণকে স্মরণ করতেই বাংলার শিয়া সম্প্রদায় অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মুহররম উৎসব পালন করেন'। (জলিল : ১৯৯৬ ; পৃ : ৬২)

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেরা উৎসব পালন করতে দেখা যায়। 'সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার সুবাদার মুকররম খান বুড়ীগঙ্গায় বেরা উৎসব পালন করেছিলেন বলে জানা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেরা উৎসব সমাজে ব্যাপকভাবে সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়। সাধারণত মুসলমানসহ আমীর ওমরাহরা পর্যন্ত এ উৎসব ঘটা করে পালন করতেন। বাংলার নবাবদের মধ্যে মুর্শিদকুলি খাঁ এবং নবাব সিরাজ উদ-দৌল্লাহ মহা ধুমধামের সাথে ভাগীরথীতে এই উৎসব পালন করেন'। (জলিল ; ১৯৯৬ : পৃ : ৬৩)

বাংলার হিন্দু সমাজের দেখাদেখি মুসলিম সম্প্রদায়ও পালন করতো হোলি উৎসব। ইতিহাস থেকে জানা যায় নবাব আলীবর্দী খানের ভ্রাতুষ্পুত্র সালামৎ জং এবং সৌলত জং মতিঝিল উদ্যানে সাতদিন যাবৎ এ অনুষ্ঠান পালন করেছিলেন। আলীনগরের সন্ধিস্থাপনের পর মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে নবাব সিরাজ উদ-দৌল্লাহও মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে হোলি উৎসব উপভোগ করেন। বাঙালি হিন্দু মুসলমানের এ সব উৎসব অনুষ্ঠানকে ধর্মীয় উৎসব না বলে বাঙালির সাংস্কৃতিক উৎসব বলা শ্রেয়।

সহমরণ ছিল বাঙালি হিন্দু নারীকুলের জন্য এক মর্মান্তিক প্রথা। সহমরণ প্রথার উদ্ভব কখন কীভাবে তার সঠিক কোন দিন ক্ষণ উল্লেখ নেই। তবে বহু যুগ ধরে এই বীভৎস, করুণ মর্মান্তিক

প্রথাটি সমাজে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে বাঙালি হিন্দু সমাজে সহমরণ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং তার প্রমাণও পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে ছায়ার সহমরণ, মানিকরামের *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে কর্ণসেনের চারপুত্রবধূর সহমরণ, রঞ্জার মা বিমলার সহমরণ এবং ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে ভবানন্দ মজুমদারের দুই পত্নী চন্দ্রমুখী এবং পদ্মমুখীর সহমরণ পাঠককে বেদনাবিধুর করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবার ও গার্হস্থ্যজীবনের একটি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছি। এ ক্ষেত্রে আমরা মনু নির্দেশিত পরিবার ও গার্হস্থ্যজীবনের সংজ্ঞার্থ নিরূপণের জন্য চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) সম্পর্কে আলোচনা করেছি যা একান্ত ভাবে ভারতীয় হিন্দু ধর্মাশ্রয়ীদের জন্য নির্দেশিত বিধান। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় মধ্যযুগের বাংলা কাহিনিকাব্যে গার্হস্থ্যজীবন। এটি সার্বজনীন। সকল ধর্মে গার্হস্থ্যধর্মকে সবার ওপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকেও বিষয়টি বিবেচিত হয়েছে। গার্হস্থ্যজীবন আলোচনায় সকল বাঙালির আচার-আচরণ, চাল-চলন, খাওয়া-দাওয়া, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অলঙ্কার-প্রসাধনী, উৎসব-পার্বণ, সংস্কার-কুসংস্কার সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যাত হয়েছে অভিসন্দর্ভের অন্তর্গত নির্বাচিত কাহিনিকাব্যসমূহের আলোচনায়। হিন্দু-মুসলিম জীবনাচরণে নির্দেশিত সূক্ষ্ম পার্থক্যটিও সংক্ষেপে নিরূপণ করা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

অনাদিকুমার মহাপাত্র	(জুলাই ১৯৯৮) *বিষয় সমাজতত্ত্ব* ; পুনর্মুদ্রণ, ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন, কলিকাতা-০৯
অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব সম্পাদিত	(১৩৮১ বঙ্গাব্দ) ময়ূরভট্টের *ধর্মমঙ্গল*, জি. ভরদ্বাজ এন্ড কো. কলিকাতা
আনিসুজ্জামান সম্পাদিত	নসরুল্লাহ খোন্দকারের (১৯৭৪) *শরীয়তনামা*, (পাণ্ডুলিপি) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা সাহিত্য সমিতি
আহমদ শরীফ সম্পাদিত	দোনাগাজীর (১৯৭৫) *সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামান*, বাংলা একাডেমী
” ”	দৌলত উজির বাহারাম খাঁ বিরচিত (২০০৬) *লায়লী-মজনু*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা
”	(এপ্রিল ১৯৭৭) *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা
কে. এম আশরাফ	(জুলাই ১৯৯৪) *হিন্দুস্তানের জন-জীবন ও জীবন-চর্যা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, পার্ল পাবলিশার্স, কলিকাতা ০৬
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	(১৯৭৪) *শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত*, দেবসাহিত্য কুটির, কলিকাতা

খগেন্দ্রনাথ সেন (১৯৯৮) *সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা*, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিমার্জিত সংস্করণ, বিদ্যাপ্রকাশ, কলিকাতা-৭৩

গোলাম হোসায়ন সলীম *রিয়াজ-উস-সলাতীন ;* আকবার উদ্দীন (অনূদিত) (বাংলার ইতিহাস) বাংলা একাডেমী, ঢাকা

পীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত (১৯৬২) ঘনরাম চক্রবর্তীর *শ্রীধর্মমঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (২০১৬) মহর্ষি-মনু-প্রণীত *মনুসংহিতা*, পুনর্মুদ্রণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা-৬

মুহম্মদ আবদুল জলিল (জানুয়ারি ১৯৯৬) *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া (মে ১৯৯১) *শ্রীরায় বিনোদ : কবি ও কাব্য*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত (১৯৪৯) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের *মনসামঙ্গল*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রাজিয়া সুলতানা (জুন ১৯৯৮) *সাহিত্য-বীক্ষণ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু প্রকাশিত (১৯২১) মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তি প্রণীত *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইণ্ডিয়ান প্রেস লি. এলাহাবাদ

শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত (১৯৬২) বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রকাশিত (১৩১৮) ঘনরাম চক্রবর্তী কবিরত্ন প্রণীত *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল*, তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গবাসী ইলেকট্রো মেসিন, কলিকাতা

শ্রীযোগিলাল হালদার সম্পাদিত (১৯৫৭) রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সনৎকুমার নস্কর (১৯৯৫) *মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য আর্থ-সামাজিক পটভূমি ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার*, প্রথম প্রকাশ, রত্নাবলী, কলিকাতা-০৯

সুকুমার সেন সম্পাদিত (২০০৭) কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত *চণ্ডীমঙ্গল*, সাহিত্য অকাডেমী, কলিকাতা

সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত (১৯৫২) দ্বিজ মাধবের *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ দাস সম্পাদিত (১৯৬০) জগজ্জীবন ঘোষাল বিরচিত *মনসামঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Irawati Karve *(1965) Kinship Organization in India*

J.S.Stavorinus	*Voyages to the East Indies, Vol. 1*
Kingsley Davis	*(1998) Human Society; California, USA*
Samuel Koenig	*Sociology*
	(1969) An Introduction to the Science of Society New York,
T.B. Bottomore	*Sociology*
	A guide to Problems and Literature
William J. Goode	*(1965) The Family, Columbia University, USA,*

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাহিনিকাব্যে গার্হস্থ্যজীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখা

১. রাজনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখা

একটি মানব শিশু যেমন ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শৈশব অতিক্রমের পর কৈশোরে পদার্পণ করে তেমনি আমাদের বাংলা সাহিত্যও প্রাচীনযুগ পেরিয়ে মধ্যযুগে উত্তীর্ণ হয়েছে। 'পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় মধ্যযুগে বাংলা দেশের সাহিত্য ছিল ধর্মকেন্দ্রিক'। (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : ১৩৭১ ; পৃ : ১৪৯) বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের ব্যাপ্তিকাল ১২০১-১৮০০খ্রি. পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘ ছয়শত বছরের ইতিহাসে বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ধারার সাহিত্য উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছে। এর মধ্যে কাহিনিকাব্যের ধারাটি ছিল বহুল প্রচলিত ও সমৃদ্ধ। এসব সাহিত্যেরও রয়েছে বিষয়ভিত্তিক নানা ধারা। যেমন লোক-পৌরাণিক ধারা, নাথ-সাহিত্যের ধারা ও মঙ্গলকাব্যের ধারা। মধ্যযুগে বাংলার বিশাল পরিসরে বিস্তৃত নানা শতাব্দীর এইসব কাহিনিকাব্য বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের দলিল। ধর্মীয় ও নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এইসব গ্রন্থ রচিত হলেও কালের স্মারক হিসেবে এদের গুরুত্ব অপরিসীম। মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য এই কাহিনিকাব্যগুলো তথ্য ও উপাত্তের আকর স্বরূপ।

মধ্যযুগের বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ে ইতিহাস-সূত্র কালের চিহ্নবহ হিসেবে বিবেচিত হয়। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক কাল কাটিয়া গিয়া কালান্তরের সূচনা হয় বৈদিক আর্যদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে'। (গোপাল হালদার : ১৯৭৪ ; পৃ : ১২৬) মোট কথা বৈদিক আর্যদের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়েই আমরা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা এবং জীবনযাত্রার একটা চিত্র পাই। এ চিত্র 'আনুমানিক (খ্রি. পূ. প্রায় ১৫০০ অব্দ) হইতে নানা পরিবর্তনের মধ্যদিয়া মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্যন্ত (খ্রি. ১৭৬৪) প্রায় একই খাতে বহিয়া আসিতেছে'। (গোপাল হালদার : ১৯৭৪ ; পৃ : ১২৬)

'১২০১ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি অতর্কিতে নদীয়া আক্রমণ করেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন বিনা যুদ্ধে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে আসেন। সেখানে সেনবংশীয় এবং অন্য হিন্দু রাজারা প্রায় এক শতাব্দী কাল রাজত্ব করতে থাকেন। কয়েক বছরের মধ্যে ইখতিয়ার উদ্দিন রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীসহ উত্তর-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গসহ অধিকাংশ স্থান দখল করে নেন। উত্তর-বঙ্গের দেবকোটে তিনি নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। দিল্লি হতে বহু দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি দিল্লির বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করতেন'। (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : ১৩৭১ ; পৃ : ১৩৭) বাংলায় মুসলিম শাসন সূচিত হয় ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়ে। বখতিয়ার খিলজির মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ইতিহাসে এক নতুন ধারার সূচনা করে। ইসলাম ধর্মের মোড়কে বাংলায় মুসলিম সভ্যতার আগমন এ দেশের ঐতিহ্যবাহী সমাজ, সংস্কৃতি তথা সামগ্রিক জীবন ধারায় সৃষ্টি হয় গভীর আলোড়ন। সূচিত হয় গভীরতর সাংস্কৃতিক সমন্বয়-সংঘাতের ধারা। তুর্কি আক্রমণের মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি জীবনে যেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি সাহিত্যচর্চায় সৃষ্টি হয়েছিল বিরূপ মনোভাবের। উচ্চতর সমাজে এ সংকট বেশি প্রত্যক্ষ করা যায় কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এর প্রভাব অতটা প্রবল ছিল না। ফলে গ্রামে যে সকল লৌকিক দেব-দেবীর উদ্ভব হয় তার মাহাত্ম্যকীর্তনসমূহ প্রচারের নিমিত্তে উত্তরকালে মঙ্গলকাব্যনামক পালাগান রচিত হয়েছিল। এই পালাগানসমূহকে পাঁচালি বা পাঞ্চালিক বলা হতো এবং সেগুলি রাতের পর রাত নাচ ও বাজনার সঙ্গে গাওয়া হতো। বঙ্গে হিন্দু শাসনের অবসান ও মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয় মোটামুটি ১২০১ খ্রিষ্টাব্দে। যারা এ দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন তারা জাতিতে তুর্কি, ধর্মে মুসলমান এবং সংস্কৃতিতে মুখ্যত পারসিক। তারা ঘরে তুর্কি, রাজকার্যে ফারসি এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে আরবি ভাষা ব্যবহার করতেন। তুর্কি আমলের (১২০১-১৩৫০) এই দেড়'শ বৎসরের মধ্যে বঙ্গে উপর্যুপরি রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকা সত্ত্বেও মুসলিম শাসন ক্ষমতা ক্রমবর্ধমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি পরিবেশও সৃষ্টি হতে থাকে। তুর্কিদের আগমনের বহু আগেই বাংলার সঙ্গে

ইসলামের পরিচয় ঘটে এবং বিভিন্ন কারণে সংযোগ স্থাপিত হয়। এ সকল কারণের মধ্যে দুটি কারণ অন্যতম, প্রথমত : ব্যবসা ও বাণিজ্য সূত্রে, দ্বিতীয়ত : ধর্ম প্রচারের সূত্র ধরে পির-দরবেশদের এ দেশে আগমন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, তুর্কিদের আগমনের ফলেই এদেশের সঙ্গে ইসলামের পূর্ব সংযোগ স্বভাবতই দৃঢ়তর এবং বিস্তৃত হয়েছিল। এদেশে ইসলামের বিস্তৃতির সাথে সাথে ইসলামি পরিবেশও গড়ে উঠতে থাকে। ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষা ধর্ম-কর্ম আচার-আচরণ আহার-বিহার প্রভৃতি প্রবর্তনের মধ্যদিয়ে এক ভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এ পরিবেশ শুধু যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয় এদেশের অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ আবহাওয়া ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হতে থাকে। এই পরিবেশেই রচিত হয় রামাই পণ্ডিতের *শূন্যপুরাণের* অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'। যদিও রামাই পণ্ডিতের আর্বিভাব ও এ কবিতাটির রচনা কাল নিয়ে নানা জনের নানা মত আছে। তবে রচনাটি যে খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ-চর্তুদশ শতকে রচিত এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শাসন-ব্যবস্থা লোপ পাওয়ায়, দেশ থেকে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব অপসারিত হতে থাকে। এই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের স্থলাধিকারী হলো ইসলাম। বখতিয়ার খিলজি ও তাঁর আমিরগণ দেশ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও সেখানে নিয়মিত খুৎবা (সাপ্তাহিক ধর্মোপদেশ) প্রদানের ব্যবস্থা করে ইসলাম বিস্তৃতির সহায়ক প্রতিষ্ঠান যেমন দরগাহ, খানকাহ প্রতিষ্ঠা করে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করেন। বঙ্গে ইসলাম প্রচারের যে প্রাধান্য স্থাপিত হয় তা বখতিয়ার খিলজির পরেও অক্ষুণ্ণ থাকে। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে বাংলার ইতিহাসও দিক পরিবর্তন করেছে। এই পরিবর্তনের মূল পাদপীঠ গৌড় এবং সপ্তগ্রাম। বাণিজ্য কেন্দ্রের অন্যতম পীঠস্থান হিসেবে গৌড় ও সপ্তগ্রামের গুরুত্ব অপরিসীম। এবং এ দুটি নগরের উপস্থিতি মঙ্গলকাব্যে পরিলক্ষিত হয়। বাণিজ্য উপলক্ষ্যে অথবা ভূ-স্বামীর আমন্ত্রণ রক্ষায় বণিকেরা প্রায়ই গৌড়ে আসতেন। সুতরাং স্থানিক গুরুত্বের কারণেই বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসও আবর্তিত হয়েছে গৌড় ও সপ্তগ্রামের কর্তৃত্বের লড়াই নিয়ে। গৌড়বঙ্গ অধিকারের মধ্য দিয়ে তুর্কি ও খিলজি বংশ প্রতিষ্ঠা পেলেও তারও প্রায় পঞ্চাশ বছর পর পূর্ববঙ্গ ইসলামি অধিকারে আসে এবং বাংলা দেশ দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

'বঙ্গে তুর্কি আমলের অবসান হয় গৌড়ের শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-১৩৫৮খ্রি.) অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে। ইতিহাসে ইলিয়াস শাহের নাম বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তিনিই বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা করে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন। ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ সালে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাধি গ্রহণ করে লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তিনি প্রথমে সাতগাঁওয়ে অভিযান পরিচালনা করেন এবং খুব সম্ভবত ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সাতগাঁও দখল করে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ পূর্ব বাংলায় সফল অভিযান চালিয়ে সোনারগাঁয়ের সুলতান ইখতিয়ারউদ্দিন গাজী শাহকে পরাজিত করে সোনারগাঁ অধিকার করেন যা বাংলা দেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইলিয়াস শাহ একজন দূরদর্শী সুলতান ছিলেন; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা বাংলা দেশে মুসলিম সাংস্কৃতিক জাগরণে এক নবযুগের সূচনা করে। সুলতান ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র সিকান্দর শাহ ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় ৩৪ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বাংলা দেশে মুসলিম শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সিকান্দর শাহের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা হলো দিল্লির সুলতানদের হাত থেকে বাংলা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ মনে করেছিলেন যে, বাংলা দেশের নতুন সুলতানের রাজত্বকালের প্রারম্ভে বাংলা দেশ পুনরুদ্ধার করা সহজ হবে। তাই তিনি ১৩৫৯ খ্রিষ্টাব্দে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দ্বিতীয়বার বাংলা দেশ আক্রমণ করেন। এ-অবস্থায় সিকান্দর শাহ ফিরোজ শাহের আগমনে ভীত না হয়ে পিতার রণনীতি অনুসরণ করে দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলে দু'পক্ষের যুদ্ধ চলতে থাকে। দীর্ঘদিন যুদ্ধ অব্যাহত থাকলেও জয়-পরাজয় অমীমাংসিত থেকে যায়। অবশেষে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়'। (সূত্র ; আশফাক : ২০১৮ ; পৃ : ২২৯-২৩৬) তবে

সিকান্দার শাহের শেষ জীবন সুখের হয়নি। কথিত আছে বিমাতার চক্রান্তে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ বিদ্রোহী হয়ে উঠেন এবং পিতা-পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হয়। সেই যুদ্ধে সিকান্দর শাহ পরাজিত ও নিহত হন। ‘গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ’র রাজত্বকাল (১৩৯০-১৪১০) তিনি ১৩৯০/৯১ সালে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪১০/১১ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। গোলাম হোসেন সেলিমের মতে রাজা কানস (রাজা গণেশ) নামে একজন জমিদারের চক্রান্তে সুলতানকে হত্যা করা হয়েছিল’। (আশফাক ; ২০১৮ : পৃ : ২৩৮-২৪০) বাংলার ইতিহাসে তাঁর রাজত্বকাল নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে। খ্যাতি ও সাফল্যের বিচারে ইলিয়াস শাহি বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রশাসক হলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ বিভিন্ন দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় প্রশাসক হিসেবে প্রজাদের মণিকোঠায় স্থান করে নেন। ইলিয়াস শাহি বংশ প্রায় ১২২ বছর বাংলা দেশ শাসন করে। ইলিয়াস শাহি আমলে বাংলা দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়েও সমৃদ্ধ ছিল। বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা এবং চীনা লেখকদের বিবরণ থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে জানা যায়। ইলিয়াস শাহি আমলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তৎকালে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অগ্রগতি দেখে বিদেশি বণিক এবং পর্যটকগণ বিস্ময় প্রকাশ করেন। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিকেও অগ্রগতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁরা বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ‘গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ কাব্যরসিক ছিলেন। পারস্যের অমর কবি হাফিজের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি নিজেও কবিতা লিখতেন এবং মহাকবি হাফিজের কাছে এক ছত্র কবিতা পাঠিয়ে তাঁকে দিয়ে কবিতাটি পূরণ করিয়েছিলেন। মৈথিলি কবি বিদ্যাপতি আনুমানিক জীবনকাল (১৩৭০-১৪৬০) যে সময় গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন সেই সময় মিথিলায় বসে অনেক শ্রেষ্ঠ পদ রচনা করেন। এ আমলেই শাহ মুহম্মদ সগীর ফারসি প্রেমাখ্যান থেকে *ইউসুফ জোলেখা* রচনা করেন’। (সুখময় মুখোপাধ্যায় : ২০০০ ; পৃ : ২৬২-২৬৩) *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসের সময় কাল এবং *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যটির রচনা কাল মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে আনুমানিক ১৩৪০-১৪৪০ বলে ধরে নেয়া যায়। এ ছাড়া চতুর্দশ শতকের অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বৈষ্ণবপদাবলি এবং বিভিন্ন পাঁচালি সাহিত্য : *রামপাঁচালি*, *ভারতপাঁচালি*, লৌকিক *দেবতাপাঁচালি।* এছাড়া *পালগীতি* এবং *নাথগীতিকাও* চতুর্দশ শতকের রচনা। আহমদ শরীফ তাঁর *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (১ম খণ্ড) গ্রন্থে এক স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্যিকের কথা বলেছেন যাঁদেরকে উনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ নামে অভিহিত করেছেন। ‘এঁরা সাধারণত ধর্মপন্থী, নাথপন্থী, গোরক্ষপন্থী, সহজপন্থী, বৈষ্ণবপন্থী, বাউল ও যোগী। বাংলার সুফিগণও গভীরভাবে বৌদ্ধ দেহতত্ত্ব ও বৌদ্ধ শূন্যতত্ত্ব প্রভাবিত’। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতকে নাথসাহিত্য, ধর্মসাহিত্য, সহজিয়া সাহিত্য ও যোগতান্ত্রিক সাহিত্য যা একান্তই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য নামে পরিচিত যার অস্তিত্ব পাওয়া যায় (আহমদ শরীফ : ২০০৮ ; পৃ : ৩১৯) গ্রন্থে।

বাংলাদেশে ইলিয়াস শাহি বংশকে উৎখাত করে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য হিন্দু রাজা গণেশ গৌড় অধিকার করেন। পরে রাজা গণেশের ছেলে মুসলমান রাজা হিসেবে রাজত্ব করেন অর্থাৎ মুসলিম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা গণেশ একজন হিন্দু জমিদার ছিলেন। তিনি সিংহাসনে বসেই অত্যাচার শুরু করেন এবং মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করার নিমিত্তে জ্ঞানী ও ধর্ম ভক্তদের অনেককে হত্যা করেন। গণেশের পুত্র যদু সুলতান জালাল উদ্দিন মুহম্মদ শাহ (১৪১৮-১৪৩১) উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। সুলতান জালাল উদ্দিন মুহম্মদ শাহ-এর সময়ে কৃত্তিবাস সংস্কৃত কাব্য হতে *রামায়ণ* অনুবাদ করেন। কৃত্তিবাস ছাড়াও ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে *রামায়ণ* রচনা করেন এক মহীয়সী নারী চন্দ্রাবতী। ইনি মনসার ভাসান রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। সুশাসক হিসেবে জালাল উদ্দিন মুহম্মদ শাহ খুব দ্রুতই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণে প্রায় এক যুগ ধরে চলতে থাকা পাণ্ডুয়ার রাজনৈতিক কন্দল এবং হত্যাযজ্ঞের মীমাংসা করেন। আমীর অমাত্য এমনকি সাধারণ জনগণও কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। এ পরিস্থিতিতে জালাল উদ্দিন সকল প্রকার দলাদলি ভেঙ্গে নতুন পরিকল্পনায় দেশ শাসনে ব্রতী হন। পাণ্ডুয়া থেকে তিনি রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তর করেন। তিনি মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার

করেন। তিনি মুদ্রায় কলেমা উৎকীর্ণ এবং মিশরের খলিফা কর্তৃক সনদ অর্জন করে রাজ্য বৈধ করে নেন। তিনি চীন সম্রাট, মিশরের খলিফা এবং তুর্কি সুলতান তৈমুর লঙের পুত্র শাহরুখ-এর সাথে দূত বিনিময় করেন। এ সম্পর্ক থেকে সুলতানের বিদেশ নীতি সম্পর্ক যে খুব সন্তোষজনক ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়। জালাল উদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শামসউদ্দিন আহমদ শাহ সিংহাসনে বসেন। শামসউদ্দিন আহমদ শাহকে তাঁর দুই বিশ্বস্ত ক্রীতদাস সাদী খান এবং নাসির খান ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেন। পরবর্তীতে ইলিয়াস শাহি বংশের কর্ণধার হলেন সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ, সুলতান রুকন-উদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪) এর সময়ে কবি মালাধর বসু *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* কাব্যটি রচনা করেন। সুলতান শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১)-এর সময়ে জৈনদ্দিন তাঁর *রসুলবিজয়* কাব্যটি রচনা করেন। সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ, সুলতান রুকন-উদ্দিন বারবক শাহ, সুলতান শামস উদ্দিন ইফসুফ শাহ, সুলতান জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহ প্রমুখ সকলেই কৃতিত্বের সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন।

এরপর বাংলার ক্ষমতায় আসে হুসেনশাহি বংশ। হুসেনশাহি বংশের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তি হলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)। তিনি অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষ ছিলেন। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তিনি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিলেন। আধুনিক অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ বাংলাদেশের মুসলমান সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। *মহাভারতের* অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'তাঁহার মহাভারত কাব্যে হোসেন শাহকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়াছেন'। (আবদুল করিম : ১৯৯৯ ; পৃ : ৩০৭) কৃষ্ণ যেমন পৃথিবীতে অবতার রূপে এসে সমাজের সকল অনাচার, অত্যাচার দূর করেন একই ভাবে আলাউদ্দিন হুশেন শাহ সমাজের এলিট ব্যক্তিদের সহায়তায় ক্ষমতায় বসে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে সমাজের সকল অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। আলাউদ্দিন হুশেন শাহ, রুকন-উদ্দিন বারবক শাহের অধীনে কর্মজীবন শুরু করে নিজ অভিজ্ঞতা, প্রতিভা এবং কর্মদক্ষতার গুণে রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। কিন্তু রাজ্যবিস্তারে পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বেই দিল্লির সুলতানের সাথে আলাউদ্দিন হুশেন শাহের সংঘর্ষ বাধে। জৌনপুরের বিতাড়িত সুলতান হুশেন শর্কীকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে দিল্লির সুলতান সিকান্দর লোদী বাংলার সুলতানের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য বাহিনী পাঠান। অপরপক্ষে আলাউদ্দীন হুসেন শাহও আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য নিজ পুত্র দানিয়েলের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী পাঠান। শেষ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, দু'পক্ষই সন্ধি স্থাপনের মধ্যদিয়ে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যায়। রাজ্য বিস্তার করেই তিনি ক্ষান্ত হননি রাজ্যকে তিনি সুসংগঠিত করেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। অনেক মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ করেন। তিনি ছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ অনূদিত হয়। তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন। স্থাপত্যশিল্পে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁর অমাত্য ও সেনানায়কদের মধ্যে পরাগল খান ও ছুটিখান বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁরা সনাতন পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর সেনাপতি পরাগল খানের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর *মহাভারত* এবং ছুটি খানের আদেশে শ্রীকরনন্দি *মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব* বাংলায় অনুবাদ করেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলেই কবি বিজয়গুপ্ত '*পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল*, বিপ্রদাস পিপিলাই *মনসাবিজয়* বা *মনসামঙ্গল* এবং যশোরাজ খান *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* কাব্য রচনা করেন। যশোরাজ খান কিছু বৈষ্ণবপদও রচনা করেন। মালাধর বসু সুলতানের উৎসাহ ও সাহায্য নিয়ে *শ্রীমদ্ভাগবত* বাংলায় অনুবাদ করেন। এই সময়ে তিনি *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* নামে আরও একটি কাব্য রচনা করেন। আলাউদ্দিনের সাহিত্যপ্রীতি তাঁর অধীন রাজকর্মচারীদেরকেও অনুপ্রাণিত করে। এ সময়ের কবি শেখ কুতবন *মৃগাবতী* কাব্যটি রচনা করেন যার ভাষা ছিল আরবি'। (আশফাক : ২০১৮ ; পৃ : ২৬১)

পরবর্তীতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্বাধীন সুলতানি আমলে দেশে সাংস্কৃতিক সংকট-সংঘাতের পরিবেশ অনেকটা উন্নত হয়। স্বাধীন সুলতানদের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সংস্কৃতি জীবনে স্বস্তি ফিরে আসে। এ আমলে মুসলমানশাসকেরা বাংলা ভাষা ও

সাহিত্যচর্চার পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন। বাংলা সাহিত্যে রোমান্সমূলক কাব্যধারা প্রবর্তনে তাঁদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এ ছাড়া বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য এবং চৈতন্যজীবনীকাব্যও এ সময়ে রচিত হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বৌদ্ধ-হিন্দু রচিত বাংলা সাহিত্য যেখানে দেব-দেবীর প্রাধান্য বেশি ছিল সেখানে মুসলমান কবি-সাহিত্যিক মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে রচনা করেছেন রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। আরবি, হিন্দি ও ফারসি থেকে অনূদিত প্রণয়োপাখ্যানগুলি বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে এক স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছে। এ সময়ে রচিত ধর্মনির্ভর সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গনে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলি মানবিক ভাবধারায় সমৃদ্ধ এবং গতানুগতিক ঐতিহ্য থেকে স্বতন্ত্র। সংস্কৃত থেকে অনূদিত হয়েছে *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত* এবং আরবি থেকে সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ*, *ফারসি থেকে লায়লী-মজনু*, *সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল*, *সপ্তপয়কর*, *সিকান্দারনামা*, *গুলেবকাওয়ালী*, ফারসি থেকে অনূদিত ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হলো—*নূরনামা ও নসিহৎনামা।* হিন্দি থেকে অনূদিত হয়েছে *সতীময়না-লোরচন্দ্রানী*, *পদ্মাবতী*, *মধুমালতী ও মৃগাবতী*।

এরপর '১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহ গৌড় জয় করে বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। শের শাহের বংশ ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় রাজত্ব করে। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জুলাই শেষ আফগান সুলতান দাইদ খান করনারি মুঘলদের হাতে পরাজিত হলে বাংলায় আফগান শাসনের অবসান হয়। সুলেমান কররানির মাধ্যমে কররানি বংশের রাজত্ব, যার সমাপ্তি ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সেই কররানি বংশের শেষ রাজা দাউদ পরাজিত হলে মুঘল সম্রাট আকবরের অধীনে বাংলায় মুঘল শাসন কায়েম হয়'। (আশফাক : ২০১৮ ; পৃ : ২৮৫)

দাউদ খানের পরাজয়ের পর বাংলা দেশ মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেনি। ঈশা খান, কুৎলু লোহানী, উসমা খান প্রভৃতি পাঠান সর্দারগণ প্রাণপণে মুঘল অগ্রগতিকে বাধা দান করেন। প্রায় দশ বছর কাল ক্রমাগত যুদ্ধ করে আকবরের সেনাপতি খান-ই জাহান, রাজা মানসিংহ, শাহাবাজ খান বাংলা দেশে বিজয় পতাকা উত্তোলন করেন। মানসিংহ রাজমহলে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনের দুঃশাসনের কিছুটা অবসান হয় মানসিংহের সুবাদারি লাভের পর। মানসিংহের প্রতি কবি মুকুন্দরামের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা–

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণু পদে লোল ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎকল মহীপ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ০৩)

মুকুন্দরাম আকবরের আমলে *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্য রচনা করলেও তাঁর সময়ে বঙ্গের জনগণ এবং কবি স্বয়ং মুসলমান রাজস্ব কর্মচারী দ্বারা নির্যাতিত হন বলে কাব্যে কোথাও আকবরের প্রশংসা করেননি। কিন্তু মুকুন্দরামের সমকালীন কবি দ্বিজ মাধব তাঁর *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* কাব্যে আকবরের গুণকীর্তি করেন—

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার।।
প্রতাবে তপন রাজা যুদ্ধে বৃহস্পতি॥
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
(দ্বিজ মাধব : ১৯৫২ ; পৃ : ০৩)

আকবর সম্পর্কে কবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসার দুটি কারণ থাকতে পারে । ১. কবি যখন কাব্য রচনা করেন তখন মুঘল দুঃশাসন সমাজে ছিল না, ২. হয়ত বা কবি যে এলাকায় বাস করতেন সে এলাকায় আকবরের দমন পীড়ন নীতি ছিল না। তবে আকবরের রাজত্বকালের প্রথম উনিশ বছর বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা যে তমসাচ্ছন্ন ছিল তার বহু প্রমাণ ইতিহাসে আছে। এই পর্বের সাতজন শাসনকর্তার মধ্যে মাত্র সাঈদ খানের শাসন কাল ছিল আট বছর। অন্য সবার রাজত্বকাল ছিল মাত্র এক থেকে তিন বছরের মধ্যে। এভাবে ঘন ঘন শাসনকর্তা পরিবর্তনের ফলে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এছাড়া বাংলা যেহেতু দিল্লি

থেকে বহু দূরে এবং বাংলার শাসকদের বিদ্রোহের রীতি সুবিদিত এ কারণেও হয়ত সম্রাট কোনো সুলতানকে বেশি দিন ক্ষমতায় রাখতে ভরসা পাননি। এসব কারণেই এ বঙ্গের মুঘল শাসকেরা পূর্ববঙ্গে হস্ত প্রসারিত করেননি। সম্রাট আকবর বঙ্গের প্রশাসনিক দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই জীবনের অন্তিম পর্বে বিশ্বস্ত সেনাপতি মানসিংহকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। সুদক্ষ সেনাপতি এবং বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ হওয়ায় মানসিংহ খুব দ্রুত মুঘল আধিপত্য বিস্তার করেন। মানসিংহ প্রথমেই বাংলার বারভূইঞাদের অন্যতম নেতা ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং মুঘলবশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। অতঃপর ঢাকায় মুঘল ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং অপরাপর ভূইঞাদের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে আক্রমণ করতে থাকেন। ফলে অচিরেই শ্রীপুরের কেদার রায়সহ এ অঞ্চলের অন্য বিদ্রোহীরা পরাজয় স্বীকার করেন এবং মুঘল আধিপত্য মেনে নেন। এ ছাড়াও মানসিংহের বাহিনী উড়িষ্যার পরলোকগত পাঠান নায়ক কতলু খানের ভ্রাতষ্পুত্র উসমান খান, কতলু খানের উজিরের পুত্র দাউদ খান, এবং ঈশা খানের পুত্র মুসা খানের সম্মিলিত বাহিনীকেও আক্রমণ করে প্রতিহত করেন। মানসিংহের সময় আরাকানি মগেরা ঢাকার কিছু অংশ দখল করে নেয়। শ্রীপুরের পরাজিত কেদার রায়ও মগদের সাথে যোগ দেন। মুঘল বাহিনী তাদেরকেও পরাজিত করতে সক্ষম হয়। এমনি ভাবেই পূর্ব বঙ্গের আরো বিদ্রোহী যখন একের পর এক মানসিংহের কাছে পরাজিত হচ্ছিলেন সেই সময় সম্রাট আকবর মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সম্রাটের আবেদনে মানসিংহ পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আগ্রা চলে যান এবং সম্রাটের মৃত্যুর (১৬০৫ খ্রি.) পর মানসিংহ আগ্রাতেই অবস্থান করেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় মুঘল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুবাদার ইসলাম খানের আমলে। ইসলাম খান যখন বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন তখন বাংলায় সর্বত্র বিদ্রোহের অনল ধূমায়িত। বিশেষ করে বাংলার বারভূইঞা নামে কথিত সামন্ত রাজাদের তখনও দোর্দণ্ড প্রতাপ। মুসা খান ছিলেন বারভূইঞাদের সবচেয়ে প্রতাপশালী ও শক্তিশালী, তাঁর জমিদারিত্বের আয়তনও ছিল বিশাল। তাঁকে নেতা বলে সবাই মান্য করতেন। মুসা খানের সহায়ক জমিদার হিসেবে যাদের নাম পাওয়া যায় তারা হলেন-ভাওয়ালের বাহাদুর গাজী, সরাইলের সুনা গাজী, চাটমোহরের মীর্জা মোমিন, চন্দ্রপ্রতাপের বিনোদ রায় প্রমুখ।

এছাড়া বর্তমানের সিলেট জেলা তৎকালীন বিদ্রোহী আফগানদের অন্যতম শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। তাদের অন্যতম নেতা ছিলেন বায়োজিদ কররানি। উল্লেখ্য, বঙ্গের বিভিন্ন এলাকার বিদ্রোহীদের অভিযান পরিচালনার অধিকাংশ সময়ই ইসলাম খান ঢাকায় অবস্থান করেছেন। ইসলাম খান ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। এবং তখন থেকে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকার নাম হয় জাহাঙ্গীরনগর। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইব্রাহিম খান যখন বাংলার সুবাদার তখন যুবরাজ খুররম বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং ইব্রাহিম খানকে পরাজিত করেন, পরে ইব্রাহিম খান নিহত হন। 'সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্বাস্থ্যের অবনতি হলে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান নিজেই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের অবর্তমানে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হবেন এ নিয়ে রাজদরবারে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। জাহাঙ্গীরের চার পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পুত্র যুবরাজ খুররম যিনি সম্রাট সাজাহান নামে ইতিহাসে অধিক পরিচিত তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। কিন্তু সম্রাজ্ঞী নূরজাহান তাঁর প্রথম বিবাহজাত কন্যার সাথে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ারের বিয়ে দিয়েছিলেন এ কারণে তিনি শাহরিয়ারকেই সিংহাসনে বসাতে চেষ্টা করছিলেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যখন মুঘল দরবারে ষড়যন্ত্র চলছে সেই সময় নূরজাহানের প্ররোচনায় জাহাঙ্গীর সাজাহানকে কান্দাহারে যাওয়ার জন্য আদেশ দিলে তিনি বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ১৬২৩ সালে সম্রাট সাজাহান মুঘল বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যান। অতঃপর ১৬২৭ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হলে যুবরাজ খুররম সম্রাট সাজাহান নাম ধারণ করে দিল্লিতে ফিরে এসে সিংহাসনে আরোহণ করেন'। (অতুল চন্দ্র ও প্রণব কুমার : ২০০০ ; পৃ : ৭৭) সম্রাট সাজাহান এবং তদীয় পুত্র আওরঙ্গজেবের সময় বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস নিরুপদ্রবের। সাজাহানের রাজত্বকালে কাসিম জুইনী, আজম খান, ইসলাম খান মাশহাদী এবং শাহজাদা মুহম্মদ সুজা এই চারজন সুবাদার বঙ্গ শাসন করেন। শাহ সুজার রাজত্বকাল সুখ-সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে ইতিহাসে বিশেষভাবে স্বীকৃত। তাঁর সময়ে বঙ্গে কোনো

বিদ্রোহ অথবা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হয়নি। এ সময়ে বঙ্গে কৃষি ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকা করের বিনিময়ে বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করেন'। (জলিল : ১৯৯৬ ; পৃ : ১৪) বঙ্গের আর্থ-সামাজিক ক্রমোন্নতির পশ্চাতে একটি মাত্র কারণ ছিল তা হলো সম্রাট শাহ সুজার সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থা। তৎকালীন ইতিহাসের সাথে সাহিত্যের এই সুশাসনের দিকটি উল্লেখিত আছে। ১৬৪২-৪৩ খ্রি. রচিত *জগৎ মঙ্গল* কাব্যের কবি গদাধর দাস বলেছেন—

রাজচক্রবর্তী শাহজাঁহা দিল্লীপতি।
ধর্মন্যয়ে তোষণ করিল বসুমতি।।
রাজ্যের হইল পতি সন পঞ্চদশ।
সমরে প্রতাপী হয় বৈরী হয় যশ॥
(জলিল : ১৯৯৬ ; পৃ : ১৪)

কবি সম্রাট সাজাহানের প্রশংসা করলেও এ প্রশংসার অধিকারী শাহাজাদা সুজা কারণ তিনিই ছিলেন তখন বঙ্গের সুবাদার। সুজার রাজত্বকালে বিরাজিত সুখ-শান্তি কিছুটা ব্যাহত হয় দিল্লির উত্তরাধিকার নিয়ে সাজাহানের চার পুত্রের আত্মকলহে। অতঃপর সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ বিক্ষুব্ধ হন এবং প্রত্যেকে সিংহাসন অলঙ্করণের জন্য যুদ্ধ আয়োজন করতে থাকেন। দিল্লির উত্তরাধিকার নিয়ে সম্রাট সাজাহানের পুত্ররা যখন আত্মকলহে ব্যস্ত ঠিক তখন কুচবিহারের রাজা কামরূপ এবং অহোম-রাজ গৌহাটি দখল করেন। অতঃপর অহোম-রাজ কুচবিহারের রাজাকে পরাজিত করে কামরূপ দখল করেন। মীরজুমলার পৌনে চার বছর সুবাদারি আমলে প্রায় দেড় বছরই অতিক্রান্ত হয় কুচবিহার ও আসাম অভিযানে। তিনি কুচবিহার সহজে জয় করতে পারলেও অহোম-রাজাকে পরাজিত করতে পারেননি। আসাম অভিযানের সময়েই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে মারা যান। তিনি মারা গেলেও যুদ্ধ ব্যয় নির্বাহের অর্থ সংগ্রহের জন্য এদেশের মানুষের ওপর রাজস্বের বোঝা চাপিয়ে দেন। শুধু তাই নয় অধিক অর্থ সংগ্রহের জন্য মীরজুমলা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যাপক দুর্নীতির প্রচলন করেন।

বাংলার আর্থ সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ও উন্নয়ন আনয়নের জন্য যিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি হলেন সুবাদার শায়েস্তা খান। তিনি দুই টার্মে (১৬৬৪খ্রি.-১৬৭৮ খ্রি. এবং ১৬৮০ খ্রি. ১৬৮৮ খ্রি.) প্রায় বাইশ বছর সুবাদারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলার ইতিহাসে শায়েস্তা খানের খ্যাতির দ্বিতীয় কারণ হলো তাঁর আমলে দ্রব্যমূল্য ছিল অতি সস্তা। টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাওয়ার বিরল ঘটনাও তাঁর আমলে ঘটেছে। শায়েস্তা খান তাঁর ২২ বছরের শাসনকালে বাংলাদেশে বৈদেশিক শক্তির আক্রমণকে প্রতিহত করেন। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে, "...his internal administration, by its mildness. Justice and consideration for the people, promoted the wealth and happiness of its teeming population'(Haig Wolseley : 1957 ; পৃ : 311.) রাজধানী ঢাকা তাঁর আমলে হয়ে উঠেছিল সুরম্য প্রাসাদ নগরী। এত সুকীর্তির পরও শায়েস্তা খান ধোয়া তুলসী পাতা ছিলেন না। ইতিহাসে শায়েস্তা খানের সুখ্যাতির পাশাপাশি কুখ্যাতি কম ছিল না। বিভিন্ন প্রকার রাজস্ব এবং একচেটিয়া বাণিজ্য দ্বারা তিনি বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। 'শায়েস্তা খানের পর বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন আওরঙ্গজেবের ধাত্রীপুত্র খান -ই-জাহান। তিনি মাত্র এক বছর বাংলায় রাজত্ব করেন। এই স্বল্পকালীন সময় রাজত্ব করা সত্ত্বেও তিনি দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন কালে এক কোটি টাকা সঙ্গে করে নিয়ে যান'। (জলিল ; ১৯৯৬ : পৃ ১৭) ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে পরিবারে আত্মদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্ব বাংলার রাজনৈতিক প্রবাহকেও আন্দোলিত করে। আওরঙ্গজেবের পর দিল্লির সম্রাট হন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মোয়াজ্জেম। তিনি শাহ আলম বাহাদুর শাহ উপাধি নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁরই চক্রান্তে মুর্শিদকুলি খানকে বাংলা ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে চলে যেতে হয়। কিন্তু তিনি পুনরায় ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি পদের দায়িত্ব লাভ করেন। অতঃপর ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাংলার সুবাদার বা নবাব নিযুক্ত হন। শুরু হয় বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়, যাকে রাজনৈতিক ইতিহাসে নবাবি আমল নামে চিহ্নিত করা হয়।

মুর্শিদকুলি খানের নবাবি আমল লাভের মধ্য দিয়ে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে দুটি দিকের পরিবর্তন ঘটে। এক-সেই সময় থেকে কেন্দ্রীয় মুঘল শাসনের দুর্বলতার সুযোগে অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, মহীশুর, দাক্ষিণাত্যের ন্যায় বাংলাও প্রায় স্বাধীন সুবায় পরিণত হয়। দুই- এই সময় থেকে বাংলার সুবাদারেরা বংশানুক্রমিকভাবে সুবাদারেরপদ ভোগ করতে থাকেন। মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন অতি সুদক্ষ দেওয়ান। যার ফলে তাঁর সময় বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য তিনি কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। 'প্রথমত- তিনি বাংলার জায়গীরগুলোকে খাস জমিতে পরিণত করেন এবং জায়গীরদারদের উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত করেন। দ্বিতীয়ত- বাংলায় ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। এবং জরিপের ভিত্তিতে প্রজাদের খাজনা নির্ধারণ করেন। তৃতীয়ত- খাস এবং জমিদারি বন্দোবস্তাধীন উভয় ক্ষেত্রে ভূমি রাজস্ব ইজারা (বন্ধকী) দেন আবার ইজারাদারদের নিকট থেকে নিয়মিতভাবে রাজস্ব আদায় করেন। চতুর্থত- রাজস্ব বন্দোবস্তের জন্য বঙ্গের পূর্বতন সরকারগুলোকে বিভাগ-উপ বিভাগে ভাগ করেন। মুর্শিদকুলি খানের ন্যায়পরায়ণতা ও প্রজাহিতৈষণার কথা ইতিহাসে সুবিদিত। তাঁর সময়েও বাংলায় টাকায় ৫/৬ মণ চাউল পাওয়া যেতো'। (জলিল ; ১৯৯৬ : পৃ ১৮-১৯)

মুর্শিদকুলি খানের জামাতা শাহ সুজাউদ্দিন যোগ্যতম শাসক ছিলেন। সুজাউদ্দিন রাজস্ব আদায় ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনেন। মুর্শিদকুলি খানের আমলে যেসব জমিদার রাজস্ব অনাদায়ের কারণে বন্দি ছিলেন তিনি তাদের মুক্ত করে দেন। মুর্শিদাবাদ মসনদের পরবর্তী উত্তরাধিকার হলেন শাহ সুজাউদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খান। তিনিও পিতার ন্যায় ভোগবিলাসী ছিলেন। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে তিনি তাঁর হেরেমের ১৫০০ নারী নিয়ে মত্ত থাকেন। এর পরিণতি স্বরূপ তাঁকে তাঁরই সভাসদদের চক্রান্তের স্বীকার হতে হয়। তাঁর অন্যতম সভাসদ হাজী আহমদ তাঁর ভাই বিহারের নায়েবে নাযিম আলিবর্দি খাঁকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন দখলের জন্য অনুপ্রাণিত করেন ফলে ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে ১০ জুলাই গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করে আলিবর্দি খাঁ মুর্শিদাবাদের মসনদ দখল করেন। আলিবর্দির জীবনে সবচেয়ে বড় বিপদ আসে মারাঠা বাহিনীর পক্ষ থেকে। বাংলার জনগণের কাছে মারাঠা সৈন্যরা বর্গী নামে পরিচিত। বর্গীরা 'চৌথ' আদায়ের নামে সুদীর্ঘ প্রায় দশ বছর যাবৎ পশ্চিম বাংলার জনজীবনের ওপর যে নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণ-লুণ্ঠন করে আসছে তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। বার বার বর্গী আক্রমণের ফলে একদিকে পশ্চিম বঙ্গের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জনমানবশূন্য হয়ে পড়ছে অন্যদিকে নবাবের সৈন্যবাহিনীও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। নিরুপায় হয়ে নবাব চৌথ বাবদ উড়িষ্যা প্রদেশ ছেড়ে দিয়ে মারাঠা রাজ্যের সাথে শান্তি চুক্তিতে উপনীত হন। অতঃপর দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে। আলিবর্দির পর বাংলার মসনদের উত্তরাধিকারী হন তাঁর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা। কিন্তু মসনদে বসার পরই নবাবকে বাহির এবং অন্দরমহল উভয় প্রকার শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়। ঘসেটি বেগম, মীরজাফর, শওকত জঙ্গ তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও বিরোধিতা করেছেন বেশি। বিদেশি বণিকদের মধ্যে ইংরেজরা নবাবের সাথে অসদাচরণ করতে থাকে। নবাবের একমাত্র বহিঃশত্রু ইংরেজ বণিকেরা। তারা মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে শাহজাদা সুজার কাছ থেকে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করে। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর ইংরেজরা প্রায় বিনা বাধায় কলকাতায় অনুপ্রবেশ করেন। এরপর নবাব কলকাতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলেও নানা কারণে ইংরেজদের হঠাতে সাহস করেননি। এতে নবাবের দুর্বলতা বহিঃশত্রু এবং গৃহশত্রু উভয়ের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। এই সময় নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মীরজাফরের সঙ্গে জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উর্মিচাঁদ গভীর ষড়যন্ত্র করে। অবশেষে কুচক্রীরা ইংরেজদের যোগসাজসে নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করেন। পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

২. আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের রূপরেখা

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য ছিল অনেকটাই তত্ত্বাশ্রয়ী ও দেবনির্ভর। ধর্মাশ্রিত ও ধর্মনিরপেক্ষ এই উভয় শ্রেণির সাহিত্যে আমরা তৎকালের সমাজ, সামাজিক অবস্থা ও মূল্যবোধের পরিচয় পাই এবং এসব সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের দেশ, জাতি, সমাজ ও সংস্কৃতির এক প্রামাণ্য চিত্র অঙ্কন করা যায়। কিন্তু এ কথা সত্য যে,

শুধু সাহিত্যের উপাদান উপকরণের সাহায্যে একবিংশ শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঐ সময়ের সমাজ বাস্তবতার পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন অসম্ভব। কারণ বৃহত্তর ভৌগোলিক আবর্তনে আবদ্ধ বাংলার সকল স্থানের, সকল মানুষের সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ধর্ম-কর্ম বিশ্বাস ও সংস্কারে যেমন সাদৃশ্য ছিল তেমনি ছিল বৈসাদৃশ্যও। যেমন *চণ্ডীমঙ্গল* ও *ধর্মমঙ্গল* রচিত হয় প্রধানত পশ্চিমবঙ্গে, *মনসামঙ্গল* পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে এবং পিরগাথা জাতীয় সাহিত্য দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও উপরিউক্ত সাহিত্য রচিত হয় যা সংখ্যায় ছিল অতি নগণ্য। এসব সাহিত্যে আমরা স্ব-স্ব অঞ্চলের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কার ও সামাজিক প্রথার বিভিন্ন দিক দেখতে পাই। *চণ্ডীমঙ্গলে* পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক ও সমাজ-পরিবেশের কথা, *ধর্মমঙ্গলে* পাই প্রধানত রাঢ় বঙ্গের অন্তজ্য শ্রেণির মানুষের শৌর্য-বীর্যের চিত্র। *মনসামঙ্গলে* বর্ণিত আছে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের সমাজ ও পরিবেশ এবং পিরগাথা জাতীয় রচনায় দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস-সংস্কারের চিত্র বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যে বিধৃত সমাজ ও সামাজিক বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ-বর্জনেও রয়েছে নানা জটিলতা কারণ উক্ত সাহিত্যের সামাজিক উপাদানের সবগুলোই বাস্তব সমাজ থেকে উদ্ভূত ছিল না। ছিল কিছুটা কল্পনা ও লোকশ্রুতির প্রভাব। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনার জন্য ঐ সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা বিশেষ করে শিক্ষা, সংস্কৃতি, নারীর ও পুরুষের অবস্থান, স্বাস্থ্য, জাতিত্ব বা বর্ণপ্রথা, ধর্মীয় চেতনা, বিবাহ, পোশাক পরিচ্ছদ ক্রীড়া-কৌতুক, যুদ্ধ-প্রণালী, বাঙালির নীতি ও চরিত্র, অতিথি আপ্যায়ন, এমনকি পূজা-পার্বণও আলোচনা করা প্রয়োজন।

তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক চিত্রের পাশাপাশি বাংলায় দ্রুত বদলে যায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র। ঐতিহাসিকদের ধারণা মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের ফলে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মহা উপকার হয়। এ বিজয় কেবল তাদেরকে একই রাজনৈতিক মঞ্চে সমবেত করেনি, একই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যসূত্রেও গ্রথিত করেনি বরং প্রশস্ত করেছে তাদের অর্থনৈতিক ভিতকে। মধ্যযুগের বাংলা সৃষ্টি থেকেই ছিল উর্বরা, সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা। এদেশের মাটিতে সোনা ফলে। তাছাড়া বাংলার নারী-পুরুষ উভয়ে ছিলেন পরিশ্রমী। মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে বাংলার অর্থনীতি এত দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করে যে, সারা পৃথিবীর মধ্যে বাংলা অন্যতম একটি সম্পদশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কৃষি ও বাণিজ্যে দেশটির অভূতপূর্ব উন্নয়ন বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। বাংলার মাটির উর্বরতা, প্রচুর পরিমাণে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতুলতা দেখে পর্যটকরা বিস্ময় প্রকাশ করে দেশটিকে স্বর্গ বলে অভিহিত করেছেন। 'পাল ও সেন রাজাদের সময়ে বাংলার স্বর্ণমুদ্রা, এমনকি রৌপ্য মুদ্রা দেশে বিরল ছিল। মুসলমান শাসকের সময় থেকে দেশে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নযনের সাক্ষ্য দেয়'। (এম. এ রহিম : ২০০৮ ; পৃ : ২৮৯)। 'পাল ও সেন যুগে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সব রকম আদান-প্রদানে কড়ি একমাত্র বিনিময় মাধ্যম ছিল। এ থেকে ধারণা করা যায় হিন্দু আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ অনগ্রসর ছিল এবং মুদ্রা তৈরির প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থের অভাব ছিল। ব্যবসায় ও শিল্পক্ষেত্রে বড় রকমের লেন-দেনের অভাব ছিল'। (এম. এ রহিম : ২০০৮ ; পৃ : ২৮৯) ঐতিহাসিকদের ধারণা একটি দেশের সমৃদ্ধি প্রধানত চারটি স্তম্ভের ওপর নির্ভর করে প্রথম : কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য, দ্বিতীয় : নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহজলভ্যতা, তৃতীয় : ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্য, চতুর্থ : দেশে স্বর্ণ ও মূল্যবান পদার্থের মজুদ। দেশি-বিদেশি ঐতিহাসিক এবং বিদেশি পরিব্রাজকদের বিবরণ অনুযায়ী প্রকাশ পায় যে মুসলিম শাসনামলে বাংলা উল্লেখিত সমৃদ্ধির চারটি প্রয়োজনীয় উপাদানের অধিকারী ছিল। (এম. এ রহিম : ২০০৮; পৃ : ২৮৯) বাংলার অর্থনীতি মূলত দুটি ধারায় নিয়ন্ত্রিত হতো ১. কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ২. বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির পরিচয় মেলে সমকালীন চিনা পরিব্রাজক ওয়াং-তা-ইউয়ানের বিবরণী থেকে। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি বাংলাদেশে এসে তিনি লক্ষ করেন কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ ক্রমশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের ভাটি অঞ্চলের দিকে এগিয়ে গেছে। সেখানে বনভূমি পরিষ্কার করে তাকে কৃষিজমিতে রূপান্তরিত করে ধান ফলিয়েছে। বিশেষত রাঢ়ভূমির সম্পন্নতায় আশ্রয় না পেয়ে এদের মধ্যে বাঁচার জন্যে লড়াই করার এক

ধরনের তীব্র মানসিকতার জন্ম হয় তার ওপর পুঁজি ছিল ধান রোপণের বিশেষ দক্ষতা। এই তীব্র লড়াকু মানসিকতা ও অসম শক্তির সমাহারে তারা ভাটি অঞ্চলকে স্বর্ণপ্রসবিনী মাটিতে পরিণত করল। '১৩৪৯খ্রি. ওয়ান-তা-ইউয়ান এর বিবরণী থেকে এই তথ্যই পাওয়া যায়, —These people "(The Bengalis) owe all their tranquility and prosperity to themselves for its source lies in their devotion to agriculture, whereby a land originally covered with jungle has been reclaimed by their unremitting toil in tilling and planting. (স্মৃতিকণা : ২০১১ ; পৃ : ৪০) পূর্ববঙ্গে ভূমির উর্বরতার কারণে সেখানে কৃষিকাজ ভালো হতো বিশেষ করে ধানের ফলন চাহিদার তুলনায় বেশি হওয়ায় অর্থনীতিতে এর প্রভাব যথেষ্ট ছিল। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে আমরা জঙ্গল কেটে নগর (গুজরাটনগর) প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাই। ফলে বাংলার সম্পন্ন অর্থনীতির চিত্র গুজরাট নগর প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে। এ নগর তৈরিতে দেবীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নতুন কিছু সৃষ্টি করা। এবং মাহাত্ম্যপ্রচারে জনগণের মধ্যে চমক সৃষ্টি করা। বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাই দেবী চণ্ডী অকারণ কালকেতুকে কৃপা করলেন এবং একইভাবে কলিঙ্গরাজকে বিব্রত করে কলিঙ্গবাসীকে বিপদে ফেললেন সবই দেবীর নিজের স্বার্থ চরিতার্থের জন্য। সৃষ্টি হলো নতুন নগর গুজরাট যেখানে কোনো সম্প্রদায়ের অমর্যাদা হবে না কোনো অকল্যাণশক্তি জয়যুক্ত হবে না, যেখানে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থাকবে না, হবে এক অসম্প্রদায়িক নগর যেখানে সবার প্রবেশাধিকার থাকবে। তাইতো কালকেতু বুলান মণ্ডলকে আহ্বান করেছে—

শুন ভাই বুলন মণ্ডল
আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব হেমকুণ্ডল।
আমার নগরে বৈস জত ভূমি চাষ চষ
সাত সন বই দিব কর।
… … …
হইআ ব্রাহ্মণের দাস পুরিব সভার আশ
জনে জনে সাধিব সম্মান।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৭৬-৭৭)

কালকেতুর গুজরাট নগরে বিশেষ কোনো সম্প্রদায় বা কোন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে নয় বরং সবাইকে নিয়ে একটি অসম্প্রদায়িক সমাজ গঠন এবং নিজের পূজা প্রাপ্তিই ছিল দেবী চণ্ডীর প্রধান উদ্দেশ্য। তাই এখানে ন্যায় ও কল্যাণধর্মিতার প্রতিষ্ঠা ও সম্ভাবনা দেখে পার্শ্ববর্তী কলিঙ্গরাজ্য থেকেও বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ ও পেশাজীবী মানুষ দলে দলে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ, গোপ, ধীবর, তেলি, কামার, কুমার, মালী, বারুই, নাপিত, আঘরি, কাঁসারি, সাপুড়ে, সুবর্ণবণিক, মোদক, সরাক, গন্ধবান্যা, শঙ্খবান্যা, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়) এসে বসবাস করতে থাকে। চণ্ডীর আশীর্বাদপুষ্ট এ সমাজ থেকে সকল অশুভ, সকল অকল্যাণ, সকল কুৎসিত দূরীভূত হয়েছে। এখানকার সকল মানুষ তাদের নিজ নিজ বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এখানে শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন, জুলুম, নির্যাতন সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তারপরও সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা অন্যের সুখ-সমৃদ্ধি সহ্য করতে পারে না, হিংসা করে, অন্যকে ঠকাতে, ক্ষতি করতে পছন্দ করে এ ধরনের মানুষের এ রাজ্যে কোনো স্থান নেই। এমনি একজন মানুষ হলো ভাঁড়ুদত্ত, যে সমাজ বিরোধী অশুভ শক্তির প্রতীক। মানুষকে নানা ভাবে বঞ্চনা ও ছলচাতুরি করে সে বেঁচে থাকে। কিন্তু কালকেতুর সমাজ হচ্ছে ছলচাতুরির উর্ধ্বের সমাজ। এখানে ছলচাতুরি এবং অকল্যাণের কোনা স্থান নেই। তাই ভাঁড়ুদত্তকে এখানে থাকতে হলে তাকেও সকল পঙ্কিলতার উর্ধ্বে থাকতে হবে। কার্যত হলোও তাই—সকল নাগরিকের নিকট ভাঁড়ুদত্তের লাঞ্ছনা, অপমান সম্ভবত সমাজদ্রোহী ব্যক্তি ও শক্তির উদ্দেশে বলা এক নিশ্চিত সাবধানবাণী। আর এভাবে গুজরাট নগরবাসী তাদের বহুবিধ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে একটি সুখী-সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠন করে অর্থনীতিতে অবদান রেখেছিলেন।

বাংলার কৃষিঅর্থনীতি বলতে তখন গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ এবং গোয়ালভরা হালগরুর সম্পন্নতাকেই বোঝাতো। বাংলাদেশ কৃষিতে সমৃদ্ধশালী হওয়ার প্রধান দুটি কারণ ছিল : বাংলার মাটি ছিল খুব উর্বর এবং ভূমি ছিল সমতল ফলে এ মাটিতে সোনা ফলত এবং একই জমিতে বছরে তিনটি করে ফসল ফলানো হতো। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম ছিল ধান, পাট, বিভিন্ন প্রকার ডাল এ ছাড়া সরিষা, তিল--তিসিসহ বিবিধ শাক-সবজি, পেঁয়াজ, রসুন, পান, সুপারি, নারকেল, এবং বিবিধ প্রকার ফল। বাংলা দেশে গুটি পোকা এবং তুঁতগাছ চাষ হতো। শিল্প-কারখানা তৈরিতে বাংলা চিরকালই উন্নত ছিল। বাংলা বস্ত্রশিল্প বিশ্বখ্যাত ছিল। সূক্ষ্মসুতা দিয়ে উন্নতমানের সুতিবস্ত্র তৈরি হতো। বাংলার বয়ন-শিল্প সম্পর্কে ইউরোপীয় বণিক বারবোসা বলেন-'এ দেশে প্রচুর সুতা আছে। তারা সূক্ষ্ম ও মিহিন অনেক প্রকার বস্ত্র তৈরি করে ; এ সব বস্ত্র তারা নিজেদের ব্যবহারের জন্যে রঙিন করে এবং ব্যবসায়ের জন্য সাদা রাখে। এ গুলো খুবই মূল্যবান কাপড়'। (এম.এ রহিম : ২০০৮ ; পৃ : ২৯৩) এক সময় বাংলাদেশে সবচেয়ে উন্নতমানের সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে তৈরি হতো মসলিন নামে বিশ্বখ্যাত বস্ত্র। আমির খসরু বাংলার এই সূক্ষ্ম বস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন -'এ বস্ত্র এতবেশি সূক্ষ্ম এবং মিহিন ছিল যে এর একশত গজ কাপড় মাথায় জড়ানোর পরেও তার ভেতর দিয়ে মাথার চুল দেখা যেত'। (এম.এ রহিম : ২০০৮ ; পৃ: ২৯৪) বাংলাদেশে প্রচুর ইক্ষু চাষও হতো। মধ্যযুগে বাংলা চিনি উৎপাদনে প্রশংসা অর্জন করে। এ চিনি দিয়ে বিভিন্ন মিষ্টান্ন দ্রব্য ও সুস্বাদু খাবার তৈরির পদ্ধতি আমরা বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় লক্ষ করেছি। চৈনিক দূতগণ বাংলায় আরও কিছু শিল্পের উল্লেখ করেছেন যেমন কার্পেট, কাগজ, ইস্পাত, বন্দুক ও বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারাদি। বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, লোহার জিনিসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র যা বাংলার ধাতব শিল্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বর্ণালঙ্কার কারিগরদের নিপুণতার সুনাম ছিল। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে নারী-পুরুষের অলঙ্কার ব্যবহারের বর্ণনা থেকে অলঙ্কার শিল্প সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। শঙ্খ তৈরি তখন বেশ সমৃদ্ধ শিল্প ছিল। শঙ্খ কেটে নানা ধরনের অলঙ্কার তৈরি হতো। মঙ্গলকাব্যে বণিক শ্রেণির নানা বিভাজন পরিলক্ষিত হয়-যেমন শঙ্খ-বনিক, গন্ধ-বণিক প্রভৃতি। শঙ্খবণিক শঙ্খশিল্পের সাথে এবং গন্ধবণিক প্রসাধনী শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। বাংলা সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ায় সমুদ্রের পানি থেকে লবণ উৎপাদনও ছিল বাংলার প্রধান শিল্পগুলোর অন্যতম। নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় প্রচুর মাছ পাওয়া যেত এ জন্যই হয়ত প্রবাদ ছিল মাছে-ভাতে বাঙালি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাছ বিদেশে রপ্তানিও হতো। জাহাজ নির্মাণ শিল্পেও বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ছিল। নদীমাতৃক দেশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এবং যাতায়াতের জন্য নৌপথ সুবিধাজনক হওয়ায় তাছাড়া নৌযুদ্ধ পরিচালনার জন্য জাহাজ নির্মাণ অত্যাবশক হয়ে পড়ায় বাঙালি কারিগরেরা সেই প্রাচীনযুগ থেকে অর্থাৎ চর্যাপদের আমল থেকে ছোট বড় নানা আকারের নৌকা তৈরি রপ্ত করেছিল। পর্তুগিজ বণিক বারবোসার বিবরণ থেকে জানা যায় যে 'ষোড়শ শতকে বাংলা দেশে জাহাজ নির্মাণ শিল্প ছিল। বাঙ্গালা শহরের আরব, ইরানি, হাবশি, পর্তুগিজ এবং ভারতীয় বণিকদের সম্পর্কে তিনি বলেন তারা সকলে বিরাট বণিক এবং একই ধরনের তৈরি বড় বড় জাহাজের মালিক ; এই জাহাজগুলোকে তারা জুঙ্গোস বা জ্যাংক নামে অভিহিত করে। এগুলো খুবই বৃহৎ এবং বিস্তর পণ্যদ্রব্য বহনে সক্ষম ছিল। এ সমস্ত জাহাজে তারা সমুদ্রপথে ভারতের পূর্ব উপকূল এবং ভারতের পশ্চিম উপকূলের দেশগুলোতে মালাবার, কামবে, পেগু, তারনাসারি (টেনাসেরিম) সুমাত্রা, সিংহল, মালাক্কা প্রভৃতি স্থানে গমন করে এবং নানা প্রকার পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা করে'। (এম. এ রহিম : ২০০৮ ; পৃ : ২৯৫-৯৬) কবি বিজয়গুপ্ত এবং জগজ্জীবন ঘোষালের *মনসামঙ্গলকাব্যে* চাঁদ সদাগর এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে* ধনপতি সদাগর এবং তার পুত্র শ্রীমন্তের বাণিজ্য যাত্রার কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে। বণিক প্রধান চাঁদ সদাগর চৌদ্দ ডিঙা নিয়ে দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্যে যেতেন। বাণিজ্য যাত্রায় চন্দ্রধর মধুকর নৌকায় অবস্থান করতেন। মধ্যযুগে (১২০১ হতে ১৮০০ খ্রি.) বাংলার অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক অবস্থা কেমন ছিল তা বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে স্পষ্ট চিত্র প্রতীয়মান হয়। ইবনে বতুতা সম্ভবত ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় এসেছিলেন। তিনি কেবল বাংলায়ই আসেননি আসামের কামরূপ অঞ্চলেও গিয়েছিলেন। বাংলা ও আসাম ভ্রমণের বিবরণ তিনি একসঙ্গেই দিয়েছেন। বিবরণটি

এমন–‘ বাংলা একটি বিরাট দেশ। এখানে প্রচুর পরিমাণে চাল উৎপন্ন হয়। পৃথিবীতে আমি এমন একটিও দেশ দেখিনি, যেখানে বাংলার চেয়ে জিনিসপত্রের দাম সস্তা। যাহোক বাংলা স্যাঁৎস্যঁতে, খুরাসানিয়া অর্থাৎ বিদেশিরা একে বলে সম্পদে ভরা নরক। আমি বাংলার রাস্তায় দেখেছি এক রূপোর দিনার যা আট দিরহামের সমান, তার বিনিময়ে দিল্লির ২৫ রৎল ওজনের চাল বিক্রি হচ্ছে। (রূপোর দিনার এবং টঙ্কা টাকার সমার্থক এবং দিল্লির এক রঁৎল= বর্তমান যুগের ১৪ সের) আমি শুনেছি যে বাংলার লোকেরা মনে করে তাদের দেশে এটাই চড়া দাম। আমি সেখানে (বাংলায়) তিনটি রূপোর দিনারে একটি দুগ্ধবতী গাভি বিক্রি হতে দেখেছি। এইসব অঞ্চলে গরুর কাজ মহিষ দিয়েও চালান হতো। আমি সেখানে এক দিরহামে আটটি দরে হৃষ্টপুষ্ট মুরগি বিক্রি হতে এবং এক দিরহামে পনেরটি দরে বাচ্চা পায়রা বিক্রি হতে দেখেছি। একটি পরিপুষ্ট মেষশাবক দুই দিরহামে বিক্রি হতে দেখেছি। চার দিরহামে এক রঁৎল চিনি পাওয়া যেত। এক রঁৎল ঘি চার দিরহামে এবং এক রঁৎল তিল তেল দুই দিরহামে পাওয়া যেত। সবচেয়ে মিহি পাতলা থান কাপড় আমি দুই দিনারে ত্রিশ হাত দরে বিক্রি হতে দেখেছি। একজন সুন্দরী বালিকা ক্রীতদাসী যে উপপত্নী হওয়ার যোগ্যতা রাখে তার দাম এক সোনার দিনার। আমি এই দরে আশূরা নামে অত্যন্ত সুন্দরী একজন বালিকা ক্রীতদাসী ক্রয় করলাম। আমার একজন সঙ্গী লুলু নামে একজন অল্পবয়স্ক সুন্দর বালককে দুই দিনারে ক্রয় করল’। (সুখময় মুখোপাধ্যায় : ২০০০ ; পৃ : ৬০৫) অপর এক পর্তুগাল পর্যটক ভাস্কো-দা-গামার বিবরণ থেকেও বাংলার অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতি সম্পর্কে জানা যায়, তিনি ১৪৯৮ সালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ভাস্কো-দা-গামার বিবরণটি এমন—“বেনগুআলা (বাংলা)-র রাজা মুরিশ (মুসলমান)। এখানে খ্রিষ্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকরাই বাস করে। এ দেশের সৈন্যবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা প্রায় চব্বিশ হাজার ; তার মধ্যে দশ হাজার অশ্বারোহী এবং অবশিষ্ট পদাতিক। রণহস্তির সংখ্যা চারশো। এদেশ থেকে প্রচুর গম এবং খুব দামি তুলার জিনিস রপ্তানি হতে পারে। এখানে যে কাপড় বাইশ শিলিং ছ’পেনি দামে বিক্রি হয় তা কালিকটে বিক্রয় করে নব্বই শিলিং। এখানে রূপার পরিমাণ অত্যাধিক’। (সুখময় মুখোপাধ্যায় : ২০০০ ; পৃ ৬২৬-২৭) কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচুর উদ্বৃতি এবং হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বাণিজ্য যাত্রার ফলে বাংলা বাণিজ্যনীতিতে সমৃদ্ধি অর্জন করে। মুসলিম আমলে অর্থাৎ ১২০১ হতে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙালিদের বাণিজ্যনীতির বহু উদাহরণ পরিলক্ষিত হয়। বাংলা সাহিত্যে (মঙ্গলকাব্যে) সমুদ্রপথে বাণিজ্যনীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। বণিকেরা দক্ষিণ উপকূল, সিংহল ও গুজরাটের সাথে বাণিজ্য করত এবং নানা ধরনের পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করত। কবি বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল কাব্য* হতে সুচতুর বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যনীতি সম্পর্কে জানতে পারা যায়। বাংলার কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের প্রাচুর্য এবং রপ্তানি বাণিজ্য পরিদর্শন করে সপ্তদশ শতকে ফ্রান্সের পর্যটক বার্নিয়ার মন্তব্য করেন— ‘পৃথিবীর আর কোথাও বাংলার মতো নানা ধরনের মূল্যবান পণ্যদ্রব্য বিদেশি বণিকদের আকৃষ্ট করতে দেখা যায় না। তিনি প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের উল্লেখ করে বলেন— বাংলা দেশ প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতবেশি চাউল উৎপাদন করে যে, তা কেবল প্রতিবেশি রাজ্যগুলোতেই নয় দূরবর্তী রাজ্যগুলোতেও সরবরাহ করে। এসব চাউল গঙ্গা থেকে পাটনা পর্যন্ত আনা হয় এবং সাগর দিয়ে ভারতীয় বহু বন্দরে রপ্তানি করা হয়। বিদেশি রাজ্য বিশেষ করে সিংহল ও মালদ্বীপে পাঠান হয়। তিনি আরও লিখেছেন- বাংলা একই ভাবে চিনি শিল্পেও উন্নত। এ চিনি কর্নাটক, মেসোপটেমিয়া এমনকি পারস্যেও সরবরাহ করা হতো। সূতি ও রেশমি দ্রব্য রপ্তানি সম্পর্কে তিনি বলেন- বাংলায় এত বেশি সূতি ও রেশম দ্রব্য উৎপন্ন হয় যে বাংলাকে এ দুটি দ্রব্যের উৎপাদন ভাণ্ডার বলে অভিহিত করা হয়। বাংলার এ ভাণ্ডার কেবল হিন্দুস্থান অথবা সমস্ত মুঘলসাম্রাজের জন্যেই নয়, বরং অন্যান্য প্রতিবেশি রাজ্যসমূহ এমনকি ইউরোপের জন্যও। কেবল ওলন্দাজ বণিকেরা মিহি ও মোটা, সাদা ও রঙিন প্রত্যেক প্রকার সূতিবস্ত্রের যে বিপুল পরিমাণ পণ্যদ্রব্য বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে জাপান এবং ইউরোপে রপ্তানি করত তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। ইংরেজ, পর্তুগিজ এবং দেশীয় বণিকেরাও প্রচুর পরিমাণে এ পণ্যের ব্যবসা করেছে। বার্নিয়ার লবণ এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশ শোরা পণ্যের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। তিনি আরও বলেন যে, শোরা পণ্যে বোঝাই বিরাট বিরাট মালবাহী জাহাজ

ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকগণ ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে ও ইউরোপে প্রেরণ করত। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ সর্বোৎকৃষ্ট লাক্ষা উৎপন্ন করত ও লাক্ষার সঙ্গে আফিম, মোম, গন্ধগোকুল, লম্বা মরিচ, বিভিন্ন প্রকার ঔষধ বিদেশে রপ্তানি করত'। (এম. এ রহিম : ২০০০ ; পৃ : ২৯৯-৩০০) বার্নিয়ারের বিবরণ থেকে বাংলার মুঘল আমলের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়।

নবাবি আমলকে মুর্শিদাবাদের স্বর্ণযুগ বলা হয়। নবাবি আমল বলতে আমরা স্বাধীন নবাবি আমল অর্থাৎ মুর্শিদকুলি খাঁ'র শাসনকাল ১৭১৭ হতে নবাব সিরাজদৌল্লা'র শাসনকাল ১৭৫৭ পর্যন্ত বুঝি। নবাবি আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ সপ্তদশ শতকে বিশেষ করে এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা থেকে দিল্লি, আগ্রা ও উত্তর ভারতের অন্যত্র সম্পদের যে বর্হিগমন ঘটত তা মুর্শিদকুলি খাঁর সিংহাসন আরোহণের পর থেকে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। মুর্শিদকুলি খাঁর সিংহাসন আরোহণের আগ পর্যন্ত বাংলার উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী যারা ছিলেন তারা সকলেই মুঘল বাদশাহী পরিবারের সদস্য এবং কোন না কোন ভাবে মুঘল দরবারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সুবাদার শাহ সুজা, সুবাদার শায়েস্তা খান, সুবাদার আজিম-উদ-শান সবাই মুঘল পরিবারের সদস্য যারা বাংলা ছাড়তে চাইতেন না কারণ এখানে ধনসম্পদ আহরণের অফুরন্ত সুযোগ। এঁরা বাংলা থেকে যে ধন সম্পদ আহরণ করতেন তার সবটাই দিল্লি, আগ্রা ও উত্তর ভারতে নিয়ে যেতেন। ফলে বাংলা থেকে এই সম্পদ বর্হিগমনের ধারা সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেশ প্রকট আকার ধারণ করেছিল। এই সুবেদারগণ কী পরিমাণ সম্পদ বাংলার বাইরে নিয়ে যেতেন তা কয়েকজনের দৃষ্টান্ত থেকে প্রতীয়মান হয়- 'সুবেদার শায়েস্তা খান ১০ বছরে ৯ কোটি টাকা, খান জাহান বাহাদুর খান ১ বছরে ২ কোটি টাকা এবং আজিম-উস- শান ৯ বছরে ৮ কোটি টাকা'। (সুশীল চৌধুরী : ২০১৮ ; পৃ : ১২৯) নবাবি আমলে বাংলা, তথা মুর্শিদাবাদ থেকে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ নিষ্ক্রমণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয় মুর্শিদকুলি খাঁর সিংহাসনে আরোহণের পর। এবং দিল্লি থেকে উচ্চপদস্থ কর্মচারি পাঠানও বন্ধ হয়। স্থানীয় বাসিন্দারাই নিজামতের সব পদে নিযুক্ত হলেন। ফলে বাংলা থেকে ধন নিস্ক্রমণের প্রক্রিয়া বন্ধ হলো। নবাবরা বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা বাংলায় ধন আহরণ বন্ধ করে দিলেন তা নয় বরং তাঁরা যে সব সম্পদ আহরণ করতেন তা বাংলাতেই রয়ে গেল ফলে বাংলার সম্পদ বৃদ্ধি পেল। '১৭৪০ এর দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত নবানরা বাংলা থেকে প্রতি বছর ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মতো রাজস্ব দিল্লিতে পাঠাতেন।' (সুশীল চৌধুরী ; ২০১৮ ; পৃ : ১২৯) তাছাড়া নবাবি আমলে প্রায় সকলেই মুর্শিদাবাদে কিছু কিছু প্রাসাদ, মসজিদ ও সমাধিভবন নির্মাণ করেন। এত কিছু করার পরও তাঁরা যে পরিমাণ অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করেন লর্ড ক্লাইভের বিবরণে তার পরিচয় পাওয়া যায়—

'পলাশিতে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাভূত করে ইংরেজরা মুর্শিদাবাদের কোষাগারে গিয়ে নবাবের সঞ্চিত ধনসম্পদ দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু সোনা-রূপো নিয়ে ওখানে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২ কোটি টাকা। ক্লাইভ লিখেছেন যে নবাবের কোষাগারে ঢুকে অবাক বিস্ময়ে তিনি দেখলেন, সোনা ও হিরে-জহরত দুধারে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। তারিখ- ই-মনসুরীর লেখক জানিয়েছেন যে নবাবের হারেমে লুকানো যে ধনসম্পদ ছিল সোনা-রূপো-হিরে-জহরত মিলে তার মূল্য কমপক্ষে ৮ কোটি টাকা, আর মুজাফফরনামার লেখক করম আলীর ভাষ্য অনুসারে সিরাজদ্দৌলা ঘসেটি বেগমকে মোতিঝিল প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত করে সেখান থেকে হিরে জহরত বাদ দিয়েই নগদ ৪ কোটি টাকা ও চল্লিশ লক্ষ মোহর বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয় ১ কোটি টাকা মূল্যের সোনা রূপোর নানা বাসন পত্রও সিরাজ মোতিঝিল থেকে উদ্ধার করেছিলেন'। (সুশীল চৌধুরী : ২০১৮ ; পৃ : ১২৯-৩০) এসব বর্ণনা হয়ত কিছুটা অতি রঞ্জিত হতে পারে তবুও এ বর্ণনা থেকে নবাবি আমলের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

নবাবরা ছাড়াও মুর্শিদাবাদের অন্যান্য অভিজাত সম্প্রদায় বিশেষ করে কুসীদ, মহাজন, সদাগর প্রভৃতি শ্রেণিও প্রচুর ধনসম্পদ আহরণ এবং সঞ্চয় করেছিলেন। জগৎশেঠ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সামান্য মহাজন থেকে এরা এশিয়ার শ্রেষ্ঠ কুসীদ হয়ে ওঠেন। 'এদের বার্ষিক আয় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। এবং ব্যবসায়ের

মূলধন ৭ কোটি টাকা। কারো কারো মতে ১৪ কোটি টাকা'। (সুশীল চৌধুরী : ২০১৮ ; পৃ : ১৩০) মুর্শিদাবাদে আরও দুজন বণিকরাজা ছিলেন-উমিচাঁদ এবং খোজা ওয়াজিদ। এদের সম্পদের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি তবে সেটাও নেহাত কম নয়। কারণ উমিচাঁদ শোরা ও আফিম এর একচেটিয়া ব্যবসা করতেন, এছাড়া টাকা লেন-দেনের ব্যবসাও তার ছিল। খোজা ওয়াজিদ বিহারের পুরো অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতেন। তিনিও শোরা এবং আফিম এর ব্যবসা করতেন। এ ছাড়া তিনি সমুদ্রবাণিজ্যেও লিপ্ত ছিলেন। তার কমপক্ষে ৬টি বাণিজ্যতরী ছিল। বণিকরাজারা ছাড়াও মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে বহু ব্যাঙ্কার, মহাজন ও সওদাগর এসে ভিড় করত। নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদে সাধারণ মানুষের অবস্থাও ভালো ছিল। প্রথমে দেওয়ানি কার্যালয় ও পরে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় এবং মুর্শিদাবাদ এবং কাশিমবাজারে কাঁচা রেশম ও রেশমি কাপড় ব্যবসার প্রচলন থাকায় ঐ অঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং আয়ের পথ সুগম হয়। তাছাড়া নবাবি আমলে নানা স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। রিয়াজ-উস-সলাতিনের লেখক গোলাম হোসেন বলেছেন- 'সে সময় মুর্শিদাবাদে টাকায় ৫ থেকে ৬ মণ চাল কেনা যেত। তখন বাংলার মানুষ মাসে এক টাকা খরচ করে পোলাও কালিয়া খেতে পারত'। (সুশীল চৌধুরী : ২০১৮ : পৃ: ১৩২) 'পলাশির পর রবার্ট ক্লাইভ প্রথম মুর্শিদাবাদ দেখে বিস্ময়ে হতবাক। তিনি মন্তব্য করেছেন-মুর্শিদাবাদ লন্ডনের মতোই বিরাট, প্রচুর লোকবসতি এবং লন্ডনের মতোই ধনী শহর। তফাত শুধু এই যে লন্ডনের চেয়ে মুর্শিদাবাদে অনেক বেশি ধনী লোক যাদের ধনসম্পদ লন্ডনের যে কোন ধনী বাসিন্দার চাইতে অনেক অনেক বেশি'। (সুশীল চৌধুরী : ২০১৮ ; পৃ : ১৩২) নগরায়ণের এ চিত্র বাংলার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকধারাকে সমৃদ্ধ করেছিল। নবাবি আমলে কাঁচা রেশম এবং রেশমিবস্ত্রের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল তুঙ্গে। এ সব পণ্যের চাহিদা শুধু ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে নয়, বরং ইউরোপেও ছিল প্রচুর। মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজার থেকে কাঁচা রেশম ক্রয়ের জন্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ যেমন গুজরাট, লাহোর, মুলতান, দিল্লি, আগ্রা, বেনারস, পাঞ্জাব ও হায়দ্রাবাদ থেকে বণিকেরা এসে ভিড় জমাত। তবে কাঁচা রেশমের সবচেয়ে বড় ক্রেতা ছিল গুজরাটিরা, তারা দামের কোন তোয়াক্কা না করে সবচেয়ে ভালো রেশম ক্রয় করত। যার ফলে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রেশমের নামই হয়ে যায় গুজারটি সিল্ক। এই গুজরাটি সিল্ক বর্তমানেও ভারতে উৎকৃষ্ট সিল্ক হিসেবে প্রসিদ্ধ। বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম ছিল শোরা ও আফিম। এ সব বাণিজ্যনীতি পরিচালনার প্রধান ক্ষেত্র ছিল কলকাতা ও পাটনা।

মধ্যযুগে বাংলাদেশে অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে সপ্তগ্রামের নামই সর্বাগ্রে উচ্চারিত হতো। বিশিষ্ট পর্যটক ইবনে বতুতা সপ্তগ্রামের সুপ্রসিদ্ধি লক্ষ করে বড় শহর বলে মন্তব্য করেন। গৌড় থেকে সপ্তগ্রাম ছিল জনপদসমৃদ্ধ। ষোড়শ শতকের শেষভাগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচনায় সপ্তগ্রামের বর্ণনা আছে। রাঢ় বঙ্গের প্রতি কবির ভালো ধারণা না থাকলে সপ্তগ্রাম সম্পর্কে কবির উচ্ছ্বাস চাপা থাকেনি। তাই তিনি বলেছেন, 'সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়/ ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়'। (মুকুন্দরাম : ১৯২১ ; পৃ : ২৬৪) খুল্লনার বিবাহের জন্য তার পিতা লক্ষপতি ঘটক জনাই পণ্ডিতকে সপ্তগ্রাম থেকে পাত্র খোঁজার অনুরোধ করেন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, বণিক সমাজের নিকট সপ্তগ্রাম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কবিকঙ্কণের ধনপতি সদাগর জাতিতে ছিলেন গন্ধবণিক। দক্ষিণপাটনে বাণিজ্য যাত্রাকালে সপ্তগ্রাম থেকে দ্রব্য কিনে তিনি তার সপ্তডিঙ্গা মধুকর সাজান এবং সরস্বতী নদী বয়ে সমুদ্রের মোহনায় পৌঁছান—

গরিফ বাহিয়া সাধু যান ভাগীরথী।
করতোয়া এড়াইয়া পাইল সরস্বতী।
(মুকুন্দরাম : ১৯৬৬ ; পৃ : ২১৯)

এর প্রায় একশো বছর আগে পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে *মনসামঙ্গলে* কবি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের বর্ণনাতেও সপ্তগ্রামের এই সমৃদ্ধ রূপটিই ধরা পড়ে। চাঁদ সদাগর সপ্তগ্রামের সৌন্দর্য উপভোগের জন্য অসীম কৌতূহলে তাঁর ডিঙা থামান—

বুহিত্র চাপায়্যা কূলে চাঁদো অধিকারী বলে

দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্ত ঋষিস্থান সর্বদেব অধিষ্ঠান
সোক্ষ মোক্ষ রম্যন্তর ধাম।
(বিপ্রদাস ; ১৯৫৩ ; পৃ : ১৪২)

কবি বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁর মনের মাধুরী দিয়ে সপ্তগ্রামের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন সেখানে হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়ে গঠিত একটি অসাম্প্রদায়িক চিত্রই ভেসে ওঠে। একদিকে হিন্দু ধর্মের ‘ছত্রিশ আশ্রমে লোক/ নাহি কোন দুঃখ শোক,’ আবার অন্যদিকে

ছৈয়দ মোল্লা কাজি কেতাব কোরান বাজি
দুই ওক্ত পড়ে তছলিম।
(বিপ্রদাস : ১৯৫৩ ; পৃ: ১৪২)

সপ্তগ্রামের সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি দেখে চাঁদ সদাগরও বিস্মিত হয়েছিলেন—

অভিনব সুরপুরী দেখি ঘর সারি সারি
প্রতিঘরে কনকের বারা
নানা রত্ন অবিশাল জ্যোতির্ময় কাঁচ চাল
গজমুক্তা প্রলম্বিত ঝারা।
(বিপ্রদাস : ১৯৫৩ ; পৃ : ১৪৩)

এই ঐশ্বর্যের প্রধান কারণ বঙ্গদেশের উর্বরাভূমির প্রাকৃতিক শস্যসম্পদ এবং বাঙালির বাণিজ্য বৃত্তি। সপ্তগ্রামে বহু লক্ষপতি বণিক বাস করতেন। *চৈতন্য-চরিতামৃতে* আছে—

হিরণ্য-গোবর্ধন নাম দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর।
(রমেশচন্দ্র মজুমদার ; ২০০৩ : পৃ : ২২৬)

মধ্যযুগের শেষভাগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাগজপত্রে বাংলা দেশকে ভারতবর্ষের ভূস্বর্গ বলা হতো। ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার, জীবন যাত্রার সচ্ছলতার মান বিচারে বাংলার খ্যাতির সার্থকতা সহজেই অনুমান করা যায়। এ সত্ত্বেও দেশে ঐশ্বর্যশালী ধনীর পাশাপাশি দারিদ্র্যের চিত্রও সমসাময়িক বাংলাসাহিত্যে কম ছিল না। দ্রব্যাদির মূল্য কম হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ কৃষক ও প্রজাগণের দুঃখ দুর্দশার অন্ত ছিল না। এই দুঃখ দুর্দশার অন্যতম কারণ হলো রাজকর্মচারীদের অযথা অত্যাচার ও উৎপীড়ন। স্মরণীয়, এ সময় সমাজে সামাজিক অবক্ষয় সূচিত হয়, ধস নামে নৈতিক চেতনায়। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে তার বিবরণ রয়েছে। *কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর* রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দামিন্যায় ছয়-সাত পুরুষ কৃষিকাজ দ্বারা জীবন যাপন করতেন কিন্তু ডিহিদার মামুদ সরীপের অত্যাচারে যখন তিনি পৈতৃক ভিটা ছেড়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হলেন তখন তিন দিন ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করেন। *কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে* সতিনের কোপে খুল্লনার কষ্ট এবং ফুল্লরার বার মাসের দুঃখ বর্ননায় দারিদ্র্যের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

সামাজিক অবস্থা

আমরা জানি যে ‘কোনো দেশকাললব্ধ নরনারীর মনন-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি শুধু ধর্মকর্ম-শিল্পকলা-জ্ঞানবিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয় এবং ইহাদের মধ্যে শেষও নয়। জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও ব্যবহারে, শীলাচরণ ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনচর্যার মধ্যেও তা ব্যক্ত হয়। চর্চা যেমন সংস্কৃতির লক্ষণ, চর্যা বা আচরণও তাহাই ; বরং এক হিসাবে চর্যা বা আচরণই চর্চাকে সার্থকতা দান করে, এবং উভয়ে মিলিয়া সংস্কৃতি গড়িয়া তোলে’। (নীহাররঞ্জন : ১৪১৪ ; পৃ : ৪৪১) বাংলা, বাঙালি ও বাংলার সমাজ এবং জীবনযাত্রার মান জানতে হলে তাদের প্রাত্যহিক জীবনাচরণ, জাতিভেদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বস্ত্র, নারীর অবস্থান, ক্রীড়া-কৌতুক, যুদ্ধ প্রণালী বাঙালির নীতি ও চরিত্র, উৎসব, অলঙ্কার প্রসাধনী আমোদ-প্রমোদ

প্রভৃতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত সাহিত্যকর্ম সংযোজিত হয়েছে সে সব সাহিত্যে বাঙালি জাতির দৈনন্দিন জীবনচর্চা তথা গার্হস্থ্যজীবনের বহুবিধ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। হিন্দুদের সামাজিক ও গার্হস্থ্যজীবন এবং লৌকিক ধর্ম, সংস্কার ও ধর্মানুষ্ঠানের বিধান বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রে হিন্দু সমাজে যে চিত্র অঙ্কিত আছে তা বাস্তব জীবনের সাথে কতটা অনুসৃত তা বলা দুষ্কর। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *কবিকঙ্কণ*-চণ্ডীতে কালকেতুর নতুন রাজধানী বর্ণনা এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে যে সামাজিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা বাংলার মধ্যযুগের বাস্তব চিত্র বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যান্য গ্রন্থেও বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্যে বিক্ষিপ্ত সমাজ চিত্রও এ বিষয়ের মূল্যবান উপকরণ। ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈশ্য সাধারণত এই তিন জাতির প্রাধান্য ছিল। মুকুন্দরাম তাঁর নিজের জন্মস্থান দামুন্যা গ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

কুলে শীলে নিরবধ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য
দামুন্যাটি সজ্জন প্রধান।
(মুকুন্দরাম : ১৯৭৪ ; পৃ. ২৯)

প্রায় একশত বছর পূর্বে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যেও অমরা হিন্দু সমাজের এ তিন জাতির প্রাধান্য প্রত্যক্ষ করে থাকি। ব্রাহ্মণদের মধ্যে একদল ছিলেন সাত্ত্বিক ও বিদ্বান প্রকৃতির। বেদ, আগম পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শিতা ছিল বলেই নানা স্থান হতে বিদ্যার্থীরা তাঁদের নিকট পড়তে আসতেন। মূর্খ বিপ্রেরও অভাব ছিল না, সম্ভবত এদের সংখ্যা বেশি ছিল। মুকুন্দরাম এদের বর্ণনা দিয়েছেন এ ভাবে—

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখিয়া পূজার অনুষ্ঠান।
(মুকুন্দরাম : ১৯৭৪ ; পৃ : ৩৪৯)

অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরও উল্লেখ আছে। শ্রাদ্ধ ও মৃত্যুকালীন দান গ্রহণ করায় এদেরকে পতিত ব্রাহ্মণ বলে গণ্য করা হতো। বৈদ্য জাতির মধ্যে বর্তমান কালের ন্যায় সেন, গুপ্ত, দাস, দত্ত, কর প্রভৃতি উপাধি ছিল।

চিকিৎসা বৈদ্যদের প্রধান বৃত্তি হলেও অন্যান্য শাস্ত্রেও তাঁরা পারদর্শী ছিলেন। মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি, ইতিহাস ও শ্রেণিভেদের উল্লেখ বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। তৎকালীন সমাজে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমান সমাজের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো যে তথ্য কবিকঙ্কণ পাঠককে জানাতে ভুল করেননি। গুজরাট নগরের পশ্চিমাংশে বসবাসকারী মুসলমান সমাজের এক সুবিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্র তিনি এঁকেছেন। যদিও ইসলাম সমতায় বিশ্বাসী, বর্ণভেদ মানে না, তবুও তার মাঝে সূক্ষ্ম বিভেদরেখাটিকে চিনে নিতে কবির অসুবিধে হয়নি। তাই মুসলমানদিগের শ্রেণিবিভাগ অংশে তিনি কর্ম অনুসারে ১৫টি জাতির উল্লেখ করেছেন। এগুলি হলো– ১. জোলা বা তাঁতি, ২. মুকেরি, (যারা বলদ চরায়), ৩. কাবাড়ি (জেলে), ৪. গয়সাল (ধর্মান্তরিত মুসলমান), ৫. পিঠারি, ৬. সানাকার, ৭. হাজাম, ৮. তীরকর, ৯. কাগজি, ১০. কলন্দর (ভ্রাম্যমান সাধুপুরুষ), ১১. দরজি, ১২. বেনেতা, ১৩. রঙ্গরেজ (যারা জামা-কাপড় রং করে), ১৪. হালাল, (হাল বহনকারি) ১৫. কসাই প্রভৃতি। এছাড়াও ছিলেন সৈয়দ, মৌলনা ও কাজি। এরা উচ্চশ্রেণির মুসলমান। অষ্টাদশ শতকের অপর কবি ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে 'তৎকালীন রীতি অনুসারে ৩৬টি জাতির উল্লেখ ও একই সাথে তাদের বৃত্তিও নির্দেশ করেছেন। সেই সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন অংশে কালোয়াত, মৃদঙ্গী, নর্তক প্রভৃতি শিল্পীকুল; ঘড়িয়াল, খানেজান, জমাদার, হাজারি, আমিন, দেয়ান, পেশকার প্রমুখ বৃত্তিভিত্তিক সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন।' (স্মৃতিকণা ; ২০১১ : পৃ. ৫)

তৎকালে বাংলা দেশে পরিবার কাঠামো ছিল একান্নবর্তী। পিতা, মাতা, ভাই, বোন, পুত্র নিয়ে যৌথ পরিবার। সাধারণত পরিবারের কর্তা ছিলেন পিতা, অবর্তমানে বড় ভাই। বিপদে আপদে সংসারটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার গুরুদায়িত্বর্তাত একান্তভাবে পরিবারের কর্তার ওপর। কবি মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে ডিহিদার মামুদ সরীপের অত্যাচারে দেশছাড়ার সময় পুত্র পরিজনদের সঙ্গে তাঁর ছোটো ভাই রমানাথও ছিলেন :

'দামিন্যা ছাড়িয়া জাই   সাঙ্গে রামা নন্দী ভাই'
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ : পৃ : ৩)

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যে কবির আত্মপরিচয় অংশেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয় তিনিও বলভদ্রের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্রদের আমলে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। এ দুঃসময়ে কবির সঙ্গী ছিলেন তাঁর অভিরাম ভাই। পারিবারিক বন্ধনের এ চিত্র আমরা আরও পাই মনসামঙ্গল কাব্যে। মনসাপুরাণে ছয় পুত্রের সাহচর্যে চাঁদ সদাগর গর্বিত। ছয় পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে চাঁদ খেতে বসতেন। স্ত্রী সোনকা ও পুত্রবধুরা খাবার পরিবেশন করতেন। এহেন ছয়পুত্রের মৃত্যু চাঁদ ও সোনকাকে ধ্বংস করে দেয়। সেই ধ্বংসস্তুপের মধ্যে থেকে ফিনিক্স পাখির মতো লখিন্দরের জন্ম সোনকা ও চাঁদকে আবারো সংসারের মায়ায় জড়িয়েছিল। (স্মৃতিকণা ; ২০১১ পৃ. ৬০) ফিনিক্স পাখি একটি কাল্পনিক দীর্ঘায়ু পাখি যার জন্ম ভস্ম বা ছাইয়ের মধ্যে এবং যে পাখি বহু বছর বাঁচে এবং মরে গিয়েও পুনরুজ্জীবিত হয়) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতির দীর্ঘ পরবাসকে তাঁর দুই পত্নী ভুলেছিলেন পুত্র শ্রীমন্তের মুখের দিকে তাকিয়ে। শিবায়নে দারিদ্র্যবেষ্টিত শিব ও পার্বতীর সংসারে কলহ থাকলেও অভিমানী স্ত্রীকে বাপের বাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনতে স্বয়ং মহাদেব শাঁখারি হয়ে পত্নীকে নিজ হাতে শাঁখা পরিয়ে দেন। ফলে অভিমানের মেঘ কেটে সংসারে আবার সুখ ফিরে আসে। পারিবারিক এ চিত্র মধ্যযুগের বিভিন্ন ধারার কাহিনি কাব্যের পরতে পরতে নিহিত আছে।

মধ্যযুগে বাংলায় বিদ্যাশিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার ব্যাপ্তি ছিল লক্ষ করার মতো। লেখাপড়া শেখায় বাঙালির চিরদিনই আগ্রহ ছিল। নবদ্বীপ ছিল বিদ্যাচর্চার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ এক বিরাট পাঠশালায় পরিণত হয়। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক নবদ্বীপের বর্ণনা—

নানা দেশে হৈতে লোকে নবদ্বী
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়।
(রমেশচন্দ্র মজুমদার ; ২০০৩ : পৃ. ২৯৪)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া বা নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক এবং বহু পণ্ডিত তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। তিনি নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সভার অন্যান্য পণ্ডিতের সঙ্গে ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করতেন। তাঁর সভাকবি হিসেবে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকে বাংলাসাহিত্যে আর এক বিশিষ্ট বাঙালি শাক্ত কবি ও সাধক ছিলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনিও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। তাঁর অন্যতম একটি কাব্যগ্রন্থ কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাহিনি। এ ছাড়া তিনি অনেক শাক্তপদ রচনা করেছেন যে পদ বা গানের মধ্য দিয়ে পলাশির যুদ্ধ এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের চিত্র প্রকাশ পায়। পলাশির যুদ্ধ ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ প্রভাব যখন পড়েছিল বাংলার কৃষিজীবী এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ওপর তখন রামপ্রসাদের গান হয়ে উঠেছিল মানুষের এক বড় আশ্রয়। সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান হিসেবে নদীয়া ছাড়াও ছিল কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুর। রূপরাম চক্রবর্তীর আত্মকাহিনিতে বর্ণিত আছে 'তিনি বাল্যকালে রঘুরাম ভট্টাচার্যের টোলে অমরকোষ, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, পিঙ্গলের ছন্দসূত্র অথবা প্রাকৃত পৈঙ্গল এবং শিশুপাল বধ, রঘুবংশ, নৈষধচরিত প্রভৃতি কাব্যপাঠ করিয়াছিলেন'। (রমেশচন্দ্র মজুমদার ; ২০০৩ : পৃ. ২৯৭–২৯৮)

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ পাঠ বিষয়ের তালিকা হতে সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। ঘনরামের *ধর্মমঙ্গলে* লাউসেনের বিদ্যাচর্চার মধ্যদিয়েও সেকালের

শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয় মেলে। লাউসেনকে প্রথমে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষা দেয়া হয় পরবর্তীতে বিভিন্নশাস্ত্র যেমন ব্যাকরণ, শব্দরূপ, ধাতুরূপ শেষে পাণিনি শিক্ষা পরে বেদান্ত ও নানা কাব্যসাহিত্য ও নাটক পড়ানো হয়।

সমসাময়িক সাহিত্যে পুরুষের বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি নারীশিক্ষাও অবহেলিত ছিল না। মেয়েদের পাঠশালায় যাওয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষা লাভের উল্লেখ আমরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় লক্ষ করে থাকি। *কবি কঙ্কণচণ্ডীতে* লহনা, খুল্লনা ও লীলাবতীর পত্রলেখা ও পত্রপাঠের উল্লেখ আছে। সপ্তদশ শতকে দয়ারামের *সারদামঙ্গলে* রাজকুমার ও রাজকুমারীদের এবং রাসসুন্দরীর আত্মচরিতে ছেলেমেয়েদের একত্রে পাঠশালায় যাওয়ার কথা আছে। এ ছাড়াও আরবীয় কাহিনিকাব্য লায়লী-মজনু কাব্যে লায়লী ও মজনুর একই পাঠশালে শিক্ষাগ্রহণের উল্লেখ আছে। আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে পাঁচ বছর বয়সে বিপ্র ডেকে পদ্মাবতীকে হাতেখড়ি দেয়া হয়। দুই এক স্থলে—যেমন রামপ্রসাদের *বিদ্যাসুন্দর* ও ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের বিদ্যাসুন্দর কাহিনির নায়িকা বিদ্যা উচ্চশিক্ষিতা। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা তর্কশাস্ত্রে এতটাই পারদর্শী ছিলেন যে মহা মহাপণ্ডিতও তাঁর কাছে পরাজিত হতেন। প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার কী ব্যবস্থা ছিল তা বলা কঠিন তবে গ্রামে গ্রামে খড়ের ঘর, অথবা কোনো বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপ বা খোলা জায়গায় অথবা কোনো গাছতলায় পাঠশালা বসত। গুরুমহাশয়রা সামান্যই সম্মানী পেতেন কিন্তু শিক্ষার্থী বিদ্যা সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দিতেন। সাধারণত সাত বছর বয়সের মধ্যে ছাত্ররা লিখতে, পড়তে ও গণনা করতে পারত। সংখ্যা গণনার উপকরণ হিসেবে কড়ি ও পাথরের কুচি ব্যবহার করা হতো। হিসাব, দলিল দস্তাবেজ, চিঠিপত্র ও দরখাস্ত লেখার শিক্ষা পাঠশালাতেই দেয়া হতো। বালির উপর খড়ের কুলা দিয়ে শিশুরা প্রথম লেখা শিখত, তারপর খড়ি দিয়ে মাটির মেঝেতে, কলাপাতায় ও তালপাতার খাগ বা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে লেখার অভ্যাস করত। তুলা দিয়ে কাগজ তৈরি হতো। এই তুলট কাগজ ছাড়া তালপাতা ও ভুর্জপত্রে পুথি লেখা হতো। হরীতকী ও বয়রার রস কালি তৈরিতে ব্যবহৃত হতো যা প্রদীপের কালো ধূয়ায় মিশানো হতো। জমিদার ও ধনী লোকেরা বার্ষিক বৃত্তি অথবা ভূসম্পত্তি দান করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ভরণপোষণ করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাটরের রাণী ভবানী এবং নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বহু সংখ্যক পণ্ডিত ও টোলের ছাত্রদেরকে বৃত্তি দিয়ে সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারে সাহায্য করেছিলেন।

সর্বজন বিদিত যে একটি সমাজ, রাষ্ট্র বা দেশের তথা বিশেষ কোনো যুগের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ে পেশা বা বৃত্তি প্রধান ভূমিকা পালন করে। সাধারণত পেশা বা বৃত্তি বলতে আমরা জীবনধারণ বা বেঁচে থাকার জন্য উপকরণ সংস্থানকে বুঝি। আদিকালেও বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষকে পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। মানবেতিহাসের আদিকাল হতে মানুষের জীবিকার সাথে পেশা বা বৃত্তি অথবা শ্রমের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। জীবনধারণের প্রয়োজনে তাকে কোনো না কোনো বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। পরবর্তীকালে সামাজিক পট পরিবর্তনের ফলে বেড়েছে মানুষের কাজের পরিধি এবং গ্রহণ করতে হয়েছে বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তি। বাঙালি কোনো কালেই শ্রমবিমুখ নয়। এ ধারা সেই প্রাচীন কাল হতে অদ্যাবধি বিদ্যমান। এর প্রমাণ প্রাচীন চর্যাগীতিতেও লক্ষণীয়। হাজার বছরের পুরোনো বৌদ্ধগান ও দোহার মধ্যেও তৎকালীন বাঙালিসমাজের কর্মময় জীবনের তথা জীবিকার নিখুঁত চিত্র প্রতিবিম্বিত রয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্য *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে রাধা ও গোপনারীদের পসরা সাজিয়ে হাটে গমন, দধি-দুধ বিক্রয়, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নৌকা পারাপার, গো-চারণ প্রভৃতি পেশা বা বৃত্তির উল্লেখ পাই। বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ধারার মঙ্গলকাব্যে এ চিত্র আরও বেশি স্পষ্ট। বিজয় গুপ্তের *মনসামঙ্গল*, মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল*, ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*, ঘনরামের *ধর্মমঙ্গল* এবং সমসাময়িক মঙ্গলকাব্য এবং অন্যান্য গ্রন্থে আমরা বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তিজীবী মানুষের চিত্র প্রত্যক্ষ করি যার মূল্য সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে কম নয়। সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মরীতির আলোকে তাদের দৈনন্দিন জীবন বিশ্লেষণ করলে এসব বৃত্তিজীবী মানুষের কথা জানা যায়।

অর্থনীতিবিদগণের মতে, 'শ্রমজীবী হলো তারাই যারা কেবল কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবিকা অর্জন করে'। (গোপিকারঞ্জন : ১৯৯৯ ; পৃ : ১) সুতরাং শ্রম হচ্ছে যে কোনো উৎপাদন কাজে নিয়োজিত মানুষের সকল প্রকার কর্ম প্রচেষ্টা। এই শ্রম শারীরিক এবং মানসিক উভয় প্রকার হতে পারে। মধ্যযুগে বাংলার সমগ্র সমাজ প্রধানত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। 'একটি অভিজাত অপরটি অনভিজাত'। (গোপিকারঞ্জন ; ১৯৯৯ : পৃ. ৩) এই শ্রেণি বিভাজন তৎকালীন হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল। বর্ণাশ্রম পদ্ধতি দ্বারা হিন্দু সমাজ বিভিন্ন বর্ণ ও উপবর্ণে বিভক্ত ছিল। *বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে* ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ চারটি প্রধান বর্ণ ও ছত্রিশটি উপবর্ণের উল্লেখ থাকলেও 'আর্যদের চতুর্বর্ণ প্রথা বিকশিত হয়নি কখনো বাংলাদেশে'। (গোপিকারঞ্জন : ১৯৯৯ ; পৃ : ৩) তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায় 'পঞ্চম শতক থেকে উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণরা বাঙ্গালায় এসে বসবাস শুরু করেন। শুধু উত্তর ভারত নয়, ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও তাঁরা এসে ধীরে ধীরে ভিড় জমাতে শুরু করলেন'। (গোপিকারঞ্জন : ১৯৯৯ ; পৃ : ৩) রঙ্গলাল সেন প্রাচীন ভারতীয় গ্রামীণ ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে চতুর্বর্ণ ভিত্তিক সামাজিক স্তর বিন্যাসের একটা সামঞ্জস্য আবিষ্কার করার চেষ্টা করে লেখেন–'ব্রাহ্মণরা গৌরবর্ণের অধিকারী। এটি পবিত্রতা ও সাত্ত্বিকতার লক্ষণ। তারা গ্রামের সাদামাটির এলাকায় বাস করে। ক্ষত্রিয়দের গায়ের রং লাল শৌর্য ও বীর্যের প্রতীক। গ্রামের মাটি যেখানে লাল সেখানেই ক্ষত্রিয়রা থাকে। বৈশ্যদের শরীরের রং হলুদ। এটি সোনার রং–যা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য। হলুদ রং–এর মাটি যেখানে বিদ্যমান সেখানেই বৈশ্যরা বসতি স্থাপন করে। শূদ্ররা কালো–যা অজ্ঞতা ও অপরিচ্ছন্ন অভ্যাসের পরিচায়ক। যেখানে কালো কাদামাটি রয়েছে সেখানেই শূদ্ররা তাদের বাস্তুভিটা গড়ে তুলেছে'। (গোপিকারঞ্জন : ১৯৯৯ ; পৃ : ৩)

ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ করে হিন্দু সমাজে বর্ণপ্রথার সঙ্গে জীবিকার একটা গভীর সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। সাধারণভাবে বলা যায় পেশা বা বৃত্তি একজনের বিশেষ কাজের নাম নয়, বরং পেশা বা বৃত্তি বলতে বোঝায় সেই কাজ যা বহুলোকের জীবনধারণের মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়। এক এক বৃত্তিকে অবলম্বন করে এক এক গোষ্ঠী বা জাতির পরিচয় নির্ণীত হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যভাণ্ডার পর্যালোচনা করে আমরা বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তির পরিচয় পাই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কালকেতু উপাখ্যানে গুজরাট নগর স্থাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাতির আগমনের কথা বলতে গিয়ে জীবিকার কথাও আলোচনা করেছেন। সেখানে ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাজনের বিষয়টি তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নানা বৃত্তির কথাও জানা যায়। কৌলীন্য প্রথার বাহক কুলীন ব্রাহ্মণদের একটি অংশের পেশাই ছিল বিবাহ করা, বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকুল মূলত বিদ্যাচর্চার সঙ্গে যুক্ত এবং পাশাপাশি যজমান বৃত্তিধারী পুরোহিত ব্রাহ্মণও ছিলেন। বৈশ্য সম্প্রদায় মূলত কৃষিকাজ ও গোরক্ষণের কাজ করতেন। কেউ সুদের কারবার, কেউ হীরা, নীলা, মোতির মতো দুর্মূল্য দ্রব্য কেনাবেচা করতেন। কেউ নৌকা সাজিয়ে দূরদেশে বাণিজ্যে যেতেন। কায়স্থরা ছিলেন মূলত সম্পন্ন জাতি। বৈদ্য সম্প্রদায়ের মূল বৃত্তি ছিল চিকিৎসা। তিলিরা তৈল তৈরি, কেউ ঘানি ঘুরিয়ে তেল বার করতেন। তাম্বুলীরা পানের বীড়া বাঁধতেন, কুমোর গড়তেন মাটির হাঁড়িকুড়ি, তন্তরায় বা তাঁতিরা তাঁত বুনতেন, মালিরা ফুলের চাষ করতেন এবং মালা বা সাজ প্রস্তুতে দক্ষ ছিলেন। এছাড়া দেবপূজার ফুলও ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতেন। নাপিতের কাজ ছিল ক্ষৌরকর্ম করা। মোদকরা মিষ্টান্ন তৈরি এবং কাঁসারিরা কাঁসার বাসন পত্র, পূজার ঘণ্টা, ঘাঘর, পঞ্চপ্রদীপ ইত্যাদি তৈরি করতেন।

বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক শ্রেণিবিভাজন ছিল এবং কর্মপদ্ধতিও ছিল ভিন্নতর। যেমন–সুবর্ণ বণিকেরা সোনারূপোর কারবার, মণিবেনেরা মূলত রত্ন ব্যবসায়ী, গন্ধবেনেরা সুগন্ধি দ্রব্য বিক্রি এবং শঙ্খবেনেরা শাঁখের জিনিস বিক্রি করতেন। পল্লীগোপেরা গোপালক ও সংরক্ষক ছিলেন। ধীবর জাতি–কেউ জাল বুনতেন, কেউ মাছ ধরতেন এবং কেউ মাছ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ধোপাদের কাজ ছিল কাঁচা এবং দরজিদের কাপড় সেলাই করা। পাটনি খেয়া পারাপার করতেন। ছুতোরেরা চিড়ে কুটতেন, কেউ মুড়ি ভাজতেন, কেউ কেউ চিত্র নির্মাণ অর্থাৎ ছবি আঁকতেন। ভাটের কাজ ছিল ভিক্ষাবৃত্তি। চণ্ডালেরা

লবণ, পানিফল, কেসুর বা ঘাসের কন্দ বিক্রি করতেন। এছাড়াও চণ্ডালেরা শ্মশানে মরা পোড়ানোর কাজ করতেন। চামারেরা চামড়ার কাজ, গায়েনরা গান এবং বারাঙ্গনাদের জীবিকা ছিল দেহব্যবসা।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মুসলমানদের বৃত্তি সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, জোলারা বস্ত্রবয়নকারী, হালবলদ বহনকারী মুকেরি, পিঠা প্রস্তুতকারী হলেন পিঠারী, তীরকরদের বৃত্তি তীর প্রস্তুত করা। হাজামেরা সাধারণত সুন্নৎ-এর অস্ত্র চিকিৎসক। ঘনরাম চক্রবর্তী *ধর্মমঙ্গলে* কবিকঙ্কণের অনুসরণে জাতিভেদ থাকলেও যোদ্ধবৃত্তিধারীদের শ্রেনিবিন্যাস করেছেন। যেমন–পদাতিকবাহিনী, অশ্বারোহী, গজারোহী, বন্দুকধারী যোদ্ধাদের ছিল নানা শ্রেণিবিভাগ। তার মধ্যে ধানুকীরা ধনুক হাতে যুদ্ধ করত, বন্দুকীদের হাতে থাকত আগ্নেয়াস্ত্র, ঢালিরা ঢাল হাতে যুদ্ধ করতেন, রায়বেশেদের হাতে থাকত লাঠি, মাহুতেরা হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতেন, সিপাই বা পাইক মূলত পদাতিক বাহিনীর অন্তর্গত ছিল। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*- এ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন অংশে মুনশি, দেয়ান, ঘড়িয়াল, খানেজান, জমাদার, আমিন, পেশকার রাজকর্মচারীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও সংগীত বৃত্তিধারী শিল্পীকুলের পরিচয়ও দিয়েছেন কবি। গায়েনরা গাইতেন গান, মৃদঙ্গীরা বাজাতেন মৃদঙ্গ, নর্তকেরা নৃত্য করতেন। মধ্যযুগের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্রধানত রাজা বা জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, রূপরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর প্রমুখ কবি রাজন্যবর্গের অনুপ্রেরণায় মূলত কাব্যরচনা করেন। কবি মুকুন্দরাম আড়ড়্যার জমিদার বাঁকুড়া রায় এবং পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায়ের সভা অলঙ্কৃত করেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দকে বিক্রমপুরের রাজা বিষ্ণুদাসের ভ্রাতা ভারামাল্ল তিনটি গ্রাম প্রদান পূর্বক বিদ্যাচর্চায় উৎসাহিত করেন। ঘনরাম চক্রবর্তীকে *ধর্মমঙ্গল* রচনায় অনুপ্রাণিত করেন স্বয়ং বর্ধমান রাজ। কবি ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার কবি ছিলেন এবং রাজাদেশদিষ্ট হয়ে *অন্নদামঙ্গল* রচনা করেন। এভাবে সমগ্র মধ্যযুগের কাল পরিসরে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষ শ্রমজীবী, কৃষিজীবী থেকে রাজ কর্মচারী, পণ্ডিত সমাজ থেকে শিল্পকার বিভিন্ন জাতির মানুষ স্ব স্ব পেশা বা বৃত্তি দিয়ে নিরন্তর নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছেন।

জীবন চলমান, দ্বন্দ্বমুখর এ ভবসংসারও তাই নিত্য পরিবর্তনশীল তথা নবায়িত। ভাঙা, গড়া, চাওয়া, পাওয়া, অথবা না পাওয়ার মধ্যেও নানা উৎসব আমেজ কিন্তু থেমে থাকে না। একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ মাতৃগর্ভাবস্থাতেই নানা উৎসব আমেজ উপভোগ করে থাকে। আর এই সব পারিবারিক উৎসব আমেজের মধ্য দিয়ে একটি সমাজের রীতি-নীতি ও বিশ্বাস প্রবণতার চিত্রটিও হয়ে উঠে সমুজ্জ্বল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে প্রাক জন্ম পূর্ব থেকেই শুরু হয় বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠান যা গার্হস্থ্যজীবনেরই খণ্ডচিত্র সাধভক্ষণ, জাতকর্ম, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, ষষ্ঠীপূজা, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণভেদ, বিদ্যারম্ভ ও উপনয়ন। এরপর পরিণত বয়সে বিবাহ কিন্তু মধ্যযুগের কাব্যপ্রবাহে আমরা বাল্যবিবাহের প্রাধান্য দেখি। বিবাহ সংঘটনেও আছে নানা রীতিনীতি ও প্রথা। ঘটক নির্ধারণ, বরপণ, কন্যাপণ, অধিবাস, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, গন্ধঅধিবাস, স্ত্রী আচার, বরযাত্রীর শোভাযাত্রা সবই বিবাহের অঙ্গ। জীবনের শেষ পর্যায় হলো মৃত্যু। সহমরণ প্রথা তৎকালীন সমাজের একটি করুণ ও বেদনাবিধুর প্রথা হিসেবে প্রচলিত ছিল। এ সকল রীতিনীতি আমরা মধ্য যুগের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য এবং রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্যে প্রত্যক্ষ করি। মঙ্গলকাব্যধারায় সোনকা, নিদয়া, খুল্লনা, রঞ্জাবতী প্রমুখ মায়েরা যথাক্রমে লখিন্দর, কালকেতু, শ্রীমন্ত এবং লাউসেনের জননী। প্রত্যেক কবিই তৎকালীন সামাজিক রীতি মেনে গর্ভবতী মায়ের সাধভক্ষণের আয়োজন করেন।

মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা ছিল কি না নিশ্চিত জানা যায় না। তবে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে রাধা এবং গোপবধূদের স্বচ্ছন্দে ভ্রমণের বিবরণ হতে অনুমেয় যে অবরোধ প্রথা বা ঘোমটার প্রচলনে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু কৃত্তিবাসের *রামায়ণে* সীতাকে চর্তুদোল কাপড় দিয়ে ঘেরা হয়েছিল।

সামাজিক আচার ও বিধি-নিষেধ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একদিকে পুরুষের বহুবিবাহ এবং অন্যদিকে নারীর সহমরণ প্রথা নারী-পুরুষের অধিকারের ক্ষেত্রে অসাম্য সৃষ্টি করে। কৌলীন্য প্রথায়

কুলরক্ষার অজুহাতে পুরুষের বহুবিবাহ স্বভাবতই সংসারে চরম অশান্তির জন্ম দেয়। মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যসাহিত্যে এ চিত্র স্পষ্টভাবেই কবিরা তুলে ধরেছেন। *চণ্ডীমঙ্গলে* ভাঁড়ুদত্ত, বণিক ধনপতি, তার পুত্র শ্রীমন্ত বা শ্রীপতি, *ধর্মমঙ্গলে* লাউসেন, এমনকি সংসার বৈরাগী শিবও একাধিক বিবাহ করেছেন। দেবতা থেকে সাধারণ পুরুষ সকলেই ছিলেন একাধিক নারীতে আসক্ত। *মনসামঙ্গল* কাব্যের প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব চাঁদ সওদাগর একাধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হলেও চরম সংকট মুহূর্তে মাত্র চারপণ কড়ির মধ্য থেকে একপণ কড়ি দিয়ে নটী বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কখনো বা মনসার মনোহারিণী রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানই হারিয়ে ফেলেছেন। পুরুষের এই অতিরিক্ত ভোগের ইচ্ছা সমাজে নানা বিশৃঙ্খলার জন্ম দিত। মঙ্গলকাব্যগুলির পৌরাণিক অংশে শিব-পার্বতীর দাম্পত্য কলহের মূল কারণ সপত্নী গঙ্গা, যাকে শিব পার্বতীর ভয়ে জটায় লুকিয়ে রাখেন। পার্বতী স্বামীর চরিত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই যুবতী মনসাকে কন্যা বলে প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাননি। দাম্পত্য কলহের এরূপ চিত্র কবিকঙ্কণের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের বণিকখণ্ডে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া *অন্নদামঙ্গল* এবং *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে বহুবিবাহের উল্লেখ আছে। এ জন্য সংসারে নিত্য অশান্তির চিত্র কবিগণ বর্ণনা করেছেন।

একদিকে পুরুষের বহুবিবাহ পদ্ধতি অন্যদিকে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর সহমরণ প্রথাও ছিল সমাজ দ্বারা নির্দেশিত। স্বামীর চিতায় জীবন্ত স্ত্রীর আত্মবিসর্জনকে সেই যুগে সতী-প্রথার মর্যাদায় ভূষিত করা হতো। এর পিছনে সমাজপতিদের এক ঘৃণ্য মনোবৃত্তি ছিল বলে আজ ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। *ধর্মমঙ্গল* ও *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে এ বর্বরোচিত প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের *মনসামঙ্গলের* দেবখণ্ডে বিষপানে শিবের মৃত্যুর পর তাঁর চিতায় দেবীচণ্ডীর সহমরণের চিত্র—

> 'ত্রিভুবনে হাহাকার মহেশ মোহনে।
> চন্দনের কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিল তখনে ॥
> হৈমবতী হুতাশনে করিতে প্রবেশ।
> পূর্বকথা মনে তার পড়িল বিশেষ'॥
> (কেতকাদাস : ১৯৪৯ ; পৃ : ৩)

হেমবতীকে অবশ্য সহমরণে যেতে হয়নি। তাঁকে রক্ষা করেছিলেন কন্যা মনসা।

ঘনরামের *ধর্মমঙ্গলে* কর্ণসেনের চারপুত্রের মৃত্যুতে পুত্রবধুদের অনুমৃতা হবার উল্লেখ আছে—'চিতানলে চারবধূ হইল অনুমৃতা'।

মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের খাদ্যাভাসের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় তাদের খাদ্য তালিকার মাধ্যমে। ভাঁড়ুদত্ত রাজাকে ভেট দিবার জন্য কাঁচকলা, পুঁইশাক, কদলীর মোচা, বেগুন, কচু ও মূলা নিল যা বাঙালির প্রিয় খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পড়ে। চৈতন্যদেব শাক ভালোবাসতেন। তাঁর মাতা বিংশতি প্রকাশ শাক রেধে ছেলেকে খাওয়াতেন। 'ভোজনে বসিয়া প্রভু শাক পাইয়া খুব খুশি হইলেন এবং অচ্যুতা, পটোল, হেলেঞ্চা প্রভৃতি শাকের মহিমা কীর্তন করিলেন'। (রমেশচন্দ্র মজুমদার ; ২০০৩ : পৃ. ৩০৩) ফল ও মিষ্টান্নের তালিকায় আছে বাঙালির অতি পরিচিত ও প্রিয় দেশজ ফল যেমন- আম, কাঁঠাল, নারকেল, তাল, কমলা, বাদাম, খেজুর এবং মিষ্টান্ন দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম হলো- ক্ষীর, ক্ষীরসা, লাড়ু অন্যতম।

তান্ত্রিক আচারের সঙ্গে বৈষ্ণবগণ মাছ ও মাংস আহার বর্জন করেন। সুতরাং বৈষ্ণব সাহিত্যে নিরামিষ ভোজ্য দ্রব্যেরই তালিকা পাওয়া যায়। নারায়ণ দেবের *পদ্মা-পুরাণে* বেহুলার বিয়ে উপলক্ষে রন্ধনের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। নিরামিষের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- শুক্তো, বিভিন্ন প্রকার শাক, বিভিন্ন প্রকার ডাল, নিরামিষ ব্যঞ্জন (একাধিক সবজি সহযোগে রান্না হয়) , অম্বল বা চাটনি।

মাছের ব্যঞ্জনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- চিতলের কোল ভাজা, মাগুর মাছের মরিচের ঝোল, শৌলের অম্বল, বোয়াল মাছের বাটি, ইলিশ মাছ ভাজা, ছোট মাছের বিভিন্ন ব্যঞ্জন। মাংসের মধ্যে অন্যতম- খাসি, হরিণ, কবুতর, কাউঠা। পিঠা পায়েস এর মধ্যে ছিল চন্দ্রপুলি, মনোহরা, নালবড়া, পাতপিঠা, খিরিসা।

মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা নানাবিধ পশুপাখির মাংস, মিষ্টান্ন এবং তাজা শুকনা ও কাবুলি ফল আচার খেতে পছন্দ করতেন। কিন্তু অধিকাংশের প্রধান খাবার ছিল ভাত। রুটিরও প্রচলন ছিল। দরিদ্রদের আহারের ব্যবস্থাও বর্ণিত হয়েছে- ব্যাধ কালকেতুর খাবারের তালিকায়- খুদ-জাউ, মুসুরির সুপ, আলু ও ওল পোড়া, কচু, করঞ্জা ও আমড়া যা প্রকৃতি থেকে আমদানিকৃত খাবার। কোনো কোনো দিন হরিণ বেঁচে দধির জোগাড় হতো। আবার যে দিন কোনো শিকার জুটত না এবং বাসী মাংস বিক্রি হতো না তখন ধার করে খুদ ও লবণ এনে বনাতি (নালিতা) শাকসহ খুদের জাউ দিয়ে উদর পূর্ণ হতো। পাত্রের অভাবে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে খাবার রেখে খেতো। উল্লেখ্য গরীব লোকেরা ভাত, লবণ, শাক এবং সামান্য তরকারির ঝোল খেতো। কদাচিৎ দধি ও সস্তা মিষ্টি। পান্তা ভাতের জল গরীবদের প্রিয় খাবার ছিল। নেশা জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল ভাঙ। সাধারণ জনগণের সাধ্যের মধ্যে ছিল বলে ভাঙ বা গাঁজার জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। এর পরিচয় মেলে *মঙ্গলকাব্যের* পাতায় পাতায়। প্রতীক পুরুষ মহাদেবও ছিলেন নেশাগ্রস্ত। সিদ্ধি এবং গাঁজার নেশায় বুঁদ শিব বিশ্ব সংসার ভুলে থাকেন।

মুখ সুদ্ধির উপকরণ হিসেবে তাম্বুল বা পান ছিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে। নারীরা সাজের উপকরণ হিসেবে (পানের রসে ঠোঁট রাঙাত) পান ব্যবহার করত। বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* কাব্যে সতীনারীর উপাখ্যান অংশে সতীনারী তাঁর অসুস্থ স্বামীকে 'কর্পুরবাসিত তাম্বুল গুয়া খাওয়ায়' (স্মৃতিকণা ; ২০১১ : পৃ. ৭৬) ধনপতি সদাগর রাত্রিকালীন আহারের পর পান খেতেন। তার পরিচয় পাই কবিকঙ্কণ এর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে—

ভোজন সঙ্কলি আচমন কুতূহলে।
কর্পূরতাম্বুল খায় হাসে খল খলে ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৬১)

সুন্দর সুস্থ পারিবারিব জীবনযাত্রায় পোশাক পরিচ্ছদের ভূমিকা অপরিহার্য। যা গার্হস্থ্যজীবন আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচ্য। সেকালের পুরুষেরা সাধারণত ধুতি ও চাদর এবং মহিলারা খালি গায়ে শাড়ি পড়তেন। মধ্যযুগে নারী-পুরুষ উভয়ে অলঙ্কার পরিধান করতেন। প্রসাধনীর মধ্যে অন্যতম ছিল চন্দন। স্নানের সময় মেয়েরা হলুদ কুমকুম দিয়ে গা এবং আমলকি দিয়ে কেশ ধৌত করতেন। পরে ধুপ দিয়ে চুল শুকাতেন এবং চন্দন দিয়ে দেহ লেপন করতেন। হিন্দু সধবারা শাঁখা, সিঁদুর ও কাজল ব্যবহার করতেন। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে উল্লেখিত বিভিন্ন ধারার সাহিত্যে বঙ্গ নর-নারীর বিভিন্ন প্রকার পোশাক, প্রসাধনী এবং অলঙ্কারের বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে।

গার্হস্থ্যজীবন চিত্র অঙ্কনে বাসস্থান নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচ্য। মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্যে এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের বাসস্থান বলতে ছিল কুঁড়ে ঘর। মাটি, বাঁশ, ছন, দিয়ে কাঠামো তৈরি হতো এবং ওপরে বা মাথায় থাকত খড় ও ছনের ছাউনি। ভ্যারেণ্ডার থাম দিয়ে ঘরের কাঠামো শক্ত করা হতো। আসবাব বলতে কাঁথা এবং মাদুর, বাসন কোসন বলতে মাটির পাত্র তাও সামান্য দু'চারটি। ঘর গৃহস্থালির এমনি চিত্র পাওয়া যায় *কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে* ফুল্লবার বারমাস্যায় যা বড়ো করুণ এবং স্বচ্ছ।

অবশ্য উচ্চবিত্ত সমাজের হর্ম্যপুরীর কথা কবিরা জানাতে ভোলেননি। সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি বর্ণনায় কবি বিপ্রদাস পিপিলাই লিখেছেন—

অভিনব সুরপুরী দেখি ঘর সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের বারা।
নানারত্ন অবিশাল জ্যোর্তিময় কাঁচ চাল,
গজ মুকতা প্রলম্ভিত ঝারা'॥
(বিপ্রদাস : ১৯৫৩ ; পৃ : ১৪২)

মধ্যযুগে যাতায়াত ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পালকি, গরু এবং ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন লক্ষ করার মতো। মধ্যযুগের বিভিন্ন কাহিনিকাব্যে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্য এবং বিভিন্ন প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্যে

হাতি ঘোড়ার যথেষ্ট ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁর *চণ্ডীমঙ্গলে* জানিয়েছেন, কালকেতু দেবীর কৃপায় যখন রাজা হলেন তখন তাঁর চড়ন পার্বত্য ঘোড়া এবং দ্বারে বাধা মত্ত হাতি। নারায়ণদেবের *মনসামঙ্গলে* রাজা চন্দ্রধর চৌদোলা চেপে নগরভ্রমণ করতেন। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গলে*-এ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন অংশে বলা হয়েছে—

হাবসী ইমামবক্স হাবসী প্রধান।
হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগান॥
(সনাতন : ২০১০ : পৃ : ১৪)

কবিকঙ্কণচণ্ডীর ধনপতি উপাখ্যানে গৌড়রাজ স্বয়ং ধনপতিকে—

চড়িবারে দিল মনোজবো নামে ঘোড়া।
(মুকুন্দরাম : ১৯৬৬ ; পৃ : ১১৫)

উচ্চবিত্ত সমাজে যানবাহন হিসেবে প্রধানত হাতি, ঘোড়া, আবার কখনো উট এর উল্লেখ আছে। জলপথে ভ্রমণ বাঙালিরা চিরকালই একটি উপভোগ্য ভ্রমণ হিসেবে মনে করে। নদী পথে শুধু অন্তর্বাণিজ্য এবং সমুদ্র পথে বহির্বাণিজ্যই নয়, সাধারণত যাতায়াতের ক্ষেত্রেও জলপথের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মঙ্গলকাব্যের পাতায় খেয়া পারাপার এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডিঙি ভাসানোর এবং বড় নৌকার বিবরণ পাওয়া যায়। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জলপথের গুরুত্ব ছিল বলেই মঙ্গলকাব্যের কবিরা বাণিজ্য যাত্রায় জলপথের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ডিঙা নির্মাণ এবং তরণী পূজার বর্ণনা আছে। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রায় কোথাও সপ্তডিঙার কোথাও বা চৌদ্দডিঙার ব্যাখ্যা আছে। ধনপতি সদাগরের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য।

কর্মব্যস্ত মানুষের ছকবাধা জীবনে রসসঞ্চার এবং শরীরকে গতিবেগ দেয়ার জন্য ক্রীড়া বা খেলাধূলা একান্ত প্রয়োজন এবং এটা আমাদের সংস্কৃতির একটি অঙ্গ হিসেবেও গণ্য। মধ্যযুগেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি তাই সমাজের উচ্চস্তর হতে নিম্নস্তর সর্বত্রই অবকাশ যাপনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে খেলাধূলার গুরুত্ব সকলেই অনুধাবন করেন। আলাওলের পদ্মাবতীতে চৌগান খেলার উল্লেখ আছে। বিবাহানুষ্ঠানে বর কনে মিলে পাশা খেলার রীতি ছিল। মধ্যযুগে রাজপরিবারের অশ্বচালনা অত্যাবশ্যক ছিল এবং রাজপুত্রের অশ্বচালনায় পারদর্শিতা অর্জন অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হতো।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে চাঁচরী খেলার উল্লেখ আছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গলের* ধনপতি উপাখ্যানে বার বার পাশা খেলার প্রসঙ্গ আছে। কখনও ধনপতি স্ত্রী খুল্লনার সাথে পাশা খেলায় মত্ত, কখনো বা কার্যোপলক্ষে গৌড়দেশে গিয়েও ধনপতি পাশা খেলেছেন। এজন্য ধনপতি স্বপ্নে দেবী চণ্ডী কর্তৃক তিরস্কৃতও হয়েছেন—

পাশার গোঁয়াও দিন মর্যাদা করিলে হীন
কৈলে নিজ কুলের কলঙ্ক।
(মুকুন্দরাম : ১৯৬৬ ; পৃ : ২৬৭)

সেকালে আখড়া ঘরে মল্লযুদ্ধের বা কুস্তির বৈঠক হতো। ঘনরামের *ধর্মমঙ্গলে* মল্ল যুদ্ধ বা কুস্তির বিবরণ আছে। দৈহিক শক্তির দৃষ্টান্ত স্বরূপ লোহার বাঁটুল চূর্ণ করা, বুকে বেলভাঙা, হাতের মুঠোয় সরিষা টিপে তেল বের করা, উর্ধ্বে তরবারি নিক্ষেপ পুনরায় মুঠোর মধ্যে উক্ত তরবারি ধরা এ সবের বিস্তারিত বর্ণনা অভিসন্দর্ভে ব্যাখ্যাত হয়েছে। পাশা খেলার মতো জুয়া খেলার প্রচলনও ছিল ব্যাপক। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে জুয়াড়ির অভাব ছিল না। বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গলে* রাখাল বাড়ির পূজা অংশে মহাদেব স্বয়ং কন্যা মনসার পূজা প্রচারের জন্য ব্রাহ্মণ বেশ ধরেন এবং দেখেন—

সকল রাখালে মিলি খেলায় জুয়াখেলা।
মাথায় ঘট লইয়া বিপ্র সেইখানে গেলা ॥
সকলে খেলায় খেলা যত রাখাল গণ।

কেহ হারে কেহ জিতে খেলার লক্ষণ' ॥
(বিজয়গুপ্ত ; ২০১১ : পৃ : ৪৪)

মনসামঙ্গল কাব্যের টেটনের ঘাট অংশে ও আমরা দেখি টেটন জুয়াখেলা করে সর্বহারা হয়েছে–

খাইতে নাহিক অন্ন পরিতে বসন
জাতি মালাকার আমি স্বভাবে টেটন ॥
শিশুকাল হইতে খলের সনে খেলা।
বাপের ধন হারাইলাম করি জুয়াখেলা'॥
(বিজয়গুপ্ত ; ২০১১ : পৃ : ৪৪)

মধ্যযুগে নৃত্যগীতের খুব প্রচলন ছিল। চৈতন্য–ভাগবতে রামায়ণের কাহিনি ও কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে যাত্রা অভিনয়ের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রেরও উল্লেখ আছে শঙ্খ, ঘণ্টা, ডম্ফ, মৃদঙ্গ, জগঝম্প, ডমরু ও বিষাণ। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল পাঁচালি গান। *মনসামঙ্গল*, *চণ্ডীমঙ্গল*, *ধর্মমঙ্গল* প্রায় প্রতিটি প্রধান মঙ্গলকাব্যেই অভিশাপগ্রস্তরা দেবলোকের শিল্পী। নৃত্যগীতের ছন্দপতনজনিত সামান্য ত্রুটির কারণেই অভিশাপগ্রস্ত হয়ে তাঁদের মর্ত্যলোকে আগমন। সুতরাং ধরে নেয়া যায় মধ্যযুগের অভিজাত সমাজে আমোদ প্রমোদের বিশিষ্ট উপকরণ হিসেবে সেকালে সংগীত নৃত্যাদি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গলে* এ বিষয়ের বাস্তব উপস্থাপনা আছে কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন অংশে—

কালোয়ত গায়ন বিশ্রাম খাঁ প্রভৃতি।
মৃদঙ্গী সমজ খেল কিন্নর আকৃতি ॥
নর্তন প্রধান শের মামুদ সভায়'॥
(সনাতন : ২০১০ ; পৃ : ১৪)

মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান চরিত্র হিন্দুধর্মের সতীত্বের প্রতীক স্বয়ং বেহুলাও তাঁর মৃত স্বামী লখিন্দরকে ফিরিয়ে এনেছিল নৃত্যগীত প্রদর্শের মাধ্যমে।

বিস্তারিত আলোচনায় মধ্যযুগের কালপরিসরে বাংলার আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি চিত্র উপস্থাপিত হলো। এখানে বিত্তশালী, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত সমাজের প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়। তবুও বলতে দ্বিধা নেই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের জনজীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। মারাঠাদের বার বার আক্রমণের কারণে অর্থাভাব ও অন্নাভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। চারিদিকে শুধু নিপীড়িত– নির্যাতিত হৃদয়ের শ্বাস এবং অন্নাভাবের হাহাকার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। একদিকে পলাশির যুদ্ধ এবং অন্যদিকে ১৭৭০ অর্থাৎ ১১৭৬–এর মন্বন্তর বাংলার সাধারণ জনজীবন বিশেষ করে কৃষিভিত্তিক সমাজকে করেছিল বিপর্যস্ত। অর্থাভাব ও অনাহারে ঘরে ঘরে হাহাকার ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় রামপ্রসাদ সেনের গান মানুষের মুক্তির আশ্রয় হয়েছিল। সমাজ মানসের এহেন সকরুণ চিত্র বিধৃত হয়েছে ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে–

যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান'॥
(ভারতচন্দ্রে : ১৪০৪ ; পৃ : ৮১)

সে সময়ে সাধারণ মানুষের জীবনে অন্নের চেয়ে প্রিয় বস্তু বোধ হয় আর কিছুই ছিল না। আর এ কারণেই খেয়া ঘাটের ঈশ্বরী পাটুনি দেবী অন্নদার কাছে মণি নয়, মুক্তো নয়, হীরা নয়, জহরত নয় কিংবা সপ্ত ডিঙা নয় প্রাপ্তির জন্য শুধুই আবেদন জানিয়েছেন একটি তুচ্ছ অনুনয়—

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।
(ভারতচন্দ্র : ১৪০৪ ; পৃ : ১৮২)

তথ্যনির্দেশ

অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় (২০০১) *ভারতের ইতিহাস*, (প্রাচীন যুগ হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) পুনঃমুদ্রণ, মৌলিক লাইব্রেরি, কলিকাতা-৭৩

আবদুল করিম (জানুয়ারি ১৯৯৯) *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশন, ঢাকা

আশফাক হোসেন (জুলাই ২০১৮) *বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা*, (প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ১৯৭১) পুনর্মুদ্রণ, জে. কে. প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা

আহমদ শরীফ (নভেম্বর ২০০৮) *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (১ম খণ্ড),পুনর্মুদ্রণ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

এম এ রহিম (মার্চ ১৯৮২) *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

গোপাল হালদার (এপ্রিল ১৯৭৪) *সংস্কৃতির রূপান্তর*, প্রথম সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা

গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯) *বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নীহাররঞ্জন রায় (মাঘ ১৪১৪) *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, ষষ্ঠ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৭৩

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত (১৪০৪) *ভারতচন্দ্র রচনাবলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত (১৯৬৬) মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মুহম্মদ আবদুল জলিল (জানুয়ারি ১৯৯৬) *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ফাল্গুন ১৩৭১) *বাংলা সাহিত্যের কথা*, (২য় খণ্ড, মধ্যযুগ) প্রথম সংস্করণ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা,

যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত (১৯৪৯) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ *মনসামঙ্গল* (১ম খণ্ড)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রমেশ চন্দ্র মজুমদার (জানুয়ারি ২০০৩) *বাংলাদেশের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ) ষষ্ঠ সংস্করণ, জেনারেল প্রিন্টার্স য়াণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা-১৩

রাজেন্দ্রকুমার গুপ্ত সঙ্কলিত (২০১১) বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল,* রাজেন্দ্র লাইব্রেরি, কলিকাতা–০১

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত (১৯৭৪) কবি মুকুন্দরাম বিরচিত কবিকঙ্কণ–চণ্ডী প্রথম ভাগ, পুর্নমুদ্রণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সনাতন গোস্বামী (এপ্রিল ২০১০) ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* প্রথম খণ্ড, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলিকাতা–০৯

সুকুমার সেন সম্পাদিত (১৯৫৩) বিপ্রদাস পিপিলাই *মনসাবিজয়,* এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা

সুকুমার সেন সম্পাদিত (২০০৭) কবি মুকুন্দরাম বিরচিত *চণ্ডীমঙ্গল,* সাহিত্য অকাডেমি, পঞ্চম মুদ্রণ, কলিকাতা

সুখময় মুখোপাধ্যায় (এপ্রিল ২০০০) *বাংলার ইতিহাস,* (১২০৪–১৫৭৬), খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কো. ঢাকা

সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত (১৯৫২) দ্বিজ মাধবের *মঙ্গলচণ্ডীর গীত,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সুশীল চৌধুরী (এপ্রিল ২০১৮) *নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ,* ষষ্ঠ মুদ্রণ, আনন্দ পালিশার্স, কলিকাতা–০৯

স্মৃতিকণা চক্রবর্তী *মঙ্গলকাব্য পুচ্ছগ্রাহিতা ও মৌলিকতা,* প্রথম প্রকাশ, জে. এন. ঘোষ এণ্ড সন্স, কলিকাতা–৭৩

Haig Wolseley, *Cambridge History of India*(vol. iv)-chapter-viii, Aurangzib-by Jadunath Sarkar. 1957

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লৌকিক প্রণয়কাব্য : বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কৃত হওয়ার পর প্রায় দুশো থেকে আড়াইশো বছর বাংলা সাহিত্য নিষ্ফলাই ছিল বলা যায়। এ সময়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো সাহিত্য রচিত হয়নি। অন্তত চতুর্দশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিক পর্যন্ত কোনো গ্রন্থের পরিচয়ই মেলেনি। তুর্কি আক্রমণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে বাংলার রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় চরম পর্যায়ে পৌঁছায়, এ ক্রান্তিলগ্নে বিপর্যস্ত বাঙালির পক্ষে সাহিত্যচর্চা সম্ভব ছিল না। আর যদি বা কিছু রচিত হয়েও থাকে তবে সেগুলো লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তুর্কি আক্রমণের ব্যাপক নৈরাজ্য, উৎপীড়ন, অত্যাচার, উপদ্রবের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা ব্যাহত হয়। তুর্কিরা যে শুধু রাজ্য জয় করেই সন্তুষ্ট ছিলেন তা কিন্তু নয়। তারা বাঙালির ধর্ম ও সমাজ জীবনে গুরুতর আঘাত হেনেছিলেন। হিন্দুদের মন্দির ও বৌদ্ধদের বিহারে ব্যাপক ধ্বংস অভিযান চালিয়েছিলেন। যা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্তরায় বলে মনে করা হয়। তারা মঠ-মন্দিরে রক্ষিত গ্রন্থাবলি বিনষ্ট করেছিলেন ফলে চর্যাপদের পর বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। অতঃপর খিলজি শাসনের অবসানের পর বাংলার ক্ষমতায় এসে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮খ্রি.) স্বাধীন শাসনধারার পত্তন করলে জনজীবনে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে আসে। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহ (১৩৫৮-১৩৯০/৯১)। কথিত আছে সিকান্দর শাহের শেষ জীবন সুখের হয়নি। সিকান্দর শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ 'বিমাতার ষড়যন্ত্রে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে সিকান্দর শাহ পরাজিত ও নিহত হন'। (আশফাক ; ২০১৮ : পৃ : ২৩৭) এরপর সিংহাসনে আরোহণ করেন গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ। গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের সময়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ইলিয়াস শাহী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থাও বেশ সমৃদ্ধশালী ছিল। ইবনে বতুতা ও চীনা লেখকদের বিবরণ থেকে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে জানা যায়। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য দেখে বিদেশী পর্যটক ও বণিকগণ বিস্ময় প্রকাশ করতেন। এ সময়ে বড়ু চণ্ডীদাস *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যটি রচনা করেন। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যটি বহুল জনপ্রিয় একটি কাব্য। বিষয়বস্তুর দিক থেকে জয়দেবের পরবর্তী রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বাংলা কাব্য রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে পুরাণের কৃষ্ণকাহিনি লোকজীবনের রসে সিক্ত হয়ে ধীরে ধীরে গ্রামীণ জীবন রসধারার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। আর এ কারণেই বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে আধ্যাত্মিক আদর্শ অপেক্ষা নরনারীর জৈবিক তৃষ্ণা, কামনা-বাসনা ও লালসাবৃত্তিই প্রাধান্য পেয়েছে। মানবিক আবেদনের দিকটিতেও কাব্যটি বিশিষ্টতার পরিচয় বহন করে। বাংলা ১৩১৬ সালে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থের গোয়াল ঘরের মাচার ওপর ধামাভরা একরাশ পুথির মধ্য হতে এ গ্রন্থটি আবিষ্কার করেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে পুথিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। পুথিটির প্রথম, মধ্য এবং শেষের কিছু অংশ পাওয়া যায়নি। ফলে কাব্যের নাম ও কবি-পরিচিতি অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। উল্লেখ্য, পুথির মধ্যে একটি চিরকুট পাওয়া যায় যেখানে কাব্যটির নাম শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ বলে উল্লেখ ছিল। এতদ্বসত্ত্বেও আবিষ্কারকের দেয়া *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* নামটিই সর্বাধিক প্রচলিত এবং গ্রহণযোগ্য। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যটি রাধা কৃষ্ণের প্রণয়লীলা নিয়ে রচিত। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের প্রধান চরিত্র তিনটি রাধা, কৃষ্ণ এবং বড়াই। বড়ুচণ্ডীদাস অমার্জিত রুচি এবং গ্রাম্য কবি হিসেবে স্বীকৃত হলেও তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* দ্বারা যে অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাধা-কৃষ্ণলীলার যে কাহিনি তিনি অবলম্বন করেছেন তা পৌরাণিক কাহিনি থেকে বিচ্ছিন্ন। তাঁর রাধা ও কৃষ্ণ লক্ষ্মী ও নারায়ণের অবতার রূপে পূজিত হলেও গোড়ার দিকে তাঁদের প্রেমকাহিনি কোনো উন্নত ভাবাদর্শ অনুসরণ করেনি বরং তাঁদের প্রেম অনেকটা গ্রাম্য তরুণ-তরুণীর রুচি বিগর্হিত লালসা ও বিকৃত মানসিকতায় পর্যবসিত হতে দেখা গেছে। কৃষ্ণ আইহন-পত্নী একাদশ বছরের বালিকা রাধার রূপ লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর প্রণয়

প্রার্থী হয়েছেন এবং প্রথম দিকে অপরিণত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক রাধার আপত্তি এবং অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও ছলে-বলে-কৌশলে জোর করে একজন গ্রাম্য লম্পট প্রেমিকের ন্যায় রাধাকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে মিলনের নানা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করেছেন। এখানে বড়াই কৃষ্ণের দূতী হিসেবে কাজ করেছেন। এ প্রণয়লীলা বিস্তারে কৃষ্ণ নিজের পেশিশক্তি এবং ঐশীশক্তির আস্ফালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে গোপাল হালদারের মন্তব্য-'শ্রীকৃষ্ণ যতই আপনার দেবত্বের বড়াই করুন না কেন তিনি একজন ধূর্ত ও গ্রাম্য লম্পট ছাড়া আর কিছুই নন'। (গোপাল হালদার ; ১৯৮৬ : পৃ : ৪৯) আর অনভিজ্ঞ বালিকা রাধা একটার পর একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে নিজের অজান্তেই কখন বিকশিত করে শেষ পর্যন্ত অন্তরের প্রেম-পরিপুষ্টা, প্রেম-মথিতা নারীরূপে উপস্থাপন করেছেন তা তিনি বুঝতেই পারেননি। আর বড়াই কুটনি রূপেই রাধা ও কৃষ্ণের মাঝখানে থেকেছেন। কিন্তু চৈতন্যেদেবের পর কৃষ্ণ-চরিত্র আর এভাবে অঙ্কন করা সম্ভব হয়নি, সহস্র কপটতার মধ্যেও তখন তিনি পরম প্রেমিক, মধুর লীলাবিলাসী শ্যামরায়। গোপাল হালদারের মন্তব্য-'আসলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যতম প্রধান সার্থকতা এই যে, শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বড়ুচণ্ডীদাসের গান নয়। কি রাধা, কি কৃষ্ণ, কেউ এখানে আধ্যাত্মিক বিগ্রহ মাত্র নন; একটু স্থূল হলেও তাঁরা রক্তে মাংসে গড়া মানুষেরই প্রতিনিধি। জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক নয়, বরং সেদিনের প্রাকৃত জীবনে যে শত শত লম্পটের প্রণয়-জাল বিস্তার ও প্রণয় বিলাস কবি প্রত্যক্ষ করে থাকবেন, আর যেমন দেখে থাকবেন বহু বহু সরলা গ্রাম্যবধূর প্রণয়-প্রবঞ্চিত জীবনের দুর্দশা ও বেদনা, অতি সহজ ভাবে বড়ু চণ্ডীদাস তা চিত্রিত করেছেন। আর তাতে এ কাব্য দেবলীলার কাব্য না হয়ে মানবলীলার কাব্য হয়ে উঠেছে'। (গোপাল হালদার ; ১৯৮৬ : পৃ : ৪৯-৫০) এখানে মানব হৃদয়ের আর্তিই বেশি প্রকাশিত হয়েছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যটি তেরটি খণ্ডে বিভক্ত। কৃষ্ণের পূর্বরাগ থেকে আরম্ভ করে প্রেম প্রত্যাশী কৃষ্ণের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম, রাধাকে ভোগ, অতঃপর রাধাকে বিরহের অগ্নিতে নিক্ষেপ করে মথুরা গমন সবই এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ লৌকিক। গ্রাম্যজীবনের কাহিনির ওপর ভিত্তি করে এ কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* রাধা বিরহ খণ্ডের সমাপ্তিতে যেখানে কৃষ্ণতে আত্মসমর্পণ করেছেন সেখানেও তাঁর দেহের আকুতি প্রেমকে দেবত্ব বর্জন করে এক অনাবিল মানবীয় সৌরভ দান করেছে।

জন্মখণ্ডে রাধা ও কৃষ্ণের জন্ম কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কংসের অত্যাচারে মথুরাবাসী যখন ভীত, সন্ত্রস্ত এবং ক্ষুব্ধ তখন কংসাসুরকে বধ করার জন্য দেবলোকে দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে—

ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে।
এহি দুই কেশ হৈবে বসুলের ঘরে।
হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ৩৩)

স্পষ্টতই কংসের অত্যাচার, অবিচার থেকে ধরিত্রীর মনুষ্যসমাজকে রক্ষা করার জন্য ভগবান নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপে দৈবকীর গর্ভে আর এ ধূলি ধূসরিত মর্ত্যলোকে কৃষ্ণের সহচরীরূপে মর্ত্যলীলা সাঙ্গের জন্য রাধারূপে জন্ম নিলেন বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীদেবী। দৈবের অমোঘ বিধানে শ্রীমতী রাধার বিয়ে হয় নপুংসক আইহনের সঙ্গে। পৌরাণিক কাহিনি দিয়ে কাব্যটি শুরু হলেও জন্মখণ্ডে লৌকিক জীবন তথা গার্হস্থ্যজীবনের চিত্র বেশি প্রত্যক্ষ করা যায়। গার্হস্থ্যজীবনের সুবিস্তৃত বর্ণনা না থাকলেও ঘটনাটি কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রথমে অত্যাচারী রাজা কংসের পরিবার, তার সাথে যুক্ত আছে বোন ও ভগ্নিপতি দৈবকী এবং বসুদেব। দৈববাণী হয়েছিল দৈবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানের হাতে কংস নিধন হবে আর এজন্যই কংস তার বোনকে কারাগারে বন্দি রাখেন। কংস দৈবকীর গর্ভজাত পর পর ছয়টি সন্তানকে হত্যা করেন। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দেবতার সহায়তায় বসুদেব দৈবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান শ্রীকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নন্দ গোপের ঘরে তাকে রেখে যশোদার সদ্য প্রসবজাত কন্যা সন্তানকে দৈবকীর কোলে দিলেন। কংস খবর পেয়ে ঐ কন্যা সন্তানকে শিলাপাটে আছড়ে হত্যা করলেন। শিশুটি শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বলে গেল 'তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'। এখানে

নন্দরাজের পরিবারেরও বর্ণনা আছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে আমরা কৃষ্ণের চরিত্রের যে বিবর্তন প্রত্যক্ষ করি সেখানে কৃষ্ণের ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত, গোপবালক কৃষ্ণ প্রেমে তন্ময়। প্রত্যেক মা তার সন্তানের রূপ-মাধুর্যে মুগ্ধ। কিন্তু কৃষ্ণের পালক-মা যশোদা একটু বেশি অশ্রুমতী। সন্তানের হাসি, তার অঙ্গভঙ্গি মাকে আকৃষ্ট করে বেশি। প্রত্যেক মা সন্তানের মঙ্গল কামনায় পাড়া-পড়শির আশীর্বাদ কামনা করেন। মা যশোদাও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। সন্তান চিরজীবী হওয়ার জন্য তিনি সকলকে ডেকে তাঁর সন্তানের আশিস কামনা করেন। এ আর্তি শুধু মা যশোদার নয় পৃথিবীর সকল মায়ের, মাতৃত্বে কোনো পার্থক্য থাকে না। সন্তানের মঙ্গল কামনা ব্রত পৃথিবীর সকল মা যুগ যুগ ধরে করে আসছেন। যশোদা তাঁর মাতৃত্বের সমস্ত আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা উজাড় করে শ্রীকৃষ্ণকে বড় করেছিলেন। শুধু আবেগ নয়, বাংলার মা যশোদা অশ্রুমতী। নয়নের মণি মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল হলেই, যশোদার মন উদ্বিগ্ন হয় এবং চোখ জলে ঝাপসা হয়ে যায়। পুত্র গোচারণে গেলে মায়ের চিন্তার অন্ত থাকে না। গোয়ালাদের পেশাই ছিল গোচারণ এবং দধি-দুধ বিক্রি করা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও গরু চরাতেন কাব্যে এর উল্লেখ আছে। রাখালরাজ হিসেবে কৃষ্ণ পরিচিত ছিলেন। কৃষ্ণ গোচারণে গেলে যশোদা থাকতেন সারাক্ষণ শঙ্কিত। গোচারণ থেকে কৃষ্ণ যখন বাড়িতে ফিরে আসতেন তখন মায়ের মুখচ্ছবি আনন্দে, আবেগে ও স্বস্তিতে উজ্জ্বল হতো।

বাঙালি কবির কলমে আঁকা যশোমতীর বাৎসল্য কিছুটা আতিশয্যে পূর্ণ হলেও এটাই বাঙালি মায়ের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। বাঙালি মায়েরা অত্যন্ত স্নেহকাতর যশোদাও এর ব্যতিক্রম নন। যশোদার মধ্যদিয়ে বাঙালি কবি বড়ু চণ্ডীদাস আবহমান বাঙালি মায়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন। সন্তানকে স্নেহাঞ্চলে বেধে রাখাই প্রতিটি মায়ের স্বভাব। সাগর গোয়ালা ও পদ্মার পরিবারের বিবরণও জন্মখণ্ডেই পরিলক্ষিত হয়। এদেরও কৌলিক ব্যবসা গোয়ালাবৃত্তি। সাগর ও পদ্মার কোল আলো করে জন্ম নিলেন রাধা। অপূর্ব রূপ লাবণ্য নিয়ে মর্ত্যলোকে এলেন রাধা—

তীনভুবনজনমোহিনী।
রতিরসকামদোহিনী॥
... ...
দিনে দিন বাঢ়ে তনু লীলা।
পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ৩৭)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কবি 'রাধার রূপ বর্ণনা করেছেন একান্ত পার্থিব ভোগের দৃষ্টি নিয়ে ; এখানে তিনি কোনো অতীন্দ্রিয় সুন্দরের অনুসন্ধান করেননি, অথবা অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য দিয়ে রাধা-অঙ্গ গড়ে উঠেছে, তারও কোনো ইঙ্গিত দেননি ; পূর্ণবিকশিত নারী-দেহ যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে পুরুষের কামনায় আঘাত করে, সে বলিষ্ঠ নিপুণ হাতে তিনি এঁকেছেন রাধা চরিত্র'। (অরবিন্দ ; ২০০৫ : পৃ : ১১৮) দৈব নির্দেশে নপুংসক আইহনের সাথে রাধার বিয়ে হয়। ঠিক কত বছর বয়সে রাধার বিয়ে হয়েছে তার উল্লেখ কাব্যে না থাকলেও রাধার অপরিণত যৌবন এবং তাঁর মুখনিশ্রিত বাণী থেকে বোঝা যায় নাবালিকা অবস্থায় রাধার বিয়ে হয়। এ থেকে তৎকালীন সমাজে বাল্যবিবাহের একটি চিত্র পরিলক্ষিত হয়। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে রাধার অলৌকিক প্রণয়-বেদনার সবটুকুই কিন্তু ব্যক্তিগত নয়, এ যেন আবহমান বাঙালি সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। যা বাংলার বাঙালি সমাজ তথা ভাগীরথীর তীরবর্তী অশিক্ষিত গোপ-পল্লীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক দুর্নীতি-পীড়িত ট্রাজেডির এক বাস্তব প্রতিবিম্ব। বাল্য-বিবাহ গ্রামীণ বাংলার সর্বস্তরে দীর্ঘদিন তথা বর্তমানেও কুপ্রথা হিসেবে প্রচলিত আছে। নারী-পুরুষের বয়োগত পার্থক্য স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা যা দাম্পত্যজীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। তৎকালে এমনকি বর্তমানকালেও সমাজে মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্যায়ন করা হয় না। পুরুষের নব-যৌবন অনেক সময়ে নির্মম লালসার আকারে অজ্ঞাত কিশোরীর নারীসত্তা উন্মোচনে হয়ে উঠত প্রমত্ত। বিশেষ করে অশিক্ষিত, অমার্জিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে এ ঘটনা খুব বিরল ছিল না। অস্বাভিক পীড়ন এবং তাড়নায় কিশোরীর নারীত্ব হয়েছে উৎক্ষিপ্ত, ততদিনে পুরুষের অনৈসর্গিক আকাঙ্ক্ষা হয়েছে বিমুখ। অকাল-বোধিত নারী-চিত্তে তখন অতৃপ্তি, বুভুক্ষা

এবং আক্রোশ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সামাজিক শৃঙ্খলার এ চিত্র প্রীতিপ্রদ নয়, তবুও ইতিহাসে এ চিত্র অস্বীকার করার উপায় নেই। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য এবং মধ্যযুগের অপরাপর অনেক সাহিত্যে এ ধরনের নীতি বিগর্হিত জীবন-চিত্রের বর্ণনা প্রচুর পরিলক্ষিত হয়। রাধার জীবনেও এ ঘটনা বিরল নয়। রাধার রূপ-লাবণ্যে আইহন শঙ্কিত। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, 'জয়দেবের কামনিপুণা রাধা বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা-ভাবনায় সংগোপনে ক্রিয়াশীল ছিল। তাই সনাতন গ্রামীণ সংস্কৃতির আঁচল গায়ে জড়িয়েও বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা বয়ঃসন্ধিতে হয়ে ওঠে কামসচেতন'- (বিশ্বজিৎ ঘোষ ; ২০১১ : পৃ : ২৩)

শিরীষকুসুমকোঁঅলী।
অদভুত কনকপুতলী॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তনু লীলা।
পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা॥
দৈবেঁ কৈল কাহ্নু মনে জাণী।
নপুংশক আইহনের রাণী॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ৩৭)

দুর্ভাগ্যবশত রাধা নপুংসক আইহনের ঘরনি। এখানেই সমগ্র চরিত্রটির মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের সম্ভাবনা নিহিত। রাধার রূপ যৌবন সম্বন্ধে আইহনের তীক্ষ্ণদৃষ্টিশক্তি এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা লক্ষণীয়। তাছাড়া রাধাকে পরিতৃপ্ত করার ক্ষমতা আইহনের ছিল না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই আইহনের মনে দেখা দেয় ভয় এবং চরম শঙ্কা আর এজন্য আইহন তার মাকে বলে রাধার দিদিমা শ্রেণির একজন নারীকে (বড়াইকে) নিযুক্ত করেন রাধাকে দেখাশোনা করার জন্য। নপুংসক আইহন দায়িত্ব পালনে কোনো রকম অবহেলা করেননি। অনিন্দ্য সুন্দরী প্রেয়সীকে নিয়ে তার শঙ্কা যেমন ছিল ঠিকই তেমনি ছিল ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ। আইহনের শঙ্কা কবির ভাষায়—

দেখি রাধার রূপ যৌবনে।
মাঅক বুয়িল আইহনে॥
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ৩৭)

উদ্ধৃতাংশে স্পষ্টতই দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথমত সেকালে নারীকে কেবল দেহকামনার উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হতো, দ্বিতীয়ত দেহকামনা চরিতার্থের জন্য নারী পরপুরুষের কাছে যেত আর এজন্যই 'পাহারা বসিয়ে তাকে ঘরে রাখার প্রয়াস নেওয়া হতো। দুটো প্রসঙ্গই সেকালের নারীর জন্য চরম অপমানকর। নারীকে দেহকামনার ঊর্ধ্বে উঠিয়ে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে ভাবতে চাননি সেকালের মানুষ, কিংবা সেকালের কবি বড়ু চণ্ডীদাস। সেকালে নারীর প্রেমকে দেহকামনার সমার্থক বলেই বিবেচনা করা হতো। তাই যেসব নারীচরিত্র নির্মিত হতো, তারা সবাই হতো দেহসচেতন কিংবা বলি কাম-সচেতন। সামাজিকের এই ভাবনা নারীর আত্মবিকাশ ও চিত্তপ্রকাশের পথে সৃষ্টি করত প্রবল অন্তরায়'। (বিশ্বজিৎ ঘোষ ; ২০১১ : পৃ : ২৩-২৪)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা প্রখর ব্যক্তিত্ব ও আত্মস্বাতন্ত্র্যময়ী মর্ত্যমানবী ও ক্রমবিবর্তনমুখী। আইহন পত্নী রাধা 'কুলবালা-কুলেরবধূ রাধা! শাশুড়ি, ননদীর শ্যেনদৃষ্টি অশেষ লাঞ্ছনা নিয়ে চায় সামাজিক বিধি-নিয়মের কঠিন নিগড়ে তাঁর নারী প্রাণকে বেঁধে রাখতে'। (ভূদেব ; ২০০৯: পৃ : ১২৮) তাইতো তাম্বুল খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত কর্পূর-বাসিত তাম্বুল, চাঁপা নাগেশ্বর ফুলের মালা এবং মিষ্টি নিয়ে বড়াই যখন কোনো এক শুভলগ্নে দেবতাদের স্মরণ করে ঐ সমস্ত প্রেম-উপহার নিয়ে রাধার নিকট উপস্থিত হন তখন রাধা ঐ প্রেম উপহার প্রত্যাখান করেছেন। প্রত্যুত্তরে রাধা বলেছেন—

ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল

তা সমে কি মোর নেহা॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ৪২)

বাঙালি কুলবধূগণ তার স্বামীকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন। যদিও মধ্যযুগের অনেক কাব্যে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে নারীগণকে পতিনিন্দা করতে দেখা গেছে। তবে স্বামী সম্পর্কে রাধার এ উচ্চ ধারণা বাঙালি কুলনারীদের আরও বেশি স্বামী অন্তপ্রাণ হতে উদ্বুদ্ধ করে। পর-পুরুষ কর্তৃক প্রেরিত প্রেম-উপহার পাওয়ার পর একজন বাঙালি গৃহবধূর যে প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত রাধা সেই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু এ রাধা ছিলেন দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই অপরিপক্ব। এ সময় প্রেমের তাৎপর্য রাধার কাছে ছিল অজ্ঞাত। তখন রাধা ছিলেন শুধুই কুলবধূ, প্রেম-পরিপূর্ণা নন। তাঁর কাছে তখন স্বামী সংসার সব। দাম্পত্যজীবন কী সে জ্ঞান তখনও রাধার হয়নি। আর যখন রাধা এটা বুঝতে পেরেছেন তখন থেকেই তিনি ধীরে ধীরে আইহন বিমুখ হয়েছেন। কারণ নপুংসক আইহনের ক্ষমতা ছিল না রাধাকে দাম্পত্য সুখ প্রদান করা। ফলে রাধা হয়েছেন কৃষ্ণ-প্রেমে ব্যাকুল। আর ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হয়েছে আইহন পরিবারের গৃহগত সুখও শান্তি। যদিও অপরিণত রাধা ঐ সময় তার মাতা-পিতা ও স্বামীর বংশ মর্যাদা নিয়েও ছিলেন গর্বে গর্বিত—

বড়ার বহুআরী আক্ষে বড়ার ঝী।
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ৪৯)

পিতৃবংশ এবং পতিকুল নিয়ে রাধার আত্মসম্মানবোধ দৃঢ় এবং প্রখর, তাই রাধা কৃষ্ণের কামাচারকে লাম্পট্য ও হ্যাংলা মনে করে চরম ঘৃণাভরে কৃষ্ণ প্রেরিত প্রেম-উপহার ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। এমনকি ক্রোধান্বিত হয়ে রাধা বড়াইকে প্রহার পর্যন্ত করেছেন। একজন বাঙালি কুলবধূর যা করা উচিত রাধা তাই করেছেন এবং বড়াইকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ঘরে তার সুদর্শন স্বামী আছেন, নন্দের ঘরের গরু রাখোয়ালের সাথে তার কীসের সম্পর্ক? নন্দপুত্র কৃষ্ণের প্রেম রাধা ঘৃণা করেন।

যেহেতু কবি এখানে রাধাকে বাঙালি কুলবধূ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন ফলে বাঙালি সংস্কৃতি ও সভ্যতা দিয়ে তার মানস গঠিত হয়েছে বলেই তিনি কৃষ্ণ প্রেম প্রত্যাখান করেন। বড়াই কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বোঝাতে থাকেন, কৃষ্ণকে তুষ্ট করলে পরকালে কী পুরস্কার পাবেন তা ব্যাখ্যা করেন রাধাকে। বড়াই এও বলেন কৃষ্ণকে তুষ্ট করলে রাধা বিষ্ণুপুরে যেতে পারবেন। এ কথার প্রত্যুত্তরে রাধা বলেন—

ধিক জাউ নারীর জীবন
দহেঁ পসূ তার পতী।
পর পুরুষের নেহাএঁ যাহার
বিষ্ণুপুরে হএ স্থিতী॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ৪২)

রাধা সেই নারীকে ঘৃণা করেন এবং ধিক্কার জানান যে-নারী নিজের স্বামী ঘরে রেখে পর-পুরুষের সাথে কেলি করে বিষ্ণুলোকে যাওয়ার জন্য। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* রাধা আমাদের সমাজ-সংসারেরই অতি আপন একজন। সাধারণ মানুষের মতো সমাজ-সংসারে তিনি প্রতিষ্ঠাতা, জৈবিক কামনা-বাসনায় তিনি আপ্লুতা, কুলহারানোর ভয়ে কম্পিতা, ভয়, লাজ-লজ্জা, ক্রোধ, মান-অভিমান সব কিছুতেই সমাজের অতি পরিচিত জনের একজন। ওপরের উদ্ধৃতিটিতে রাধার চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ পেলেও অচিরেই তাঁর চরিত্রে শিথিলতা প্রকাশ পায় কারণ এখানে যে রাধাকে দেখা যায় সে রাধা শারীরিক এবং মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত অপরিপক্ব। পরবর্তীতে রাধার শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন আসে। যদিও রাধা তাঁর স্বামী আইহনের বীরত্বের কথা বলে কৃষ্ণের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেতে চান-আমার স্বামী অতি বীর্যবান সে যদি ইচ্ছা করে তাহলে করাত দিয়ে তোমাকে দু'টুকরো করে ফেলবে। এ উক্তির প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ নিজেই নিজের প্রশংসা করে রাধাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। রাধা পর-পুরুষের সাথে সম্পর্কে না জড়ানোর আরও একটি

কারণ উল্লেখ করেন সেটা হচ্ছে তাদের কৌলিক সম্পর্কের সূত্র। সম্পর্কে রাধা-কৃষ্ণ মামী-ভাগিনা এদের মিলন কী করে সম্ভব? বঙ্গললনার প্রথম বাধা ছিল তাঁর অন্তরের আর দ্বিতীয়টি পরিবারিক ও সামাজিক। কারণ 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের রাধা চন্দ্রাবলী আমাদেরই একজন। আমাদের মতো সমাজ সংসারে প্রতিষ্ঠাতা, আমাদের মতোই কামনা-বাসনায় তিনি আকুল, আর কুল হারাবার ভয়ও তাঁর কম নয়। তাঁর ভয়, লজ্জা, ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনা অসহায় অবস্থা তাঁকে অধিকতর মানবিক গুণে ভূষিত করেছে'। (নীলিমা ; ১৯৯০ : পৃ : ৫১) ঘরে তার স্বামী, শাশুড়ি এবং ননদ আছেন। তাছাড়া দেহমিলনের সঙ্গে তার পরিচিতি নেই, সবে রাধা দেহের যৌবনে পর্দাপণ করেছেন, দেহের এ যৌবন এখন তার হৃদয়ে উন্মোচিত হয়নি। দেহে যা যৌবন হৃদয়ে তাই প্রেম। বয়ঃসন্ধি হচ্ছে একজন কিশোর-কিশোরীর যৌবনে পদার্পণে পূর্বশর্ত। বয়ঃসন্ধির রাধা তাই প্রেম জানে না। রাধার দেহে এবং মনে মিলন হয়নি বলে অন্ধ দেহাবেগে যৌবন চেতনায় সাড়া মেলেনি। রাধা তাই কৃষ্ণের প্রেম-উপহার ফিরিয়ে দিয়েছেন। এ উপহার বয়ে আনার অভিযোগে রাধা বড়াইকে প্রহার পর্যন্ত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এমনকি কৃষ্ণের মাতা-পিতাকে পর্যন্ত কটু কথা বলতে ছাড়েননি। রাধা কালনাগিনীর মতো গর্জন করে কৃষ্ণ প্রেরিত তাম্বুল, ফুল পদদলিত করেছেন। এতে বড়াই খুব অপমানিত হয়েছেন এবং এ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কৃষ্ণের সাথে শলাপরামর্শ করতে থাকেন। এদিকে কৃষ্ণ রাধাবিরহে অত্যন্ত কাতর, শয়নে-স্বপনে রাধাকে ধ্যান করেন তিনি—

আজি রজনীতে বড়ায়ি দেখলোঁ সপনে।
রাধা সিআঁ বসিলী শয়নে॥ বড়ায়ি ল
তখনে হৃদয়ে মোর বেধিল মদনে॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ৪৩)

উপহার সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার অপরাধে প্রত্যাখাত ও অপমানিত বড়াই কৃষ্ণের কাছে নালিশ করেন এবং দু'জন মিলে এ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন।

দানখণ্ডে পরিপক্ব রাধাকে দেখতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগের কাব্যে নারীদের গৃহস্থালি পালনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক কর্মেও সম্পৃক্ত দেখি, তাইতো আইহন পত্নী রাধাও অন্যান্য গোপ নারীদের সাথে মাথায় দধি, দুগ্ধ এবং ঘি এর পসরা সাজিয়ে মথুরার হাটে যেতেন বিকিকিনি করতে এবং এতে পরিবারের কোনো আপত্তি থাকত না। তৎকালে নারীরা যে সারাক্ষণ ঘরে অবরুদ্ধ থাকতেন এমনটি নয় কারণ সেকালের নারীরা কিছুটা হলেও স্বাধীন ছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না আর সেজন্যই অর্থনৈতিক কর্মের সাথে তারা নিজেকে সম্পৃক্ত করতেন। উল্লেখ্য তৎকালে সকল স্ত্রীলোকই যে ঘরের বাহিরে যেতে পারতেন তেমনটি নয়, বিশেষ কিছু সম্প্রদায়ের নারীরা ঘরের বাহিরে যেতে পারতেন। এর মধ্যে ব্যাধ এবং গোপ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে রাধা ও তার সখীবৃন্দ গোপ সম্প্রদায়ভুক্ত। এ সম্প্রদায়ের নারীরা তাদের কৌলিকব্যবসা রক্ষা ও জীবিকার তাগিদে দধি-দুগ্ধের পসরা নিয়ে হাটে যেতেন এবং বিক্রয়লব্ধ কড়ি এনে গৃহকর্ত্রীর (শাশুড়ির) হাতে দিতেন—

হেনমতে নিতি নিতি মথুরা নগরে।
দধি দুধ বিকণিআঁ রাধা আইসে ঘরে॥
কৌড়ী আণিআঁ দেএ সাসুড়ীর থানে।
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ১৯৯২ : পৃ : ২১৩)

অতি প্রত্যুষে রাধা সংসারের সমস্ত কাজকর্ম সেরে দেহসজ্জা করে অন্যান্য গোপ নারীর সাথে চললেন মথুরার হাটে দধি, ঘি বিক্রির জন্যে। গৃহের বাইরে বেরুনোর সময় অথবা কোনো উৎসব-পার্বণে যাত্রার প্রাক্কালে বউ- ঝিরা বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার পরিধান করতেন তার বর্ণনা রাধার রূপবর্ণনা অংশে অথবা এ ধরনের কিছু পদে দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা দেশে বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে স্ত্রীলোকদের

অলঙ্কার ও প্রসাধনী ব্যবহারের বর্ণনা মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে খুব বেশি অলঙ্কার ও প্রসাধনী ব্যবহার না করলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও পার্বণ উপলক্ষ্যে অলঙ্কার ও প্রসাধনী ব্যবহারের উল্লেখ আছে। রাধার অঙ্গে যে সমস্ত প্রসাধনী ও অলঙ্কার শোভা পেত—

বিচিত্র খোঁপার উপরেঁ রাধা
পুষ্প তোর শোভে মাথে।
কণ্ণের কুণ্ডল রতনে উজল
তোর মুখ নিশানাথে॥
শিশের সিন্দুর সুরেখ শোভে
আর দশনের যুতী॥
বন্ধুলী জিণিআঁ তোহ্মার আধর
গিএ শোভে গজমতী॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ৫৫)

একালের নারীদের মতো সেকালের নারীরাও হাস্যরস ও কৌতুকের মধ্য দিয়ে সখী-পরিবেষ্টিত হয়ে কর্মে যেতেন তার প্রমাণ কাব্যের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। রাধা ও তার সখীবৃন্দের মধ্যেও এ ধরনের হাস্যরস ও ব্যঙ্গ কৌতুক প্রত্যক্ষ করা যায়। রাধা যখন সখী-পরিবৃতা হয়ে দধি, দুগ্ধ, ঘির পসরা নিয়ে মথুরার পথে রওনা হতেন তখন তাদের মধ্যে হাস্যরস ও কৌতুক করতে দেখা যেত—

গোকুলে থাকোঁ মো গোআল জাতী
তোহ্মে না পুছহ কিকে।
ষোল শত গোপী পশার সাজিআঁ
মথুরা জাঁও মো বিকে॥
ওলাহা রাধা মাথার চুপড়ী
দেখোঁ মো তোহ্মার পসারা।
কোণ বথু লআঁ জাহা মথুরা
তাহার দেহ বিচারা।
ঘৃত দধি দুধ আওর ঘোল
এ সব মোর পসারা।
তোহ্মে না কমণ কারণে কাহ্নাঞিঁ
চাহ এহার বিচারা॥
তো এঁ না জাণসি মোএঁ মহাদাণী
এ দান সব আহ্মারে
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ৪৭)

উদ্ধৃতিটিতে একদিকে নারীদের অর্থনৈতিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ইঙ্গিত অন্যদিকে রাস্তায় পুরুষ কর্তৃক নির্যাতিত হওয়ার বর্ণনা আছে। পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতনের চিত্র আবহমান কাল থেকে সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে। এখানে কৃষ্ণ মহাদানী সেজে রাধার প্রতিটি অঙ্গের ও প্রতিটি দ্রব্যের শুল্ক দাবি করেন।

যে কৃষ্ণ কংসকে নিধন করার জন্য দেবলোক থেকে মর্ত্যলোকে এসেছেন সেই কৃষ্ণই আবার কংসের সম্পত্তির শুল্ক আদায়কারী নিযুক্ত হয়েছেন এটা কৌতুকেরই নামান্তর। এতে কৃষ্ণের চরিত্রে কিছুটা শৈথিল্য প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণ শুল্ক আদায়কারী শুধু রাধার জন্য। রাধার বিরহে দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণ অশান্ত হয়ে পড়েছেন। ধর্ম-ভয়, রাজ-ভয় কিছুতেই কৃষ্ণ বিচলিত নন। রাধা বড়াইকে দোষারোপ করলেন কারণ বড়াই কৃষ্ণের হয়ে ওকালতি করছেন অথচ তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে রাধাকে দেখাশোনা করার জন্য। এ নিয়ে রাধা-কৃষ্ণের বাকযুদ্ধ চলে অবশেষে রাধা রাগে অভিমানে বড়াইকে নাপিত ডেকে আনতে বলেন মাথা মুড়ে নিজেকে অসুন্দর করার জন্য। কিন্তু রাধা ব্যর্থ হলেন, কৃষ্ণকে কোনোমতেই নিরস্ত করতে পারলেন না বরং

নিজেই শেষে শ্রান্ত হয়ে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে দৈব-নিবন্ধন মনে করে কৃষ্ণের কাছে আত্মসর্ম্পণ করলেন। ‘শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের দুর্নিবার আকর্ষণের জয় হলো। নিরুপায় এগারো বছরের বালিকা কৃষ্ণের হাতে নিজেকে সমর্পণ করলেন। যে কৃষ্ণ তার কাছে এত উচ্ছৃঙ্খল গ্রাম্য দুর্বৃত্ত যুবক ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না প্রেমের মাহাত্ম্যে তিনি হলেন ‘শ্রীনন্দনন্দন গোবিন্দ’, শ্রীমতীর প্রেম তাঁর প্রেমিককে মহীয়ান করেছে’। (নীলিমা ; ১৯৯০ : পৃ. ৭৪) *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে একাধিকবার রাধা-কৃষ্ণের মিলনচিত্র বর্ণিত হয়েছে। এই চিত্রগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথম মিলনের বর্ণনা এবং শেষ মিলনের বর্ণনার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। দানখণ্ডে প্রথম বারের মতো মিলন বর্ণনায় কৃষ্ণের ভূমিকা প্রধান ছিল। রাধার কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না রাধা এখানে ভীত কম্পিতা। পুরুষের সঙ্গে আইহন পত্নীর এই প্রথম মিলন অভিজ্ঞতা। এখানে রাধার অনভিজ্ঞতার চিত্রই স্পষ্ট কিন্তু কুলবধূ এগারো বছরের বালিকা রাধার এ বোধটুকু খুবই স্পষ্ট ছিল শরীরে কোনো চিহ্ন রাখা যাবে না। এজন্য রাধা বার বার কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছেন—

নখঘাত না দিহ মোর পয়োভারে।
আইহন দেখিলেঁ মোর নাহিঁক নিস্তারে॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ৬৬)

রাধার এ উক্তির মধ্য দিয়ে আইহন চরিত্রের একটি প্রতিচ্ছবি চিত্রায়িত হয়। আইহন নপুংসক হতে পারেন কিন্তু তিনি রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। মানবীয় সকল গুণ আইহনের মধ্যে বিরাজমান। স্নেহ, প্রীতি. মায়া মমতা, আনন্দ বেদনা, ভালোবাসা, রাগ দুঃখ, অভিমান সবই সাধারণ মানুষের মতো। আইহন বিবাহিত, তিনি তার স্ত্রীকে ভীষণ ভালোবাসেন, স্ত্রীর রক্ষণা-বেক্ষণেও তিনি খুব মনোযোগী। রাধাও তার স্বামীর প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ বলেই বলতে পারেন স্বামীর তিনি বড়ই দুলালী। কোন প্রতিদেবতা তার স্ত্রীর বক্ষে অন্য পুরুষের নখাঘাতের চিহ্ন সহ্য করবেন? আইহন নপুংসক হলেও তার অপমানবোধ আছে, আছে যন্ত্রণাও। আর এ জন্যই রাধার এ সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় নারীর প্রতি বৈষম্য, অত্যাচার, অবিচার শুধু একালে নয় সেকালেও প্রচলিত ছিল, একালের মতো তাই সেকালেও ‘নারী দেবতাপ্রতিম পুরুষ দ্বারা ধর্ষিতা হতো, দুর্বল বলে তারা প্রবলের বলাৎকারের শিকার হতো। দানখণ্ডের শেষাংশে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের যে দেহমিলন ঘটেছে, তা কৃষ্ণের দিক থেকে বলাৎকার ছাড়া আর কিছুই নয়। হৃদয় সম্মতিহীন এ দেহমিলন রাধার চিত্তলোকে জাগ্রত করেছে চরম বিপন্নতা ও ঘৃণাবোধ’। (বিশ্বজিৎ ঘোষ ; ২০১১ : পৃ : ২৪)

ভাল ভৈল বড়ায়ি মোর ভৈল পরতেখ।
নিজ পতি বিহানে আবস্থা মোর দেখ॥
একসরী বনে ভয় পাইলোঁ আপারে।
এত দুখ দিআঁ বিধি নির্ম্মিল আহ্মারে॥
লয়িআঁ চল বড়ায়ি নিজ মোর দেশ।
সে কাহ্নঞিঁ লাগি ভৈল পাঞ্জর শেষ॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ১৯৯২ : পৃ : ২৭৯)

অবশ্য রাধার মর্মলোকের এ বেদনা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। নৌকাখণ্ড ও ভারখণ্ডের দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর বৃন্দাবন খণ্ডে রাধা মানসিকভাবে অনেকটাই পরিপক্ব। এখন রাধা নিজেই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল। বৃন্দাবন খণ্ডে দেহের সাথে রাধার মনের সংযুক্তি ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে রাধার সে তীব্র ঘৃণা, ধিক্কার বাণী ও উচ্চ কণ্ঠ কিছুটা হলেও পরিবর্তিত, বড়ায়ির কাছে রাধা দেহ মিলনের যে বিবরণ দিয়েছেন সেখানে আগের মতো ধিক্কার বাণী শোনা যায় না—

ডর পায়ি রাধা কাহ্নাঞিঁকে মাঙ্গে কোল॥
কোলে কর কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি জুনী জাণে।

বড়ায়ি জাণিলে জাণে কংস আইহনে॥
এ বোল শুণিআঁ কাহ্নাঞিঁ মনের হরিষে।
নাঅ ডুবায়িআঁ রাধা কোলে করি ভাষে॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ৭৩)

রাধার এ বিবর্তন ভারখণ্ডে হয়েছে আরও স্পষ্ট। ভারখণ্ডে এবং ছত্রখণ্ডে রাধা অনেক বেশি ক্রিয়াশীল। ভারবহন এবং ছত্রধারণে রাধা কৃষ্ণকে নিয়োগ দিয়েছেন। প্রতিদান স্বরূপ তিনি কৃষ্ণকে দেহদানের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। 'মজুরিআ' বৃত্তি নিয়ে নানা রস কৌতুক এমনকি হাসি ঠাট্টাও বাদ যায়নি। যদিও শেষে রাধা দেহ মিলনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। ভারখণ্ডে এবং ছত্রখণ্ডে রাধার ক্রিয়াশীলতা শুধু দেহ নিরপেক্ষই নহে অনেকটা প্রেম-নিরপেক্ষও বটে। কিন্তু কুলবধূ রাধা ঘরের বাহির হবেন কি করে ? শাশুড়ি যে তাকে গৃহবন্দি রেখেছেন। শাশুড়ি তার বড়ই উগ্র স্বভাবের—

আহ্মার সাসুড়ী বড়ায়ি বড় খরতর।
সব খন রাখে মোরে ঘরের ভিতর॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ৮০)

দীর্ঘদিন রাধা মথুরার হাটে দধি দুগ্ধ বিক্রি করতে যান না। রাধার অদর্শনে কৃষ্ণ ব্যাকুল এ অবস্থায় বড়াই আইহনের মায়ের কাছে আসেন ওকালতি করতে। বড়াই রাধার শাশুড়িকে বলেন—

গোআলের কুলে রাধা জরম লভিআঁ।
দধি বিকে না জাএ থাকএ বসিআঁ॥
বিধি না লিখিত তার কপালের ভাতে।
সত্যেঁ আইহনমাঅ কহিলোঁ তোহ্মাতে॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ১৯৯২ : পৃ : ২৯৯)

এভাবে গার্হস্থ্যজীবনের নানা প্রসঙ্গ রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* বিবৃত হয়েছে যেমন, দীর্ঘদিন কৃষ্ণ রাধাকে কাছে না পেয়ে বড়ই ব্যথিত, মর্মাহত। কৃষ্ণের এ অবস্থাদৃষ্টে বড়াই তাদের পুনরায় মিলনের জন্য নানা পন্থা খুঁজতে থাকেন। বড়াই রাধাকে কৃষ্ণের বিরহ যাতনার কথা বললে কৃষ্ণ দর্শনের জন্য রাধাও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু বাধা হয়ে ওঠে রাধার শাশুড়ি, যিনি রাধাকে গৃহবন্দি করে রেখেছেন। শাশুড়ির অনুমতি কিভাবে পাওয়া যায় রাধা নিজেই তার উপায় বের করেন। সকল গোপিনী রাধার শাশুড়ির কাছে এসে বলেন-দেখো গোয়াল জাতি হয়ে যদি ঘরের বৌকে দধি-দুগ্ধ বিক্রি করতে না পাঠাও তাহলে—

তোহ্মার ঘরত অন্ন পাণি না খাইব।
এ বোল সুণিআঁ ডরে আইহনের মাএ।
প্রণাম করিআঁ বুইল তা সহ্মার পাএ।
কালি হৈতেঁ যাইবে রাধা মথুরা নগর।
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ৮১)

স্বভাবতই সমাজের চাপে এবং একঘরে হওয়ার ভয়ে রাধার শাশুড়ি রাধাকে মথুরার হাটে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। সমাজের যে কোনো লোককে অথবা কোনো পরিবারকে একঘরে করে দণ্ডদানের প্রথা যে শুধু সেই যুগেই (মধ্যযুগে) প্রচলিত ছিল তা নয় এ প্রথা বর্তমান সমাজেও বঙ্গদেশের বহু স্থানে প্রচলিত আছে। বড়াই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের উদ্দেশে রাধিকাকে অভিসারের বেশে সজ্জিত করে মথুরার পথে বের হলেন। নারীদের সাজ-সজ্জা সবদেশে, সবকালে প্রচলিত ছিল তাই একালের মতো সেকালের নারীরাও সাজ-সজ্জা করতে বেশ পছন্দ করতেন। বিশেষ করে দয়িতের সঙ্গে মিলনের সময় তাদের সাজ-সজ্জা বেড়ে যেতো বহু গুণ। এ সময় নারীরা দয়িতের সামনে নিজেকে আরও সুন্দরভাবে, পরিপাটি করে উপস্থাপন করতে পছন্দ করেন। সেকালে নারীদের সাজ-সজ্জার উপকরণ হিসেবে সচরাচর প্রাকৃতিক উপকরণই বেশি ব্যবহৃত হতো। যেমন পান খেয়ে তারা ঠোঁট লাল করতেন, সুগন্ধির উপকরণ হিসেবে

ব্যবহার করতেন ধূপ এবং বিভিন্ন প্রকার ফুলের পাপড়ি। বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে রাধার সাজ-সজ্জার মধ্য দিয়ে সেকালের সাজ-সজ্জার বিবরণ পাওয়া যায়—

বিচিত্র খোঁপার উপরেঁ রাধা
পুষ্প তোর শোভে মাথে।
কণ্ণের কুণ্ডল রতনে উজল
তোর মুখ নিশানাথে॥
শিশের সিন্দুর সুরেখ শোভে
আর দশনের যুতী॥
বন্ধুলী জিণিআঁ তোহ্মার আধর
গিএ শোভে গজমতী ॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ৫৫)

দয়িতের (কৃষ্ণের) সাথে দেখা করার জন্য রাধা উন্মুখ এজন্যই তার এ ব্যস্ততা। নিজেকে সুন্দর ভাবে, পরিপাটি রূপে উপস্থাপন করার জন্যই রাধার এ সাজ-সজ্জা। কিন্তু সামনে তাঁর অনেক বাধা একদিকে সামাজিক লোকনিন্দার ভয় অন্যদিকে স্বামী, শাশুড়ি, ননদ ও সখীদের কড়া নজরদারি এড়িয়ে রাধা যেতে চান কৃষ্ণের সান্নিধ্যে। রাধার এই মনোভীতির মাঝে বাঙালি নারীর লজ্জাশীলতার পরিচয়টিই যেন ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এ লজ্জাশীলা রাধাই একদিন কৃষ্ণের জন্য হয়েছেন লজ্জাহীনা। বারবার দেহ মিলনের আকাঙ্ক্ষা রাধাকে ধীরে-ধীরে নপুংসক আইহন হতে দূরে সরিয়েছে। রাধা হয়েছেন আইহন বিমুখ। 'রাধারতিরসন্যস্তমনাঃ' কৃষ্ণের জন্য। যে রাধা একদিন কৃষ্ণের প্রেম-উপহার ফেরত দিয়ে বলেছিলেন ঘরে তার সর্বাঙ্গসুন্দর স্বামী আছেন, নন্দের ঘরের গরু রাখোয়ালের সাথে আমার কীসের সম্পর্ক; সেই রাধাই কাব্যের শেষাংশে এসে কৃষ্ণের কথা ভেবে আকুল হয়েছেন, মন আর স্থির রাখতে পারছেন না। নন্দের নন্দন কৃষ্ণের কথা ভেবেই তার রাত-দিন অতিবাহিত হচ্ছে। কৃষ্ণের জন্য এ উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা রাধার রন্ধনশালা এমন কি পারিবারিক তথা গার্হস্থ্যজীবনেও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি রাধাকে করেছে ব্যাকুল তাই রাধা বড়াইকে বলেছেন—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ১১১)

কৃষ্ণের সুমধুর বংশীধ্বনি রাধাকে এতটাই আবেগাপ্লুত করে যে ঐ বংশীবাদকের দাসী হয়ে জীবন যাপন করতেও তাঁর আপত্তি নেই। কৃষ্ণের বাঁশীর মধুর সুর রাধার প্রাণ-মন কেড়ে নেয়। কৃষ্ণ-প্রেমে পাগলিনী রাধার ঘর সংসারের সমস্ত কাজকর্ম ওলট-পালট হয়ে যায়। যে রাধা একদিন পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল নিয়ে গর্বে গর্বিত ছিলেন সেই রাধাই এখন কুলমান ও জাতমানের ভ্রুক্ষেপ না করে বেরিয়ে পড়েন ঘরের বাইরে—

কাহ্নঞিঁ বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল
দশ দিগ লাগে মোর শূন॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ১১৪)

কৃষ্ণ ছাড়া রাধার জীবন-সংসার এখন মরুময়, শূন্যতায় ভরা। কৃষ্ণ আবেগ রাধাকে এতটাই আপ্লুত করে যে তার পরিবার-পরিজন অবাঞ্ছিত মনে হয়। তাঁর স্বামী, শাশুড়ি, রাগী ননদ (ননদ মোর ঘরে দুরুবার) শ্বশুর (মোর দুরুবার সাসুড়ি সশুর), বড়াই সকলেই তাঁর কাছে অবাঞ্ছিত। কৃষ্ণের চিন্তায় রাধা

এতটাই বিভোর যে সবাইকে জঞ্জাল মনে হয়। সংসারের কাজ-কর্মে তাঁর মন বসে না। সম্ভবত আইহন পরিবারের রান্না ঘরের দায়িত্ব রাধার ওপরেই ন্যস্ত ছিল। শুধু রাধার রূপে নয় রন্ধনেও বোধ হয় আইহন বশীভূত ছিলেন। রাধা যে কেবল নিত্য নৈমিত্তিক বাঙালি খাবার ডাল, ভাত, তরকারি রাধতে পারতেন তা নয় গোয়ালার কন্যা হিসেবে রাধা হাত ঘুরিয়ে ভালো ঘোল এবং লস্যিও বানাতে পারতেন। সুতরাং গুণে দ্রপদী এবং রূপে লক্ষ্মীর মতো বউ পেয়ে আইহনের পরিবার বেশ সুখীই ছিল। কিন্তু রাধা এখন কৃষ্ণ চিন্তায় আত্মহারা, এখানেই ছন্দপতন। দূর হতে বাঁশীর শব্দ শুনে আকুল রাধার রন্ধনকর্মে কী ধরনের বিপর্যয় ঘটেছে সেই কাহিনি রাধা বড়াইকে বর্ণনা করেছেন এভাবে—

সুসর বাঁশীর নাদ শূণিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ
সাকে দিলোঁ কানাসোঅঁ পাণী॥
রান্ধনের জুতি হারায়িলোঁ বড়ায়ি
সুণিআঁ বাঁশীর নাদে॥
নান্দের নান্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ
যেন রএ পাঞ্চরের শুআ।
তা শুণিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ
ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ।
সেই ত বাঁশীর নাদ সুণিআঁ বড়ায়ি
চিত্ত মোর ভৈল আকুল।
সোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ।
বিণি জলেঁ চড়াইলোঁ চাউল॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ১২০)

এটি গার্হস্থ্যজীবনের ও ভেতর বাড়ির অর্থাৎ নিভৃত পারিবারিক রন্ধনশালার বিবরণ। এ বর্ণনায় এক অতি সাধারণ বাঙালি পরিবারের রান্নার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। কৃষ্ণের চিন্তায় রাধার রন্ধনশিল্পেও ঘটে ছন্দপতন যা রাধার স্বীকারোক্তিতেই প্রকাশ পেয়েছে। রাধা পটল ভাজতে গিয়ে কাঁচা সুপুরি ঘিয়ে ভাজল, নিম ঝোলে লেবুর রস নিংড়িয়ে দিল। বস্তুত আইহনের কপালে সেদিন যে কী খাবার জুটেছিল সেই কথা আর কে বলবে? *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে রাধার স্বামী আইহন যে খুব বেশি অবস্থাশালী ঘরের সন্তান ছিলেন তেমন নয় বরং বড়ু চণ্ডীদাস বঙ্গদেশে নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণির মানুষগুলির যে বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন আইহনের পরিবারে।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণের জন্য মনটি পড়ে থাকলেও ঘর-সংসারের সকল কাজ রাধাকেই সামলাতে হয়। আর এজন্যই ঘটে নানা বিপত্তি। রাধার দিন অতিবাহিত হয় কৃষ্ণের কথা ভেবে, কৃষ্ণের জন্য কেঁদে, কৃষ্ণের স্বপ্নে বিভোর হয়ে। রাধা যে ধীরে-ধীরে আইহন হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন তা সরল সোজা আইহন বুঝতেই পারেননি। কারণ তার পত্নীর বুকে তো আর নখাঘাতের চিহ্ন নেই তবে কেন তিনি তাঁর স্ত্রীকে অবিশ্বাস করবেন? সমস্ত কাব্য জুড়ে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা আইহনকে আড়াল করে সংঘটিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বড়াই বারবার রাধাকে সহায়তা করেছেন। আইহনের জীবনে আরও করুণ চিত্র প্রকাশ পায় তাঁর শয়ন কক্ষের দিকে তাকালে। একই শয্যায় আইহন এবং আইহন পত্নী। আইহন কখন ঘুমাবে এ চিন্তা রাধাকে সব সময় তাড়িত করে। আইহন নিদ্রামগ্ন হলে কৃষ্ণের জন্য শুরু হয় রাধার ক্রন্দন, রাধার ক্রন্দন পাঠক শুনতে পান কিন্তু আইহনের দুঃখ-বেদনার কথা কে কবে চিন্তা করেছেন? *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে আইহনকে নপুংসক হিসেবে আবির্ভুত করা হয়েছে সত্য কিন্তু কাব্য মধ্যে কোথাও তাকে অসম্মান বা অমর্যাদা করা হয়নি। জন্মসূত্রে আইহন যে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন তার হাত থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই। কিন্তু পাঠকের প্রশ্ন হলো কার অভিশাপে আইহনের এ অভিশপ্ত জীবন? সে কী তার নিজের পাপ? পুরাণে বর্ণিত আছে, পূর্বজন্মে আইহন সুদীর্ঘকাল গভীর তপস্যায় নিয়োজিত থেকে

নারায়ণকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিলেন এবং নারায়ণ যখন তপস্বীকে বর দিতে চাইলেন তখন তপস্বী নারায়ণপত্নী লক্ষ্মীকে নিজ পত্নী রূপে পেতে চাইলেন। নারায়ণ প্রতিশ্রুত বর প্রদান করলেন তুমি পরজন্মে লক্ষ্মীকে পত্নী হিসেবে পাবে বটে কিন্তু নিজে নপুংসক হয়ে জন্ম গ্রহণ করবে। দেবতার নির্মম অভিশাপে তেজস্বী তপশ্চারীর (আইহনের) মর্ত্যভূমে এ নিদারুণ করুণ পরিণতি। এখানে দেখা যাচ্ছে নপুংসক স্বামীকে নিয়ে রাধার একদিকে যেমন একটি দাম্পত্য জীবন ছিল, তেমনি সেই স্বামীকে আড়াল করে কৃষ্ণের সাথে প্রণয়লীলাও চলছিল সমান তালে। এক সময় রাধার মনে হয়েছে কৃষ্ণ ছাড়া তার জীবন যৌবন সবই ব্যর্থ তাই রাধা বড়াইকে বলেছেন—

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ অসার।
ছিণ্ডিয়া পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ মোয়ে সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর।
দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদাহ।
আপনার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন॥
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনীরূপ ধপ লইবোঁ দেশান্তর॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ১৪২)

'কৃষ্ণ বিরহে রাধা অসীম যন্ত্রণায় ভেঙে পড়েছেন। নিজের মর্মান্তিক দুঃখ-কথা এভাবে রাধা বড়াইয়ের কাছে নিবেদন করেছেন'। (শ্রীমন্ত ; ২০১১ : পৃ : ৮৬) বিরহের তীব্রতায় এবং হৃদয়ের অসীম যন্ত্রণায় রাধা বড়াইকে বললেন যেমন করে পারো কৃষ্ণকে এনে দাও। রাধার মিনতি শুনে বড়াই কৃষ্ণ প্রেরিত ফুল, পান ফেলে দেওয়ায় কৃষ্ণের যে অপমান হয়েছিল সেই কথা স্মরণ করান। পরক্ষণে আবার বড়াই রাধাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু কোনো সান্ত্বনাই রাধাকে শান্ত করতে পারল না। কৃষ্ণের খোঁজ করার জন্য রাধা বড়াইকে অনুনয়-বিনয় করতে থাকেন অবশেষে বড়াই এবং রাধা মিলে বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণকে খোঁজ করতে থাকেন। এমন সময় নারদ মুনি উপস্থিত হলেন এবং কৃষ্ণ বৃন্দাবনে কদমতলায় কুসুমশয্যায় বসে আছেন ধ্যানযোগে এ খবর দিলেন। রাধা কদমতলায় গিয়ে কৃষ্ণকে দেখে আনন্দে ও পুলকে মূর্চ্ছা গেলেন, বড়াই রাধার চোখে-মুখে জল দিয়ে চৈতন্য ফিরিয়ে আনলেন। অতঃপর বড়াই কৃষ্ণের কাছে গিয়ে রাধার মনোকষ্টের কথা বর্ণনা করলেন এভাবে—

ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে।
নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে॥
বনের হরিণী যেন তরাসিনী মনে।
দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে।
দয়া করী এবেঁ তাক দেহ আলিংগনে॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ১৭৫)

বড়াই কৃষ্ণের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে অনুরোধ করলেন রাধার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে। কৃষ্ণ তাকে বেশভূষা পরিধান করে মধুর বাণী শোনাতে বলেন। বড়াই রাধাকে সুন্দর বেশবাস পরিয়ে কৃষ্ণের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত রাধার বিরূপ মনোভাব দূর হলো, প্রেমে তার অন্তর ভরে উঠল। কিন্তু রাধার এ মিলন দীর্ঘস্থায়ী হলো না। অচিরেই অসীম বিরহ-বেদনায় রাধার হৃদয় আচ্ছন্ন হলো। রাধার অন্তরে যে আর্তি ফুটে ওঠে তার মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস সকল নিয়ম-সংস্কার বিধি-বিধানের ঊর্ধ্বে মুক্ত ও শ্বাশত প্রেমকে জয়যুক্ত করেছেন। এখানেই প্রেমের অনন্ত মহিমা, নারীর অন্তর্রহস্য ও প্রেমিকার রসোজ্জ্বল প্রতিমূর্তিটি পরিস্ফুট। নৌকাখণ্ডে জলকেলির পর কৃষ্ণের প্রতি রাধার আন্তরলিপ্সা হয়েছে আরও জাগ্রত। তারপর ধীরে ধীরে তা গভীর প্রেমে পর্যবসিত হয়েছে। বংশীখণ্ডে রাধার চিত্তে সামান্যতমও প্রতিকূল মনোভাব নেই। বংশীবাদক কৃষ্ণের চরণতলে রাধা আত্মসমর্পণ করতে চান। এ খণ্ডে রাধা নৈষ্ঠিক প্রেমের চিরন্তন প্রতীক।

এখানে রাধার বিলাপের মধ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আকুতি ছিল প্রবল এবং দেহমুখী। কিন্তু রাধাবিরহ অংশে এসে কৃষ্ণ বড়াইয়ের অনুরোধে রাধার জন্য কিশলয় শয্যা বিছিয়ে দিলেন, রাধা কৃষ্ণের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ বড়াইকে বললেন—

তোহ্মার কারণে ল বড়ায়ি।
কৈলো মোঞেঁ রাধার সঙ্গে ল।
আর বচনেক বোলোঁ সুণ ল বড়ায়ি
ধরিঞাঁ তোর করে।
তাক রাখিহ যতনে আপণ আন্তরে।
জাইব আহ্মে মথুরা নগরে॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ১৭৮)

কৃষ্ণ পরম মমতায় নিজের উরু থেকে ধীরে ধীরে রাধার মাথা নামিয়ে রেখে মথুরা চলে গেলেন। ক্ষণিকের মিলনে রাধা যে সুখ অনুভব করলেন মুহূর্তেই তা অর্ন্তজ্বালায় পর্যবসিত হলো। রাধা বিরহের অগ্নিজ্বালায় অশ্রু জরাতুর ভাবময়ী নারীতে রূপান্তরিত হলেন। অসীম যন্ত্রণায় রাধা ব্যথিত, মর্মাহত তার যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ের আর্তি বড়াইয়ের কাছে তুলে ধরেছেন এভাবে—

বড়ায়ি গো।
কত দুখ কহিব কাঁহিণী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় অভাগিনী॥
নান্দের নন্দন কাহ্নু যশোদার পো আল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞঁ বিকাসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ॥
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নঞিঁর সঙ্গে আছে॥
(বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ১৪৯)

এখানেই বাংলার গৃহগত জীবনের প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ‘বিরহের তীব্রতায়, অসীম হৃদয়-যন্ত্রণায় রাধা এখানে পদাবলীর রাধার আক্ষেপানুরাগের সমধর্মী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তবুও রাধা মর্ত্যসংস্কারকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে পারেননি। বড়ুর রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি নন, তিনি আমাদের অতি পরিচিতা এই মর্ত্যেরই মানবী-তার সর্বাঙ্গে ধূলির লাঞ্ছনা’। (শ্রীমন্ত ; ২০১১ : পৃ. : ৮৬) প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য-‘এ পদাবলীর তিল-তুলসী সমর্পিত রাধা নহে, ভক্তিরস যাহার উপজীব্য। এ রাধা দুরন্ত বালিকা, অনভিজ্ঞা কিশোরী, গর্বিতা যুবতী। কৃষ্ণের দেবত্বে ইহার বিশ্বাস নাই। পরকীয়া প্রেমের মহত্বে সন্দিগ্ধা, এ হাসিয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া, মারিয়া ধরিয়া, ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া কথার তীব্র শ্লেষ নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত ক্ষণ পাঠকের মর্মকে টানিয়া রাখে এবং কাব্যের শেষে বিরহ ব্যথার নিভৃত খিলানপথে কখন অজ্ঞাতসারে একেবারে মনের মধ্যে আসিয়া আসন গ্রহণ করে’। (শ্রীমন্ত ; ২০১১ : পৃ : ৮৬) বিষয়বস্তুর দিক থেকে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে পৌরাণিক এবং লৌকিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। স্বর্গের মৃতপাত্রে কবি মর্ত্যলোকের মানুষের বিশেষ বাঙালির জীবনরস পরিবেশন করেছেন। স্বর্গ ও মর্ত্যের সেতুবন্ধন তৈরি করেছেন।

বড়ু চণ্ডীদাস এক অদ্বিতীয় জীবনশিল্পী। চিত্র ও চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি কৃতিত্বের দাবিদার। ভোগের চিত্র বর্ণনাতেই তিনি শুধু নিজেকে নিয়োজিত রাখেননি বরং নর-নারীর অন্তর্জগতের অন্তর্রহস্যকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। যে কৃষ্ণের প্রতি রাধা প্রথমে বিরূপ এবং ক্ষুব্ধ—যে কৃষ্ণ তাকে বলাৎকার

করে ছেড়েছেন সেই কৃষ্ণের বাঁশীর শব্দ শুনে রাধা ব্যাকুল হয়েছেন। কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য রাধা উৎকণ্ঠিতা। আর কৃষ্ণ যে কেবলই ভোগী তা নন—বরং প্রেমিক পুরুষ এবং সুবিবেচক অভিভাবকও। তাইতো মথুরা চলে যাওয়ার পূর্বে বড়াইকে অনুরোধ করেন ‘তাক রাখিহ যতনে আপন আন্তরে’। (বড়ু চণ্ডীদাস ; ২০১৪ : পৃ : ১৭৮)

এ সুর স্নেহ-ভালোবাসার, আন্তরিকতার এবং অভিভাবকত্বের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। একজন বাস্তববাদী জীবনশিল্পী হিসেবে বাস্তব জীবনের রসসৃষ্টিই ছিল কবির প্রধান উদ্দেশ্য। জীবন সর্ম্পকিত এ অভিজ্ঞতার উদ্ভব ঘটে কবির সমকালীন জীবনবোধ থেকে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যটি জীবনমুখী ও প্রাণবন্ত। সম্রান্ত ঘরের বধূ রাধা সমাজ সংসার, নীতিবোধ, স্নেহ-প্রেম ভালোবাসা এসব উপেক্ষা করে গোপ বালকের প্রেমে পাগল। রাধা স্বামীর স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, সোহাগ ও আদর উপেক্ষা করে কৃষ্ণের প্রেমে আত্মসমর্পণ করেছেন। এ নিষিদ্ধ সর্বনাশা প্রেম রাধাকে শেষ পর্যন্ত করেছে ছন্নছাড়া ও ঘরছাড়া। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের ধর্মীয় কাহিনি ও তার অন্তরালে নিহিত পাঠকের মনোজগতের ইপ্সিত ভাব অপেক্ষা বাংলার লৌকিক জগৎ ও মানবিক রূপ পরিবেশনই এ কাব্যকে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করেছে।

তথ্যনির্দেশ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত	(১৯৯২) বড়ুচণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম সমগ্র সংস্করণ, কলিকাতা
অরবিন্দ পোদ্দার	(অক্টোবর, ২০০৫) *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*, চতুর্থ মুদ্রণ, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-০৯
আশফাক হোসেন	(জুলাই, ২০১৮) *বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা*, পুনর্মুদ্রণ, জে. কে. প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
গোপাল হালদার	(মে, ১৯৮৬) *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা* (প্রথমখণ্ড), মুক্তধারা, ঢাকা
নীলিমা ইব্রাহীম	(নভেম্বর, ১৯৯০) *সাহিত্য সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
”	(অক্টোবর ১৯৯৬) *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যপাঠের ভূমিকা*, চতুর্থ সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা
বিশ্বজিৎ ঘোষ	(২০১১) *বাংলা সাহিত্যে নারী*, প্রথম প্রকাশ, একুশে বইমেলা, ধ্রুবপদ, প্যারিদাস রোড, ঢাকা
মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা:	(২০১৪) বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, সপ্তম সংস্করণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার ঢাকা
শ্রীভূদেব চৌধুরী	(আগস্ট, ২০০৯) *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, পুর্ণমুদ্রণ, দে’জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৭৩
শ্রীমন্তকুমার জানা	(জুন, ২০১১) *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ওরিয়েণ্টাল বুক কো. প্রা. লি. ৫৬, সূর্য সেন স্টীট, কলিকাতা- ০৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাথসাহিত্য : সেখ ফয়জুল্লা প্রণীত *গোরক্ষ-বিজয়*

মধ্যযুগে বাংলা কাব্যধারায় সেখ ফয়জুল্লা একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিচিত কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য তাঁর রচিত পুথির পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তবুও দীনেশচন্দ্র সেন সেখ ফয়জুল্লাকে *গোরক্ষ-বিজয়* রচনার জন্য মালাচন্দন দিতে প্রস্তুত। *গোরক্ষ-বিজয়ের* বিক্ষিপ্ত কিছু অংশ মুহম্মদ এনামুল হক আবিষ্কার করেন। এই বিক্ষিপ্ত পুথির কোনো এক জায়গায় কবির অন্য দুটি গ্রন্থ *গাজীবিজয়* ও *সত্যপীরের* পরিচয় আছে। পৌরাণিক বৌদ্ধসিদ্ধা গোরক্ষনাথের অলৌকিক মাহাত্ম্য বর্ণনাই *গোরক্ষ-বিজয়ের* মূল লক্ষ্য। এ গ্রন্থটিতে প্রধানত যোগতত্ত্ব প্রাধান্য পেলেও, যোগতত্ত্বের অন্তরালে কবি তৎকালের স্বদেশ ও স্বজাতির গার্হস্থ্যজীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কন করেছেন। *গোরক্ষ-বিজয়ে* গুরু মীননাথের পতন এবং শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাঁর পুনরুদ্ধার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এ কাব্যে আচার্য গোরক্ষনাথ কীভাবে আত্মভ্রষ্ট গুরু মীননাথকে কদলিনগরের রমণীসমাজের মোহজাল হতে উদ্ধার করেছিলেন সেই কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে। স্ত্রীরাজ্যের কবল থেকে শিষ্য কর্তৃক গুরুকে উদ্ধার করার বিজয় গাথাই *গোরক্ষ-বিজয়* বা *মীনচেতন* নামে পরিচিত। *গোরক্ষ-বিজয়* কাহিনিতে বর্ণিত আছে-ধর্মঠাকুর নিরঞ্জনের মুখ থেকে যোগীরূপে শিব, নাভি থেকে মীননাথ, হাড় থেকে হাড়িপা, কান থেকে কানুপা ও জটা থেকে গোরক্ষনাথ জন্মগ্রহণ করলেন। নিরঞ্জনের সর্বশরীর থেকে জন্মগ্রহণ করলেন গৌরী এবং নিরঞ্জনের নির্দেশেই শিব গৌরীকে বিয়ে করেন। শিব একদা ক্ষীরোদসাগরে জলটুঙ্গি ঘরে গৌরীকে গুহ্যতিগুহ্য যোগশাস্ত্র শোনাচ্ছিলেন। মীননাথ গোপনে তাঁদের কথোপকথন শুনে তত্ত্বকথা জেনে ফেলেন। সর্বজ্ঞ মহাদেব অচিরেই সব বুঝতে পেরে মীননাথকে অভিশাপ দিলেন এককালে হোক বিস্মরণ। এরপর মহাদেব গৌরীকে নিয়ে কৈলাসধামে চলে যান। মহাদেবের চারজন শিষ্য চারদিকে গেলেন; হাড়িপা পূর্বদেশে, দক্ষিণে কানুপা, পশ্চিমে গোরক্ষনাথ এবং মীননাথ গেলেন উত্তরদেশে। গৌরী একদিন শিবকে তাঁর শিষ্যদের বিয়ে দিয়ে সংসারী করার অনুরোধ করলে শিব শিষ্যদের কাম, ক্রোধ, লোভ, লালসাশূন্য পরিশুদ্ধ চিত্তের জিতেন্দ্রিয় মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেন। শিবের এ কথার প্রত্যুত্তরে গৌরী শিষ্যদের পরীক্ষা করার জন্য ছলনাময়ী মোহিনী বেশ ধারণ করলেন। ধ্যানস্থ শিব তাঁর চার শিষ্যকে ডেকে পাঠালেন, গৌরী শিষ্যদের অন্ন পরিবেশন করছেন, আহারের সময় তিনজন সিদ্ধা আত্মবিস্মৃত হয়ে বিভিন্নভাবে দেবীকে কামনা করতে লাগলেন। মীননাথ কামে জর্জরিত হয়ে গৌরীকে দেখে ভাবলেন 'এমনতর নারী পেলে রঙ্গকৌতুকে রাত যাপন করি'। দেবী তাকে অভিশাপ দিলেন, স্ত্রীরাজ্য কদলি রাজ্যে গিয়ে ষোলশ রমণী নিয়ে কামকেলীতে মত্ত থাকবে। হাড়িপাকে অভিশাপ দিলেন রাণী ময়নামতীর কাছে গিয়ে কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে হাড়িকর্ম করার জন্য। কানুপা ভাবলেন এমন নারী পেলে মৃত্যুতেও আপত্তি নেই। দেবী তাকে অভিশাপ দিলেন ডাহুকের দেশে গিয়ে বধূ নিয়ে ক্রীড়ায় মত্ত থাকবে। পরিশেষে যোগীশ্রেষ্ঠ সিদ্ধপুরুষ গোরক্ষনাথ দেবী গৌরীকে জননীরূপে কামনা করলেন—

> এরূপ জননী যদি থাকএ আহ্মার।
> তাহান কোলেত বসি সুখে দুগ্ধ খাই
> (সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ২১)

গোরক্ষনাথ মনে মনে দেবী গৌরীর সন্তানরূপে স্নেহবাৎসল্য কামনা করলেন। দেবী গৌরী গোরক্ষনাথের কাছে হার মানলেন বটে তবে তাকে মহাপরীক্ষায় ফেললেন। পথিমধ্যে উলঙ্গ হয়ে লাস্যময়ী রূপ ধারণ করলেন, গোরক্ষ নারীর এহেন নির্লজ্জ অবস্থা দেখে বৃক্ষপত্র দিয়ে লজ্জা নিবারণ করালেন। এ পরিস্থিতে দেবী ভীষণ লজ্জিত হলেন এবং পরাজিত হওয়ার অপমানে প্রতিশোধ স্পৃহা নিয়ে গোরক্ষনাথকে জব্দ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন এবং মাছির রূপ ধারণ করে গোরক্ষনাথের উদরে প্রবেশ করলেন। গোরক্ষনাথ

যোগবলে দশমীদুয়ার বন্ধ করে দিলে দেবীর প্রাণ যায় যায় অবস্থা এবং অনেক কাকুতি মিনতি করায় অবশেষে গোরক্ষনাথ দেবীকে মুক্ত করে দিলেন। বেরিয়ে আসার সময় দেবীর কোমর ভেঙ্গে গেল। এ অবস্থায় তিনি রাক্ষসের বেশ ধারণ করে রাস্তায় পড়ে রইলেন এবং প্রতিদিন একটি করে মানুষ ধরে খেতে লাগলেন। এদিকে শিব গৌরীকে না পেয়ে শেষে গোরক্ষনাথের কাণ্ডকারখানা দেখে ভর্ৎসনা করলেন। গোরক্ষনাথ দেবীকে মুক্ত করে দিলেন। শিবের অভিশাপে গোরক্ষনাথ তপস্যারত গর্ভেশ্বর রাজার অল্পবয়স্কা কন্যার স্বামী হলেন। স্বামী হয়ে গোরক্ষনাথ শিশুর রূপ ধারণ করে কাঁদতে লাগলেন। স্ত্রীর বিমূঢ়মতি দেখে বললেন, তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, লালসাশূন্য শুদ্ধ চিত্তের মানুষ তনুতে তাঁর নারীর কামনা মিটবে না। স্ত্রীকে ত্যাগ করে যাবার সময় বলে গেলেন, তাঁর কৌপীন ধুয়ে পান করলে তিনি গর্ভবতী হবেন। গোরক্ষনাথের নির্দেশ মেনে গর্ভেশ্বর কন্যা গর্ভবতী হলেন এবং কর্পটিনাথ নামে এক পুত্র সন্তানের জননী হলেন। গোরক্ষনাথ স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করে গুরুকে অপরাধ জগত থেকে উদ্ধারের জন্য বের হলেন। পথিমধ্যে হাড়িপার কাছে তিনি গুরুর সাংঘাতিক অধঃপতনের কথা জানতে পারেন। মীননাথ কদলিনগরে ষোলশ রমণী নিয়ে কামরসে মত্ত আছেন। গুরুকে আত্মজ্ঞানে প্রবুদ্ধ করার জন্য রমণীর ছদ্মবেশে গোরক্ষনাথ কদলি নগরে প্রবেশ করলেন এবং মীননাথকে যোগশাস্ত্র, কায়াশাস্ত্র সম্পর্কে ইঙ্গিত দিলেন। মীননাথ কামসরোবরে কামকেলিতে এতটাই নিমজ্জিত ছিলেন যে তিনি সমস্ত দিব্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। বিন্দুনাথ নামে তিনি এক পুত্র সন্তানের জনক হন। গোরক্ষনাথ যোগসাধনার দ্বারা নানা প্রক্রিয়ায় যোগশাস্ত্র ও কায়াশাস্ত্র সম্বন্ধে গুরু (মীননাথকে) প্রলুব্ধ করলেন। নিজের অধঃপতনের জন্য মীননাথ খুবই ব্যথিত হলেন। ইত্যবসরে কদলিরমণীরা মীননাথকে সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ করার নিমিত্তে বিন্দুনাথকে তার কোলে দিলেন। তিনি পুনরায় সংসারের মায়াজালে আসক্ত হয়ে চঞ্চল ও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সন্তানের আসক্তি থেকে মীননাথকে মুক্ত করার জন্য গোরক্ষনাথ বিন্দুনাথকে হত্যা করেন। কদলিরমণীগণ ও মীননাথ পুত্রশোকে ব্যথিত হলে গোরক্ষনাথ যোগবলে বিন্দুনাথকে পুনরায় জীবিত করেন। অতঃপর কদলিনগরের রমণীর মোহজাল থেকে মীননাথকে উদ্ধার করার জন্য সকল রমণীকে বাদুর করে উড়িয়ে দিলেন। মীননাথ মোহমুক্ত হয়ে যোগীজীবনে ফিরে এলেন। এতকাল তিনি যে স্বপ্নের মধ্যে ছিলেন এবার সে স্বপ্নের পরিসমাপ্তি হলো। তিনি আত্মসম্বিত ফিরে পেলেন। মীননাথের পুত্র বিন্দুনাথও যোগীজীবনের ব্রত গ্রহণ করলেন। গোরক্ষনাথ একজন প্রকৃত শিষ্য, শুদ্ধচিত্তের মানুষ হিসেবে যা করা উচিত সেটাই করেছিলেন। পথভ্রষ্ট গুরুকে আপ্রাণ চেষ্টায় ভক্তিমার্গে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তত্ত্বগত দিক থেকে এ কাব্যটি যোগসাধনার আদর্শ এবং অপ্রাকৃত শক্তির মহিমায় মহিমান্বিত হলেও এর অন্তরালে *গোরক্ষ-বিজয়* কাব্যে তৎকালীন বাঙালি সমাজের ধর্ম, ভাষা, ইতিহাস এবং গার্হস্থ্যজীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য রয়েছে। দেবী দুর্গার শাপে যোগী মীননাথের কদলি নগরে গমন এবং ষোলশ কদলিরমণী নিয়ে বিহার, অদ্ভুত এক সংসারাশ্রম পালনের যে বর্ণনা রয়েছে যেটা সচরাচর মানব সমাজে দেখতে পাওয়া যায় না, সেই বর্ণনা প্রত্যক্ষ করা যায় *গোরক্ষ-বিজয়* কাব্যে—

কদলিত দেখে জুবতি সব প্রজা
স্ত্রীরাজ্য হএ সে জে স্ত্রী হএ প্রজা
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ২৪)

এ কারণেই মীননাথ যেদিন কদলিনগরে উপস্থিত হলেন সেদিন ঐ রাজ্যে এক হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটে গেল কদলিরমণীরা আনন্দে আন্দোলিত—

মীননাথ আইল জবে   দেখিয়া কদলি সবে
তানে চাহে রাখিতে ভোলাই॥
জ্ঞানে ধ্যানে দেখি স্থির   সোন্দর জে শরীর
আক্ষি সবে যদি তারে পাই॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ২৪)

মীননাথকে দেখে কদলিনগরের নেত্রী স্থানীয় দুই রমণী মঙ্গলা ও কমলাসহ অন্যান্য রমণী বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে মীননাথের সামনে উপস্থিত হন—

গুরুতর হইল ভার তাতে দোলে রত্তন হার
হস্ত পদ জ্বলে এ উর্ঝলে।
কটিত কিঙ্কিণী চরণে নপুর ধ্বনি
দেখিয়া মুনির মন টলে॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ২৫)

নারীরা ছলনাময়ী তবে কদলিনগরের নারীরা আরও বেশি ছলনাময়ী যা *গোরক্ষ-বিজয়* কাব্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। বিশেষ করে মঙ্গলা ও কমলার অঙ্গ-ভঙ্গি চোখে পড়ার মতো। কদলি নারীরা ছলনার মাধ্যমে মীননাথকে ভোলাতে চেষ্টা করেন এবং তাকে গৃহবাসী হতে অনুরোধ করেন—

কোন দেশে তোহ্মার ঘর মাগি খাও নিরন্তর
কি কারণে না কর গৃহবাস॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ২৬)

কদলিনগরের ষোলশ কদলিনারীর প্রতিনিধি হয়ে ঐ রাজ্যের রাজসিংহাসনে বসার অনুরোধ করেন তারা মীননাথকে। এ প্রস্তাবে খুশি হয়ে মীননাথ ষোলশ নারীর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সুখে সংসার যাপন করতে থাকেন। এক সাথে ষোলশ নারীকে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া আমাদের সমাজে অসম্ভব, অবাস্তব। এ জন্যই মীননাথ যে-সংসার জীবন অতিবাহিত করতেন সে-জীবন ছিল সাধারণের বাইরে এক অসাধারণ জীবন। এক সাথে এত রমণীর সঙ্গ পেয়ে মীননাথ এতটাই বিভোর হলেন যে, তিনি গুরুর দেওয়া চৈতন্যজ্ঞান ভুলে গেলেন। কদলিনারীর আদর যত্নে তিনি বিমোহিত—

কদলির রূপ দেখি মীননাথ হইল সুখী
শুনি সব বচন মধুর॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ২৭)

দিব্যজ্ঞান শূন্য হয়ে তিনি কামরসে মত্ত হন। কদলিবাসী তাকে রাজার সম্মানে ভূষিত করে রাজসিংহাসনে বসিয়ে রাত-দিন সেবা করেন। ষোলশ কদলি মিলে সুবর্ণ আসনে বসিয়ে মীননাথকে স্নান করান। যেহেতু মীননাথ এখন কদলি নগরের সর্বেশ্বর তাই তাকে তুষ্ট করার জন্য হেন কাজ নেই যে তারা করতে কুণ্ঠা বোধ করেন। কামকেলিতে মীননাথ এতটাই মত্ত ছিলেন যে, তিনি গুরু প্রদত্ত মন্ত্রজ্ঞান ভুলে যান। কামকেলি ছাড়া কদলিনগরে আর কোনো কর্ম বা পেশার পরিচয় খুব বেশি পাওয়া যায় না—

তেজিল গুরুর বোল সব হইয়া গেল ভোল
কামরসে মগ্ন হইয়া মতি।
সকল যুবতীগণ কামরসে অনুক্ষণ
কাম বিনে আর নাই গতি॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ২৯)

সিংহাসনে আরোহণ করার পর মীননাথ ষোলশ রমণী নিয়ে পুরীতে অবস্থান করেন। পুরীর বাইরে তিনি কখনই বের হননি। কামরসে মীননাথ কতকাল যে মত্ত ছিলেন তা তিনি ভ্রুক্ষেপ করেননি। এরই মধ্যে তিনি বিন্দুনাথ নামে এক পুত্র সন্তানের জনক হয়েছেন। কদলিনগরের বর্ণনা অনুযায়ী কদলিনগর এক সমৃদ্ধশালী নগর এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ নগরের বাসিন্দারা কারো পুকুরের পানি কেহ পান করে না এবং মণি মাণিক্য তারা রৌদ্রেতে শুকায়—

কার পখরির পানি কেহ নহি খাএ।
মণি মাণিক্য তারা রৌদ্রেতে সুখাএ।
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ৫৪)

কদলিনগরের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানে পুরুষের সংখ্যা কম হওয়ায় 'এক রাউলের ঘরে দুই চার জন মাই' যা দ্বারা সমাজে বহুবিবাহের ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মীননাথ একাই ষোলশ কদলিনারী নিয়ে সুখে দিন যাপন করেন এবং এই ষোলশ রমণী তাদের প্রিয়কে নিয়ে পতাকাখচিত সুবর্ণ প্রাসাদে বাস করেন। এখানকার রমণীরা বিশেষ কোন ব্যক্তির একার ভোগ্য ছিলেন না—

এক রাইলের ঘরে দুই চারি মাই।
সোল সয় কদলি একলা মিনর ঠাই
স্থানে স্থানে দেখে সব অমরা নগর।
সকল নগরে দেখে উচ্চ উচ্চ ঘর॥
সুবর্ণের ঘর সব পতাকা রচিত।
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ৫৫)

উপর্যুক্ত বর্ণনায় কদলিনগরের প্রাচুর্যের পরিচয় নিহিত। সমৃদ্ধ নগর এবং সুবর্ণখচিত প্রাসাদ। সমৃদ্ধ নগর সমৃদ্ধিশীল অর্থনীতির পরিচয় বহন করে। কদলি রাজ্য ছিল স্ত্রী প্রধান। এক এক জনের ঘরে তিন-চারজন করে মহিলা। এর মধ্যে মঙ্গলা ও কমলা সবার শীর্ষে। তাদের সাজ-সজ্জার বাহার ছিল বেশ উন্নত এবং তারা পুরুষকে ভোলাতে ছিলেন বেশ পারদর্শী। উন্নত বসন-ভূষণ পরে কদলি নারীরা নিজেদেরকে এমন ভাবে উপস্থাপন করতেন যে মুনি ঋষিরা পর্যন্ত আকৃষ্ট হতেন—

মঙ্গলা কমলা দুই জতেক কদলি লই
নানা রঙ্গে ছিঙ্গার করিব।
মীননাথ ভোলাইতে সব য়াইল একচিত্তে
চারি ভিতে বেড়িয়া রহিল॥
কদলির হেন বেশ শিরেত লঙ্গিবে বেশ
কবরী জে বাধিল মস্তক।
যদি পৌরে পুষ্পমালা কবরীতে শোভা ভালা
জেন দেখি বিজুলি চমকে।
... ...
কটিত কিঙ্কিণী চরণে নপুর ধ্বনি
দেখিয়া মুনির মন টলে॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ২৫)

গোরক্ষনাথের পারিবারিক চিত্র ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। শিবের আশীর্বাদে গোরক্ষনাথ গর্ভেশ্বর রাজার অল্পবয়স্কা কন্যার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও তিনি ছিলেন সংসার বিরাগী, স্ত্রীকে সন্তান লাভের বর দিয়ে গুরুকে উদ্ধারের জন্যে কদলিনগরের উদ্দেশে রওনা হলেন। যেহেতু কদলিনগরে পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না তাই গোরক্ষনাথকে রমণীর ছদ্মবেশ ধারণ করে কদলি নগরে প্রবেশ করতে হয়েছিল। গোরক্ষনাথ নর্তকীর সাজে সজ্জিত হয়েছিলেন। গোরক্ষনাথ নাটুয়ার বেশ ধরে বিজয়া নগর ছেড়ে কদলিনগরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। নাটুয়ার সাজে তিনি যে সব অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন তা দ্বারা ঐ সময়ে ব্যবহৃত অলঙ্কারের তালিকা নির্দেশ করে। বিজয়া নগর ছেড়ে গোরক্ষনাথ কদলিনগরের এক বকুল তলায় আশ্রয় নিলেন। বকুলতলায় বিশ্রাম নিচ্ছেন এমন সময় একজন কদলি রমণীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। জল ভরবার ছলে রমণী সরোবরকূলে এলেন এবং গোরক্ষনাথের রূপে মুগ্ধ হলেন। লাজ ভয় ত্যাগ করে রমণী গোরক্ষনাথের নিকটে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন-

ক থা হোতে আইস জোগি কোন দেসে ঘর।
কি হেতু আসিছ তুহ্মি কদলি নগর॥
জখনে হইছে রাজা ঈশ্বর মিনাই।

তদবধি এহি দেশে বিদেসি জোগি নাই॥

(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ৫৮)

আগন্তুক রমণী রাজা মীননাথ বিদেশি জোগী দেখলে কতটা ভয়ঙ্কর ও রুদ্র মূর্তি ধারণ করেন তার একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দেন—

তাহার সেবক জান সোল শত নারী।
বুড়া জোগি পাইলে চোপাড়ে ভাঙ্গে গাল।
... ...
পোলা জোগি পাইলে পাটাত তুলি বাটে॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ৬০)

এই রমণী গোরক্ষনাথকে তার বাড়িতে যাওয়ার অনুরোধ জানান এবং তাকে অনেক আদর যত্নে রাখবেন এবং থালা ভরে দুধ ভাত দিয়ে তাকে আপ্যায়ন করবেন এমন প্রতিশ্রুতিও দেন—

আঞ্চলে ঢাকিয়া নিমু মণ্ডবেতে বাসা দিমু
দুগ্ধ ভাত দিমু থালী ভরি ॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ৬৩)

সম্ভবত দুধ-ভাত কদলিনগরে সবার প্রিয় খাবার ছিল। কদলিনারীদের কাজই হচ্ছে বিদেশি কোনো পুরুষকে ছলনার মায়াজালে আকৃষ্ট করা, কখনো অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে, আবার কখনো প্রলোভন বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

সংসারে সুখ ও সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য নারী পুরুষের সমান তালে পরিশ্রমের তাৎপর্য *গোরক্ষ-বিজয়ে* দেখতে পাওয়া যায়। তারা একসাথে চিকন সূতা কেটে বাজারে বিক্রি করে কড়ি উপার্জনের কথা ব্যক্ত করেছেন কাব্যে। আগন্তুক রমণী গোরক্ষনাথকে সঙ্গে নিয়ে এক সাথে চিকন সুতা কাটার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন—

কাটিমু চিকন সুতি তোহ্মিহ বুনিবা ধুতি
হাটে নি বেচিলে পাইবা কৌড়ি॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ৬৬)

বাজারে চিকন সুতার চাহিদা এবং মূল্য বেশি ছিল এবং অর্থ উপার্জন বেশি হত।

যেহেতু গোরক্ষনাথ সিদ্ধ-যোগী তাই কোনো কিছুতেই তার মন টলে না অবশেষে উক্ত নারী বিমর্ষ বদনে নিম্নোক্ত বাণী উচ্চারণ করেন-

রসের নাগর তুমি নবীন নাগরী আমি
মন কেন করি আছ ভারী॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ৬৭)

কিন্তু গোরক্ষনাথ এ সব উপেক্ষা করে ঐ নারীর কাছে অনুরোধ করেন কীভাবে তিনি তাঁর গুরু মীননাথকে উদ্ধার করবেন এবং তাঁর কাছে পৌঁছাবেন।

উক্ত নারী তখন গোরক্ষনাথকে জানালেন পুরুষের বেশে তিনি কখনই কদলি নগরে প্রবেশ করতে পারবেন না, একমাত্র নাট নাটুয়ারাই কদলিরাজ্যে প্রবেশ করতে পারেন। আর এ জন্যই গোরক্ষনাথ নাটুয়ার বেশ ধারণ করে কদলিরাজ্যে প্রবেশ করেন—

মীনের পুরীতে গিয়া হৈল উপস্থিত।
রত্নময় পুরীখান দেখিলা বিদিত।
ধীরে ধীরে করিয়া ছাড়য়ে সিংহনাদ।
চমকি চমকি উঠে রাজা মীননাথ॥

ধুত ধুত করি দিল সিঙ্গাতে নাদ্রয়।
চমকিত হইল তবে মীননাথের গাও॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ৭৪)

গোরক্ষনাথের এ দুঃসাহস দেখে মীননাথ ভীষণ অবাক হলেন এবং ষোলশ নারী অস্ত্র হাতে তাঁকে ধাওয়া করলেন। অবশেষে গোরক্ষনাথ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বললেন আমি ইন্দ্রের নাটুয়া। এবং মীননাথকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

তুহ্মি হও মোহারাজা তোহ্মার জে স্ত্রীতে রাজা
নাম যশ তোমার কিছু নাই॥
তোহ্মার জে নাম সুনি য়াইলাম রাজধানি
দরসন করিতে তোহ্মরে॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ৯০)

নানা ছলনা, মিথ্যাচার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে গোরক্ষনাথ মীননাথের সাক্ষাৎ পান। শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে গোরক্ষনাথ অবনত মস্তকে গুরুর পদধূলি গ্রহণ করলেন। গোরক্ষনাথের নৃত্যে মীননাথ খুব খুশি হলেন এবং তাকে তার সেবাদাসিনী করার প্রস্তাব দিলেন—

আহ্মাতে ভজিয়া রূপ করহ সাফল।
... ...
সোল সয় কদলি পালি আপনার গুণে।
তোহ্মারে পালিব আহ্মি জেই লএ মনে॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ৯৭-৯৮)

এরপর নানাবিধ পরীক্ষার মধ্যদিয়ে গোরক্ষনাথ নিজের পরিচয় তুলে ধরেন। এ জন্য তাঁকে আলগা আসনে, জলের পরে থালা রেখে নাচতে হয়েছিল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর গোরক্ষনাথ গুরু মীননাথকে এই অপরাধ জগৎ থেকে মুক্তি লাভের জন্য নানা পরামর্শ দিতে থাকেন। প্রত্যুত্তরে মীননাথ বললেন—

গৃহ ভাঙ্গি গেলে পুনি ঘর হইব ধোলা॥
... ...
করিলাম গৃহবাস আর রাজেশ্বর।
নবদণ্ড ছত্র ধরি সিরের উপর॥
সোল সয় কদলি মোরে সেবিয়াছে নিত।
তাহার অধিক য়ার কি য়াছে পৃথিবীত॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ১১০)

মীননাথ মনে করেন কদলিনগরে তিনি যে আরাম আয়েশে দিন কাটাচ্ছেন এত আরাম আয়েশ পৃথিবীতে আর কোথায় পাবেন? এ কারণেই তিনি কদলি নগর ছেড়ে যেতে চান না। 'এহা থাকি সুখ কিবা আছে পৃথিবীতে?' মীননাথ তার শিষ্যকে বলেন পৃথিবীতে জন্মালে মরতে হবে কিন্তু মেগে খাওয়ার সময় ও শক্তি আমার নেই। তিনি আরও বলেন জগৎ ঈশ্বরকেও (মহাদেবকে) তো গঙ্গা গৌরী নাম্নি দুই নারী সারাক্ষণ সেবা করছেন। জগৎ ঈশ্বর যদি গৃহবাসী হতে পারেন তাহলে আমার দোষ কোথায়? এর প্রত্যুত্তরে গোরক্ষনাথ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন কামিনীর ভোলে গুরু আপনি সব জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন—

নিস্যাস এড়িয়া গোর্খ হাসি হাসি বোলে।
সব পাসরিয়া গুরু কামিনীর কোলে॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ১৩৫)

গুরুকে এ অপরাধ জগৎ থেকে উদ্ধার করাই ছিল গোরক্ষনাথের একমাত্র ব্রত। গোরক্ষনাথের বিবিধ প্রবোধবচনেও যখন মীননাথের এই কামিনী-কাঞ্চনের মায়া-মোহ থেকে মুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল তখনও মীননাথ বলেছিলেন, আমার আশা ত্যাগ কর। এবং অনুরোধ করেন—

মাগিয়া খাইতে না পারিমু কহিলাম তোহ্মাতে॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ১৩২)

অবশেষে শিষ্য গোরক্ষনাথ মীননাথকে পথ দেখালেন এবং মীননাথ তাঁর সম্বিত ফিরে পেলেন তখন তিনি তার রাজ পাটেশ্বরী মঙ্গলা ও কমলাকে কদলিনগরের সমস্ত নারীকে নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকতে বললেন—

গোর্খনাথে যদি মোরে দেখাইল তত্ত্ব।
সুখনা গাছেত জেন মেলএ পত্তর॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ বন্দি কৈল নাথে।
অখনে চলি জাঅ তোমরার হোতে॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ১৬২)

মীননাথের এ প্রত্যুত্তরে মঙ্গলা বলেন হে প্রভু তুমি কোন দুঃখে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে এ সংসারে তো সুখের কোন অভাব নেই। তবে কেন তুমি আবার সেই যোগী জীবনে ফিরে যেতে চাইছো ? উত্তরে মীননাথ বললেন—

তোহ্মি সব চলি জাও ঘরে য়াপনার।
সুখ নাহিক আহ্মার নাহিক জোয়ার॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ১৬৩)

ষোলশ কদলি নারী তখন মীননাথের পায়ে ধরে তাকে এ রাজ্য ছেড়ে না যাওয়ার অনুরোধ করেন এবং বলেন-পুষ্পশয্যাতে যিনি নিদ্রা যান, ষোলশ রমণী যার মাথায় ছত্র ধরে রাখেন তিনি কীভাবে যোগী জীবনযাপন করবেন। কদলি নারীদের অভিযোগ তাদেরকে কার কাছে মীননাথ সমর্পণ করে যাচ্ছেন?—

আহ্মি সব কারে দিয়া জাও জোগি হই।
এহি সব রাজ্য দেস দিলা কার ঠাই ॥
কাহারে দিলা প্রভু কদলি অধিকারী।
কাহারে দিলা তুহ্মি ঊয়ারি মেহারি॥
কাহারে দিয়া জাও প্রভু সুবর্ণ ভাণ্ডার।
কাহাতে সপিলা প্রভু বিন্দুক কুমার॥
(সেখ ফয়জুল্লাহ : ১৩২৪ ; পৃ : ১৬৫)

গার্হস্থ্যজীবনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে এমনকি দেবতা ও শাস্ত্রের কাহিনি উল্লেখ করে কদলির নারীগণ মীননাথকে মায়াজালে আবদ্ধ করতে চাইলেন এবং বললেন—

স্ত্রী হোন্তে আছে কোন জান (জনে ?) সতান্তর।
জথ দেখ নারী লৈয়া সবে করে ঘর॥
(সেখ ফয়জুল্লা ; ১৩২৪ : পৃ : ১৬৭)

ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্ম সাধনার চারটি স্তরের মধ্যে গার্হস্থ্যজীবনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, এজন্য দেবদেবী এবং মুনি ঋষিরাও গার্হস্থ্যধর্ম পালন করেন—

স্ত্রী পুত্র দেখ প্রভু থাকিয়া সংসার।
রামের জানকী ছিল অনঙ্গের রতি।
কৃষ্ণের রুক্মিণী সত্যভামা জাম্বুবতী॥
চন্দ্রের রোহিনী শচী ইন্দ্রের জে নারী।
রাবণের মন্দোদরী শিবের গঙ্গা গৌরী॥
গন্ধর্ব্বের রম্ভা নারী শাস্ত্রেত জে দেখি।
পৃথিবীতে কেবা আছে এ সব উপখি॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ১৬৯)

দীর্ঘদিন মীননাথ কদলিনারীদের সাথে অবস্থান করার সুবাদে উক্ত নারীরা মীননাথের প্রাত্যহিক জীবনাচরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। মীননাথের যোগীজীবন সম্পর্কে তাই তারা বেশ শঙ্কিত—

মিলিলে খাইবা অন্ন না মিলিলে উপাস।
… … …
নিতি নিতি খাও প্রভু পঞ্চাস ব্যেঞ্জন।
(সেখ ফয়জুল্লাহ : ১৩২৪ ; পৃ : ১৭০)

স্ত্রীগণের অনুযোগ আমরা (মীননাথকে) সব সময় পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করে তার আহারের ব্যবস্থা করতাম। তার যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না। যোগতত্ত্বে এসব অসম্ভব। যোগী হলে তাকে থাকতে হবে বনের মাঝে এবং সেখানে শৃগাল, শকুনে আক্রমণ করবে। বনের মাঝে সুন্দর পোশাক পরিধান অকল্পনীয় তাই কদলিবাসী মনে করেন মীননাথ সব সময় বিচিত্র বসন পরিধান করে খাটে বসে থাকেন তিনি এত দুর্ভোগ সহ্য করবেন কীভাবে ? এত কিছু বলার পরও যখন মীননাথ তার নিজের অবস্থানে অনঢ় তখন কদলির নারীরা তাদের রাজাকে সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ করার জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। সবশেষে মীননাথের ছোট্ট পুত্র বিন্দুনাথকে তার কোলে দিলেন—

বিন্দুনাথেরে মীনের কোলে দিয়া।
মঙ্গলা কমলা দুই পাসেতে বসিয়া॥
… … …
দুই পাও মুছিয়া করে য়তি বেস।
… … …
কেহএ তাম্বুল জোগাএ সুবর্ণ বাটা ভরি॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ১৭৩)

পুত্রকে কোলে নিয়ে মীননাথ খুব আবেগপ্রবণ হন এবং নারীগণকে দেখে খুব রঙ্গ তামাশা শুরু করেন—

নারীগণ দেখিআ গুরু মনে বড় রঙ্গ।
… … …
স্ত্রী পুত্র লইয়া থাকিতে কুতুহলে।
য়াপনার জোগভঙ্গ কৈলা কোন ফলে॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ১৭৫-১৭৬)

যদিও পার্থিব জগতে গার্হস্থ্যজীবন ধর্ম সাধনার অন্যতম একটি অংশ হিসেবে বিবেচ্য তবুও মীননাথের এ অধঃপতন পাঠককে বিস্মিত করে। গুরুর এহেন অধঃপতনে গোরক্ষনাথ ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। তিনি মীননাথের পুত্র বিন্দুনাথকে হত্যা করেন। এতে রাজা মীননাথ এবং কদলি নারীরা খুবই ব্যথিত হলেন, কাঁদতে কাঁদতে মীননাথ বলেন বৃদ্ধকালে পুত্র শোক শরীরে আর সহ্য হচ্ছে না। তখন গোরক্ষনাথ যোগবলে আবার তার গুরু ভাই বিন্দুনাথকে জীবিত করেন। এরপরও যখন কদলি নারীরা মীননাথকে চতুর্দিক ঘিরে ফেলে তখন গোরক্ষনাথ যোগবলে কদলিনারীদের বাদুর করে আকাশে উড়িয়ে দেন। মধ্যযুগের কাহিনিকাব্যে এরূপ অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। গোরক্ষনাথের এ সকল কলাকৌশল দেখে মীননাথ মুগ্ধ হলেন—

ভ্রম ভাঙ্গিল মীন হ্ইল চেতন॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ১৯৭)

মীননাথ স্বপ্নের জগৎ থেকে জেগে উঠলেন এবং তিনি দিব্যজ্ঞান ফিরে পেলেন। তারপর তিনি শিষ্য গোরক্ষনাথ এবং পুত্র বিন্দুনাথকে নিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। পুত্র বিন্দুনাথও যোগীজীবনে নাম লিখালেন এরপর তারা উভয়ে বিজয়া ভুবনে চলে এলেন—

বিন্দুনাথেরে কৈলা আসন আরোহন॥

আসনে তুলিয়া তিন করিলা গমন।
এহি মতে চলি গেলা বিজয়া ভুবন॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ১৯৮)

ভোগতত্ত্ব নয় যোগতত্ত্বই জীবনের চরম ও পরম পাথেয় এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তারা তাদের সাধনতত্ত্বে মনোনিবেশ করেন—

সংসার অসার জান গুরু মাত্র সার॥
তিন গুণ প্রমাণ কারণ মহাশয়।
তাহান সমান গুরু জানিয় নিশ্চয়॥
জ্ঞানাঞ্জন জ্বালে গুরু সোবর্ণের মতে।
ধন্ধ পথ ভাঙ্গি গুরু দেখাইল পথে॥
(সেখ ফয়জুল্লা : ১৩২৪ ; পৃ : ১৯৩)

গোরক্ষ-বিজয় কাব্যে যদিও যোগতত্ত্বের কথা বর্ণিত আছে তবুও সেখানে যোগতত্ত্বের অন্তরালে অদ্ভুত এক সংসার জীবনের চিত্র পরিলক্ষিত হয় যা স্বাভাবিক জীবনে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। এ চিত্র সাধারণ জগতের বাইরে অন্য এক অসাধারণ জগতের চিত্র। এ চিত্রে রয়েছে গার্হস্থ্যজীবনের এক নিভৃত অংশ— নর-নারীর দৈহিক মিলনমুখর ইন্দ্রিয়বিলাসী জীবনের রূপকার্থ-নিহিত পরিচয়। অশন-বসন ও ইন্দ্রিয়-পিপাসা জীবনেরই অনিবার্য অংশ। এই জীবনের অনেকটা অমিতাচার *গোরক্ষ-বিজয়ের* কাহিনিতে বিধৃত হয়েছে। মধ্যযুগের সমাজের এটি প্রধান জীবনাচার নয়, তবে এ জীবনও সমগ্র জীবনধারাই অংশ হিসেবে বিবেচ্য। যে অমিতাচারের রূপায়ণ সমগ্র কাব্যটিতে ঘটেছে—এতে এক অরাজক পরিস্থিতি আমাদের কাছে প্রতিভাত হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, এ-কাব্যের গভীরে রয়েছে প্রখর ধর্মজ্ঞান। আর ঐ ধর্মজ্ঞানেরই রূপকার্থিক রূপায়ণ ঘটেছে কাব্যের মধ্যবর্তী নর-নারীর পারস্পারিক সম্পর্কের কথকতায়। আর এভাবেই মধ্যযুগের গার্হস্থ্যজীবনের এক ভিন্নমাত্রিক পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে এ-কাব্যে।

আকর গ্রন্থ :

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত সেখ ফয়জুল্লা-প্রণীত (১৩২৪) *গোরক্ষ-বিজয়*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা

সহায়ক গ্রন্থ :

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৩) *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পর্ব, তৃতীয় সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলিকাতা-৭৩

” (১৯৯৫) *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, খ্রীষ্টীয় দশম থেকে বিংশ শতাব্দী, পুনর্মুদ্রিত, নতুন সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলিকাতা-৭৩

আহমদ শরীফ (এপ্রিল ১৯৭৭) *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা

” (নভেম্বর ২০০৮) *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

গোপাল হালদার	(মে ১৯৮৬) *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রথম খণ্ড, (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) মুক্তধারা, তৃতীয় প্রকাশ
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	(ফাল্গুন ১৩৭১) *বাংলা সাহিত্যের কথা*, (দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ), প্রথম সংস্করণ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	(১৯৯৯) *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*, নব সংস্করণ, ওরিয়েণ্ট বুক. কো. লি. কলিকাতা-৭৩
সুকুমার সেন	(১৯৭৫) *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা-০৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মঙ্গলকাব্যে বাঙালি সমাজের মন ও মনন, জীবন ও জীবনবোধ, পারিবারিক তথা গার্হস্থ্যজীবন-দর্শন উপস্থাপিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের ব্যাপ্তিকাল চৈতন্য-পূর্ব যুগ হতে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্রের সময় পর্যন্ত প্রায় চারশ বছরের। এ সময় পরিসরে বাঙালির সমাজ ও জীবন চিত্রে নানা পরিবর্তন এসেছে। পাঠান শক্তির অবসানে মুঘলসাম্রাজ্য বাংলার দিকে হস্ত প্রসারিত করলে গ্রাম প্রধান বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে রাজনৈতিক ঘনঘটা সাময়িক ছায়াপাত ঘটালেও পরবর্তীতে তা লঙ্কাকাণ্ডে পরিণত হয়নি। সমাজ ও পারবারিক জীবনধারা শম্বুক গতিতেই প্রবাহিত ছিল। ফলে গ্রামাঞ্চলে তেমন কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা ওলট-পালট না হওয়ায় এই চারশ বছরের বাংলার সামাজিক অবস্থা অতীতানুসারীই ছিল বলা যায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের জ্ঞাত, অজ্ঞাত, খ্যাত, স্বল্পখ্যাত বহু কবি *মনসামঙ্গল*, *চণ্ডীমঙ্গল*, *অন্নদামঙ্গল*, *ধর্মমঙ্গল*, *শিবমঙ্গল*, *কালিকামঙ্গল* কাব্য রচনা করেন। এ ছাড়াও *শীতলামঙ্গল*, *রামমঙ্গল*, *ষষ্ঠীমঙ্গল*, *বাসুলীমঙ্গল* প্রভৃতি অপ্রধান মঙ্গলকাব্যও রচিত হয়। সব ধরনের মঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন বর্ণিত আছে। অলৌকিক শক্তির অধিকারী এ সকল দেব-দেবী ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে অশেষ কল্যাণ সাধন করেন; বিপদকালে ভক্তকে সাহায্য করেন, রোগ শোক থেকে মুক্ত করে ভক্তকে সুখী রাখেন। আর যারা এ সকল দেব-দেবীকে অমান্য করেন তাদের প্রতি দেব-দেবী প্রতিহিংসাপরায়ণ ও ক্ষুব্ধ হন ফলে তাদের জীবনে নেমে আসে চরম দুঃখ-দুর্দশা। মঙ্গলকাব্যে দেবতার প্রতি যারা ভক্তিপরায়ণ তারা জীবনে অনেক ধন-দৌলত এমনকি রাজসিংহাসনের অধিকারীও হয়েছেন। এর বিপরীত চিত্রও প্রত্যক্ষ করা যায়, *মনসামঙ্গল* কাব্যে চাঁদ সদাগর দেবী মনসার সন্তুষ্টি বিধানে আগ্রহী ছিলেন না বলে তাকে হারাতে হয়েছে সাত পুত্র সন্তান এবং চৌদ্দ ডিঙা এবং ভোগ করতে হয়েছে অশেষ দুঃখ-দুর্দশা ও যন্ত্রণা।

মঙ্গল কথাটির আভিধানিক অর্থ কল্যাণ। বিশেষ এক রাগিণী বা সুরের নামও মঙ্গল। যে কাব্যের কাহিনি শ্রবণ করলে মানুষের সমস্ত অকল্যাণ দূর হয়, মানুষ পাপ মুক্ত হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মুক্তি লাভ করে তাকেই মঙ্গলকাব্য বলে। মঙ্গলকাব্যগুলি সাধারণত এক মঙ্গলবারে গীত হয় এবং পরের মঙ্গলবারে শেষ হয়। মঙ্গল শব্দটির মধ্যে বিজয় অর্থও নিহিত আছে। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা বেশির ভাগই স্বর্গের দেবশিশু, নর্তক বা নর্তকী, বিভিন্ন কারণে শাপগ্রস্ত হয়েই মর্ত্যভূমে তাদের আগমন, মর্ত্যলীলা শেষ করে আবার স্বর্গে প্রত্যাগমন। মঙ্গলকাব্যে সাধারণত কতগুলি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, এ বৈশিষ্ট্যগুলিকে মোটামুটি চারটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশ ; বন্দনা, এই অংশে বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা বা দেবস্তুতি থাকে। দ্বিতীয় অংশ ; গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, এই অংশে থাকে কবির আত্মপরিচয়। মধ্যযুগে রচিত প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যের গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ হিসেবে দেব-দেবীর স্বপ্নাদেশ বর্ণিত আছে। তৃতীয় অংশটি হলো দেবখণ্ড। এই অংশে পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে লৌকিক দেবতার সম্পর্ক স্থাপনের ইতিহাস বর্ণিত হয়। চতুর্থ অংশের নাম নরখণ্ড। এ খণ্ডে বর্ণিত হয় স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত দেবতার পূজা প্রচারের নিমিত্তে কোনো কোনো দেবতার শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যধামে জন্মগ্রহণের কাহিনি। *চণ্ডীমঙ্গলের* কালকেতু ও ফুল্লরা যথাক্রমে দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধূ নীলাম্বর এবং ছায়া। *মনসামঙ্গলের* বেহুলা ও লখিন্দর হলেন উষা ও অনিরুদ্ধ। *মনসামঙ্গলের* কাহিনিতে দেখা যায় অভিশাপপ্রাপ্ত স্বর্গের নর্তক ও নর্তকী মর্ত্যে বণিকের ঘরে জন্ম নিলেন। দেবীর স্বপ্নাদেশে তাদের মর্ত্যলোকে পূজা প্রচারে নিয়োজিত থেকে দেবীর প্রতিষ্ঠা তথা মর্ত্যধামের লীলা শেষে স্বর্গালোকে প্রত্যাবর্তন। *মনসামঙ্গল* কাব্যে বিশেষ করে দেবী মনসার চরিত্রে মানবীয় গুণের অভাব প্রদর্শিত হয়েছে। মনসার চরিত্র অত্যন্ত রূঢ়, হিংস্র, অত্যাচারপ্রবণ এবং ন্যায়নীতি বর্জিত। আঙ্গিকগত দিক থেকে নরখণ্ডে কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—এর মধ্যে বারোমাস্যা ও চৌতিশা অন্যতম। বারোমাস্যায় নায়িকার বারোমাসের সুখ-দুঃখের কাহিনি বর্ণিত হয়। চৌতিশায় রয়েছে বিপন্ন নায়ক-নায়িকা কর্তৃক চৌত্রিশ

অক্ষরযোগে ইষ্টদেবের স্তুতি। এছাড়াও মঙ্গলকাব্যে নায়িকার সাজ-সজ্জা, রন্ধন প্রণালী, বিবাহ অনুষ্ঠান ও নানা রীতিনীতির কথাও বর্ণিত হয়েছে।

মনসা ও *চণ্ডীমঙ্গলে* আছে ব্যবসা-বাণিজ্যের বর্ণনা। বাঙালিরা এককালে দেশ-বিদেশে সমুদ্র পথে বাণিজ্য যাত্রায় যেতেন তারই ক্ষীণ স্মৃতির অতিরঞ্জন ঘটেছে মঙ্গলকাব্যগুলোতে। এছাড়াও মঙ্গলকাব্যে কিছু অলৌকিক এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনার অবতারণা ঘটে যা চোখে পড়ার মতো। যেমন, শিবঠাকুর বৃষভবাহনে অবলীলাক্রমে শূন্যমার্গে সমস্ত পথ অতিক্রমণের পর ছোট্ট একটি নদী অতিক্রমের জন্য খেয়াঘাটে পাটনির শরণাপন্ন। সেই পাটনি আর কেউ নন শিবেরই সহধর্মিণী দেবী চণ্ডী। আবার, মনসা বা অপর কোনো কন্যার জন্ম গ্রহণের পর মুহূর্তেই তার রূপ বর্ণনার ফলে তিনি দেবশিশু না-হয়ে হয়ে উঠেছেন ভরা যৌবনবর্তী সুন্দরী রমণী মূর্তি—এই রকম যুক্তিহীন অবাধ কল্পনাময় বর্ণনা মঙ্গলকাব্যে পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া মঙ্গলকাব্যে যুগচেতনা ও গোষ্ঠীভাবনার ছায়াপাত লক্ষ করার মতো। মঙ্গলকাব্যের বাহ্যরূপটি পৌরাণিক হলেও দেবদেবীর ইতিহাস, ঘরসংসার, দ্বন্দ্ব ও প্রাধান্য লাভের চেষ্টা, অকারণে অভিশাপ প্রদান, জোর করে মানুষের ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার এবং পূজা আদায়ে বাধ্য করা মঙ্গলকাব্যের নৈমিত্তিক বিষয়। মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর আধিক্য বা প্রভাব বিস্তার ছাড়াও নিহিত থাকে একটি সমাজ, পরিবার ও পারিবারিক জীবনের বিশ্বাস, আদর্শ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ইতিহাস। মঙ্গলকাব্যের উপলক্ষ্য দেবতা কিন্তু দেবতার মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয় মর্ত্যলোকের জীবনালেখ্য। দেবতার মাহাত্ম্যসূচক কাহিনিতে মানবিক আবেদন, অনুভূতি ও সমাজচৈতন্য এমনভাবে গ্রথিত যা নিত্যকালের সাহিত্যবস্তুতে পরিণত হওয়ার উপযোগিতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। নায়কের পৌরুষ, সাহস, বীরত্ব, শৌর্য, বীর্য এবং নারীর ধৈর্য, সতীত্ব, শোকোচ্ছ্বাস, দুঃসাহসিক অভিযান, দাম্পত্যজীবন প্রভৃতি গুণ তাই একে কৌতূহলোদ্দীপক আকর্ষণীয় আখ্যানে পরিণত করেছে। মঙ্গলকাব্য বাংলার রসমধুর হাসি-কান্নার সম্পদ। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যও দোষে-গুণে রক্তমাংসে গড়া মানুষের মতো। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, 'মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তা মানুষের সঙ্গে মানুষেরই দ্বন্দ্ব, অদৃশ্য কোনো শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের দ্বন্দ্ব নয়'। (আশুতোষ : ২০০৯ ; পৃ : ১২৯) সকল মঙ্গলকাব্যের গঠনপ্রকৃতিতে বা রূপায়ণে একই ধরনের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা, বিশ্বকর্মা কর্তৃক পুরী নির্মাণ, হনুমানের বিক্রম ও মল্লযুদ্ধ, শিক্ষাদান, পৌরাণিক দেব-দেবীর রূপবর্ণনা, কুলবধূর পতিনিন্দা, বারোমাস্যা, দেবমহিমাসূচক চৌতিশা বর্ণনা মঙ্গলকাব্যে পরিলক্ষিত হয়। কবি মাত্রই সমাজের একজন দায়িত্বশীল মানুষ। সমাজ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই কবির সৃজনী শক্তির উদ্ভব ঘটে। সামাজিক দায়বদ্ধতা কবিকে সৃষ্টিশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে। কেউ তাঁর শেকড়কে অস্বীকার করতে পারেন না। মাটির বন্ধন তাঁকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে রাখে সেই বন্ধন ছিন্ন করা প্রায় অসম্ভব। এক কথায় কবি বাস্তববাদী বা কল্পনাপ্রবণ যাই হোন না কেন, সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে কিছু না কিছু সামাজিক ও প্রাকৃতিক কারণ থাকে। প্রকৃতিগত কারণেই বাংলাদেশ নদীনালা, খালবিল ও বনজঙ্গলে ভরা; ঝড় বৃষ্টি, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, নদীভাঙন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ দেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। এছাড়া বাঘ, কুমির, সাপ প্রভৃতি হিংস্র জীবজন্তুর উৎপাত তো আছেই। তৎকালে 'কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক ছোঁয়াচে ব্যাধির প্রকোপে প্রায়শই মানুষের প্রাণহানি ঘটত'। (শ্রীমন্ত ; ২০১১ : পৃ : ২৪০) এত অত্যাচারের সাথে আরও যুক্ত ছিল রাষ্ট্রিক উপদ্রব এবং বিপর্যয়। নানাভাবে বিপর্যস্ত বাঙালি ছিল বড় অসহায়। এই দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় মানুষগুলি এহেন বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন দেবতার কাছে মুক্তির প্রার্থনা করে। প্রসঙ্গত অরবিন্দ পোদ্দারের মতামত প্রণিধানযোগ্য :

'নবজাত শিশুদের জীবনরক্ষা ও লালন-পালনের জন্য ষষ্ঠীদেবীর কল্পনা, পার্থিব সুখ-সম্পদ ও অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য সর্বপ্রকার বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য মঙ্গলচণ্ডী ও সত্যনারায়ণের আর্বিভাব, রোগ-শোক নিবারণের জন্য, নিঃসন্তান মাকে সন্তান দানের জন্য এবং অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টিদানের জন্য মানুষ ধর্মঠাকুরের পূজা করে। আর বাঘ ও সাপের ভয়ে ভীত মানুষ দক্ষিণরায় ও মনসাদেবীর পূজা করে বাঘ ও সাপের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে'। (অরবিন্দ ; ২০05 : পৃ : ৫৯)

নানাভাবে উপদ্রুত বাংলার মানুষ তাই মনে করত এ সমস্ত আধিভৌতিক বিপর্যয়ের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো অদৃশ্য পরাক্রমণশালী দেবতার হাত আছে। সেই ক্রুদ্ধ দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। এ উদ্দেশে সাপ, বাঘ ও কুমিরের আক্রমণ থেকে উদ্ধারের জন্য মনসা, দক্ষিণরায় ও কালুরায় প্রভৃতি দেব-দেবীর আরাধনা, ঝড়-ঝঞ্ঝার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য দেবী চণ্ডী এবং কলেরা ও বসন্ত রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য শীতলা দেবীর প্রার্থনা করে বিপদগ্রস্ত মানুষ। তখন থেকেই মনুষ্য সমাজে এ ধারণা জন্মে যে, উক্ত দেব-দেবীর বন্দনা করলে, বা মহিমাকীর্তন করলে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেন এবং ভক্তকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। মঙ্গলকাব্য রচনার মৌল প্রেরণা সম্ভবত এই ভয়-ভাবনাজাত অহেতুক ভক্তি।

প্রথম পর্বের মঙ্গলকাব্যগুলো কাহিনি, ছড়া, মেয়েলি ব্রতকথা ও পাঁচালি আকারে দীর্ঘকাল সমাজে প্রচলিত ছিল। কবে যে সেগুলো কাব্য আকারে সাহিত্যিক মূল্য অর্জন করেছে তা সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ নেই কিন্তু এসব কাব্য উদ্ভবের পেছনে রয়েছে বাংলাদেশের অধিবাসীদের আধিভৌতিক ভয় ও ভাবনা। আর এ ভয় ও ভাবনাকে পরিপক্বতা দান করেছে রাষ্ট্রিক বিপর্যয় তথা দীর্ঘকাল ধরে চলমান রাষ্ট্রীয় ভাঙা গড়ার জীবন্ত ইতিহাস। বাঙালি আর্য ও অনার্য মিশ্রণে সৃষ্ট একটি সংকর জাতি। আর্য প্রভাব নানাদিক থেকে বিস্তৃত হলেও বাঙালির চিন্তা চেতনা, সংস্কার ও স্বভাবে অনার্য ভাবনা প্রবল ছিল। এ দেশে আর্যদের আগমনের ফলে অনার্যদের ধর্মবিশ্বাস এবং উৎসব অনুষ্ঠান একপেশে হয়ে যায়। জাতি ও সংস্কৃতিতে মিশ্রণ ঘটলেও ধর্মগত দিক থেকে বিরাট ব্যবধান থেকে যায়। আর্যরা উচ্চবর্গের অভিজাত সম্প্রদায় বলে পৌরাণিক শাস্ত্র ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান একচেটিয়াভাবে অধিকার করে। অনার্যরা নিম্ন সম্প্রদায় বলে এদের ধর্মচর্চা এবং সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি উচ্চবর্গের দারুণ অবজ্ঞা ও ঘৃণা ছিল। এভাবে পৌরাণিক ও লৌকিক দেব-দেবী নিয়ে বাঙালি আর্য ও অনার্য দুটি সম্প্রদায় দীর্ঘদিন (প্রায় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত) সমান্তরালভাবে বসবাস করেছে। এরপর সময়ের অমোঘ নির্দেশে এলো তুর্কি আক্রমণ। তুর্কিরা মঠমন্দির, দেবগৃহ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সব ধ্বংস করে অবাধ লুণ্ঠন ও হত্যাযোগ্য চালিয়ে ক্রমশ নিজেদের ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। দেশব্যাপী এই উৎপীড়ন, অত্যাচার, অরাজকতা ও অশান্তির দিনে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ হিন্দু পরস্পর বিভেদ, বিচ্ছেদ, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে চেয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রয়াস সাফল্য পায়নি। এটা আরও প্রবল হয়েছে যখন নিম্নবর্ণের হিন্দুরা উচ্চবর্ণের হিন্দু কর্তৃক প্রত্যাখাত, ঘৃর্ণিত ও অবহেলিত হবার পর দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। তখন হিন্দু সমাজের এহেন অধঃপতন, ভাঙণ ও অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সাধারণ ও উচ্চশ্রেণির মানুষ লৌকিক দেবদেবী ও লৌকিক ধর্মবিশ্বাসকে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

এই সংস্কৃতি সমন্বয়ের অনুকূল মনোভাব থেকেই নিম্নশ্রেণির মানুষেরাও উচ্চশ্রেণির পৌরাণিক দেবদেবী ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করার সুযোগ পেল। মঙ্গলকাব্য যেহেতু দেবলীলা বর্ণনার কাব্য সেহেতু এ সকল কাব্যগ্রন্থে ধর্মতত্ত্ব ও বিভিন্ন কাহিনি-উপকাহিনির সংমিশ্রণ ঘটেছে। সুতরাং একে মিশ্রশিল্প বললেও অত্যুক্তি হয় না। পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনির সংমিশ্রণে সৃষ্ট মঙ্গলকাব্যগুলিকে সংস্কৃত পুরাণের শেষ বংশধর, আখ্যায়িকা মহাকাব্য, ভক্তিকাব্য বা লৌকিক জীবনাশ্রয়ী কাব্য বলে অভিহিত করা হয়। তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মঙ্গলকাব্যে দেবমাহাত্ম্য প্রচারের অন্তরালে মর্ত্যজীবনের মাধুরী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। আর তার সাথে যুক্ত হয়েছে নর-নারীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমসাময়িক জীবন-জীবিকা, মর্ত্যমানবের বিচিত্র আশা-নিরাশার চিত্র। যদিও কাহিনিগ্রন্থনে এবং জীবনলীলা বর্ণনায় কিছু অপ্রাসঙ্গিকতা আছে তবে তা জীবনরসে পরিপূর্ণ। প্রখর জীবনবোধ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সমাজধর্ম ও বর্ণনাভঙ্গির ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি গুণগত বৈশিষ্ট্য মঙ্গলকাব্যে বিদ্যমান। আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন- 'সামগ্রিকভাবে মঙ্গলকাব্য এক একটি সুবৃহৎ সমাজ-দর্পণ' (আশুতোষ : ২০০৯ ; পৃ : ৪১) বাস্তবিকই মঙ্গলকাব্য সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম দলিল। মধ্যযুগে রচিত প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যে সমাজ ও জনজীবন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। বাঙালির আচার-আচরণ,

ঘর-কন্নার কথা, ধর্মবিশ্বাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, পালা-পার্বণ, বিবাহ, স্ত্রী-আচার, অন্নপ্রাশন, শিক্ষা-দীক্ষা, নর-নারীর দাম্পত্যজীবন, মিলন, কলহ, সহমরণ, অলঙ্কার, আহার্য প্রভৃতির নিখুঁত ও নির্ভেজাল বর্ণনা দিয়েছেন কবিরা। মঙ্গলকাব্য প্রধানত তিনটি ধারায় বিভক্ত : *মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল* এছাড়াও আছে *অন্নদামঙ্গল, শিবমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল* প্রভৃতি দেব-দেবী নির্ভর আখ্যানধর্মী কাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

২. ক. কবি বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল*

মনসামঙ্গল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার মধ্যে প্রাচীনতম। অপর দিকে এ পূজার কাহিনি সমাজ ইতিহাসের আদিযুগের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে। সর্পপূজা বিবিধ নিসর্গ পূজারই নামান্তর যা আমাদের সুদূর অতীতে নিয়ে যায়। মনসাপূজার সাথে সর্পপূজার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। হিন্দুপুরাণে সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন মনসা। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে সর্পপূজা প্রচলিত। *দেবীভাগবত, পদ্মপুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাদিতে* সর্পের দেবী মনসার উল্লেখ আছে। মনসা নটরাজ শিবের মানসকন্যা, জরৎকারু মুনির পত্নী এবং আস্তিকের জননী। *বৌদ্ধতন্ত্রশাস্ত্রে* সর্পদেবতার নাম জাঙ্গুলী।

সর্পজীব ও সর্পপূজায় বিশ্বাসী নাগজাতির উল্লেখ প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক বহু গ্রন্থে পাওয়া যায়। ভারতে অস্ট্রিক গোষ্ঠী অপেক্ষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যে সর্পপূজার প্রচলন বেশি দেখা যায়। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় উত্তর ভারতে নাগপূজা বেশ জনপ্রিয় ছিল। ভারতে এখন সমাজের উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন সর্বস্তরেই সর্পপূজার প্রচলন অল্প বিস্তর পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী সর্বপ্রথম সর্পপুজার প্রচলন করেন। একাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলাদেশের অধিকাংশ ভাস্কর্য শিল্পে দেবী মনসার চিত্রফলক অঙ্কিত আছে। মনসা সর্পবিভূষিতা। অরণ্যসংকুল পরিবেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সর্প ভয় থেকেই মনসা বা সর্পপূজার উদ্ভব বলে মনে করা হয়। এছাড়া প্রজনন শক্তির প্রতীক হিসেবেও সর্পের গুরুত্ব আছে বলে সমাজের অনেকেই বিশ্বাস করেন। এ সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—'সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা-পূজার উদ্ভব, এ-তথ্য নিঃসন্দেহ। পৃথিবী জুড়িয়া আদিবাসী সমাজে কোনও না কোনও রূপে সর্পপূজার প্রচলন ছিলই'। (নীহাররঞ্জন : ১৪১৪ ; পৃ : ৪৮৯)

নীহাররঞ্জন রায় রচিত *বাঙ্গালীর ইতিহাস* আদি পর্ব গ্রন্থে আরও একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য-'বাঙলাদেশে যে-সব মনসাদেবীর প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের, ক্রোড়াসীন একটি মানবশিশুর, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ইহাদের প্রত্যেকটিই প্রজনন শক্তির প্রতীক'। (নীহাররঞ্জন : ১৪১৪ ; পৃ : ৪৮৯)

মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য ধারায় *মনসামঙ্গল* কাব্য সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং প্রশংসিত। মহাদেব শিবের সন্তান লাভের বাসনা থেকে মনসার জন্ম। কালীদহে পদ্মপাতার ওপর জন্ম নিলেন শিবের মানসকন্যা পরমা সুন্দরী মনসা। পদ্মপাতায় জন্ম বলে তার নাম হলো পদ্মা। পত্নী চণ্ডীর ভয়ে শিব মনসাকে ঘরে নিলেন না। মনসা আশ্রয় নিলেন পাতালে। সর্পেরা তাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে নিজেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে স্থান দিলেন। একদিন ফুল তুলতে গিয়ে শিব পরিত্যক্তা কন্যা মনসার পরিচয় পেলেন। এবার তিনি কন্যাকে কৈলাসধামে নিয়ে এলেন বটে তবে পত্নী চণ্ডীর ভয়ে মনসাকে ফুলের সাজির মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। দেবী চণ্ডী ফুল নিতে গিয়ে পরমা সুন্দরী এক যুবতী দেখে রাগে, ক্রোধে একেবারে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন। মনসা নিজের (শিবের কন্যা) পরিচয় দিয়েও চণ্ডীর ক্রোধ থেকে রক্ষা পেলেন না। মনসা দেবী চণ্ডীর চোখেরবালি। দিনরাত ঝগড়াঝাটি ও মারামারির অন্ত নেই। প্রতিদিন অমানবিক নির্যাতন ও প্রহার সহ্য করতে হয় মনসাকে। একদিন চণ্ডী এতটাই ক্রুদ্ধা হলেন যে, তার নখের আঘাতে মনসার একটি চোখ বিনষ্ট হলো। সংসারে বিরাজমান চরম অশান্তি দূর করার জন্য মহাদেব মনসাকে সিজুয়া পর্বতে রেখে

এলেন। কন্যার জন্য শিবের চোখ থেকে এক ফোটা জল পড়ল আর এ জল থেকে জন্ম হলো নেতার। নেতা মনসার সহচরী হিসেবে সুখে দুঃখে তার পাশে অবস্থান করতে থাকেন। এক সময় সমুদ্র মন্থনোদ্ভূত বিষপানে শিবের মৃত্যু হয়। মনসা শিবকে বাঁচিয়ে দেন। শিব মহাতপস্বী মুনি জরৎকারুর সাথে মনসাকে বিয়ে দেন। কিন্তু সংসার বৈরাগী স্বামী হঠাৎ মনসার সামান্য অপরাধে (নিদ্রা ভঙ্গের) সংসার ত্যাগ করে চলে যান। স্বামী নেই, বিমাতার যন্ত্রণায় বাবার সংসারে থাকা দুষ্কর তাই নেতার পরামর্শে মনসা মর্ত্যধামে চলে এলেন নিজের পূজা প্রচারের প্রত্যাশায়।

মনসামঙ্গল কাব্যে নরখণ্ডে দেবী মনসা নিজের পূজা প্রচারের জন্যে শৈব্যসাধক চন্দ্রধরের ওপর প্রয়োগ করেন অমানুষিক ও অবর্ণনীয় অত্যাচার। চন্দ্রধর ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্বের, প্রবল প্রতাপের এবং অসীম বীরত্বের অধিকারী। শৌর্যে, বীর্যে ও প্রতাপে চন্দ্রধরের মতো ব্যক্তিত্ব মর্ত্যে বিরল। আত্মশক্তিতে তার বিশ্বাস অবিচল। মহাযোগী ও সর্বত্যাগী ধ্যানের প্রতীক শিব চন্দ্রধরের একমাত্র উপাস্য। চন্দ্রধর মনসার পূজা না দিলে পৃথিবীতে মনসার পূজা অসম্ভব। মনসা তাই নানা প্রলোভনের পসরা সাজিয়ে এলেন মহাপ্রতাপশালী রাজা চন্দ্রধরের কাছে। চন্দ্রধরকে নানা প্রলোভনও দেখালেন, মনসাকে পূজা করলে আধিভৌতিক অভ্যুদয়ের সীমা থাকবে না। কিন্তু মহাজ্ঞানী মহাশক্তিধর চন্দ্রধর তথা চাঁদ নিরাসক্ত উদাসীনতায় মনসা প্রদত্ত সকল প্রলোভন প্রত্যাখান করে বলেন জ্ঞান তাপস শিব ছাড়া তার আর কোনো উপাস্য দেবতা নেই। তিনি আর কোনো দেবতাকে স্বীকারও করেন না। ফলে মনসার ক্রোধ ও রোষ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। মনসা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে চন্দ্রধরের অনিষ্ট সাধনে প্রমত্ত হন। চন্দ্রধরের ওপর নেমে আসে দৈবী প্রতিহিংসার রোষ। প্রথম আঘাত আসে চন্দ্রধরের পরম বিশ্বাসী, শুভানুধ্যায়ী দৈবজ্ঞ ভিষক ধন্বন্তরী ওঝা সঙ্কর গাড়রির ওপর। ওঝার মৃত্যুতে চাঁদের দক্ষিণ হস্ত ভেঙে যায়। এরপর একজন নয়, দু'জন নয় একসাথে ছয়পুত্রের মৃত্যু যন্ত্রণা ধারণ করতে হয় তাকে, যাদের মৃত্যু হয় সর্পদংশনে। স্ত্রী সোনকা এবং ছয় বালিকা পুত্রবধূর করুণ আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। চন্দ্রধর এ শোককে শক্তিতে পরিণত করেন এবং সাধনায় অটুট, অবিচল ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ থেকে পুত্রশোক অস্বীকার করে সমস্ত সম্পদের পসরা সাজিয়ে চৌদ্দডিঙা মধুকর নিয়ে চললেন বাণিজ্যতে। পথে মনসার রোষে কালিদহে চন্দ্রধরের সমস্ত সম্পত্তির সলিল সমাধি হলো। বৈরী পরিস্থিতিতে একমাত্র জীবিত রইলেন চন্দ্রধর। ভীষণ ঝড়ের মুখে নিশ্চিত মৃত্যুর বক্ষে চন্দ্রধর ভাসমান, কালিদহে উত্তাল তরঙ্গ, এমন সংকটকালে মনসার দৈববাণী-এখনও যদি চন্দ্রধর মনসা পূজায় স্বীকৃত হয় তবে তার ছয়পুত্র পুনর্জীবন লাভ করবে, চৌদ্দডিঙা ভেসে উঠবে। অন্যথায় মৃত্যু অনিবার্য। এই নিশ্চিত মৃত্যুর বলয় থেকেও চন্দ্রধর বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন—

চান্দ বলে কাণী তোর লাজ নাই চিতে।
কোন মুখে আইলি তুই মোর পূজা খাইতে॥
যেই হাতে পুজি আমি শঙ্কর ভবাণী।
সেই হাতে পূজা খাইতে চাহ দুষ্ট কাণী॥
যেই হাতে পুজি আমি দেবী দশভুজা।
কোন মুখে চাহ তুমি সেই হাতের পূজা॥
মরণ জীয়ান যদি তুমি করিতে পার।
তবে কেন কাণা চক্ষুর ঔষধ না ধর॥
(বিজয়গুপ্ত ; ২০১১ : পৃ. : ১১৫)

সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জমান চন্দ্রধরের সামনে মনসা পদ্মবন ফেলেন আশ্রয়লাভের জন্য। হৃত চেতনায় প্রাণধারণের সেই সম্বল আঁকড়ে ধরতে গিয়ে হঠাৎ চন্দ্রধরের মনে হয় পদ্মবনের সাথে পদ্মাবতী অর্থাৎ মনসার সংযোগ আছে আর তখনই চাঁদ জীবন লাভের শেষ আশ্রয়টুকুও প্রত্যাখ্যানে দ্বিধাবোধ করেননি। মনসা নিজের স্বার্থেই চাঁদকে শত বিপদের মধ্যেও বাঁচিয়ে রাখেন কারণ চাঁদের মৃত্যু হলে মনসার পূজা মর্ত্যে সম্ভব নয়। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে চাঁদ অনেক কষ্টে এবং বুদ্ধিমত্তার জোরে তীরে আসতে সক্ষম হন।

তীরে উঠে আসার পরেও মনসার প্রতি চাঁদের তীব্র ঘৃণা এবং উপেক্ষা সমান তালে চলতে থাকে। এতৎসত্ত্বেও মনসা সারাটি পথ চাঁদকে লোভের পর লোভ দেখাতে থাকেন আর চাঁদ পূর্ণ ঘৃণায় তা প্রত্যাখান এবং মনসাকে বিভিন্ন ভাষায় গালি দিতে থাকেন। অবশ্য দেবীর স্বার্থেই চাঁদ মরতে মরতে নিজ গৃহে ফিরে আসেন। এবার চাঁদের একমাত্র অবলম্বন, তাঁর আশার প্রদীপ সপ্তম সন্তান লখিন্দর দেবী মনসার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। চাঁদ বেনে যখন গৃহে ফিরে আসেন তখন লখিন্দর নধরকান্তি যুবক হয়ে উঠেছেন। পুত্রের জন্য চন্দ্রধর দেশে দেশে পাত্রীর সন্ধানে ঘটক প্রেরণ করতে থাকেন। অবশেষে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতীর চিহ্নযুক্তা অপূর্ব সুন্দরী এক কন্যাকে খুঁজে পান উজানিনগর সাহেবেনের ঘরে। পাঁজিপুথি দেখে শুভ দিনে লখিন্দর বেহুলার বিয়ে স্থির হলো। কিন্তু ভবিতব্য ছিল বিয়ের রাতে বাসরেই সর্পদংশনে লখিন্দরের এর মৃত্যু হবে। বিয়ের আসরে বার বার সর্প দর্শনে লখিন্দর মূর্ছা যেতে লাগলেন এবং বেহুলা বার বার তার শক্তি প্রয়োগ করে লখিন্দরের জ্ঞান ফিরান। এদিকে চন্দ্রধর লখিন্দরের ভবিতব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য নিশ্ছিদ্র লোহার বাসরঘর নির্মাণ করেন। কিন্তু মনসার অনুরোধে কর্মকার চুলের আকৃতির একটি ছিদ্র রেখে দিলেন যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব নয়। এই ছিদ্র দিয়েই কালনাগিনী বাসরঘরে প্রবেশ করে লখিন্দরকে দংশন করে। সপ্তমপুত্রের মৃত্যুতে পুত্রহারা জননী সোনকার গগনবিদারি আহাজারিতে পুরো চম্পকনগর যেন ক্ষণিকের জন্য থমকে গেল। সোনকাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা তারা হারিয়ে ফেলেন। পুত্রের এ পরিণতির জন্য সোনকা স্বামী চন্দ্রধর এবং পুত্রবধূ বেহুলাকে দোষারোপ করেন। নির্বিকার চন্দ্রধর হেঁতালযষ্টি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন চেংমুড়ি কানির সন্ধানে। আর বেহুলা কর্তব্যে অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে ভেসে গেলেন অকুল সাগরে। জলপথে অশেষ বিপদ, উন্মত্ত ও উত্যক্ত লালসার আক্রমণ থেকে নিছক সতীত্বের বলে বার বার আত্মরক্ষা করে সতী বেহুলা গিয়ে পৌঁছালেন দেবপুরে। সেখানে দুঃসাধ্য সাধনায় (নৃত্য গীতে) দেবতাদের সন্তুষ্ট করে বেহুলা দেবতার আনুকূল্য লাভে সক্ষম হন এবং উদ্ধার করেন নিজের স্বামী ও ছয় ভাসুরের প্রাণ। সেই সাথে উদ্ধার করেন সমুদ্র-তলাশ্রয়ী অতুল ধনসম্পদ এবং চৌদ্দডিঙা। পরিশেষে বেহুলা স্বামী ও ছয় ভাসুরসহ সপ্তডিঙা মধুকরে চড়েই ফিরে আসেন নিজের বাড়ি চম্পক নগরে। সফর সঙ্গী হন দেবী মনসা। সেই একই আব্দার চন্দ্রধরের হাতে এক মুষ্টি পুষ্পার্ঘ্য, চাই মানবীশক্তির দরবারে দেবতার স্বীকৃতিটুকু।

এবার চন্দ্রধরের পরাভবমুহূর্ত ঘনিয়ে এলো, জয়ী হলো পিতৃস্নেহ এবং পরাজিত হলো প্রবল প্রতাপ, দম্ভ ও প্রখর ব্যক্তিত্ব। অবশেষে চাঁদ পুত্রবধূর স্নেহের কাছে হার মানলেন। কিন্তু চাঁদের এ পরাজয় দৈবশক্তির পাদপীঠে মানবীশক্তির আত্মবিলাপ নয়, এ পরাজয় স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, নিষ্ঠা ও সাধনায় পূর্ণ মানবীশক্তির সংবেদনশীলতার কাছে চিরকালের মানবের আত্মসমর্পণ। *মনসামঙ্গল* কাব্যে বেহুলা কেবল চন্দ্রধরের পুত্রবধূই নন মর্ত্যলোকের শ্রদ্ধেয়া রমণীমূর্তির মূর্ত প্রতীকও। তাই বেহুলার নারীশক্তি চন্দ্রধরের পৌরুষের সমগোত্রীয় বা তার চেয়েও বেশি। যে আত্মশক্তি ও দম্ভের প্রতাপে চন্দ্রধর বার বার ব্যর্থ হয়েও ভেঙে পড়েননি, ক্রুদ্ধ আক্রমণে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন, সেই মানবীশক্তিই সার্থক পরিণামরূপে আবির্ভূত হয়েছিল পুত্রবধূর স্নেহের কাছে। দেবপুরী-প্রত্যাগতা বেহুলার এই সার্থকতার মহিমাকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা ছিল না চন্দ্রধরের। তাইতো বেহুলার একান্ত অনুরোধে চন্দ্রধর মনসা পূজায় স্বীকৃত হয়েছিলেন (যদিও বাম হাত দিয়ে ফুল দিয়েছিলেন) কারণ তিনি শিবের ভক্ত ডান হাত দিয়ে কেবল শিবকেই ফুল দেন। এতেই মনসা সন্তুষ্ট হলেন এবং মর্ত্যে মনসার পূজা স্বীকৃত হলো। বস্তুত *মনসামঙ্গল* কেবল দেবী মনসার মঙ্গল-গাথাই নয়—বিদ্রোহী মানবতার যশোগানও। আহমদ শরীফের মন্তব্য এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য- 'মনসামঙ্গলের কাহিনী কর্তৃত্বকামী পরাক্রান্ত দেবতার বিরুদ্ধে আত্মপ্রত্যয়ী স্বাধীনচেতা মানুষের দ্রোহের ও সংগ্রামের ইতিকথা। দেব-মানবের সেই সংগ্রামে মানুষ পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে মাববিকতার মর্যাদা, মহিমান্বিত হয়েছে মনুষ্যত্ব'। (আহমদ শরীফ ; ২০০৮ : পৃ : ৪০১)

মনসামঙ্গল কাব্যের এ জয়গাথা গ্রাম বাংলার বহু কবিকে আকৃষ্ট করেছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের কত কবি যে এই কাহিনি অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেন তা সঠিক ভাবে নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। তবে এ পর্যন্ত

আবিষ্কৃত তথ্যাদি থেকে অনুমান করা যায় যে, কানা হরিদত্তই মনসামঙ্গলের আদি কবি। *মনসামঙ্গল* কাব্যের সন তারিখ যুক্ত প্রাচীনতম লেখক কবি বিজয়গুপ্ত কানা হরিদত্ত সম্পর্কে লিখেছেন :

সর্ব্ব লোকে গীত গাহে না বোজে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।।
হরিদত্তের গীত লোপ্ত পাইল এই কালে।
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৫)

কবি বিজয়গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি। সুতরাং বিজয়গুপ্তের সময়ে যে গানগুলি প্রায় বিলুপ্তির দিকে সেই কবির জন্ম বিজয়গুপ্তের এক-দুই শতাব্দী পূর্বে হবে এটাই স্বাভাবিক এবং গ্রন্থ মধ্যে এমনটিই উল্লেখ আছে। মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, 'কানা হরিদত্ত সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন'। (আশুতোষ : ২০০৯ ; পৃ : ২৪৯)

মনসামঙ্গল এর প্রাচীন কবিদের মধ্যে কানা হরিদত্তের পরেই কবি নারায়ণদেবের নাম প্রথমেই স্মরণ করতে হয়। ইনি *মনসামঙ্গল* কাব্যের একজন সুপ্রাচীন কবিই নন, মঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ কবিও বটে। নারায়ণদেবের কবি প্রতিভা শুধু পূর্ব বঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সমান প্রশংসা অর্জন করেছিল। অসমীয়া ভাষায় লেখা নারায়ণদেবের *পদ্মাপুরাণ* এর পুথিটি পাওয়া গেলেও এমন বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় কাব্যের পূর্ণাঙ্গ পুথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে এবং অনেক ঐতিহাসিকের মতামতের ওপর ভিত্তি করে নারায়ণদেবকে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বলে মনে করা হয়। সম্ভবত বিজয়গুপ্তের কিছুকাল পূর্বে তিনি তাঁর *পদ্মপুরাণ* কাব্যটি রচনা করেন।

মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতাগণের মধ্যে নারায়ণ দেবের পরেই কবি বিজয়গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। এমন কি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সন, তারিখযুক্ত প্রথম *মনসামঙ্গল* কাব্য রচয়িতা কবিগণের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে কোনো কবির নাম বলতে গেলে প্রথমেই কবি বিজয়গুপ্তের নাম বলতে হয়। চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবিগণের মধ্যে বিজয়গুপ্ত একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। এ সকল ঐতিহাসিক তথ্যের প্রমাণ বিজয়গুপ্তের কাব্যে নিহিত। এসব তথ্য থেকে বিজয়গুপ্তের পরিচয় উদ্ঘাটন করা সহজতর হয়েছে। বিজয়গুপ্ত নিজেই কাব্য রচনার কাল উল্লেখ করেছেন তৎকালে প্রচলিত সাংকেতিক রীতিতে। এসব যুক্তি-তর্ক ও তথ্য বিশ্লেষণ করে আহমদ শরীফ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে '১৪৮৪-১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়গুপ্ত তাঁর *পদ্মাপুরাণ* কাব্যটি রচনা করেন। (আহমদ শরীফ ; ২০০৮ : পৃ : ২৬৯) কিন্তু কখন এবং কবে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোথাও উল্লেখ করেননি। সুতরাং বিজয়গুপ্তের কাল নির্ণয় করতে কবির কাব্য রচনার সময়কেই উৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে ধরা হয়। *মনসামঙ্গল* কাব্য রচনার কাল নিয়ে দেশ-বিদেশের বহু প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক, পর্যটক এমন কি স্বনামধন্য পণ্ডিতমণ্ডলী বহু নিবন্ধ, প্রবন্ধ রচনা করেছেন। কিন্তু জন্মসালজ্ঞাপক সুস্পষ্ট কোনো মতামত বিদগ্ধ কোনো পণ্ডিত কোথাও উপস্থাপন করেননি। তাঁর কাব্য রচনার কাল নিয়ে কয়েক ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে দুটি তথ্যকেই প্রধান হিসেবে ধরা হয়। এই দুটি মতবাদের মধ্যে পার্থক্য দশ বছর। দীর্ঘদিন যারা বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তাঁরা কবি বিজয়গুপ্তকে *মনসামঙ্গল* তো বটেই বরং সমস্ত মঙ্গলকাব্যধারার একজন বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমধর্মী কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কবি করুণ-রসাশ্রিত কাহিনির উদ্দাম ভাবপ্রবাহে ভেসে না গিয়ে বিছিন্ন খণ্ড বস্তুকে আশ্রয় করে অগ্রসর হয়েছেন। আর এজন্যই বিজয়গুপ্তের কাব্যে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্রগুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এমনকি কবির তুলির আঁচড়ে দেব চরিত্রগুলিও ধূলি-ধূসরিত মর্ত্যলোকের সামাজিক মানবের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে দেবত্বের লেশ মাত্র নেই। দেবকাহিনি যেন বাংলার গৃহাঙ্গিনায় পরিবেশিত হয়েছে। এর মধ্যে কোনো আদর্শের স্পর্শমাত্র নেই। মনসা, চণ্ডী, শিব প্রভৃতি দেবচরিত্রে সংসার জীবনের চিত্র পর্যবেক্ষণ করলে যে নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায় তার সাথে আমাদের এ সমাজের তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। এই নিখুঁত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই বিজয়গুপ্ত

প্রাক-চৈতন্যযুগের সমাজের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করতে পেরেছিলেন। এই চিত্র কেবল প্রাচীন লোকসাহিত্যের দিক হতেই নয়, বরং বাংলার প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকেও মূল্যবান।

বিজয়গুপ্তের কাহিনিতে তৎকালীন সামাজিক ও পারিবারিক চিত্র অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। চৈতন্যপূর্ব পাঠান রাজত্বের ভৌগোলিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক চিত্রের উত্থান-পতন কাব্যটিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। সামন্তপ্রতাপ, মুসলমান কাজির অত্যাচার, ধনীর বিলাসিতা, জমিদারি সংঘর্ষ, রাখালি সমাজ, রান্না-বান্না, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, বিবাহ-অনুষ্ঠান, কুটিল ও উদ্দেশ্যমূলক ষড়যন্ত্র, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহসহ অনেক আচার-আচরণ ও বিধি-বিধান কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কাহিনি চয়ন, চরিত্র চিত্রণ ও সমাজজীবনের প্রতিবিম্বনে বিজয়গুপ্ত দেবমাহাত্ম্যকে অতিকাল্পনিক বা অবাস্তব জগতের বিষয়বস্তু করে তোলেননি বরং তাঁর কাব্যের দেব-দেবী মর্ত্যলোকের মানুষের সাথে একাকার হয়ে গেছে। গভীর জীবনবোধ এবং তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা তাঁর কাব্যের মূল বিষয়। কাব্যের দেবখণ্ড এবং নরখণ্ড দুটি অংশেই জীবনবোধ সঞ্চারিত হয়েছে। প্রসঙ্গত মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

'বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসও একটি মূল্যবান উপাদান হইয়া রহিয়াছে। এমন কি, তাঁহার পরিকল্পিত দেব-চরিত্রগুলিও তৎকালীন সমাজের এক একটি জীবন্ত মানব-চরিত্ররূপেই অঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে দেবত্বের লেশ মাত্র নাই। বাংলার ধূলিমলিন গৃহাঙ্গিনায় তাঁহার কাহিনীর পরিবেশটি রচনা করা হইয়াছে ; ইহার মধ্যে আদর্শবাদের স্পর্শমাত্রও নাই'। (আশুতোষ ; ২০০৯ : পৃ : ২৬৫)

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন বিজয়গুপ্তের 'ভাষা প্রাচীন ও কতকটা অমার্জিত হইলেও এই কাব্যের পত্রে পত্রে পল্লী-প্রাণের করুণ সাড়া পাওয়া যায়'। (দীনেশচন্দ্র : ১৯৮৬ ; পৃ : ১৯৮) খাঁটি বাঙালি প্রাণের আশা তিনি মিটিয়েছেন। এছাড়া বিজয়গুপ্তের বড় কৃতিত্ব চরিত্র সৃষ্টির অভিনবত্ব। তিনি মানব জীবনের কবি তাই দেবতাকে তিনি দোষেগুণে, রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের মতো করে সৃষ্টি করেছেন। দেবখণ্ডে বারাণসীতে হরপার্বতীর গার্হস্থ্যজীবনের বর্ণনা দিয়ে বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* বা *পদ্মাপুরাণ* কাব্যের কাহিনি আরম্ভ হয়েছে। তাঁর বর্ণনায় পার্বতী মহিষাসুরমর্দিনী নন তিনি এ মর্ত্যলোকের এক বাঙালি গৃহস্থ পরিবারের কুলবধূ। যেখানে পার্বতীকে বৃদ্ধ স্বামী শিব, কার্তিক, গণেশ ও সপত্নীকন্যাকে সামলানোসহ সংসারের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে হয়।

৩. মনসামঙ্গল কাব্যে প্রতিফলিত গার্হস্থ্যজীবন চিত্র

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য বাংলার সমাজ তথা বাঙালির জীবনের দর্পণ স্বরূপ। একটি দর্পণের মাধ্যমে যেমন অতি সূক্ষ্ম কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে অনেক বড় বস্তু খুব স্বচ্ছভাবে দেখা যায় ঠিক তেমনিভাবে মঙ্গলকাব্য পাঠের মাধ্যমে একটি সমাজ, পরিবার, তথা কোনো অঞ্চলের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা অনুধাবন করা যায়। মা ও মাটির সাথে যেমন সন্তানের সম্পর্ক তেমনি মঙ্গলকাব্যের সাথে বাঙালির সম্পর্ক। আর এ জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুভব করেছিলেন—'মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই প্রথম বাঙালীর সামাজিক অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। এ কারণেই মঙ্গলকাব্যসমূহকে বাংলার মাটির সম্পদ (production of the soil) হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে ; কেননা মঙ্গলকাব্যধারার উদ্ভব ও বিকাশ বাংলার লোক-জীবনের জন্ম ও বিবর্তনধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত'। (বাসুদেব ; ২০০৪ : পৃ. : ৮) মোট কথা বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজ বিবর্তনের ধারায় মঙ্গলকাব্যধারা মিশে আছে ওতপ্রোতভাবে। *মনসামঙ্গল* বাংলার মৌলিক কাব্য। লেখকের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, সমাজ, সংসার, ধর্ম, পারিবারিক স্নেহ বন্ধন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন কি জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি কবির গোচরে বা

অগোচরে প্রকাশ পাবে এটাই স্বাভাবিক। কবি বিজয়গুপ্ত পরিবেশ সচেতন কবি, তাঁর রচিত *মনসামঙ্গল* কাব্যের প্রতিটি অংশে বিশেষ করে দেবখণ্ড এবং নরখণ্ডে এর সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে। *মনসামঙ্গল* কাব্যের কাহিনির কুশীলবগণকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে দেবলোকের শিল্পী যাদের বসবাস আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে ইন্দ্রলোকে। স্বর্গাশ্রয়ী দেবদেবী যেমন-শিব-দুর্গা মনসা, নেতা ও নারদ এছাড়া স্বর্গের অন্যান্য দেবদেবী। দ্বিতীয় ভাগ-অর্থাৎ মর্ত্যভূমে চন্দ্রধর-সোনকা, ধন্বন্তরী সঙ্কুর গাড়রি, তারাপদ কর্মকার চাঁদ-সোনকার অন্যান্য কর্মচারি মাঝি-মাল্লা দক্ষিণ পাটনের রাজা ও তাঁর সভাসদগণ এবং উজানিনগরে সাহেবেনে ও তার পরিবার-পরিজন। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যবর্তী আর একটি ভাগে আছে ঊষা ও অনিরুদ্ধ এঁরা শাপগ্রস্ত (সম্পর্কে স্বামী ও স্ত্রী) স্বর্গের দেবপুত্র ও দেবকন্যা। এঁদের জন্ম স্বর্গলোকে কিন্তু কর্ম মর্ত্যলোকে। অভিশাপ কাল পূরণের জন্যই স্বর্গ থেকে মর্ত্যে এসে অনিরুদ্ধ জন্ম নিয়েছেন চম্পকনগরের রাজা চাঁদের পুত্র লখিন্দর রূপে এবং ঊষা জন্ম নিয়েছেন উজানিনগরে সাহেবেনের কন্যা বেহুলা বা বিপুলা রূপে। বেহুলা এবং লখিন্দর *মনসামঙ্গল* কাব্যের নায়ক এবং নায়িকা।

৩.১ দেবখণ্ড বিধৃত গার্হস্থ্যজীবন

মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা শিবকন্যা হিসেবে পরিচিতা। কিন্তু মনসার জন্ম সমাজ সংসার বর্হিভূত। কালিদহে পদ্মবন বিহাররত অবস্থায় শিবের সম্মুখে চণ্ডী ত্রিলোকমোহিনী নারীরূপে উপস্থিত হলেন। চণ্ডীর এ মনোহারিণী রূপ দেখে কামার্ত শিবের শুক্রস্খলন হলো। দেবগণও যে নারীর মনোহারিণী রূপ দেখে কামার্ত হন শিব তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—

কামেতে হইল ভোল শ্রীফল গাছে দিল কোল
আচম্বিতে খসে মহারস।
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ১৮)

স্খলিত শুক্র পদ্মের দলে রেখে শিব পুষ্প চয়নে মনোনিবেশ করেন। দূর হতে এক পিপাসার্ত পাখি জল ভেবে স্খলিত শুক্র পান করে। কিন্তু উদরস্থশুক্র পাখিটি হজম করতে না পারায় শিবের তপোবনেই তার মৃত্যু হয়। শিব পাখিটির পুনর্জীবন দান করেন এবং পাখিটি শিবের বীর্য উগরে দেয়। শিব সেই বীর্য মৃণালে রেখে দিলে তা সপ্তম পাতালে গিয়ে পৌঁছে এবং এ বীর্য থেকেই মনসার জন্ম হয়—

প্রবেশিল পাতাল পুরী জন্মিল নাগিনী নারী
দেবকন্যা সোন্দর দেখিল॥
বার্ত্তা পাইয়া নাগরাজে. স্বর্গে ধুম ধুমি বাজে,
নাগরাজে পুজিল সম্ভ্রমে॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ১৯)

যদিও চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী মনসার জন্ম হয়নি কিন্তু দেবতাদের আনন্দ-উল্লাসের কোনো কমতি ছিল না। সদ্য প্রসবজাত অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা সন্তানকে দেখে তাঁরা খুবই আনন্দিত। অযোনিসম্ভবা কন্যা মনসার নামকরণ করেন স্বয়ং ব্রহ্মা। এয়োগণ জোকার দিয়ে আনন্দ-উল্লাস করতে থাকেন। অযোনিসম্ভবা এ কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই ষোড়শী কন্যায় পরিণত হয়—

মহাদেবের কন্যা হইল দেবের হরিষ।
তখনে হইল কন্যা ষোড়শ বরিষ।
পুষ্পবনে শিবকন্যা আছে একেশ্বরী।
অযোনিসম্ভবা কন্যা পরম সুন্দরী॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ১৯-২০)

কন্যা জন্মের পরই তার রূপ বর্ণনা এবং ষোড়শ বছরের সুন্দরীতে রূপান্তরিত হওয়া অলৌকিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে জন্মের পর থেকেই মনসা মাতা-পিতার আদর স্নেহ থেকে বঞ্চিতা। তিনি

লালিত-পালিত হলেন কদ্রুর কাছে। নাগমাতা রূপে নাগলোকে মনসার অভিষেক হলে নাগগণের আনন্দ-উৎসবের আর সীমা রইল না। এত আনন্দের পরও মনসা মনে মনে পিতৃদর্শনের জন্য বড্ড ব্যাকুল। একেই হয়ত বলে নাড়ির টান। পিতৃসন্দর্শনে মনসা বাসুকির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নাগগণসহ কমলবনে গেলেন। তবে মনসার জীবনে পিতৃসন্দর্শনের ক্ষণটিও সুখকর হয়নি-'আজন্ম মাতৃস্নেহ বঞ্চিতা অযোনিসম্ভবা মনসা যৌবনে পা দিয়েই পিতার সাক্ষাৎ পেয়েছে পদ্মবনে ভ্রমণের সময়। কিন্তু পিতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের এই বহু আকাঙ্ক্ষিত ক্ষণটিও তার চরম অপমান ও পরম বেদনায় পর্যবেশিত হয়েছে'। (নীলকান্ত ; ২০০১ : পৃ : ৯৭) পদ্মবনে পিতৃদর্শন হলো বটে কিন্তু আত্মভোলা শিব কন্যাকে চিনতে তো পারলেনই না বরং যৌবনবতী রূপসী মনসাকে দেখে শিব মদনাহত হয়ে সকাতরে রমণাভিলাষ ব্যক্ত করেন যা মনসার জন্য ছিল চরম অপমানকর—

তুমি কুমারী সতী   অবশ্য চাহি তোমার পতি
তুমি রূপবতী আমি গুণবান
যে লয়ে তোমার মতি॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ২২)

শিব আত্মভোলা তবে কামে জর্জর। কামকেলিতে শিবের জুড়ি মেলা ভার। সুন্দরী নারী দেখলেই তিনি রমণ প্রার্থী হন। তিনি নিজের কন্যাকে তো চিনতে পারলেনই না উপরন্তু মনসার রমণ প্রার্থী হলেন। শিবের এহেন প্রত্যুক্তিতে মনসা ব্যথিত, মর্মাহত এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে স্বীয় পরিচয় দিতে বাধ্য হন—

বুজিয়া কার্য্যের দশা   প্রণাম হইল মনসা
বোলে তুমি আমার বাপ॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ২২)

অবশেষে মনসা শিবের কাছে তনয়ারূপে আত্মপরিচয় দিলেন এবং নিজের জন্মকাহিনিও বিবৃত করলেন কিন্তু এতে কোনো কাজ হলো না। ত্রিভুবনে আমার কোনো কন্যা নেই এ কথাটি শিব মনসাকে জানিয়ে দিলেন এবং পুনরায় তাঁকে কামকেলিতে আহ্বান করেন। মেয়েরা যে কোনো কালেই, কোনো দেশেই এমন কি দেবলোকেও সুরক্ষিত ছিলেন না তা স্পষ্ট। কোনো না কোনো লম্পট পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি কন্যা সন্তানের ওপর পড়বেই পড়বে। অবশেষে মনসা পিতার আচরণে ভীষণ দুঃখ পেলেন এবং সর্পালঙ্কারভূষিত বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে শিবকে মূর্ছিত করে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেন—

বিষ নয়নে চাইলা জয় বিষহরি।
ঢলিয়া পড়িয়া মহাদেব ত্রিপুরারি॥
(ষষ্ঠীবর ; ১৯৩৬ : পৃ : ২৭)

দেবতাদের অনুরোধে মনসা মহাজ্ঞান মন্ত্র বলে শিবের চৈতন্য ফিরালেন। এরপর পিতা-পুত্রীতে পরিচয় হলে মনসা তাঁর পিতৃত্বের দাবি নিয়ে পিতার সাথে পিত্রালয়ে যাওয়ার জন্য বায়না করলেন কিন্তু শিব দেবী চণ্ডীর ভয়ে মনস্যাকে নিজ আলয়ে নিতে রাজি নন, নাছোড়বান্দা মনসাও তাঁর পিতৃত্বের দাবি নিয়ে পিত্রালয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প। অবশেষে শিব পিতৃস্নেহের কাছে পরাজিত হয়ে মনসাকে আপন আলয়ে নিয়ে গেলেন কিন্তু চণ্ডীর ভয়ে ফুলের সাজির মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। ফুলের সাজিটি শিব গঙ্গার ঘরে রাখলেন। কিন্তু চণ্ডীর চোখ বেশিক্ষণ এড়ানো গেল না। চণ্ডী ফুলের সাজির মধ্য হতে মনসাকে বের করে প্রহার করতে লাগলেন তখনই মনসা অত্যন্ত কাতরভাবে আত্মপরিচয় ব্যক্ত করেন—

মা ভাই কেহ নাহি মনে বড় তাপ।
তোমার কোপ দেখিয়া লুকাইয়া থুইল বাপ॥
কোপে বেয়াকুল হইয়া পাছে নাহি চাও।
উচিত সমন্দে তুমি হও সত মাও॥
কহিলাম সকল কথা যত মনে আইসে।

না জানিয়া কোপ কর দুঃখ পাবা শেষে॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৪৮)

পৃথিবীতে 'সৎমা-সৎসন্তানের দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-কোন্দল চিরকালের ও প্রায় সর্বজনীন, তাই দেবতাও মুক্ত নয় এ দোষ থেকে'। (আহমদ শরীফ ; ২০০৮ : পৃ : ২৭২) আর এ বিদ্বেষের কারণেই চণ্ডী মনসাকে কন্যা রূপে মেনে নিতে পারেননি এমনকি মনসার উল্লিখিত বক্তব্য বিশ্বাস তো করেননি বরং মনসাকে ইঙ্গিত করে কুৎসিত, ভয়ঙ্কর ও ঘৃণিত এক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন—

চণ্ডী বোলে শুন পদ্মা আমার বচন।
মোর স্বামী লোভে তুই আশীষু কি কারণ॥
মোর লোভে তুই পাতিছ নারিকলা।
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৪৯)

নারীলোলুপ শিবের চরিত্র সম্পর্কে চণ্ডী ওয়াকিবহাল বলেই মনসাকে নিয়ে চণ্ডী এমন মন্তব্য করেছেন। এতো কুৎসিত মন্তব্য করেও চণ্ডী ক্ষান্ত না হয়ে মনসাকে দেখে এতটাই ঈর্ষান্বিত ও ক্রোধান্বিত হলেন যে শারীরিক প্রহার করতেও দ্বিধাবোধ করলেন না। মায়ে-ঝিয়ের দ্বন্দ্ব একটি সাধারণ ঘটনা হিসেবে স্বীকৃত। তবে সেই ঝি যদি হয় সতিনের তাহলে তো কথাই নেই। চণ্ডী ও মনসার দ্বন্দ্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, চণ্ডীর প্রহারেই মনসাকে হারাতে হলো তাঁর অমূল্য সম্পদ একটি চোখ। এক পর্যায়ে গঙ্গা এসে মনসাকে উদ্ধার করলেন। শুরু হলো পরিবারে দুই সতিনের দ্বন্দ্ব। পার্বতী বিশ্বাস করেন শিব অতি আদরে গঙ্গাকে মাথায় তুলে রেখেছেন। এটা পার্বতীর জন্য অপমানকর। পার্বতীর ধারণা শিব গঙ্গাকেই বেশি ভালোবাসেন তাকে নয়। অহেতুক সন্দেহ শিব-পার্বতীর দাম্পত্য জীবনে অশান্তির মূল কারণ।

মায়ে-ঝিয়ে দ্বন্দ্বে, সপত্নী বিদ্বেষে শিব-পার্বতীর সংসারে চরম অশান্তি। বিশেষ করে মনসার সাথে চণ্ডীর সম্পর্ক অত্যন্ত বৈরী। ধৈর্যচ্যুত হয়ে সৎমার অত্যাচারে ক্রুদ্ধ মনসা অবশেষে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে চণ্ডীকে মূর্ছিত করে অপমান এবং অত্যাচারের প্রতিশোধ নেন। সংবাদ পেয়ে শিব গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি মনসাকে ডেকে ঘটনার আদ্যোপান্ত অবগত হলেন এবং অনুরোধ করলেন দেবী চণ্ডীকে পুনর্জীবন দিতে। শিব এতটাই স্ত্রৈণ যে স্ত্রীকে সুস্থ করার জন্য মনসাকে অনুরোধ করেছেন অথচ চণ্ডী যে মনসার এত বড় ক্ষতি (একটি চোখ অন্ধ) করে দিল তার কোনো কৈফিয়ত চাননি। শিবের অবস্থা হলো শ্যাম রাখি না কুল রাখির মতো। গৃহসুখ বজায় রাখতে গিয়ে তিনি মনসাকে অনুরোধ করলেন চণ্ডীর জীবন দান করতে অথচ মনসার অঙ্গহানি ও অপমানের কোনো প্রতিকার করলেন না। তারপরও মনসা পিতৃআদেশ শিরোধার্য মনে করে চণ্ডীর জীবন দান করলেন। অবসান হলো মনসা-চণ্ডীর অন্তর্কলহ—

চণ্ডীরে জিয়াই বাপু তোমার কারণ।
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৬৩)

স্ত্রৈণ শিব স্ত্রীকে খুশি করতে এবং সংসারে তথা দাম্পত্য জীবনের শান্তি বজায় রাখতে নিজের কন্যাকে বনবাস দিতেও আপত্তি করেননি বরং মায়ে-ঝিয়ের দ্বন্দ্ব নিরসনে শিব মনসাকেই দোষারোপ করেন। এবং শেষে পারিবারিক অশান্তি নিরসনে তিনি মাতৃহীন অযোনি কন্যা মনসাকে বনবাসে পাঠালেন। শিব স্বীয় কন্যাকে তার প্রাপ্য সম্মান ও সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হলেন। প্রতিশ্রুতি মতো মনসাকে সিজুয়া পর্বতে বনবাসে পাঠানো হলো। বনবাস গমনকালে ক্রন্দনরত শিবের চোখের জল থেকে নেতার জন্ম হলো। মনসা নেতা ও নাগসহ সিজুয়া পর্বতে চলে গেলেন। বিশ্বকর্মা সেখানে মনসার বসবাসের জন্য মনোরম এক পুরী নির্মাণ করে দিলেন। মনসার সঙ্গে চণ্ডীর বিবাদের অবসান হলো। ফিরে এল সংসারে শান্তি। শিব-পার্বতীর সংসারের এ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কবি আমাদের বাঙালি নিম্নবিত্ত পরিবারের চিত্র তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। *মনসামঙ্গল* কাব্যে দৈবী অংশে বা দেবখণ্ডে শিব-চণ্ডীর ঘরকন্না, তাঁদের পরিবারের দৈন্য-দশা, চণ্ডী-গঙ্গার দাম্পত্য কলহ এবং মায়ে-ঝিয়ের দ্বন্দ্ব বর্ণনা করতে গিয়ে কবি যে পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তা অত্যন্ত জীবন্ত এবং প্রশংসনীয়। শিব-চণ্ডীর সংসার চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বিজয়গুপ্ত

আমাদের চির পরিচিত হত দরিদ্র তথা নিম্ন-নিম্নবিত্ত পরিবারের হুবহু চিত্র অঙ্কন করেছেন। সন্তান-সন্ততির ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ, সংসারের আয়-উপার্জন বৃদ্ধিকল্পে একজন আদর্শ স্ত্রীর ভূমিকা পালন এবং বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়ার চিত্রগুলি কবি এত প্রাণবন্ত করে উপস্থাপন করেছেন যা পাঠককে সত্যিই বেদনার্ত করে। দাম্পত্য কলহের বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর অন্যতম কারণ হিসেবে সতিন ও শাশুড়ির যন্ত্রণা ছাড়াও আছে স্বামীর পরনারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের এ আকর্ষণ শুধু মর্ত্যলোকে নয় দেবলোকেও বিদ্যমান ছিল। এমনকি চণ্ডীর পতি স্বয়ং মহাদেবেরও পরনারী ভোগের অভ্যাস ছিল যা চণ্ডীর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। তাইতো নিদ্রাকালে চণ্ডী নিজের আঁচল দিয়ে স্বামীকে বেঁধে রাখেন কিন্তু শিবকে আটকে রাখেন সাধ্যি কার—

আচলে আচল বান্ধি ছিলাম এক ঠাঁই।
তবত রাখিতে নারি পাগলা শিব॥
কপট চরিত্র তোমার না বুজি তব রঙ্গ।
… … …
নিদ্রাতে ভাণ্ডিয়া গেলা মনে সন্দে লাগে॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ. ২৬)

নিদ্রাভিভূত পত্নী চণ্ডীকে ফেলে শিব চলে গেলে জাগ্রত হয়ে শয্যায় স্বামীকে না দেখে চণ্ডীর সন্দেহ হলো। পরস্ত্রী ভোগের মনোভাব শিবের আছে যা চণ্ডীর জ্ঞাত। তাইতো ক্রোধান্বিত চণ্ডীর ক্ষেদোক্তি—

ভূত সঙ্গে শ্মশানে ফিরে মাথায়ে ধরে নারী।
সবে বলে পাগল শিব কত সইতে পারি॥
… … …
ছিড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা ত্রিশূল নেওক চোরে।
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেন ভাড়িলা মোরে॥
… … …
সাত পাঁচ ভাবে চণ্ডী বলে মনের কোপে।
মাঞা করি ধরিব তোমা ডোমনির রূপে॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ২৬)

উল্লিখিত উদ্ধৃতিটিতে চণ্ডী মহাদেবকে অভিশম্পাত করেছেন। দেবীরাও যে মর্ত্যলোকের সাধারণ নারীর মতো স্বামীর আচরণে কষ্ট পেয়ে অভিশাপ দেন তার বর্হিপ্রকাশ ঘটেছে চণ্ডীর উল্লেখিত উক্তির মধ্য দিয়ে। এর মধ্য দিয়ে জীবনবাদী কবি মর্ত্যলোকের নিম্ন নিম্নবিত্ত পরিবারের গৃহবধূর চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। পরনারী ভোগে মত্ত শিবের প্রতি ক্রুদ্ধ পত্নী চণ্ডীর যে সরস বর্ণনা তা মর্ত্যলোকের সাধারণ নারীর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। শিবের গতিবিধি লক্ষ করে পার্বতী স্বামীর চারিত্রিক দৃঢ়তা যাচাইয়ের জন্য নিজে ডোমনির ছদ্মবেশে পরদারলোভী শিবকে পরীক্ষা করেন। গভীর রাতে শিব সরযূ নদী পার হন। সুযোগ বুঝে পার্বতী নিজের স্বামীকে পরীক্ষা করার জন্য ঐ রাতে সরযূ নদীতে খেয়া পারের দায়িত্ব নেন। খেয়াপারের সময় শিব ডোমনির রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে প্রেমালিঙ্গন প্রার্থনা করেছেন। দেবতারাও যে সাধারণ একজন ডোমনির রূপে প্রণয়াসক্ত হন এটা তার বাস্তব উদাহরণ। উচ্চ বর্ণের পুরুষ নিম্ন বর্ণের রমণীর প্রতি আসক্ত হওয়ার বহু নজির বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সেই আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে আজ অবধি এ ধারা সমাজে সমানতালে প্রবহমান। কবি বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* কাব্যের দেবখণ্ডে একজন ডোমনির পরিচয় পাওয়া যায় যার পেশা ছিল খেয়াপার করা। চণ্ডী এ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে মহাদেবকে পরীক্ষা করেছিলেন—

কূলে ডোমনি নাও চাপাইল যখন।
এক দিষ্টে চাহে তবে দেব ত্রিলোচন॥
… … …

তোমার সঙ্গে গৃহবাসে মনের দুঃখ ঘোচে॥
কার্ত্তিকের মায়ে আছে দেবী মহামায়া।
তাহা হইতে তোমারে অধিক করব দয়া॥
ক্ষেণে চঞ্চল দেখি দেবীর মনে হাস।
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩৫-৩৬)

শিবের চারিত্রিক দৃঢ়তা পরীক্ষা করার জন্য পার্বতীর যে প্রচেষ্টা তার মধ্য দিয়ে কবি বাঙালি পরিবারের চিত্র তুলে ধরেছেন। শিব ডোমনির প্রেমে শুধু মুগ্ধ হয়েছেন তা নয় বরং পার্বতীকে বাদ দিয়ে ডোমনিকে নিয়ে সংসার পাতার এবং তাকে পার্বতীর চেয়ে আরও বেশি ভালোবাসার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। স্বয়ং মহাদেবও যে একজন সাধারণ ডোমনির রূপে দিশেহারা তা পার্বতী পরীক্ষা না করলে বিশ্বাসই হতো না। মদনবাণে বিদ্ধ শিব বলপূর্বক ডোমনিকে আলিঙ্গন করতে চান—

মদনে পিড়ীত শিব হাসে কুতূহলে।
শূন্য ঘরে ডোমনিকে ধরিতে চাহে বলে॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩৯)

শুধু ডোমনি নয় দেবলোকে বেহুলার নৃত্য-গীতে মুগ্ধ হয়ে শিব বেহুলার প্রতিও কামদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। স্ত্রৈণতা ও নারী লোলুপতা শিবের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শুধু এ দুটো বৈশিষ্ট্যই যে শিবের জীবনের ব্যর্থতার একমাত্র কারণ তা নয় বরং শিবের পরম ভক্ত সন্তানতুল্য চাঁদকেও তিনি রক্ষা করতে পারেননি, এ ছাড়াও *মনসামঙ্গল* কাব্যে শিবকে দায়িত্ব জ্ঞানহীন দারিদ্র্য নিপীড়িত নিঃস্ব রিক্ত একজন গৃহকর্তা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। যিনি সন্তানদের খাবার ও নিরাপত্তা দিতেও ব্যর্থ হয়েছেন। কাব্যের পৌরাণিক অংশে শিব পার্বতীর দাম্পত্য কলহের মূল কারণ সপত্নী গঙ্গা, যাকে শিব স্ত্রী পার্বতীর ভয়ে জটায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। দেবী পার্বতী স্বামী শিবের চরিত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই যৌবন প্রাপ্তা মনসাকে কন্যা হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। শিবের গতিবিধি এবং তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা পার্বতীর বিশ্বাসের ভিতটাই নষ্ট করে দিয়েছিল। পার্বতীকে উপেক্ষা করে শিব যে ডোমনির প্রেমে মজেছিলেন আসলে তিনি বুঝতেই পারেননি এই ডোমনি আসলে মহামায়ারই মায়া। এই ডোমনি শিবকে তাঁর গৃহে ভোজনের আমন্ত্রণ জানান এবং বলেন যদি তুমি আমার ঘরে ভাত খাও তাহলেই জানবো তুমি আমার প্রাণনাথ। অনেক ভেবে চিন্তে শিব ডোমনির ঘরে ভাত খেতে রাজি হলেন—

আমি রন্ধন করি তুমি করহ ভোজন॥
ডোমনির বাক্যে শিব চিন্তে মনে মন।
রন্ধন করহ তুমি করিব ভোজন॥
… … …
রন্ধন করিল দেবী আপনার মন।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন হইল তখন॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩৯)

বাঙালি নারীরা রান্না করতে সব সময়ই পছন্দ করেন, স্ত্রী ও জননীর ভালোবাসা প্রকাশের অন্যতম উপায় হিসেবে রন্ধন শিল্পের জনপ্রিয়তা সর্বজন স্বীকৃত। পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের উপাচার পুত্র অথবা প্রাণপতির সামনে জননী ও দয়িতারা তুলে ধরতে পারলে নিজেদেরকে ধন্য মনে করতেন। মধ্যযুগের অনেক কবি নারীর রন্ধন কর্মের নিপুণতা, পরিশ্রম, আগ্রহ এবং একনিষ্ঠতা দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন এবং তাদের ধৈর্য, শ্রম ও একনিষ্ঠতার প্রশংসা করেছেন। স্বর্গের দেবীরাও তাঁর প্রিয়কে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করে খাওয়াতেন। রন্ধন শিল্পে দক্ষতা অর্জন নারীদের অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়। স্বয়ং দেবী পার্বতীও পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে স্বামী শিবকে খাওয়ান। ছদ্মবেশী ডোমনি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করে শিবকে খাওয়ান। শিব তৃপ্তির সাথে ডোমনির গৃহে ভোজন সমাপ্ত করেন। শিবকে আমরা সবসময়ই আত্মভোলা হিসেবেই চিনি অথচ তিনি

কামে অত্যন্ত সচেতন তাইতো ভোজন শেষে তাম্বুল মুখে দিয়ে শিব হাসতে হাসতে ডোমনির পাশে গিয়ে বসেন—

ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান কামে অচেতন।
সম্পূর্ণ ভোজন করি করিল আচমন॥
রতিলোভে যায় শিব ডোমনির পাশে।
বলে ধরিতে চাহে অতি মন ত্রাসে॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৪০)

শিবের এহেন নারী লোলুপতা দেখে পার্বতী নিজেকে আর আড়াল রাখতে পারেননি অথবা আড়াল রাখতে চাননি। ঠিক এ মুহূর্তে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। ডোমনির ছদ্মবেশ ত্যাগ করে পার্বতী নিজমূর্তি ধারণ করেন—

কোপে রাঙ্গা দুই আঁখি প্রভাতের রবি।
ডোমনীর ভেস এড়ি তখনে হইল দেবী॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৪০)

শিবের এ কীর্তিকলাপ দেখে পার্বতী রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে মহাদেবকে কটুবাণে বিদ্ধ করলেন-কোন দেব আছে যে ডোমের অন্ন মুখে দেন, কোন দেব ভুতের সঙ্গে শ্মশানে বাস করেন এবং মাথার পাগড়িতে নারীকে ধারণ করেন ? কোন দেব গায়ে ভস্ম মাখেন ? পরিশেষে পার্বতী এক সাধারণ গৃহবধূর মতো স্বামীর এহেন কীর্তিকলাপের জন্য নিজের কপালকে দোষ দিয়ে সখিগণের কাছে বেদনার্ত হৃদয়ের আর্তি প্রকাশ করেন—

চণ্ডী বলে সখি মোর দুঃখের নাহি ওর।
বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পরনারী চোর॥
পরদার-কৌতুকে তাঁহার ঘরে নাহি মন।
বুড়াকালে অপযশ হাসে সর্ব্বজন॥
(বিজয়গুপ্ত ; ২০১১ : পৃ : ৯)

স্বয়ং পার্বতীও মর্ত্যলোকের সাধারণ নারীর মতো সখীদের কাছে পতি নিন্দা করেছেন। আবার পরক্ষণেই সাধারণ বাঙালি রমণীর ন্যায় অনুশোচনায় অনুতপ্ত হয়ে বলেছেন পরনারীতে আসক্তির জন্যই আমি তাঁকে গালি দিলাম। আর এ কারণেই বোধ হয় প্রাণনাথ আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও পত্নীপ্রেমে শিবের জুড়ি নেই। শিব পার্বতীকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। তাইতো মনসার কোপদৃষ্টিতে যখন পার্বতী চেতনা হারিয়ে ফেলেন তখন শিবকে একজন ছোট নির্বোধ বালকের মতো কাঁদতে দেখে দর্শক এবং দেবতারাও লজ্জিত হন—

যত কহে দেবগণে   তাহা কিছু না লয়ে মনে
গৌরী গৌরী ডাকে উচ্চস্বরে।
করুণা করিয়া কান্দে   আপোনার কর্ম্ম নিন্দে
শুনিয়া কাতর দেবগণ॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৫৮)

শিবকে নাবালকের মতো কাঁদতে দেখে নারদ নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন—

নারদ মুনি বোলে শিব কর কোন কাজ।
স্ত্রীর জন্যে বিলাপ কর নহে বাস লাজ॥
চৈতন্য হইবে চণ্ডীর তুমি কান্দ কিসে।
জগতের নাথ তুমি সর্ব্ব লোকে হাসে ॥
স্থির হইয়া রহ তুমি সম্বর ক্রন্দন।
কোন হেতু বাঁচে চণ্ডী তাহে দেও মন॥

(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৫৯)

নারদের যুক্তিতে শিব হচ্ছেন সর্বেশ্বর, জগতের নাথ, অসুস্থ স্ত্রীর জন্য বিলাপ করা শিবের শোভা পায় না বরং স্ত্রীকে কী প্রকারে তাড়াতাড়ি সুস্থ করা যায় এটা নিয়ে ভাবা উচিত। নারদের যুক্তিতে অপ্রাসঙ্গিকতা কিছু নেই তবে প্রেম, ভালোবাসা কোনো যুক্তি মানে না। অবশেষে শিবের চৈতন্যোদয় হয় এবং মনসাকে ডেকে পাঠান চণ্ডীকে সুস্থ করার জন্য। মনসা এসে পিতার কাছে সৎমা কর্তৃক নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন—

মন দিয়া শোন বাপু দুঃখের কথন॥
তোমার দুহিতা হেন দিলাম পরিচয়।
তবুও মোরে প্রহার করে যত মনে লয়ে॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ ৬২-৬৩)

কলহপ্রিয়া চণ্ডী মহাদেব-কন্যা মনসাকে দর্শনমাত্রই যে অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করেন তাতে মনসা ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হন। অবশেষে মনসার বিষ দৃষ্টিতে চণ্ডী ঢলে পড়েন। শেষে পিতার অনুরোধে মনসা চণ্ডীর চৈতন্য ফিরালেন। চণ্ডী মনসার প্রতাপ বুঝতে পেরে নিরস্ত হলেন এবং স্বাভাবিক নিয়মে শিব-পার্বতীর সংসার জীবনে পূর্বের অবস্থা ফিরে এলো—

মা নাহি পদ্মাবতীর বাপের বড় দয়া।
বিক্রম জানিয়া পালেন দেবী মহামায়া॥
দিনে দিনে বাড়ে দেবী ভুঞ্জিয়া বিশাল।
নানা সুখে মনসা আছেন কত কাল॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৬৬-৬৭)

পার্বতী মনসাকে কন্যা হিসেবে মেনে নেন। কন্যা, পুত্র ও স্বামীকে নিয়ে সুখে জীবন যাপন করতে থাকেন।

বিজয়গুপ্ত গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের কবি তাই তাঁর কাব্যে সাধারণত অসচ্ছল ও সচ্ছল সকল মানুষের অন্তর্বাস্তবতা অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে সমাজের নিম্নবিত্ত, রিক্ত নিঃস্ব অসহায় মানুষের অন্তর্জ্বালা ও ক্ষোভ কবির জানা ছিল বলেই এসব অসহায় মানুষের চিত্র কবি তাঁর কাব্যে বেশ কয়েক জায়গায় উপস্থাপন করেছেন।

দেবকন্যা মনসা বড় হয়েছেন। শিব কন্যাকে সৎপাত্রে পাত্রস্থ করার জন্য উদগ্রীব। সন্তান বড় হওয়ার সাথে সাথে মাতা-পিতার চিন্তার সীমা থাকে না, বিশেষ করে কন্যা সন্তান হলে তো কথাই নেই। তাদেরকে সুপাত্রে পাত্রস্থ করা মাতা-পিতা পরম দায়িত্ব বলে মনে করেন। কন্যা যৌবনপ্রাপ্তা হলে বাঙালি মাতা-পিতার উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা বেড়ে যায় বহু গুণে। এ ধরনের উদ্বেগ শিবের মধ্যেও দেখা যায়। একদিন নবোদ্ভিন্ন যৌবনা মনসা স্নানার্থে সরযূ নদীতে গেলে তা দেখে শিব যে মানসিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন তা নিম্নরূপ —

একদিন সখীগণ সঙ্গে করি মেলা।
সরযুর মধ্যে মনসায়ে করে খেলা॥
জলে সাতরে কেহ পায়ে মারে লাথি।
কেহ ডুব পাড়ে কেহ করে হাতাহাতি॥
উদলা মাথার কেশ বুকে বস্ত্র নাই।
অকস্মাৎ সেই পথে মিলিল গোঁসাই॥
প্রথম যৌবন কন্যার রূপের নাহি সীমা।
ঘরে অকুমারী কন্যা বড় অহমিয়া॥
ঘরে অকুমারী কন্যা রহিল আমার।
ভাবিতে চিন্তিতে গেল গৃহে আপনার॥

(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৬৭-৬৮)

কবি এখানে মেয়েদের নদীতে স্নানের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা একান্তভাবেই বাংলার পল্লি এলাকার মা-বোনদের স্নানের দৃশ্য। সরযূ নদীতে মনসাকে স্নানরত অবস্থায় দেখে হঠাৎ শিবের মনে হলো মেয়ে বড় হয়েছে, বিবাহযোগ্য হয়েছে। কবি এখানে বাঙালি পিতার উদ্বেগের সাথে মহাদেবের উদ্বেগের তুলনা করেছেন। কন্যা বিবাহযোগ্য হলে একজন সাধারণ বাঙালি পিতার পিতৃহৃদয়ের যে অনুভূতি হয় সেই অনুভূতির সাথে মহাদেবের পিতৃহৃদয়ের কোনো পার্থক্য নেই বরং বাঙালি পিতার ন্যায় স্বয়ং মহাদেবও যৌবন প্রাপ্ত কন্যা মনসার বিয়ে নিয়ে বড়ই চিন্তিত। এজন্য উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণে মহামুনি নারদকে ডেকে পাঠালেন তিনি। শিব-চণ্ডীর সংসার জীবনের অন্তরালে জীবনবাদী কবি বিজয়গুপ্ত বাঙালি মাতা-পিতার উৎকণ্ঠাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। হিন্দুধর্মে ধর্ম সাধনার যে চারটি মার্গের কথা উল্লেখিত আছে তার মধ্যে গার্হস্থ্যধর্ম অন্যতম। আর গার্হস্থ্যধর্ম পালনের প্রধান শর্তই হচ্ছে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুন্দর সুশৃংখল এবং পবিত্র একটি সম্পর্ক স্থাপন করা। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিবাহাচারের সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে। বিভিন্ন অঞ্চলের মঙ্গলকাব্যের কবিগণ নিজ নিজ অঞ্চলের ও বংশের আচার-পার্বণ ও বিয়ের যে সংস্কারগুলি প্রত্যক্ষ করে থাকেন সেই বৈশিষ্ট্যগুলিই তিনি তাঁর কাব্যে উপস্থাপন করেন। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক কবি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। বিয়ের আচারগুলি অত্যন্ত রক্ষণশীল কারণ এর সাথে মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রশ্ন জড়িত। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধারণা বিয়েতে আচার-পার্বণে যদি সামান্য ত্রুটি হয় তাহলে তাদের সাংসারিক জীবনে তথা তাদের সন্তানের অমঙ্গল হবে কারণ তৎকালে ধরেই নেয়া হতো বিয়ের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সন্তান লাভ এবং বিয়েতে আচার-পার্বণে ত্রুটি হলে সন্তানের ওপর তার প্রভাব পড়ে। বিবাহসংঘটন সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। কেননা এর মধ্যদিয়ে পারিবারিক জীবনধারা রক্ষা পায় এবং ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী তৈরি হয়। এছাড়া পরিবারকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে বৃহত্তর সমাজব্যবস্থা।

প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে একাধিক বিবাহ-আচারের সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে। *মনসামঙ্গল* কাব্যে দুইটি বিবাহ-সংঘটিত হয়েছে; দেবখণ্ডে মনসা বা পদ্মাবতীর এবং অপরটি নরখণ্ডে লখিন্দর-বেহুলার। এ দুটি বিয়ের বর্ণনায় যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হলেও একটি অন্যটির পুনরাবৃত্তি নয়।

দেবখণ্ডে মনসার বিবাহ-সংঘটনে ঘটকের ভূমিকা পালন করেন স্বয়ং মুনি নারদ। মহাদেব নিজে নারদকে ডেকে পাঠান মনসার জন্য যোগ্যপাত্র খুঁজে বের করার জন্য। মহাদেব নারদকে উদ্দেশ্য করে বলেন-প্রাণের দুর্লভ মনসার জন্য উপযুক্ত পাত্রের খোঁজ করো। মহাদেবের আজ্ঞা শুনে নারদ ভীষণ চিন্তায় পড়লেন। তিনি কোথায় বর অন্বেষণ করবেন ? অবশেষে তিনি একটি উপায় পেয়ে গেলেন—

এতেক ভাবিয়া মুনি চলিল সত্বর।
বর অন্বেষণে গেলা সুমেরু পর্ব্বত॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৬৯)

সুমেরু পর্বতে যথাযোগ্য মর্যাদায় নারদকে পর্বতবাসী অর্ভ্যথনা জানালেন, কারণ হিন্দু শাস্ত্রে অতিথি নারায়ণতুল্য তাদেরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা পবিত্রতম দায়িত্ব। পর্বতবাসী পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে মুনিকে বসতে দিলেন। সকলে একত্র বসে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন এ পর্যন্তই কিন্তু সাহস করে নারদ মুনি বিয়ের প্রস্তাব তোলেননি। জরৎকারু মুনি শাপ-শাপান্তর করেন এই ভয়ে। মহাদেব সমস্ত ঘটনা শোনার পর প্রেমের দেবতা মদনকে সংবাদ পাঠালেন—

ঘটাইয়া দেও মোরে শুভ প্রয়োজন।
কন্যা বিহা দিতে চাহি দেবী বিষহরি॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৭০)

যথা আজ্ঞা তথা জয় কামদেব মদন মহাদেবের আজ্ঞা অনুসারে জরৎকারুর হৃদয়ে কামবাণ নিক্ষেপ করেন। এই কামবাণেই জরৎকারু মুনি মোহিত হয়ে বিয়ে করবেন মনস্থির করলেন। জগতের নাথ, সর্বেশ্বর

শিবও তাঁর কন্যার বিয়েতে ছলনার আশ্রয় নিলেন। এর মধ্য দিয়ে জগৎ সংসারে ছলনার মাধ্যমে বিবাহ-সংঘটনের রীতি প্রচলিত হলো—

নারদ বোলে জরৎকারু শুন দিয়া মতি।
মহাদেবের কন্যা আছে নাম পদ্মাবতী॥
… … …
তাহারে করহ বিহা যদি লয় মতি॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৭২)

নারদের এ প্রস্তাবে জরৎকারু সম্মত হলেন এবং বর সাজে সজ্জিত হয়ে চৌদোলে চড়ে অন্যান্য মুনিকে সঙ্গে নিয়ে মহাদেবের আলয়ে উপস্থিত হলেন—

দুই হাতে লইয়া কুশা এইত মুনির দশা
কপালে ধরেন দীর্ঘ ফোটা॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৭৩)

জরৎকারুকে দেখে মহাদেব অত্যন্ত খুশি হলেন এবং অভ্যাগতকে বিনয়পূর্বক বসতে আসন দিলেন। তারপর ধীরে সুস্থে স্বীয় কন্যার বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন—

মহাদেব বোলে মুনি শুন দেবগতি।
তুমি বিবাহ কর মোর কন্যা পদ্মাবতী॥
জরৎকারু বোলে গোঁসাই তুমি জগতের পতি।
তোমার বাক্য লজ্ঘিতে কাহার শকতি॥
এত শুনি হরষিত হইলা শুলপাণি।
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৭৪)

তৎকালে বিয়ের ব্যাপারে মাতা-পিতা ও গুরুজনদের মতামতের প্রাধান্যই ছিল বেশি। পাত্র-পাত্রীর ইচ্ছা অনিচ্ছা, ভালোলাগা খারাপ লাগা বা তাদের মতামতের কোনো গুরুত্বই ছিল না। এমন কি ভদ্রতার খাতিরেও তাদের মতামত নেয়া হতো না। উদ্ধৃতিতে জরৎকারুর সাথে বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা হলেও মনসার সাথে মহাদেব কোনো আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। এতে মনসার কোনো আক্ষেপ নেই, পিতার ইচ্ছাকেই মনসা ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছেন। জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিয়ে ঠিক হলে দেবাদিদেব চণ্ডীকে বিয়ের সমস্ত আয়োজন করার জন্য অনুরোধ করেন।

নিঃস্ব রিক্ত দরিদ্র পরিবার শিবের। দৈনিক ভিক্ষার অন্নে যার সংসার চলে মেয়ের বিয়ের আপ্যায়নের জন্য তাঁর সংসারে কী সামগ্রীই বা থাকতে পারে ? গৃহস্থ শিবের দৈন্য-দশার চিত্র আহমদ শরীফ বর্ণনা করেছেন এভাবে- 'বিজয়গুপ্ত গ্রামবাসী কবি। নিম্নবিত্তের নির্জিত নিরক্ষর মানুষের মধ্যেই তাঁর বাস। তাই নিঃস্ব লোকের অন্তরের ক্ষোভ ও যন্ত্রণার খবর তাঁর জানা ছিল, ছদ্ম পরিহাসের আবরণে সেই ব্যর্থ-সাধের বেদনাকরুণ অভিব্যক্তি মেলে নিঃস্ব বাঙালি গৃহস্থ প্রতীক হর-গৌরীর পদ্মার বিবাহোৎসব সংক্রান্ত সংলাপে' (আহমদ শরীফ ; ২০০৮ : পৃ: ২৭১):

গৌরী বোলে কর কাজ তোমার মুখে নাহি লাজ
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে॥
আইয় আসিবে মঙ্গল গাইতে তারা চাবে পান খাইতে
তৈল সিন্দুর পাইব কথাতে।
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৭৪)

একজন গৃহস্থ কতটা রিক্ত, নিঃস্ব এবং অসহায় হলে তার পারিবারিক অবস্থা এমন করুণ হয় যে নিজের কন্যার বিয়ের প্রাক্কালে এয়োদের সামান্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা তেল, সিঁদুর পর্যন্ত তার গৃহে থাকে না।

গুয়া-পান ভোজনের কথা তো অবান্তর। স্ত্রী চণ্ডীর কথার জবাব দিতে গিয়ে শিব তাঁর নিজের অন্তরের সমস্ত দুঃখ, বেদনা ও অক্ষমতাকে পাথর চাপা দিয়ে স্ত্রীর সাথে হাসি তামাসা করতে ভোলেননি। শিবের এ উক্তি তাঁর দারিদ্র্যের ক্ষোভ চেপে রাখার কৌশল মাত্র—

হাসি বোলে শুলপাণি আইয় ভাড়াইতে জানি
লেংগটা হইয়া মধ্যে দাঁড়াইবো॥
... ...
লজ্জা পাইয়া আইয় যাইবো কে বা পান গুয়া খাবে
তৈল সিন্দুর দিবা কার তরে ॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৭৫)

একজন পিতা কতটা দরিদ্র এবং নিঃস্ব, রিক্ত হলে কন্যার বিয়ের প্রাক্কালে স্ত্রীর সাথে এমন হাস্যপরিহাস ও কৌতুক করতে পারেন তারই দৃষ্টান্ত উল্লিখিত অংশে ব্যক্ত হয়েছে। আপ্যায়নের জন্য পান সিঁদুর ও গুয়ার প্রয়োজন নেই বিয়ের আয়োজন শেষ হলে 'সমাগত আইয়দের সামনে লেংটা হয়ে দাঁড়ালেই অভ্যাগত আইয়গণ লজ্জায় পালিয়ে যাবে গুয়া পানের প্রয়োজন হবে না। কি নির্মম যুক্তি! কতটা অসহায় হলে স্বীয় কন্যার বিয়ের প্রাক্কালে পিতা এমন ছলনা এবং প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে পারেন'। (নীলকান্ত ; ২০০১ : পৃ. ১৭৩)

শিবের এ ছলনা অনেকটা পরিহাসপ্রিয়তারই নামান্তর। তবে একথাও অস্বীকার করা যায় না পরিবারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে আলাপচারিতার প্রয়োজন হয় সেখানে প্রয়োজনে হাসি-ঠাট্টা থাকতে পারে তবে তা কোনো অবস্থাতেই তামাশা নয়, বরং কন্যাদায়গ্রস্ত একজন অসহায় নিঃস্ব, রিক্ত মাতা-পিতার সংসার জীবনের সচিত্র প্রতিচ্ছবি যা অত্যন্ত করুণ এবং মর্মস্পর্শী। এ মর্মস্পশী ঘটনার মধ্য দিয়ে কবি আমাদের সমাজ সংসারে অবস্থানরত হত দরিদ্র পিতার অসহায়ত্বকে তুলে ধরেছেন।

যেহেতু বিজয়গুপ্ত পরিবেশ এবং সমাজ সচেতন কবি তাই তিনি *মনসামঙ্গল* কাব্যে হিন্দু বিবাহরীতি অনুযায়ী সমস্ত আচার-পার্বণ তথা নিয়ম কানুন অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন-মঙ্গলাচরণ, স্ত্রী আচার, অধিবাস, নান্দীমুখ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, ষোড়শমাতৃকা, কন্যাসমর্পণ, শুভদৃষ্টি, সাতপাক এছাড়া বিভিন্ন নৃত্যগীত, অলঙ্কারের ব্যবহারসহ সকল অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। যে কোনো শুভকাজ শুরুর আগে মঙ্গলাচার ব্রত পালন করা হয়।

বর কন্যাকে স্নান করানোর জন্য এয়োগণ নদী হতে জল ভরে আনেন। আইয় সংখ্যা সব সময় বিজোড় থাকে। কুলায় সাজানো থাকে ধান, দুর্বা, হলুদ, সিঁদুর ও মঙ্গল ঘট। উপাদানগুলি বর-কনের মঙ্গলের প্রতীক। বিয়ের বর-কনেকে তিল, তৈল, আমলকি এবং হরিদ্রা দিয়ে শরীর পরিষ্কার করে স্নান করানো হয়—

তিল তৈল আমলকি হরিদ্রা পীঠালি।
লেপিয়া মুনির অঙ্গে কৌতুকে জল ঢালি॥
... ...
স্নান করিয়া মুনি কেশের তুলে জল।
... ...
অগুরু চন্দন গন্ধ' সুগন্ধি বিশেষ।
ধুপের ধুয়া দিয়ে শুকায় মাথার কেশ॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৭৮)

বিয়ের এ আচার-পার্বণগুলো বাঙালির গৃহগত জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মধ্যযুগে বর-কনেকে বিয়ের সাজে সজ্জিত করতে প্রসাধনী হিসেবে ব্যবহৃত হতো অগুরু, চন্দন, ধূপের ধোঁয়া।

কন্যার বিয়ের পূর্বে অকর্মন্য শিব অনেক দায়িত্ববান হয়ে যান। তিনি বিশ্বকর্মাকে দিয়ে কন্যার বিয়ের পূর্বে এক মনোরম পুরী নির্মাণ করেছেন কিন্তু বিয়েতে তো আরও অনেক খরচের ব্যাপার আছে যা নির্বাহ করার আর্থিক সংগতি শিবের নেই। এ নিয়ে শিবের সাথে পত্নী চণ্ডীর আলাপও হয়েছে। তারপরও পত্নী চণ্ডীকে চিন্তিত দেখে শিব একজন দায়িত্ববান স্বামী হিসেবে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন—

শিবে বোলেন গৌরী তুমি না করয় চিন্তা।
ধনের ঈশ্বর কুবের আছে আমার পিতা॥
তাহার ঠাঁই যত চাহি তত পাই ধন।
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৭৮-৭৯)

কন্যার বিয়ের পূর্বে আত্মভোলা শিব অনেক দায়িত্ববান হয়ে গেছেন বলেই মনসার বিয়ের অলঙ্কার তৈরির জন্য তিনি বিশ্বকর্মাকে আদেশ দেন। কারণ প্রত্যেক মাতা-পিতা চান বিয়ের পূর্বে তাঁর কন্যাকে বিভিন্ন অলঙ্কারে বিভূষিত করে জামাতার হাতে সমর্পণ করতে। শিবের আদেশ শিরোধার্য মনে করে বিশ্বকর্মা মনসার জন্য নাকের বেসর, গলার হাসুলি, পায়ের মল, খাড়ু, নূপুর এবং হাতের অলঙ্কার তৈরি করলেন।

বিয়ের পূর্বে বর-কন্যার মঙ্গলার্থে কিছু আচার সংস্কার পালন করতে হয় এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অধিবাস, ষোড়শমাতৃকা, নান্দীমুখ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ এগুলো বিয়ের পূর্বে অথবা কোনো শুভকাজ সংগঠনের পূর্বে পালনীয় হিন্দু সংস্কার বিশেষ। গোধূলি লগ্ন অধিবাসের উত্তম সময়। এমনি এক শুভলগ্নে পদ্মাবতী এবং জরৎকারুর অধিবাস পালিত হয়

কন্যার বিয়ের পূর্বে মহাদেব নিজে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করেন। এ অনুষ্ঠানটি প্রভাত বেলা শুভক্ষণ দেখে করতে হয়। এরপর ষোড়শ মাতৃকা ও নান্দীমুখ পালনের পর বর-কনেকে বিয়ের সাজে সজ্জিত করা হয়। বিয়ের সাজে সজ্জিত হয়ে জরৎকারু কন্যার বাড়িতে উপস্থিত হলে চারিদিকে সাজসাজ রব পড়ে। চারিদিকে পঞ্চস্বরে বাজনা বাজতে থাকে। কাশীর আশপাশের সমস্ত লোক আনন্দ উল্লাস করতে থাকেন।

বিয়ের দিন প্রত্যেক কন্যাকে সাধ্য অনুসারে তার মাতা-পিতা বিভিন্ন বসন-ভূষণ উপহার দেন দৃষ্টিনন্দন করে সাজানোর জন্য। *মনসামঙ্গল* কাব্যে মনসার বিয়েতে মনসাকে নিম্নলিখিত অলঙ্কার এবং ভেষজ প্রসাধনী দিয়ে সাজানো হয়—

ধূপের ধোঁয়া দিয়ারে বাসিত করে কেশ॥
সুবর্ণের কর্ণফুল কর্ণে আনি দিল।
নাকেতে বেসর দিল করে ঝলমল॥
গলায় হার দিল সুবর্ণের পাঁতি।
… … …
পায়ে খাড়ু দিল আঙ্গুলে পাসলি।
চক্ষুতে কাজল দিল যেন নিলোৎপল।
… … …
কনক নূপুর দেবীর তুলিয়া দিল পায়॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৭৯)

আধুনিক যুগের মতো মধ্যযুগে এ্যারোমেটিক প্রসাধনী ছিল না বলেই প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত প্রসাধনী দ্বারা বর-কনেকে সাজানো হতো। এজন্য ব্যবহৃত হতো অগুরু, চন্দন, হলুদ, গিলা, ধূপের ধোঁয়া।

বিয়ের অনুষ্ঠানে নানা বাদ্য বাজছে, জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, এমনি এক মাহেন্দ্রক্ষণে মনসাকে বিভিন্ন অলঙ্কারে বিভূষিত করে গোধূলিলগ্নে বিয়ের আসরে আনা হলো। এয়োগণ বরের কপালে চন্দনের ফোঁটা

এঁকে দিলেন। জামাইকে বরণ করার জন্য শিব ছাঁদনাতলায় পূর্বদিকে মুখ করে জামাইয়ের জানু ধরে বসেন—

কনক আসনে বসিল জামাই অবশেষ ভানু।
পূর্ব্বমুখী হইয়া দেব মহেশ্বর ধরিল জামাইর জানু ॥
বিবিধ বিধানে বরিল শিব জামাই লোকরিত তর্ক ।
মাল্য আভরণ গন্ধ পুষ্প দিয়া আর দিল মধুপর্ক ॥
দেব বিধানে জামাই বরিয়া শিব বসিলা এক কাছে।
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৮১)

শিব মালা, আভরণ ও গন্ধ পুষ্প দিয়ে জামাইকে বরণ করেন। বর বরণের পর মনসাকে ছায়ামণ্ডপের তলে আনা হলো। এর পরের পর্ব সাতপাক। বিয়ের অনুষ্ঠানে সাতপাক অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং দৃষ্টিনন্দন একটি পর্ব। সাতপাক শুধু সাতটি পাক নয় এটি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রতিশ্রুতি দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার শর্ত। সাতপাক পর্বে কন্যা বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন, প্রতিবার একটি করে ফুল স্বামীর চরণে দিয়ে ভক্তি নিবেদন করেন। এ সময় চারপাশে দণ্ডায়মান অতিথিবৃন্দ ফুল দিয়ে বর-কন্যাকে অভিনন্দন জানান। সাতপাকের পর বর-কনের শুভদৃষ্টি সম্পন্ন হয় যা বিয়ের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্ব—

ছায়নি করিতে আসিল মনসা চাহে একদিষ্টে।
স্বামী দেখিয়া মনসার কৌতুক যেন প্রবিষ্ট হইল অন্তরে॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৮১)

সাতপাক শেষ হওয়ার পর জলপূর্ণ মঙ্গল ঘট মধ্যে রেখে বর এবং কনেকে মুখোমুখি করে বসানো হয়। নানা শাস্ত্র বিধানে ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ এবং বেদধ্বনি করে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত করেন। এখানে লক্ষণীয় যে দেবকন্যার বিয়েতে কবি বাঙালি গার্হস্থ্যজীবনের লৌকিক আচার প্রয়োগ করেছেন।

এতদিনের স্নেহে লালিত-পালিত কন্যাকে জামাতার হাতে সমর্পণ করার মধ্যে আছে যেমন আনন্দ তেমনি বেদনাও। এক অর্থে কন্যা সমর্পণের মধ্যদিয়ে মাতা-পিতার অধিকার অনেটাই শিথিল হয়ে যায়। শিব তাঁর কন্যা মনসাকে জরৎকারুর হাতে সমর্পণ করে অনেকটা নিশ্চিন্ত হন-

হাতে কুশা জলে শিব পুরোহিত দেবগুরু।
কন্যা উৎসর্গিয়া হস্তে সমর্পিয়া জরৎকারু ॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৮২)

কন্যা সমর্পণের মধ্যদিয়ে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত হয়। এরপর স্ত্রী আচার এবং সবশেষে জামাই আপ্যায়ন। ভোজন শেষে মুখশুদ্ধির জন্য কর্পূর তাম্বুল খাওয়ার প্রচলন মধ্যযুগে লক্ষ করা যায়। তারপর নব দম্পতি কুসুমশয্যায় রাত্রি যাপন করেন—

কর্পূর তাম্বুলে মুখ শুদ্ধ করি করিল সুখ শয়ন॥
… … …
জয়ে জয়ে মঙ্গলের ধ্বনি কৌতুক বান্ধবের মনে।
স্বামীর সঙ্গে মনসা শুইল সানন্দে বিজয়ে গোপ্তে ভোগে॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২: পৃ : ৮২)

কিন্তু মনসার এ সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। নিদ্রাভঙ্গের অপরাধ এবং ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব তাঁদের দাম্পত্য জীবনকে সুখী হতে দেয়নি। প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী মনসা স্বামী প্রদত্ত অযৌক্তিক আদেশকে মেনে নিতে পারেননি। বাসর রাত শেষ হতে না হতেই স্বামী তাকে গঙ্গার তীর হতে কুষা আনার আদেশ দেন। এছাড়াও জরৎকারু মনসাকে অতি প্রত্যুষে বন হতে ফুল আনতে বলেন। মনসা তখন নিজের অবস্থান উল্লেখ করে নিজ হাতে ফুল আনতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এতে জরৎকারু মুনি মনসাকে ভাঙ্গরার বেটি বলে

অপমান করেন। মনসা নির্বিচারে এ অপমান মেনে নেননি বরং পিতৃনিন্দার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। বাগ্‌বিতণ্ডা শেষে মনসা মুনিকে নিজের বিষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছেন। যুক্তিবাদী মনসা স্বামীর অযৌক্তিক দাবি মেনে না নেওয়ায় দাম্পত্যজীবনে কলহ হয়েছে এবং এর শেষ পরিণতি হয়েছে বিচ্ছেদ।

মনসার বিষের কোপে মুনি তাঁর চেতনা হারিয়ে ফেলেন, শীঘ্রই মহাদেবের কাছে এ বার্তা পৌঁছে যায়। মহাদেব নিজে পদ্মার কাছে এ দুরবস্থার কারণ জানতে চান। কারণ তিনি জানেন মুনির কোনো রোগ শোক নেই। তিনি এও জানেন জরৎকারু মুনি অজর, অমর, বিয়ের রাতেই কেন মুনির এ দুর্দশা? মহাদেবের এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে মনসা বলেন-যত গালি দিল আমি সবটা সহ্য করেছি কিন্তু যখন আমাকে বাপ তুলে গালি দিয়েছেন এটা আমি মেনে নিতে পারিনি। শিব মনসাকে জরৎকারুর চৈতন্য ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। মনসা পিতৃআদেশ শিরোধার্য মনে করে স্বামীর চৈতন্য ফিরাতে মনোনিবেশ করেন। ধীরে ধীরে মনসা স্বামীর শিহরের কাছে গিয়ে মূল মন্ত্র জপ করতে থাকেন। জরৎকারু ধীরে ধীরে বিষমুক্ত হয়ে চৈতন্য ফিরে পান। চৈতন্য ফিরে পেয়ে মুনি রাম রাম বলতে বলতে বলেন মনসার মতো স্ত্রীতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। মুনির এ কথা শুনে মনসা খুব ব্যথিত ও মর্মাহত হন। কারণ একজন স্ত্রীর কাছে স্বামীই তার অলঙ্কার, স্বামী ছাড়া নারীর জীবন অনেকটাই ব্যর্থ। তাইতো মনসা সাধারণ বাঙালি নারীর মতো স্বামীর পায়ে ধরে অনুরোধ করেছেন—

প্রভু মোরে না জাইও ছাড়িয়া ।
আচলের নিধি   আহারে দারুণ বিধি।
অখন আমি মরিব কান্দিয়া।
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ. : ৮৯)

এখানেই বাঙালি গার্হস্থ্যজীবনের একটি জীবনঘনিষ্ঠ চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। শুধু মনসা নয় কন্যার দুঃখে ‘জগৎপিতা’ মহাদেবও দুঃখিত হয়ে জামাতার হাত ধরে মিনতি করতে দ্বিধাবোধ করেননি, মহাদেবের এ বিনয় তাঁকে মর্ত্যলোকের সাধারণ এক পিতাতে পরিণত করেছে। মহাদেবের এ বিনয়েও কোনো ফল হয়নি, জরৎকারু বলেছেন মনসার জন্য আমি গর্বিত তবে এটাও সত্য মনসার মতো ঘরনিতে আমার সাধ নেই। আর বিচ্ছেদ আমাদের ভবিতব্য, আমি তপস্বী বনে জঙ্গলে থাকি, ফলমূল খেয়ে বাঁচি এটাই আমার ধর্ম অর্থাৎ জরৎকারু মুনি সন্ন্যাসব্রত পালনে অভ্যস্ত গার্হস্থ্যধর্ম পালন করা তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। অবশেষে মুনি মনসাকে পুত্র লাভের বর প্রার্থনা করতে বলেন, মনসা পুত্র পুত্র বলে আটবার বর প্রার্থনা করেন, এ বর প্রাপ্তির ফলেই মনসার গর্ভে বাড়তে থাকে অষ্ট নাগ—

নাগ জাতি জন্মিবে সহোদর অষ্ট ভাই।
তাহা হইতে হইবে তোমার অনেক বড়াই॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ. : ৯২)

এই বর দিয়ে জরৎকারু মুনি সাংসারিক সকল মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রেম ও ভালোবাসা পরিত্যাগ করে বনে চলে গেলেন তপস্যার নিমিত্তে। মুনির বরে মনসা গর্ভবতী হলেন, কন্যা প্রথম গর্ভবতী হলে পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি আত্মীয়-স্বজন খুশি হবেন এটাই স্বাভাবিক। মনসার শ্বশুর-শাশুড়ির উল্লেখ কাব্যে না থাকায় তাঁদের প্রতিক্রিয়া পাঠক জানতে পারেননি কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেবের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মনসা প্রথম গর্ভবতী হয়েছেন শুনে মহাদেব ভীষণ খুশি—

মনসা প্রথম গর্ভবতী   আনন্দিত পশুপতি
না চিন্তি অতি কুতূহল।
(বিজয়গুপ্ত : পৃ. : ৯৫)

সাধারণত গর্ভবতী হওয়ার তিন চার মাস পর গর্ভের লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। গর্ভকালীন সময়ে গর্ভবতী মায়ের শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়, এর মধ্যে খাবারে অরুচি, শারীরিক দুর্বলতা অন্যতম—

ভূমিত আচল পাতি নিদ্রা যায় পদ্মাবতী
উঠে বৈসে অতি কুতূহল্॥
দুর্ব্বল পাণ্ডুর গায়ে আড় নয়ানে চায়
তাম্বুল শর্করা ক্ষীর ঘৃত ননি না লয় জিব
বড় প্রিয় জামির ছোলঙ্গ॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৯৫)

একজন সমাজ সচেতন এবং জীবনবাদী কবি বলেই বিজয়গুপ্তের পক্ষে এরূপ সরস বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কবির বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয় মনসার অন্তঃকষ্টকে তিনি নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব করে পাঠককে উপলব্ধির জন্য উপস্থাপন করেছেন। হিন্দু শাস্ত্র-অনুযায়ী গর্ভবতী মায়ের পাঁচমাসে পঞ্চামৃত এবং সাতমাসে সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। মনসাকে পাঁচমাসে পঞ্চামৃত খাওয়ানো হয়। এ-সব পার্বণ পালিত হয় গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গলকামনায়। সন্তান যেন সুস্থ সবল ভাবে পৃথিবীতে আসে সেই প্রত্যাশায়।

প্রত্যেকটি মেয়ের জীবনে পূর্ণতা আসে তার মাতৃত্বে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর একজন মা অতীতের সকল দুঃখ কষ্ট এমনকি প্রসববেদনাও ভুলে যান সন্তানের মুখ দেখে। সন্তানকে দেখে মা যে কতটা আনন্দিত হন তা অবর্ণনীয়। মনসাও তার আট পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর খুব খুশি হয়েছিলেন—

উপজিল অষ্ট জন হরিষে নাচে দেবগণ
আকাশে কুসুম বরিষণ।
দেখি দেখি আষ্টজন মায়ের আনন্দিত মন
বিজয়গুপ্তের সরস রচন॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ. : ৯৬)

একসাথে আট পুত্রের জননী হয়ে মনসার আনন্দ আর ধরে না। সর্বদিক থেকে বঞ্চিতা নারী পুত্রের মুখ চেয়ে, তাদেরকে আকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিমাতার চক্রান্তে মনসা সে সুখ থেকেও বঞ্চিত হতে যাচ্ছিলেন। বিমাতা চণ্ডী ডাকিনী ডেকে মনসার স্তনের দুধ হরণ করিয়েছিলেন।

মহাদেবের কৃপায় অবশ্য মনসা এ যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিলেন। তাই বলা যায়— 'সমাজে মেয়েরা শুধু পুরুষ বা স্বামী কর্তৃকই নির্যাতিত নয়, তারা মহিলা এবং মাতা কর্তৃকও নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন। বিশেষ করে ঘরে যদি সৎমা থাকে, তাহলে মেয়েদের তো দু'কুলেই জায়গা থাকে না বেঁচে থাকার। মনসা আবহমান বাংলার সেই দুঃখী ও বঞ্চিত মেয়েদের একজন, যে আবাল্য ক্রমাগত বিভিন্নমুখী নির্যাতনের শিকার'। (হাননান ; ১৯৯৪ : পৃ : ৮০)

বিমাতার চক্রান্ত এবং সংসারের অশান্তি থেকে মুক্তি লাভের জন্য মহাদেব বাধ্য হলেন মনসাকে বনবাসে পাঠাতে। কন্যার দুঃখে মহাদেবের দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে থাকে আর এই চোখের জল থেকে জন্ম নেয়া কন্যা নেতাকে আদেশ দিলেন মনসাকে দেখাশোনা করার জন্য। সুখে-দুঃখে, সুদিনে-দুর্দিনে নেতা মনসার সহযোগী হয়ে সর্বক্ষণ সাহায্য করেছে।

৩.২ নরখণ্ডে বিধৃত গার্হস্থ্যজীবন

নরখণ্ডে দেবী মনসা মর্ত্যলোকে পূজা প্রচারের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। প্রথমে রাখাল কর্তৃক মনসা পূজা, কাজীর সাথে যুদ্ধ এরপর চাঁদ সদাগর কাহিনি। হাসান হোসেন কাহিনিটি *মনসামঙ্গল* কাব্যের সাথে সম্পৃক্ত নয় বলে অনেকে মনে করেন। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে এরূপ মনে হলেও মনসার মাহাত্ম্য প্রচার এবং তৎকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পটভূমিকায় এ অংশটি বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শাসক বিধর্মীদের প্রতি বেশি

সহানুভূতিশীল হলে তারা বেশি দেবতার প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং বেশি করে দেবীর পূজা অর্চনা করবেন এরূপ একটি ধারণা তখনকার মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর কুয়াচ্ছন্ন রাজনৈতিক অঙ্গনের চিত্র অত্যন্ত নিখুঁতভাবে মঙ্গলকাব্যে উপস্থাপন করা সেই সময়কার কবিগণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু কোনো কবি সমাজ-সংসার বর্হিভূত নন, তাই সমাজ সংসার বাদ দিয়ে কোনো কবির পক্ষে সাহিত্য বা কবিতা রচনা সম্ভব নয় বরং ধর্মতত্ত্বের অন্তরালে তাঁদের লেখনীর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে মানব হৃদয়ের অতলান্তে লুকিয়ে থাকা তৎকালীন বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক জীবনালেখ্য।

বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* কাব্যটি বিশ্লেষণ করলে কুপিতা দেবীর রোষে মানব জীবন কীভাবে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হয়েছে সেটা খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়। এই কাব্যে মনসা হচ্ছেন দৈবী শক্তির প্রতিভূ আর চাঁদ সদাগর এবং তার পুত্রবধূ বেহুলা হচ্ছেন মানবী শক্তির প্রতিভূ। দৈব শক্তির প্রভাবে মানবী শক্তি কীভাবে বিপর্যস্ত এবং ধূলিসাৎ হতে পারে এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা কতটা প্রবল হলে একজন দুর্দশাগ্রস্ত মানব সফলতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করতে পারেন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ চাঁদ সদাগর। *মনসামঙ্গল* কাব্যে মানবীয় অংশে চাঁদ সদাগর কাহিনিতে পিতৃশাসিত সামন্ততান্ত্রিক একান্নবর্তী পরিবার-চিত্র পরিলক্ষিত হয়। একদিকে চম্পকনগরে চাঁদের পরিবার (স্ত্রী, ছয়পুত্র ও ছয়পুত্রবধূ), জ্ঞাতিগোষ্ঠী, সভাসদবর্গ, প্রতিবেশী ও পারিষদবর্গের কাহিনি বর্ণিত আছে অপরপক্ষে উজানিনগরে আছে বেহুলা তথা চাঁদের পুত্রবধূর মাতা-পিতা, ভ্রাতা ও ভাতৃবধূসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশী। চাঁদ শৈব, শিব ছাড়া তার আর কোনো উপাস্য দেবতা নেই। চাঁদ প্রভূত ধন সম্পদের মালিক ; ছয়পুত্র, পুত্রবধূ ও স্ত্রী সোনকাকে নিয়ে তার সুখের সংসার। তার এ সুখের সংসারে অশনিসংকেত হয়ে আসে মনসা। মনসার কোপের ভয়ে চাঁদপত্নী সোনকা গোপনে জালু-মালুর বাড়িতে গিয়ে মনসা পূজা করেন। মানবীয় খণ্ডের শুরুতেই দেখা যায় চাঁদপত্নী নিঃসন্তান। মনসার পূজা দিয়েই সোনকা মনসার বরে ছয়পুত্রের জননী হয়েছেন। সোনকা মনসার প্রতি ভক্তিপ্রাণা আগে থেকেই ছিলেন কিন্তু পরম শৈব চন্দ্রধরের আক্রোশে তিনি লুকিয়ে মনসার পূজা করতেন। একদিন চাঁদ বাণিজ্য থেকে ফিরে বহুমূল্য রত্ন সম্ভারযুক্ত বাণিজ্যতরী বরণ করার জন্য স্ত্রী সোনকাসহ ছয় পুত্রবধূকে সংবাদ পাঠিয়ে জানতে পারলেন সোনকা মনসা পূজায় রত, তরীবরণ করতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এ সংবাদ শুনে চাঁদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। তার অসাক্ষাতে এবং অজান্তে সোনকা মনসা পূজা করছেন জেনে চাঁদ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে পূজা স্থলে গিয়ে পূজার উপাচার লণ্ড-ভণ্ড করে দেন এবং হেতালের লাঠি দিয়ে মনসার ঘট চূর্ণ-বিচূর্ণ করলে মনসার কোপ আরও বেড়ে যায়। প্রথমে মনসা চাঁদের গুয়াবন ধ্বংস করেন। এরপর মনসা একটার পর একটা অঘটন ঘটিয়ে চাঁদের সর্বনাশ করতে থাকেন। চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ, সঙ্কুর গাড়ুরি নিধন, ছয়পুত্র নিধন, সোনকা ও ছয়পুত্র বধূর শোক, গোপনে সোনকার মনসার পূজা ও মনসা কর্তৃক পুত্র লাভের বর, শাপগ্রস্ত উষা ও অনিরুদ্ধের মর্ত্যে আগমন, চাঁদের দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য যাত্রা এবং যাত্রার প্রাক্কালে চাঁদ কর্তৃক সোনকাকে গর্ভপত্র প্রদান, দক্ষিণ পাটনে যাত্রার জন্য চৌদ্দডিঙা সাজানো, ডিঙায় দেশীয় পণ্যসম্ভার উত্তোলন অতঃপর দক্ষিণ পাটনে গমন এবং সেখানকার রাজার সঙ্গে দ্রব্য বিনিময় প্রভৃতি ঘটনা বর্ণনার মধ্যদিয়ে কবি একটি পরিবার, সমাজ তথা একটি রাষ্ট্রের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক ও গার্হস্থ্যজীবনাচরণ অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বিজয়গুপ্ত যে সময় *মনসামঙ্গল* কাব্য রচনা করেন সেই সময় বাংলাদেশে হুসেনশাহি শাসন বিদ্যমান ছিল। বাংলার ইতিহাসে হুসেনশাহি বংশের গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তি ছিলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)। তিনি শাহজাদা হয়ে জন্মগ্রহণ করেননি বরং অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে নিজের যোগ্যতা বলেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ক্ষমতায় বসে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহায়তায় সমাজে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। একজন সুশাসক হিসেবে রাজ্যবিস্তার করেই তিনি ক্ষান্ত হননি বরং রাজ্যকে সুসংহত করেছিলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে তিনি ছিলেন আপোশহীন। তিনি নিজেও সাহিত্যানুরাগী

ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষাকে রাজদরবারে স্থান দেন ফলে তাঁর শাসনামলে বাংলা ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং এই সময়েই কবি বিজয়গুপ্ত *পদ্মাপুরাণ* বা *মনসামঙ্গল* এবং বিপ্রদাস পিপিলাই *মনসা বিজয়* কাব্যটি রচনা করেন। কবি বিজয়গুপ্ত তাঁর কাব্যে হুসেন শাহের মহানুভবতা, শৌর্য, বীর্য, রাজ্যবিস্তার ও প্রজাহিতৈষণার উল্লেখ করে লিখেছেন—

ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসন রাজা পৃথিবীপালক॥
সমরে দুর্জ্জয়ে রাজা বিপক্ষের যম।
দানে কল্পতরু রাজা রূপে কামসম॥
যাহার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে (অ)ধিক।
মুলুক ফতোয়াবাদ বাঙ্গ রোর (তম)সিক॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৮)

কোনো কবি বা সাহিত্যিকের কবিতায় বা সাহিত্যকর্মে স্বজাতি, স্বশ্রেণি, স্বগোষ্ঠী এমন কি তাঁর পারিপার্শ্বিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্য স্থান পাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। বিজয়গুপ্তের কাব্যে তাঁর আশৈশব লালিত ফুল্লশ্রী গ্রামের জীবনবৈচিত্র্য ও কল্পলোকের রূপবৈচিত্র্যও মূর্ত হয়ে উঠেছে—

পশ্চিমে গর্গর নদী পূর্ব্বে ঘণ্টশ্বর।
মধে(্য) ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥
বৈদ্য জাতি বৈসে তথা লেখনে চতুর।
একাদশীর ব্রত করে পূজয়ে ঠাকুর॥
স্থানগুণে জেই বৈসে সেই জ্ঞানময়ে।
হেন (ফুল)শ্রী গ্রামে বাস করেন বিজয়ে॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৯)

বিজয়গুপ্ত তাঁর আত্মপরিচয়ে নিজ গ্রাম ফুল্লশ্রীর রূপবৈচিত্র্য ও বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বর্ণাশ্রম প্রথার সাথে বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণিসহ ধর্মাচারের স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ নীহাররঞ্জন রায় এ বৃত্তিভিত্তিক বিভাজনকে বাংলা-দেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে লিখেছেন—'বৃত্তি বা জীবিকা বর্ণনির্ভর, এবং বর্ণ জন্মনির্ভর। বৃত্তি বা জীবিকা যেখানে বর্ণ অনুযায়ী সেখানে বর্ণ ও শ্রেণী একে অন্যের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়, এবং শ্রেণীর মর্যাদাও সেই সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি অনুযায়ী হইবে তাহাও বিচিত্র নয়'। (নীহাররঞ্জন : ১৪১৪ ; পৃ : ২৬২) সামাজিক স্তরবিন্যাসে ব্রাহ্মণরা ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অনমনীয়। অবস্থানটি ছিল এমন-একপাশে ব্রাহ্মণ ও তার পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় এবং অন্যপক্ষে অন্ত্যজ শূদ্র শ্রেণি। *মনসামঙ্গল* কাব্যে সমাজের অর্থনৈতিক মানদণ্ড শ্রেণিকাঠামোর ওপর নির্ভরশীল ছিল। শীর্ষে ছিলেন বণিক সম্প্রদায়। যদিও সামাজিক কাঠামোর বর্ণবিন্যাসে বণিকেরা ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না তবে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে শ্রেণি নির্ধারিত হতো বলেই ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থায় ওঠা-নামা পরিলক্ষিত হয় এবং বণিক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ধারণ ও লালন করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য সব সময়ই একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রধান হাতিয়ার। আর এ ব্যবসা-বাণিজ্য যেহেতু বণিক সম্প্রদায় নিয়ন্ত্রণ করতেন ফলে সমাজে বণিকদের একচেটিয়া আধিপত্য লক্ষণীয়।

এছাড়াও *মনসামঙ্গল* কাব্যে বিভিন্ন কবি বাণিজ্যনীতির যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্য দিয়েও একটি সমাজের আর্থ-সামাজিক তথা ধনোৎপাদনের পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগের কাব্যে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে বাণিজ্যের সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে। *মনসামঙ্গল* কাব্যের নায়ক চাঁদ সদাগরের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা ছিল মূলত বিনিময়-বাণিজ্য। এই বিত্তশালী বণিক আমাদের দেশজ প্রাকৃতিক দ্রব্য যেমন নারকেল, পান, সুপারি, পাটজাতদ্রব্য, শুকনা খেজুর, মূলা, কলই, হলুদ, বারকোস, ঘৃত,

কবুতর এই সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিনিময়ে চতুর চন্দ্রধর যে সমস্ত দ্রব্য আনতেন তা অত্যন্ত দামি অনুৎপাদনশীল দ্রব্য যা বিলাসদ্রব্য ও চাকচিক্যময়। এগুলি প্রধানত বিত্তশালী পরিবারের ভোগের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

মধ্যযুগে বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে বণিক সম্প্রদায় একচেটিয়া ভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ঐ সময়ে অন্যান্য বৃত্তিজীবীর মধ্যে ছিল ব্রাহ্মণ, তাঁতি, কামার, কৈবর্ত, ওঝা, ঢাকি, তেলি, ছুতার, করাতি, নাপিত, জেলে, ডোম, মালি, গোয়ালা, কুরি, ধোপা, হালচাষী প্রভৃতি সম্প্রদায় যারা তাদের স্ব স্ব বৃত্তি দিয়ে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রেখেছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাখাল, জোলা কারিগর, কাজি-মোল্লা, শেখ-সৈয়দ। বিজয়গুপ্তের কাব্যে মুসলিম সমাজের মধ্যে কাজি হাসান অপেক্ষাকৃত প্রতিপত্তিশালী ছিলেন তাইতো হাসান রাখাল বাড়িতে যখন মনসা পূজা হয় তখন হামলা করেছেন। হিন্দুদের জাতি নাশ করার জন্য নিম্নোক্ত উক্তি করেছেন—

যদি গিয়া লাগ পাম যতেক হিন্দুয়া।
জাতি নাশ করিব আজি গোস্ত খিলাইয়া॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ১২৭)

জাতি নাশ প্রসঙ্গটি যত না রাজনৈতিক বিদ্রুপ তার চেয়ে অধিক সামাজিক। এ অংশে কবি দেশি জোলা ও কাজিদের প্রতি তাঁর শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করেছেন প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য—

ছোট বিবি লর পারে   মাঝিয়া বিবি গরি পারে
বড় বিবিকে খাইল বিষম ঠাই॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ১৪১)

কাজিদের বহুবিবাহের ইঙ্গিতটিও কবি উপরিউক্ত উক্তিটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

রাজনৈতিক দমন-পীড়ন ও উচ্চবর্ণের ঘৃণা ও অবজ্ঞা থেকে রেহাই পাবার জন্য নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকেন তখন হিন্দু দলপতিদের টনক নড়ে এবং তারা ভাবতে থাকেন এভাবে দলে দলে নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকলে অচিরেই দেশ হিন্দু শূন্য হবে। *মনসামঙ্গল* কাব্যে হাসানের মা সম্পর্কে কবির উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়—

হিন্দু দেবতা তাহা বুড়ি ভাল জানে।
...   .
আছিল হিন্দুর বেটী বড় দৈব ফলে॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ১২৯)

হিন্দু সমাজের এ দুর্যোগ মুহূর্তে সমাজরক্ষার তাগিদে এবং স্বসমাজের শান্তি বজায় রাখার মানসে ব্রাহ্মণ্যবাদী সম্প্রদায় নিম্নশ্রেণীয়দের আরাধ্য অপৌরাণিক দেব-দেবী ও লৌকিক ধর্মবিশ্বাসকে মেনে নিলেন। শুরু হলো উভয় সম্প্রদায়ে সংস্কৃতির আদান-প্রদান।

এই সংস্কৃতি আদান-প্রদানের ফলেই নিম্নশ্রেণিভুক্তরাও উচ্চশ্রেণির পৌরাণিক দেব-দেবীকে এবং তাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতিকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করার সুযোগ পেলেন। আর অনার্য দেবতারা আর্য দেব-দেবীর কাছে নিজেদের স্থান করে নিলেন। আদিতে চণ্ডী যেমন প্রথমে পশুগণের তারপর অনার্য ব্যাধ জাতির উপাস্য দেবতা ছিলেন ক্রমে ক্রমে তিনি আর্য সমাজে প্রবেশ করেন। তদ্রূপ মনসাও প্রথমে রাখাল ও জালু মালু দ্বারা পূজিত হয়েছেন পরে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আর্য সমাজে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু খুব সহজে কিন্তু মনসা তাঁর পূজা পাননি এজন্য পেরুতে হয়েছে দীর্ঘপথ আর এ দীর্ঘপথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে একটি সমাজের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক পরিবর্তন ঘটেছে সেই সমস্ত কাহিনি বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে একটি অঞ্চলের গার্হস্থ্যজীবনাচরণ।

মনসা মর্ত্যে পূজা প্রচারের নিমিত্তে মরিয়া হয়ে ওঠেন। যে ভাবেই হোক দেবীর স্বীকৃতি পেতেই হবে তাঁকে। আর এ জন্য চম্পকনগরের বণিক প্রধান চন্দ্রধরকে দিয়ে মনসাকে পূজা আদায় করতে হবে। কিন্তু নানা প্রলোভন দেখিয়েও মনসা যখন চাঁদকে কোনো ভাবেই রাজি করাতে পারছেন না তখন তিনি চাঁদের নানা ক্ষতি সাধনে ব্যস্ত হলেন। প্রথমে চাঁদের গুয়াবন ধ্বংস এরপর মহাজ্ঞান হরণ। চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ পালায় কবি বিজয়গুপ্ত তৎকালীন সামন্ত ও বণিক সমাজের নারীলোলুপতার নগ্নচিত্র উপস্থাপন করেছেন যা আরও বেশি বাস্তবমুখী। চাঁদের মহাজ্ঞান হরণের জন্য মনসা নটীর বেশ ধারণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। নিজেকে মনোহারিণী করে চাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন—

কাজলে রঞ্জিত আখি কর্ণে সুবর্ণের চাকি
লামা কর্ণে পরে কর্ণফুল॥
বিচিত্র বসন পরে অঙ্গুরি কঙ্কণ করে
পায়ে শোভে জত মৃগমদ।
চন্দন কুঙ্কুম গায়ে চলন্ত নূপুর পায়ে
রুনু ঝুনু করে সর্ব্বদা॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ১৫৮)

বিবিধ অলঙ্কার ও বসনে ভূষণে সুসজ্জিত হয়ে মনসা চাঁদের নগরে এলেন। শুধু বসনে ভূষণে নয় সুললিত কণ্ঠে নেচে গেয়েও মনসা চাঁদের মন হরণ করার চেষ্টা করেন। মনসার কণ্ঠে যেন বসন্তের কোকিলের সুর। যে সুর চাঁদের মনকে বিমোহিত করে। চাঁদ ঘন ঘন মনসার দিকে তাকান—

একদিষ্টে চাঁন্দ নটীর দিকে চায়॥
... ...
সাধিতে বিষম কাজ মনসার নাহি লাজ
দেব কন্যা হইয়া হইল নটী
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ১৫৯)

কতটা ক্রূর হলে মনসা এতটা হীন মানসিকতার পরিচয় দিতে পারেন, তাঁর প্রলোভনের ফাঁদ পাতার মধ্যেই এর পরিচয় নিহিত। দেবকন্যা হয়ে মনসাকে নটীর ছদ্মবেশ ধরে চাঁদের কাছে যেতে হয় মহাজ্ঞান হরণের জন্য। মনসার এ প্রচেষ্টাকে জয়া সেনগুপ্তা বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে–'আজীবন বঞ্চিতা মনসা জীবনে একটি ক্ষেত্রে জয়লাভের আশায় পরাজিতা হয়ে সর্বনীতিজ্ঞান বিবর্জিত হয়েছে–নেতার পরামর্শে সে চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান হরণ করে তাকে জয় করবার তথা নিজে জয়ী হবার প্রয়াস পেয়েছে; এবং জয়ী হবার দুর্নিবার বাসনায় সে যে কোন মূল্যে তার ভাগ্যে জয় ছিনিয়ে আনতে চেয়েছে; নিজের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবার আশঙ্কা বা দেব সভায় উপহাসের পাত্রী হবার সম্ভাবনা তাকে তার কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি বরং জয়লাভের অপ্রতিরোধ্য কামনায় নটীর ছদ্মবেশে দেবী মনসা মানব চাঁদ সদাগরকে কামমোহিত করেছে'। (জয়া সেনগুপ্তা ; ১৯৯০ : পৃ : ১৪৯) নটী তথা পদ্মার রূপে চাঁদ এতটাই বিমোহিত যে, নটীকে আলিঙ্গনে আহ্বান করতে চাঁদের বিবেক কম্পিত হয়নি—

চান্দে বোলে নটী তুমি শোন কথা মোর।
আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণ রক্ষা কর॥
নটী কহে তবে শোন মহাশয়।
যেমন কহো তেমন করিব নিশ্চয়॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ১৬০)

মনসা ছলনাময়ী এবং নানা বিদ্যায় পারদর্শী। তাই চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করতে তাকে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। মনসার নৃত্য-গীতে চাঁদ যখন খুব সন্তুষ্ট তখনি মনসা এ সুযোগটি কাজে লাগান। তিনি কামদেবকে স্মরণ করেন এবং অনুরোধ করেন তিনি যেন চাঁদের শরীরে পঞ্চবাণের আঘাত হেনে চাঁদকে মানসিকভাবে দুর্বল করেন—

দেখিয়া নটীর বেশ　　কামবানে হইলা শেষ
চান্দর প্রাণ কাঁপে থর থরি॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ১৬১)

এই কামবাণই চাঁদের জীবনের কাল হলো। কামের ঘোরে চাঁদ তার দিব্যজ্ঞান মনসার হাতে তুলে দেন—

কামবানে চান্দো বানিয়ার পোড়ে মন।
গুণের গামছা চান্দে দিল ততক্ষণ॥
গামছা পাইয়া পদ্মা হরষিত হইল।
ততক্ষণে পদ্মাবতী উড়িয়া লড় দিল॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ১৬২)

নৈতিক স্খলন মানুষকে যে কতটা নীচে নামিয়ে দেয় চাঁদ মহাজ্ঞান হারানোর পর বুঝতে পারেন। মহাজ্ঞান হারানোর পর চাঁদের বোধোদয় হয় এটা মনসার ছলনা ছিল। চাঁদকে মানসিকভাবে আঘাত করাই ছিলই মনসার প্রধান লক্ষ্য। আর এজন্যই মনসা নানা কৌশল অবলম্বন করতে থাকেন। চাঁদকে মানসিকভাবে পঙ্গু করার পরবর্তী ধাপ হলো চাঁদের অতি বিশ্বস্ত দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ সঙ্কুর গাড়রি নিধন।

ছয়পুত্র, ছয়পুত্রবধূ ও সোনকাকে নিয়ে চাঁদের সুখের সংসার। *মনসামঙ্গল* কাব্যের এই পারিবারিক চিত্র অত্যন্ত সুখময় এবং অনুকরণীয়। ছয়পুত্রের সাহচর্যে চাঁদ গর্বিত, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চাঁদ খেতে বসেন। স্ত্রী সোনকা এবং ছয়পুত্রবধূ খাবার পরিবেশন করেন। এরূপ একটি একান্নবর্তী পরিবারে একই সাথে ছয়পুত্রের মৃত্যু চাঁদ ও সোনকাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের সাজানো সুখের সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। সন্তানহারা মায়ের হাহাকার এবং অল্পবয়স্ক ছয়পুত্রবধূর বৈধব্যপীড়িত জীবন এবং তাদের অন্তর্বেদনা পাঠককেও মর্মাহত করে—

কান্দে সোনাই বিষাদ ভাবিয়া।
কোথায় পুত্র যাও হৃদয়ে শেল দিয়া॥
ছয় বধূ কান্দে তারা ভূমিতে পড়িয়া।
কোথায়ে যাও প্রাণনাথ আমায় ছাড়িয়া॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ১৮৫)

অল্পবয়স্ক ছয় পুত্রবধূর আর্তনাদ ও তাদের বৈধব্যবেশ সকলকে কাঁদায়। একদিকে স্বামী হারানোর যন্ত্রণা ও অন্যদিকে বৈধব্যবেশে জীবন-যাপনের শঙ্কা বধূদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে। পুত্রহারা জননী এবং স্বামীহারা ছয়বধূর আহাজারিতে প্রকৃতিও নিস্তব্ধ। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় কষ্টের, বড় বেদনাদায়ক ঘটনা হচ্ছে মাতা-পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় সন্তানের মৃত্যু। এ হৃদয়বিদারক ঘটনা যে কতটা যন্ত্রণার তা সেই মা বাবাই অনুভব করেন যাঁদের সামনে সন্তানের মৃত্যু ঘটে। একজন নয় দু'জন নয় একসাথে ছয় পুত্রের মৃত্যু চাঁদ-সোনকার অন্তর ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল। স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও অনেক সময় ওই আঘাত সামলানো কিছুটা সহজ হয় কিন্তু এটা তো স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না। তাইতো সোনকার কষ্ট এত বেশি। ব্যথাতুরা জনক-জননীর আহাজারি পাঠককেও কাঁদিয়েছে। শোকে অভিমানে সোনকা তার অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার খুলে ছিড়ে ফেলেন—

ছিড়িল গলার হার,　　আর যত অলঙ্কার,
ধরিয়া রাখিতে কেহ নারে॥
কান্দিছে সোনেকা রাণী,　　শিরে করাঘাত হানি,
ফেলাইয়া অঙ্গের ভূষণ॥
(বিজয়গুপ্ত ; ২০১১ : পৃ : ৮৪)

একদিকে পুত্র হারানোর বেদনা অন্যদিকে ছয় বিধবা পুত্রবধূর করুণ আর্তনাদ সোনকার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে। সোনকা ছয় পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকাতে পারেন না। এজন্য তিনি তার স্বামী চন্দ্রধরকেই দোষ দেন। মানুষে দেবতায় দ্বন্দ্ব এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। তিনি সব সময়

আশঙ্কায় থাকেন আর না জানি কি বিপদ অপেক্ষা করছে? তাই শোকাতুরা সোনকা অভিমানে স্বামীসঙ্গ পরিত্যাগ করেছেন। 'দেবতা মনুষ্যে হইল বাদ'- স্বামীর এ ধরনের অসঙ্গত-অনুচিত দম্ভের জন্য সোনকা একই সঙ্গে ছয়পুত্র শোকে বিধুরা। শুধু তাই নয়, দূরদর্শী সোনকা ভবিষ্যতে আরও বেশি বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিতা—

মরিল যে ছয়পুত্র, না জানি আর কিবা হয়,
দেবতা মনুষ্যে হইল বাদ॥
(বিজয়গুপ্ত ; ২০১১ : পৃ. : ৮৪)

দেবতা মানুষে কখনো বিবাদ হত পারে না। বাস্তববাদী সোনকার এ বোধ বাস্তবে রূপ নিয়েছিল ভবিষ্যতের আশঙ্কা এবং পুত্রবধূদের বৈধব্যপীড়িত জীবন-যাপন দর্শনে। শোকাতুরা সোনকা স্বামীর সাথে মনসার এই একান্ত অনুচিত, অযৌক্তিক ও ঔদ্ধত্য আচরণকে নির্বিচারে মেনে না নিয়ে এবং দুঃসহ এ জীবন যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেতে বনবাসী হতে চেয়েছেন—

তুমি হেন স্বামী যার সে বাঁচে কেনে।
গৃহবাসে কাজ নাই চলিলাম কাননে॥
কাননে চলিল তবে সোনেকা সুন্দরী।
ইহা দেখি ভয় পাইল চান্দ অধিকারী॥
(বিজয়গুপ্ত ; ২০১১ : পৃ. : ৮৫)

স্ত্রীর এ সংকল্প শুনে চন্দ্রধর ভয় পেয়েছিলেন। ব্যথাতুরা জননী সোনকার সন্তান হারানোর বেদনা লাঘবের জন্য স্বামীকে আকড়ে ধরেই বেঁচে থাকা উচিত কিন্তু স্বামীর অন্যায় অযৌক্তিক আচরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নারী জীবনের সেই লালিত আকাঙ্ক্ষাকেও সোনকা পদদলিত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষের বহুগামিতায় কোনো অপরাধ নেই, বহুবিবাহেও নেই কোনো অপরাধ সেই সমাজব্যবস্থায় সোনকার স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত তার কঠোর ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। এ ছাড়াও সোনকার এ প্রতিবাদের মূলে ছয়পুত্র হারা মাতৃহৃদয়ের হাহাকারও বারবার উঁকি দিয়েছে। চাঁদ সদাগরের কৃতকর্মের জন্যই মনসার রোষ সোনকার সন্তানের ওপর পড়ে। চাঁদকে ঘায়েল করার জন্য মনসা এই মর্মন্তুদ ঘটনাকেই হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেন। স্বামীর প্রতি অভিমান, তাঁর একগুঁয়েমির প্রতি বিক্ষোভ, সন্তান হারাবার হৃদয়বিদারক শোক সোনকাকে স্বামী সহবাস বর্জনের মতো দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিতে প্রেরণা যুগিয়েছে। শুধু শঙ্কা বা ক্ষোভ, বেদনা বা অভিমান নয় ছয়পুত্রবধূর অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণাও সোনকার বিবেককে তাড়িত করেছে। নবযৌবনা, নিঃসন্তানা ছয়পুত্রবধূর অন্তর্বেদনা সোনকাকে স্বামী সোহাগী হতে বাধা দিয়েছে। অকাল বিধবা ছয়পুত্রবধূর শঙ্কা বৃদ্ধ শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাদের ঠাঁই কোথায় হবে? এ শঙ্কা জানিয়ে তারা বারবার শাশুড়ির চরণে মিনতি জানিয়েছেন একজন দেবরের প্রত্যাশায়। যার মুখ চেয়ে স্বামী শোক কিছুটা হলেও ভুলে থাকতে পারে। হতভাগিনী পুত্রবধূগণের এ যুক্তিসংগত দাবিতে এবং তাদের প্রতি একান্ত সমব্যথিনী, মমতময়ী সোনকা স্বামী সহবাসে সম্মত হয়েছেন। তবে সকল কর্ম বিড়ম্বনারমূলে স্বামীর ঔদ্ধত্য কৃতকর্ম সোনকাকে রাগে, অভিমানে, দুঃখে, বেদনায়, ক্ষোভে মর্মাহত করেছে। চাঁদের এ পারিবারিক বিপর্যয় তাদের দাম্পত্যজীবন তথা গার্হস্থ্যজীবনকেও নানা ভাবে ক্ষত-বিক্ষত করেছে।

মনসা সোনকাকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং জালু মালুর বাড়িতে গিয়ে মনসার পূজা দিয়ে বর মাগার আদেশ দেন। পুত্র শোকে শীর্ণ, ক্ষীণ সোনকা কোনো রকমে জালু মালুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে যথাযথ আচার-পার্বণ পালনের মধ্য দিয়ে মনসার পূজা দেন। এতে মনসা সন্তুষ্ট হয়ে সোনকাকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। ব্যথাতুরা জননী পুত্রসন্তান কামনায় আঁচল পেতে নিম্নোক্ত বর প্রার্থনা করেছেন। কারণ পুত্র সন্তান লাভ করাই ছিল তখনকার নারীদের একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান—

চম্পক নগরে ঘর সোনাই মাগে পুত্রবর

মাগে বর আচল পাতিয়া॥

... ...

দিলাম দিলাম পুত্রবর নাম থুইঅ লক্ষিন্দর

বিহার রাত্রে আনিব দংশিয়া॥

(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ১৯২)

মনসার এ বরে সোনকা চমকে ওঠেন। সোনকা এ বর চান না। এমনিতে ছয়পুত্র শোকে সোনকার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত। আবার পুত্রশোক! এ আঘাত সোনকার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। অবশেষে সহজ-সরল সোনকা নেতার পরামর্শে বর প্রার্থনায় সম্মত হন—

নেতা বলে সোনাই শুন বিলম্বেতে নাহি গুণ

হৈলে পুত্র না করাইবা বিহা॥

এতেক ভাবিআ নারী আপনার মনে গণি

লইল বর অঞ্চল পাতিয়া।

(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ১৯২)

সোনকা হয়তো এটা ভেবেই আনন্দিত হয়েছিলেন অন্তত সন্তানের মুখ দেখি। ভবিষ্যতে না হয় সন্তানকে অবিবাহিতই রাখবো। এখানে সোনকার অদূরদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছে কারণ তিনি বুঝতেই পারেননি একটা নিদিষ্ট বয়সে নারী-পুরুষের যৌনবৃত্তি নিবৃত্তির এবং যাপিত জীবনের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার জন্য সমাজ স্বীকৃত পন্থায় বিবাহ সংঘটনের মাধ্যমে একজন জীবনসঙ্গী নির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ফলত লখিন্দরের জীবনে ঘটেছিলও তাই। কারণ দেবতার বাক্য অলঙ্ঘনীয়। তাইতো চাঁদ সদাগর শত চেষ্টা করেও, এমনকি লোহার বাসরঘর নির্মাণ করেও রক্ষা করতে পারেননি পুত্রের জীবন।

চাঁদের পরিবারে আবার অঘটন ঘটানোর জন্যই মনসা স্বর্গের নর্তক-নর্তকী অনিরুদ্ধ এবং উষাকে হরণ করে তাদের জীবন নিয়ে মর্ত্যধামে এলেন। অনিরুদ্ধকে চম্পক নগরের রাজা চন্দ্রধরের স্ত্রী সোনকার গর্ভে এবং উষাকে উজানিনগরে সাহেবেনের স্ত্রী সুমিত্রার গর্ভে স্থাপন করেন। দুজনের গর্ভে দুটি ভ্রূণ দিনে দিনে বাড়তে থাকে।

কবি বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* কাব্যে বহু স্থানে রান্না-বান্না এবং খাদ্যগ্রহণের সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা এই বাংলার সন্তানেরা সেই অতীতকাল কাল থেকেই যে ভোজনপটু তা কাব্যের বহু স্থানে পরিলক্ষিত হয়। দেবী মনসার কোপদৃষ্টিতে ‘কাজী পাড়ার জোলার বেটার সর্পঘাতে মৃত্যু হলে তার ক্ষোভ প্রকাশের মধ্যে তৎকালীন নিম্ন জাতির বিধবা বিবিদের লোভনীয় খাবার প্রীতির কথা জানা যায়’। (নীলকান্ত ; ২০০১ : পৃ : ১৭৪) জোলার বিধবা বিবি আক্ষেপ করে বলেছে—

সউল মাগুর কৈ আলু কচু মূলা চৈ

আর আনিত গুয়া পান॥

আদার সুঠান ঝাল খাইতে পোড়াই গাল

কহিতে বিদরে মোর বুক॥

(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ১৩৯)

এ বর্ণনা ছিল অস্বচ্ছল সমাজের খাবারের বর্ণনা। কিন্তু উচ্চবিত্ত সমাজের রান্নার প্রণালী ও খাবারের তালিকা ছিল চোখ ধাঁধানো। হিন্দু সমাজে রান্নার পূর্বে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান, অন্নপূর্ণাকে স্মরণ এবং অগ্নিদেবকে প্রদক্ষিণ করার নিয়ম আছে যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির শুদ্ধচিন্তা ও ভক্তি প্রবণতার প্রকাশ ঘটে। এটা গার্হস্থ্যজীবনের একটি অনিবার্য প্রথা। রান্নার পূর্বে বণিক পত্নী সোনকাও অগ্নিদেবকে প্রদক্ষিণ করে বর মাগেন। সংসারের মঙ্গল কামনায় বাঙালি গৃহস্থ বধূরা এ সমস্ত সংস্কার মেনে চলতেন। সোনকা বলেন আমি যা রন্ধন করি তা যেন অমৃতের মতো হয়। চাঁদ সদাগর পত্নীর রান্নার বিবরণ নিম্নরূপ—

ষোল ব্যঞ্জন রান্ধিল নিরামিষ।

নারিকেল কোরা দিয়া রান্ধে মুসুরীর সূপ॥
পাটাই ছেঁচিয়া নেয় পলতার পাতা।
বেগুন দিয়া রান্ধে ধনিয়া পলতা॥
কাঁচা কলা দিয়া রান্ধে সুগন্ধ পাঁচন।
… … …
সাজ ঘৃত দিয়া রান্ধে গিমা তিতা শাক।
কোমল বাথুয়া শাক করিয়া কেচা কেচা।
… … …
নারিকেল দিয়া রান্ধে কুমড়ার শাক।
… … …
ঝিঙ্গা পোলাকড়ি ভাজে আর কাঁঠাল আঁঠি।
… … …
ঝাঁজ কটু তৈল দিয়া রান্ধে বেগুন পোড়া॥
… … …
কলার থোর রান্ধিতে বাটিয়া দিল রাই॥
সরিষা বাটা দিয়া রান্ধে পানিকচুর বৈ॥
মরিচের ঝাল দিয়া রান্ধে বরবটী।
মুগের ঝোল রান্ধে আর মাস কলাইর বড়ি।
দুগ্ধ লাউ রান্ধে আর নারিকেল কুমড়ি॥
সুক্তা পাতা দিয়া রান্ধে কলাইর ডাইল।
পাকা কলা লেবু রসে রান্ধিল অম্বল॥
(বিজয়গুপ্ত; ২০১১ : পৃ : ৮১)

এ বর্ণনা সোনকার নিরামিষ রান্নার বর্ণনা, এখানে প্রত্যেকটি পদ কীভাবে রান্না করলে স্বাদ বৃদ্ধি পায় এবং পুষ্টিগুণ বজায় থাকে তার সুবিস্তৃত বিবরণ আছে। শুধু নিরামিষ নয় চাঁদপত্নী আমিষ তথা মাছ মাংস রাঁধতেও ছিলেন সমান পারদর্শী। সোনকার আমিষ রান্নার বিবরণ—

মৎস্য মাংস কাটিয়া থুইল ভাগ ভাগ।
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলতার আগ॥
মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাছ গাছ।
ঝাঁজ কটু তৈলে রান্ধে খরসুল মাছ॥
ভিতরে মরিচ গুঁড়া বাহিরে জড়ায় সূতা।
তেল পাক করি রান্ধে চিঙ্গড়ীর মাথা॥
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল।
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল॥
… … …
ছাল খসাইয়া রান্ধে বাইন মৎসের খৈ।
বারমাসি বেগুনেতে শৌল মৎস্যের মাথা।
… … …
ছাল খসাইয়া রান্ধে বুড়া খাসির তেল।
ছাগ মাংস কলার মূলে অতি অনুপম।
… … …
শৌল মৎস্য দিয়া রান্ধে আমের অম্বল॥
মিষ্টান্ন অনেক রান্ধে নানাবিধ রস।
দুই তিন প্রকার পিষ্টক পায়স॥
দুগ্ধে পিঠা ভাল মত রান্ধে ততক্ষণ
রন্ধন করিয়া হইল হরষিত মন॥
(বিজয়গুপ্ত ; ২০১১ : পৃ : ৮১-৮২)

সোনকার এ বাহারি রান্নার বিবরণ হতে অবশ্যই রাজকীয় ব্যাপার পরিলক্ষিত হয় এবং মধ্যযুগের কবিদের ভোজন রসিকতার পরিচয় মেলে। সুবর্ণের থালায় চন্দ্রধর এবং তার ছয়পুত্র খাবার খেতেন। চাঁদের বাড়ি ছিল আসলেই চাঁদের হাট, পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে চাঁদ খেতে বসতেন—

ছয় পুত্র লইয়া চান্দ করয়ে ভোজন।
একে একে খাইল অন্ন যতেক ব্যঞ্জন॥
পরিপূর্ণ ভোজন করিয়া সর্ব্বজন।
পিতলের ডাবরে করিল আচমন॥
রজত পাদুকায় চান্দ দিলেন চরণ।
বিনোদ মন্দিরে গিয়া করিলেন শয়ন॥
(বিজয়গুপ্ত ; ২০১১ : পৃ : ৮২)

চাঁদের পরিবার অভিজাত পরিবার। তার পরিবারে সবকিছুতেই আভিজাত্যের ছাপ। মধ্যযুগে বিশেষ করে অভিজাত পরিবারে খাবারের তালিকায় যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় তাতে স্পষ্ট যে খাবারের পুষ্টিগুণ ও রান্নার প্রণালী সম্পর্কে তারা বেশ জ্ঞান রাখতেন। এছাড়া খাবার খাওয়ার পদ্ধতিতে প্রথমে শুক্তো দিয়ে শুরু এবং চাটনি বা অম্বল দিয়ে শেষ—এর মধ্য দিয়েও স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের গভীরতা প্রমাণিত হয়। চাঁদের পরিবারের রান্না-বান্না, ঘর-বাড়ি, খাবার পরিবেশনের স্থান ও নিয়ম নীতি, শয়ন কক্ষ, বিশ্রামাগার সবকিছুর মধ্যে রাজকীয় এবং শৈল্পিক ছাপ সুস্পষ্ট।

জীবনবাদী কবি বিজয়গুপ্ত চাঁদপত্নী সোনকার গর্ভসঞ্চার ও স্ফীত উদরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পাঠককে বিস্মিত করে। সোনকার দৈহিক বর্ণনা, সাধ ভক্ষণের জন্য রান্নার যে বিবরণ আছে তা শুধু তৎকালীন সমাজেই বিদ্যমান ছিল তেমনটি নয় বরং বর্তমান কালেও এ সব আচার-সংস্কার নিষ্ঠার সাথে পালিত হয়, যা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। হিন্দু সমাজে অন্তঃসত্ত্বা নারীকে পাঁচমাসে পঞ্চামৃত এবং সাতমাসে সাধভক্ষণ করানোর নিয়ম প্রচলিত আছে।

সাত মাস গর্ভকালীন সময়ের যথাযথ সামাজিক আচার-পার্বণ পালনের মাধ্যমে সোনকার সাধভক্ষণের আয়োজন করা হয়। সাধভক্ষণের সময় বাঙালিরা তাদের সাধ্য অনুযায়ী বিভিন্ন মুখোরোচক খাবারের আয়োজন করে থাকে। এর মধ্য দিয়ে একদিকে গর্ভবতী নারীকে পুষ্টিকর খাবার প্রদান করা হয় ফলে তার গর্ভস্থ সন্তানও কিছুটা পুষ্টি পায়। অন্যদিকে গর্ভবতী নারীকে সাময়িক আনন্দদানের ব্যবস্থাও করা হয়। এর ফলে তার গর্ভের সন্তানও আনন্দে থাকে। অভ্যাগতরা গর্ভবতীকে ও তার গর্ভস্থ সন্তানকে আশীর্বাদ করেন ফলে গর্ভবতী মানসিক শক্তি পায়। যেহেতু সোনকা রাজা চন্দ্রধরের পত্নী তাই তার সাধের অনুষ্ঠান রাজকীয় হবে এটাই স্বাভাবিক। সোনকার সাধ অনুষ্ঠানে রান্নার আয়োজনে এলাহিকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়। সোনকার সাধ অনুষ্ঠানে রান্নার আয়োজনে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় বিভিন্ন প্রকার শাক রান্নার প্রসঙ্গ। গর্ভকালীন সময়ে গর্ভবতী নারীরা যে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগেন এর মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য অন্যতম। এ থেকে মুক্তি পেতে অন্তঃসত্ত্বা নারীরা শাক পছন্দ করে বলে মনে হয়। এছাড়া তিতা ও টক জাতীয় দ্রব্যের প্রতিও গর্ভবতীরা আকৃষ্ট হন। এতে গর্ভবতী নারীদের মুখের অরুচি দূর হয় এবং খাবারের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। সোনকা অন্তঃসত্ত্বা হলেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। শাক কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে পরিপাকতন্ত্র পরিষ্কার করে ফলে মানুষের খাবারের প্রতি রুচি বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত মধ্যযুগের গর্ভবতী নারীরা এ তথ্য জানতেন। তাই শাকের প্রতি তাদের আগ্রহ বেশি ছিল। কবি বিজয়গুপ্ত অত্যন্ত সযত্নে এবং সতর্কতার সাথে সোনকার দাসীর শাক তোলার চিত্র বর্ণনা করেছেন—

সাধের শাক খাইব রাণী।
আনিবা তুয়া সলুফা ঠেনঠেনি॥
গিমা গাঙ্গড়াইয়া তোলে আর ললিতা।

মধুলতা খাইয়া আর পোলতা॥
লাউর ভাঙ্গে আগা আর কুমরের ভাঙ্গে ডোগা।
বাছিয়া বাছিয়া তোলে শাক ঢোলকলমির আগা॥
ঢুলুয়া লটীয়া তোলে আর স্বরূপা।
মরিচের আগে তোলে রান্দনি ধনিয়া॥
শাক তুলিয়া ধাই ঘরে যায়ে।
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ২৯৭)

শুধু শাক তোলার চিত্রই নয় শাক রান্নার উপকরণাদি যেমন— ধনে, কাঁচা মরিচ ও রান্ধনী বীচি এর বর্ণনা দিতে কবি ভুল করেননি। এবং কোন শাক কীভাবে রান্না করলে স্বাদ বৃদ্ধি পায় এবং পুষ্টিগুণ বজায় থাকে সে তথ্যও প্রদর্শিত আছে। সাধারণ মানুষের কবি হিসেবে বিজয়গুপ্ত গ্রাম বাংলার সাধারণ অথচ অতি পরিচিত ঘটনা বর্ণনা করার লোভ সংবরণ করতে পারেননি। তাই তিনি উচ্চবিত্ত সমাজের গৃহবধূ সোনকার সাধের অনুষ্ঠানের শাক সংগ্রহের জন্য ঝিকে দিয়ে সাধারণ গৃহস্থ বাড়ির মতো করে শাক তোলার বর্ণনা দিয়েছেন। গীমা এক প্রকার তেতো শাক, রান্ধনী জিরার মতো সুগন্ধীযুক্ত মশলা যা নিম্নবিত্ত গৃহস্থ ঘরে জিরার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নটে শাক, ললিতা শাক, সরিষা শাক, লাউ কুমড়ার ডোগা খেতে সুস্বাদু। এসব শাক উচ্চবিত্ত পরিবারে বেমানান। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে এ সবের অভাব হয় না এবং সংগ্রহ করতে পয়সা খরচ করতে হয় না। শাক তোলার বর্ণনায় কবি গ্রামের সহজ সরল জীবনাচরণের এক উজ্জ্বল চিত্র উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু চাঁদ পত্নী সোনকার সাধ অনুষ্ঠান তো আর যেন তেন ভাবে করা যায় না। শুধু শাকের বর্ণনা নয় সোনকা উচ্চবিত্ত পরিবারের কুলবধূ তার সাধভক্ষণের অনুষ্ঠান হয়েছে রাজকীয়ভাবে। সোনকার সাধের অনুষ্ঠানের রান্না আর সাধারণ গৃহস্থালি কুলবধূর মতো হতে পারে না। সোনকার সাধ অনুষ্ঠানে রাজকীয় রান্নায় তিনটি ভাগ ছিল- নিরামিষ, আমিষ এবং মিষ্টান্ন জাতীয় খাবার যার রন্ধন কৌশলও ভিন্ন। সোনকার সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানের রান্না সোনকা নিজেই করেছিলেন। রান্নার পূর্বে শুদ্ধবস্ত্রে অন্নপূর্ণা ও অগ্নিদেবকে স্মরণ করে রাঁধুনীরা রান্না শুরু করেন। এ নিয়ম শুধু আনুষ্ঠানিক রান্নার ক্ষেত্রে নয় সাধারণত গৃহস্থ বাড়িতে রান্নার প্রাক্কালেও গৃহিণীরা বিভিন্ন ঠাকুর দেবতা স্মরণ করে রান্না শুরু করেন। সোনকাও রান্নার প্রাক্কালে ঠাকুর দেবতা স্মরণ করতেন—

স্নান করিয়া সোনাই চড়াইল রন্ধন।
নিরামিষ আমিষ রান্ধে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥
... ...
আগে পূজিল অগ্নি ধূপ দীপ দিয়া।
চড়াইল রন্ধন রাণী হরষিত হইয়া॥
... ...
শাক সুকুতা রান্ধে কলইর ভাঙ্গে বড়া।
কটু তৈল দিয়া ভাজে তাল বাইয়ন পোড়া॥
নারিকেল দিয়া রান্ধিলেক ঝিঙ্গা।
লতা পাতা সর্ব্ব শাক করে ফেচ ফেচা।
... ...
কির কড়ি দিয়া রান্ধে কাঁঠাল আটি॥
খেসারির ডাইল রান্ধে কাঁঠালের মুছি।
... ...
হিঙ্গ মরিচে রান্ধিলেক শ্বেত সরিষার আগ॥
নিরামিষ রান্ধিয়া করিল একভিত্য।
এরপর সোনকা আমিষ ব্যঞ্জন রন্ধন করেন-
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধিতে গেল চিত্ত॥

... ...
ছোট ছোট মৎস্যের ফালাইয়া মুড়।
তাহা দিয়া রান্ধিলেক নন্দন বারিব থোড়॥
বড় বড় ইচা মৎস্যের ফেলাইয়া তালু।
তাহা দিয়া রান্ধিলেক সঙ্কচুর আলু॥
বড় বড় কই মৎস্য করিয়া ভাগ ভাগে।
তাহা রান্ধিল লাউ আলু কচুর লগে॥
... ...
ছোট্ট ছোট্ট নালি মৎস্যের ফালাইয়া মুরি।
সরিষা বাটিয়া দিয়া রান্ধিলেক ঝুরি॥
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধিয়া করে এক ভিত।
মাংসের ব্যঞ্জন রান্ধে হইয়া হরষিত॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ২৯৭-৩০০)

সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আমিষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সেকালের মানুষের ধারণা ছিল খুব স্পষ্ট। সোনকার বিভিন্ন প্রকার আমিষ রান্নার বিবরণ থেকে সেটা প্রমাণিত। বাঙালি নারীদের রান্নার বিবরণ হতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় শুধু সোনকা নয় আপামর বাঙালি নারী নিজ হাতে রান্না করে স্বামী, সন্তান, পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়াতে খুব পছন্দ করেন। তাইতো সোনকা অসুস্থ শরীরে (সাত মাস গর্ভকালীন সময়েও) রান্না করতে কষ্ট অনুভব করেননি বরং রান্না করে সকলকে খাইয়ে গর্ব ও আনন্দ উপভোগ করেছেন। তৎকালে রান্নার সময়ে গ্রামীণ জ্বালানিতে তেঁতুল কাঠের খুব গুরুত্ব ছিল। সোনকা রান্নার সময়—'তেতইলের কাষ্ঠে অগ্নি করে ধুক ধুক। (বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ. ২৯৮)

হিন্দু সমাজে রন্ধন প্রণালীতে আগে নিরামিষ পরে আমিষ এবং সবশেষে মিষ্টান্ন জাতীয় খাবার প্রস্তুত করার এবং একই নিয়মে খাবার খাওয়ার নিয়ম প্রচলিত আছে। মসলার মধ্যে কাঁচা মরিচ, জিরা, সরিষা, আদা এবং সরিষার তৈল ও ঘি-এর উল্লেখ আছে। রন্ধন শেষে সোনকা বাটিতে বাটিতে আলাদা করে তরকারি ভরে রাখেন যার মধ্য দিয়ে একটি পরিপাটি পরিবারের চিত্র প্রকাশ পায়। সাধভক্ষণের পূর্বে সোনকার সাজ-সজ্জার মধ্যেও ছিল আভিজাত্যের ছাপ—

সোনেকার গাএ দিল গন্ধ আমলকি॥
নারীগণে তৈল দিল সোনকারে বেড়ি।
স্নান করিয়া সোনাই পৈরে পাটের শাড়ি॥
নানা অলঙ্কার পৈরে গলায়ে হাসলি।
সাধ ভাত সোনকা খাইল তখনি॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ২৩৭)

গর্ভকালীন সময়ে একজন নারীর শারীরিক অবস্থা কেমন হয়, কত কষ্ট সহ্য করে একজন মা তার সন্তানকে পৃথিবীতে আনেন তা অতি সংবেদনশীল হৃদয় দিয়ে কবি বিজয়গুপ্ত অনুভব করেছেন। অতি সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করলে বোঝা যায় কবি অত্যন্ত সংবেদনশীল হৃদয় দিয়ে আন্তরিকতার সাথে গর্ভবতী মায়ের কষ্টকে অনুধাবন করেছেন। মায়ের গর্ভে সন্তান যখন ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে মায়ের কষ্টও বাড়তে থাকে। সপ্তম সন্তান লখিন্দরের জন্ম দিতে গিয়ে সোনকা অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলেন—

উদরে দারুণ ব্যথা তুলিতে না পারি মাথা।
এবার রক্ষা কর বিষহরি।
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩০০)

সাধারণত গর্ভ দশমাস দশদিন পূর্ণ হলে গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় বলে সমাজে একটি ধারণা প্রচলিত আছে। সোনকার গর্ভ দশমাস দশদিন পূর্ণ হলে প্রসব বেদনা শুরু হয়। আতঙ্কে, শঙ্কায়, বেদনায় সোনকার

প্রাণ যায় যায় অবস্থা এরমধ্যেও কিন্তু গর্ভধারিণী মা সন্তানের মঙ্গল কামনায় ঠাকুর দেবতাকে স্মরণ করতে ভুল করেন না। অবশেষে উপস্থিত হয় সেই মাহেন্দ্রক্ষণ—

রাম লক্ষণ শুন সোনাই কাকালি চড়িল।
হস্ত জোড়ে লখিন্দর ভূমিতে পড়িল॥
... ...
পুত্র কোলে করি সোনাইর সুখ হইল বড়ি।
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩০১)

অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ভূমিষ্ঠ হলো সোনকার পুত্র লখিন্দর। সকলে পুত্র পুত্র করে আনন্দ-উল্লাস করতে লাগলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মা আগত সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে অতীতের সকল বেদনার কথা ভুলে যান। লখিন্দর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সোনকাও সকল দুঃখ ভুলে সন্তানের মুখ দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন—

দেখিয়া পুত্রের মুখ সোনকার বাড়ে সুখ॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩০২)

ছয় পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর লখিন্দরের জন্ম চাঁদের পরিবারে নিয়ে আসে আনন্দের বন্যা। চারিদিকে ঢাক, ঢোল বাজছে, সর্বরাজ্যে চাঁদের পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। শিঙ্গা ডম্বুরের সুমধুর ধ্বনিতে চারিদিক আমোদিত, গাইয়েনেরা গান গাচ্ছে, নর্তকীরা নাচছে পুরা রাজ্যে একটা হুলস্থুল ব্যাপার। আনন্দে আত্মহারা আত্মীয়-স্বজন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার মঙ্গল কামনায় কিছু আচার-পার্বণ পালন করা হয়। লখিন্দরের জন্মের পরও কিছু অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বাঙালি সমাজ আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে বাচ্চার নাড়িচ্ছেদ করেন। কিন্তু ধনাঢ্য প্রভাবশালী চাঁদ সদাগরের পুত্র লখিন্দরের নাড়িচ্ছেদ তো আর যেন তেন ভাবে সাধারণ আর পাঁচ জন নবজাতকের মতো করা যায় না। কবি চাঁদের সামাজিক মর্যাদার কথা বিবেচনায় রেখে নাড়িচ্ছেদের বর্ণনা দিয়েছেন—

সোনার কাটারি দিয়া নাড়িচ্ছেদ কৈল।
গঙ্গা জলে স্নান করি মায়ের কোলে দিল॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩০১)

এরপর পবিত্র গঙ্গাজল দিয়ে বাচ্চাকে স্নান করিয়ে মায়ের কোলে দেওয়া হয়। সন্তানের মঙ্গলকামনায় মা ও ধাত্রী সারা রাত জেগে সন্তানের শিয়রের কাছে নতুন বস্ত্র এবং দোয়াত-কলম রেখে ছয় দিন বয়সে ষষ্ঠী পূজা পালন করেন। মায়ের বদ্ধমূল ধারণা এ দিনে বিধাতা সন্তানের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেন।

তৎকালে রাজা বাদশাগণ ফাড়া ও গ্রহদোষ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য উপযুক্ত মর্যাদা ও পারিশ্রমিক দিয়ে জ্যোতিষী-দৈবজ্ঞ রাখতেন এবং তারা বিশ্বাসও করতেন দৈবজ্ঞ বা জ্যোতিষী গণনার মাধ্যমে ফাঁড়া ও গ্রহদোষ কাটাতে পারেন। আর এজন্যই নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কোষ্ঠী গণনা এবং যাত্রাকালীন শুভক্ষণ নির্ণয়ের জন্য জ্যোতিষ-দৈবজ্ঞের শরণাপন্ন হতেন। জ্যোতিষ-দৈবজ্ঞ পুরাণ শাস্ত্রাদি পড়ে, রাশি নক্ষত্র বিচার করে নবজাতক সম্পর্কে ভবিষ্যৎদ্বাণী করে কোষ্ঠী গণনা ও জন্ম পত্রিকা তৈরি করতেন। লখিন্দরের বয়স যখন এক দুই তিন চার করতে করতে ছয় মাস পূর্ণ হলো তখন সোনকা সোমাই পণ্ডিতকে ডেকে শুভক্ষণ ঠিক করে পুত্রের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ করেন—

এক দুই তিন চারি ছয় মাস হইল।
অন্নপ্রাশন হেতু কৌতুক জন্মিল॥
সম্বাদিয়া আনে তবে সোনাই ব্রাহ্মণ।
নান্দীমুখ যজ্ঞ আদি করিলেক সুখে।

লখিন্দর নাম রাখি অন্ন দিল মুখে॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩০৩)

বিদ্যা অর্জন মানবজীবনে সকল যুগে সকল কালে সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়ে আসছে। সন্তানের বয়স সাধারণত চার-পাঁচ বছর পূর্ণ হলে তাদের নানা শাস্ত্রে শিক্ষা দেয়া হতো। বিদ্যা চর্চার প্রচলন প্রধানত রাজা বাদশা বা অভিজাত সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে নারী শিক্ষার প্রচলন একেবারেই ছিল না এমনটি বলা যাবে না। কারণ বেহুলা লিখতে ও পড়তে জানতেন, *চণ্ডীমঙ্গলের* লহনা, খুল্লনা ও লীলাবতী সামান্য হলেও লিখতে পড়তে পারতেন। কবি বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* কাব্যে লখিন্দরের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তাকে হাতেখড়ি দেয়া হয়। হাতেখড়ি অনুষ্ঠানটি তৎকালীন সমাজে সর্বজন স্বীকৃত এবং জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান ছিল। বর্তমান সমাজে বিশেষ করে হিন্দু সমাজে এ অনুষ্ঠানটি এখনো সমান গুরুত্বের সাথে পালিত হয়। সাধারণত মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে এ অনুষ্ঠানটি পালন করার প্রচলন বেশি পরিলক্ষিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ফলাহার দেয়া হয়। ফলাহার শেষে অতিথিবৃন্দ পুত্র-কন্যাকে আশীর্বাদ করেন তারা যেন সর্বশাস্ত্রে শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে দেশ ও জাতির মান উজ্জ্বল করে। বাঙালির গৃহগত জীবনে বিশেষ করে হিন্দু সমাজে হাতে হাতেখড়ি অনুষ্ঠাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

পিতার অবর্তমানে সন্তানকে যথার্থ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সোনকা কোনো ত্রুটি রাখেননি। সোনকার এ প্রচেষ্টাকে জয়া সেনগুপ্তা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে- 'ছয় সন্তান হারিয়ে সপ্তম সন্তান লক্ষ্মীন্দরকে কোলে পেয়ে সনকা কেবল আনন্দে আত্মহারা হয়েই কালযাপন করেনি, কিংবা প্রবাসী স্বামীর অকল্যাণ আশঙ্কায় দুরু দুরু বক্ষে নিষ্ক্রিয় হয়ে দিনাতিপাত করেনি। সে একাধারে মাতার যত্নে-পিতার দায়িত্বে সন্তান পালন করেছে'। (জয়া সেনগুপ্তা ; ১৯৯০ : পৃ : ২৬৬)। তাইতো দেখি সোনকা একজন আদর্শ মা হিসেবে পুত্রকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করে পিতার যোগ্য উত্তরসূরি করে গড়ে তুলেছেন।

বিজয়গুপ্তের কাব্যে বেহুলার বিদ্যা শিক্ষার সুবিস্তৃত বর্ণনা না থাকলেও তাকে জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ হিসেবে কাব্যে বহু স্থানে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক বা গুরু গৃহে গিয়ে শিক্ষা লাভের বর্ণনা কাব্যে নেই তবে বেহুলা যে চিঠিপত্র লিখতে পড়তে পারতেন তার বর্ণনা কাব্যে উল্লেখিত আছে। মৃত স্বামীর সহযাত্রী হয়ে কলার মাজুষে যাওয়ার সময় বাপের বাড়ির ঘাটে এসে শ্বেতকাক মারফত বেহুলা যে চিঠি তার মা সুমিত্রাকে পাঠিয়েছিলেন তা হতে স্পষ্ট যে বেহুলা সামান্য লেখা-পড়া জানতেন। ফলে নারীশিক্ষা যে একেবারে অবহেলিত ছিল এটা বলা সমীচীন নয় কারণ তৎকালে প্রধানত উচ্চবিত্ত সমাজে কিছুটা হলেও নারীদেরকে চিঠি পত্র লেখা এবং পড়ার মতো বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতো। তবে পুরুষদের শিক্ষার ব্যাপারে কোনো বাধা নিষেধ ছিল না। পিতার অবর্তমানে লখিন্দরকে বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জনের ক্ষেত্রে লখিন্দরের মায়ের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে।

লখিন্দর যখন মায়ের গর্ভে তখন চন্দ্রধর দক্ষিণপাটনে যান বাণিজ্য করতে। বাণিজ্যে যাবার প্রাক্কালে বুদ্ধিমতী সোনকা লোকে যাতে তার চরিত্রে সন্দেহ না করে অথবা সময়ের বিবর্তনে চন্দ্রধরের মনেও যাতে কোনো সন্দেহ না জন্মে এ জন্য চন্দ্রধরের নিকট হতে সোনকা গর্ভপত্র লিখে রাখেন। দূরদর্শী সোনকার জীবনে এ ঘটনা সত্যে পরিণত হয়েছিল। দক্ষিণপাটনে বাণিজ্য যাত্রাকালে চন্দ্রধর মনসার কোপে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে বহু কষ্টে যখন নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন তখন লখিন্দরকে অন্দর মহলে দেখে চন্দ্রধর তার স্ত্রী সোনকাকে সন্দেহ করেই ক্ষান্ত হননি বরং সোনকাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়েছেন এমনকি চুলের মুঠি ধরে তাকে অপমান করেছেন। মধ্যযুগে কারণে-অকারণে নারীদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একটি সাধারণ ঘটনা হিসেবে গণ্য হতো। যে চন্দ্রধর তার সতী সাধ্বী স্ত্রীর দোষ-গুণ বিচার না করেই নিজ পুত্রকে পরপুরুষ ভেবে সোনকার গায়ে হাত তুলতে দ্বিধাবোধ করেননি সেই চন্দ্রধরই আবার জীবনের চরম সংকট মুহূর্তেও মাত্র চারপণ কড়ি উপার্জন করে তার মধ্য হতে একপণ কড়ি দিয়ে নটী বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অবশেষে সোনকা এ অপমান থেকে রক্ষা পেতে স্বামী প্রদত্ত গর্ভপত্র প্রদান করে কলঙ্ক মুক্ত হয়েছেন। সোনকার এ গর্ভপত্র লিখিয়ে নেয়া এবং সেই গর্ভপত্র সযত্নে

সংরক্ষণ করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তার বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে সেই সাথে অন্যদিকে সেই সময়ে কারণে-অকারণে নারীর প্রতি যে অবিচার করা হতো এবং তাদের চরিত্রে সন্দেহ করা হতো তারও প্রমাণ মেলে—

বৃদ্ধকালে দোচারিণী বলিবে আমারে।
তবে কি বলিব আমি লোকের গোচরে॥
কোন কালে নাহি তোমার অন্য মতি।
সর্ব্বলোকে সংসারে জানে তুমি বড় সতী॥
এত শুনি চান্দো গর্ভ পত্র লিখি দিল।
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ২৪০)

চন্দ্রধরের এতদিনের জীবনসঙ্গিনী, তার সাত সন্তানের জননী তারপরও সোনকার মুখের কথা চন্দ্রধর বিশ্বাস করেননি। তার সতীত্বের প্রমাণ স্বরূপ তাকে গর্ভপত্র দেখাতে হয়েছে। নিজ হস্তে লিখিত গর্ভপত্র দেখে চাঁদের সন্দেহ দূর হয়েছে। এত সন্দেহের পরও কিন্তু সোনকাকে রাগে অভিমানে ক্রোধান্বিত হতে দেখা যায়নি বরং তিনি ধীর-স্থির ভাবে পরিস্থিতিটি সামলে নিয়েছেন—

সুস্থির হইয়া প্রভু খাও বাটার পান।
পুত্রের মুখ চাও করিয়া শুভক্ষণ॥
সোনেকার বচনে সাধু আনন্দিত মন।
লখিন্দর ধরিয়া দিল চুম্ব আলিঙ্গন॥
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কপালে।
পুত্র পুত্র বলি চান্দে লইলেক কোলে॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩১৭)

সোনকার এ সংযত আচরণের মধ্য দিয়ে নারীর সহনশীলতা ও গার্হস্থ্যজীবনে নারীর অবদান যে কতটা তা সহজেই অনুমেয়।

অবশেষে সমস্ত প্রমাণপত্র বিচারের পর এই প্রথম পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ। চাঁদ লক্ষ লক্ষ বার পুত্রের মুখ চুম্বন করছেন। অপত্যস্নেহের এক মনোহর দৃশ্য। পুরুষ প্রধান এ সমাজে পুরুষদের বহুগামিতায় কোনো অপরাধ নেই। যে চন্দ্রধর তার সতী সাধ্বী স্ত্রী সোনকাকে এতটা সন্দেহ করেছেন সেই চন্দ্রধরই আবার নর্তকীর নাচে মুগ্ধ হয়ে নিজের মহাজ্ঞান নর্তকীকে দান করেছেন। এ ছাড়াও *মনসাবিজয়* কাব্যে লক্ষ করা যায় '*মনসাবিজয়ে* সনকার স্বামীত্যাগী বোন মেনকা সেজে মনসা যখন চাঁদ সদাগরের বাড়িতে এলেন, তখন তাঁকে দেখে বিমোহিত হয়ে চাঁদ অনায়াসে স্ত্রীকে বলতে পারল, 'তারে বুঝাইয়া প্রাণ রাখহ আমার'। এ-কথা শুনে কানে হাত দিয়ে সনকা হাহাকার করে বিলাপ করলেও শেষ পর্যন্ত অনুরোধ করে বোনকে স্বামীর শয্যায় পাঠিয়েছিল'। (আনিসুজ্জামান ; ২০০০ : পৃ : ২২) জীবনের চরম সংকট মুহূর্তেও চন্দ্রধর নটী বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন—

এক পোন দিয়া আমি ক্রিয়া শুদ্ধি করিমু।
এক পোন দিয়া আমি চিড়া কেলা খামু॥
এক পোন দিয়া আমি নটী নৃত্য চাব।
এক পোন দিয়া আমি সোনেকার ভেটিব॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ২৯২)

দক্ষিণপাটনে বাণিজ্যে গিয়ে দীর্ঘদিন সোনকার অদর্শনে চন্দ্রধরের মতিভ্রম ঘটলেও সোনকা কিন্তু চন্দ্রধরের প্রতীক্ষায় পথ চেয়েছিলেন। চরম উৎকণ্ঠা ও শঙ্কা নিয়ে সোনকা প্রতিটি ক্ষণ অপেক্ষা করেছেন। চন্দ্রধরের মৃত্যু সংবাদেও সোনকা আশা ছাড়েননি। এমনকি চন্দ্রধরের শ্রাদ্ধের আয়োজন প্রায় সমাপ্তিক্ষণেও সোনকা পরম বিশ্বাস নিয়ে চাঁদের পথ চেয়ে আছেন। স্বামীর প্রতি সোনকার এ উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে আপামর বাঙালি নারীর পরম মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে, স্বামী, সন্তান তাদের কাছে প্রাণের চেয়ে প্রিয়।

এরপর নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে চন্দ্রধরের সাথে যখন সোনকার মিলন ঘটেছে তখন সোনকা আবেগে আপ্লুত হয়েছেন।

সোনকা সব সময় একজন আদর্শ গৃহিণী ও জীবনসঙ্গী হিসেবে সুখে দুঃখে চন্দ্রধরের পাশে থেকেছেন। তাইতো মনসার কোপে চন্দ্রধর যখন তার সমস্ত সম্পদ ও বাণিজ্যতরী হারিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন তখন সোনকা তার স্বামীর কাছে কোনো অভিযোগ বা দোষারোপ করেননি বরং এই বিপদের সময় সোনকা পরম আলিঙ্গনে চাঁদকে কাছে টেনেছেন, পাশে থেকে তার সুখ দুঃখে সমব্যথী হয়েছেন-'হৃত-সর্বস্ব চাঁদ সদাগর ধনসম্পদের জন্য আক্ষেপ করলে একান্তভাবে পতিগতপ্রাণা সনকা তার হৃদয়ঢালা প্রেমের সান্ত্বনা বাণী দিয়ে স্বামীকে প্রফুল্ল করার প্রয়াস পেয়েছে। তার এই সান্ত্বনা বাণীর মাধ্যমে ধনসম্পদ লোলুপতার উর্ধ্বে নিরাসক্ত প্রেমময় পতিব্রতা স্ত্রীর রূপটিই ফুটে উঠেছে'। (জয়া সেনগুপ্তা ; ১৯৯০ : পৃ. ২৬৬) নানা অঘটন ও বিপর্যয় কাটিয়ে চন্দ্রধর চম্পকনগরে নিজ আলয়ে ফিরে এসেছেন। আসার পরও ঘটেছে নানা বিপত্তি। চন্দ্রধর ও সোনকা উভয়কে নানা পরীক্ষা দিতে হয়েছে। সন্দেহ মান-অভিমান কাটিয়ে তাদের মিলন ঘটেছে। এরপর তারা তাদের একমাত্র অবলম্বন অন্ধের যষ্টি লখিন্দরকে নিয়ে সুখে সংসার করতে থাকেন। লখিন্দর বয়োপ্রাপ্ত হয়েছে। পুত্রের বিয়ের আয়োজনে চাঁদ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং দেশে দেশে সুপাত্রীর সন্ধান করতে থাকেন।

মধ্যযুগে বিয়ের বয়সদৃষ্টে মনে হয় বাল্যবিবাহ সমাজে খুব জনপ্রিয় ছিল। এ ধরনের বাল্যবিবাহে পাত্র-পাত্রীর নির্দিষ্ট কোনো বয়স মেনে চলা হতো না। তবে মধ্যযুগে রচিত বিভিন্ন কাব্যপাঠের মাধ্যমে জানা যায় বারো বছর বয়সই ছিল বর-কনের বিয়ের উৎকৃষ্ট সময়। কবি বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* কাব্য পাঠে জানা যায় লখিন্দরের বয়স যখন বারো বছর তখন চাঁদ সদাগর লখিন্দরের বিয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সাহেবেনের বারো বছরের কন্যা বেহুলাকে পুত্রবধূ হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* কাব্যে লখিন্দর ও বেহুলার বিয়ের যে বর্ণনা আছে তা অত্যন্ত রাজকীয় এবং জাঁকজমকপূর্ণ। বণিক চন্দ্রধর চম্পকনগরের কর্ণধার। ধনে-জনে, কুলে-মানে, সম্পদে-ঐশ্বর্যে তিনি সমাজের শীর্ষে অবস্থান করছেন। তাঁর পুত্র লখিন্দরের বিয়ে তো আর সাধারণ পাঁচ-দশ জনের মতো হতে পারে না। কবি তাই চাঁদের পারিবারিক অবস্থা ও প্রতিপত্তি বিবেচনায় রেখে তাঁর পুত্রের বিয়ের অনুষ্ঠান অত্যন্ত রাজকীয় করে বর্ণনা করেছেন যা সাধারণ মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সেকালের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের বিবাহ সংঘটনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন-'উচ্চবিত্তের বিবাহোৎসব সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হত। এই প্রক্রিয়ায় ঘর-বাড়ী দেখা, বর-কনে দেখা, পাকা কথা, দিন-তারিখ ঠিক করা, বিয়ের ভোজ, কনে-ভোজ, বর ভোজ প্রভৃতি থাকত'। (শাহজাহান : ১৯৯১ ; পৃ : ২২৭) লখিন্দরের বিয়েতেও দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছিল। সাধারণত বিয়ে সংঘটনের পূর্বে বর ও কনেপক্ষ পরস্পরের বংশ মর্যাদা কুলমান গোত্র সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন এবং বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার সময় পাঁজিপুথি দেখে তিথি নক্ষত্র যাচাই করে শুভক্ষণ ও শুভদিনে রওনা হতেন যা ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। বিয়ের ঘটক সোমাই পণ্ডিত বেহুলার পিতা সাহেবেনের কাছে রাজা চন্দ্রধরের বংশ-মর্যাদা তুলে ধরেন—

কাশ্যপ গোত্র চান্দ বণিক প্রধান।
সাহের পাত্রে কহে তবে চান্দোর বিদ্যমান॥
… … …
মণি মাণিক্য পূর্ণ ভাণ্ডার ঘর॥
পুত্র আছয়ে সাহের পরম সুন্দর।
ধনে জনে কুলে শীলে বণিক প্রধান।
… … …
চান্দোর কনিষ্ঠ পুত্র নাম লখিন্দর।
নানা গুণ ধরে শাস্ত্র পড়িছে বিস্তর॥

তোমার ঘরে কন্যা আছে পরম সুন্দরী।
নানা গুণ ধরে কন্যা রূপে বিদ্যাধরী॥
চান্দোর নিবেদনে যদি তুমি দেও মন।
লখিন্দর সঙ্গে কর শুভ প্রয়োজন॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩৩১)

উল্লিখিত বর্ণনায় বণিক প্রধান চন্দ্রধরের পারিবারিক প্রতিপত্তির বিবরণসহ বংশ পরিচয়, পারিবারিক অবস্থা, অর্থ বিত্ত এমনকি তাঁর প্রাসাদের বর্ণনাও উল্লেখিত হয়েছে। পাত্র হিসেবে লখিন্দরের গুণপনার বিবরণও উপস্থাপিত হয়েছে। লখিন্দরের বিয়ের পাত্রী দেখতে যাওয়ার সময় চন্দ্রধর পাঁজিপুথি দেখে শুভক্ষণে যাত্রা করেন। পাঁজিপুথি দেখে শুভক্ষণে যাত্রা করার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি মেনে বিয়ের কাজ শুরু হয়েছে সেটা স্পষ্ট।

এমন এক শুভদিনে শুভক্ষণে চাঁদ তার সভাসদগণকে নিয়ে উজানিনগরে কনের বাড়িতে যান বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। সেখানে সাহেবেনের সাথে চাঁদ পারিবারিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিকসহ বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এরূপ আলোচনার মধ্যদিয়ে দুটি পরিবার একে অপরকে জানতে ও বুঝতে পারেন এবং এ-আলোচনার মধ্যদিয়ে সৃষ্টি হয় হৃদ্যতার। তারপরই দুটি পরিবার সিদ্ধান্ত নেন আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার। ঘটক সোমাই পণ্ডিত এ হৃদ্যতা বুঝতে পেরেই সাহেবেনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিয়ের ঘটক সোমাই পণ্ডিত সাহ সদাগরের কাছে তার একমাত্র কন্যা বেহুলার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের পুত্র লখিন্দরের বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করার সাথে সাথেই চাঁদের বংশ, মর্যাদা, গোত্র, পিতৃ-মাতৃকুলের পরিচয় প্রদানসহ চাঁদের প্রতিপত্তি, বাড়িঘর ও ধনৈশ্বর্যের বর্ণনা বিবৃত করেন। এরপর চাঁদ পুত্র লখিন্দরের রূপ, গুণ, আচার-আচরণ এবং বিদ্যাভাসের বর্ণনা দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় যে বৈদিক আচার-রীতি সমাজে প্রচলিত ছিল তার নিখুঁত রূপায়ণ ঘটেছে।

বর-কনের জন্ম-জন্মান্তরের এ সম্পর্কে যেন কোনো রকম বিঘ্ন না ঘটে, তাদের সম্পর্ক যেন সারা জীবন অটুট থাকে সে জন্যই এসব মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পালিত হয়। উভয় পরিবারের অভিভাবক যখন বিয়েতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন তখন লগ্নপত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নিয়ম মেনে গণকঠাকুর-এর সহযোগিতায় বিয়ের শুভদিন, ক্ষণ, তারিখ ঠিক করা হয়। গণকঠাকুর দিনপঞ্জিকা দেখে বিয়ের লগ্ন, তিথি ধার্য করে থাকেন। সাহ সদাগর গণকঠাকুর দিয়ে পাঁজিপুথি দেখে বেহুলা লখিন্দরের বিয়ের শুভ দিনক্ষণ নির্ধারণ করার জন্য সভাসদগণকে অনুরোধ করেছেন-

শাহে বলে গণক আনি দিন ধার্য কর॥
মুকাই গণক বলি চান্দো ডাকে উচ্চস্বরে।
পাঁজি হাতে করি আইল চাঁন্দের গোচরে॥
পাঁজি বিচারিয়া তবে নাহি দেখে ভাল।
বিবাহের দিনে দেখে সর্পের জঞ্জাল॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩৩২)

মুকাই পণ্ডিতের বিধান শুনে সাহেবেনে মনসার সঙ্গে বিবাদের জন্য কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কন্যা সমর্পণে অপরাগতা প্রকাশ করেছেন। কেননা জেনে শুনে কোনো মাতা-পিতা তার সন্তানকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারেন না। এ সময়ে চন্দ্রধর বিন্দু মাত্র বিচলিত না হয়ে বজ্রকণ্ঠে জানিয়েছেন তিনি কীভাবে চ্যাংমুড়ি কানিকে অপমানে ও লাঞ্ছনায় ঘায়েল করেছেন—

চান্দো বলে শুন শুন বাদের কাহিনী।
... ...
পূজার মণ্ডপে আসি অর্ঘ্য না পাইল।
সেই অপরাধে মোর ছয়পুত্র খাইল॥
... ...

হেমতালে বাড়ি মারি ভাঙ্গিলু কাকলি॥
কাপিতে কাপিতে গেলি ধন্বন্তরির বাড়ী॥
(ষষ্ঠীবর ; ১৯৩৬ : পৃ : ২৮০)

সাহেবেনে খুব ভালো করেই বুঝে গেছেন চন্দ্রধরের পুত্রের জীবন রক্ষার একমাত্র উপায় মনসার পূজা প্রদান। তাই তিনি চন্দ্রধরকে অনুরোধ করেন মনসার পূজা প্রদানের জন্য কিন্তু চন্দ্রধর দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দেন তাঁর দ্বারা 'চ্যাংমুড়ি কানি'র পূজা সম্ভব নয়—

চান্দো বলে শুন সাহে আমার বচন।
প্রাণ গেলে না পূজিব কানির চরণ॥
(বিপ্রদাস ; ১৯৫৩ : পৃ : ১৭৪)

অবশেষে অন্য এক গণকঠাকুর বিধান দিলেন বৈশাখ মাসের তের তারিখ গত হওয়ার পর চৌদ্দ তারিখই হচ্ছে বিবাহের উত্তম দিন। ঐ দিনই বেহুলা-লখিন্দরের বিয়ের শুভদিন। গণকের মুখে এ কথা শুনে চাঁদ এতটাই খুশি হলেন যে, নিজের হাতের অনেক দামি অঙ্গুরি গণকঠাকুরকে বকশিস হিসেবে প্রদান করেন। চাঁদ-শাহ একসাথে বসে পুত্র-কন্যার বিয়ের দিন তারিখ স্থির করেন। বিয়ের দিন-তারিখ স্থির হওয়ার পর চাঁদ স্বীয় পুত্রের বিয়ের আয়োজন করার নিমিত্তে নিজ রাজ্য চম্পকনগরে ফিরে আসার প্রাক্কালে সাহেবেনের কাছে অনুমতি নিতে গেলে সাহেবেনে হবু বেয়াইকে না খাইয়ে কিছুতেই ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না—

সাহে বোলে তোমা সঙ্গে শুভ প্রয়োজন।
আমার ঘরেতে বেহাই করিবা ভোজন॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩৩৭)

মধ্যযুগের বাঙালি সমাজের সম্প্রীতি-আত্মীয়তা ও মৌলিকতার এ আরেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হবু বেয়াইয়ের আমন্ত্রণ চন্দ্রধর উপেক্ষা করতে পারেননি। চাঁদ জাতিতে বণিক, বুদ্ধিতে অত্যন্ত প্রখর ও জ্ঞানে ধীর। হবু পুত্রবধূর গুণপনা জানার জন্য তিনি এক শর্ত জুড়ে দিলেন। তিনি সাহেবেনেকে বললেন দক্ষিণপাটনে বাণিজ্য যাত্রায় গিয়ে তিনি অসুখে পড়েছিলেন। সেজন্য তিনি লোহার কলাইয়ের ভাত খান যদি তারা লোহার কলাইয়ের ভাত তাকে খাওয়াতে পারেন তবে তিনি অবশ্যই আতিথ্য গ্রহণ করবেন। এ শর্ত দিয়ে চাঁদ এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করতে চেয়েছেন। একদিকে নিমন্ত্রণ রক্ষা অন্যদিকে হবু পুত্রবধূর গুণপনা জানার আগ্রহ। অবশ্য এ পরীক্ষায় ভাবী পুত্রবধূ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পুত্রবধূ কর্তৃক লোহার কলাইয়ের রান্না ভাত খেয়ে চন্দ্রধর খুব খুশি হয়েছিলেন। বিয়ের পাত্রীর গুণপনা যাচাইয়ের এইসব কৌশল তৎকালীন বাঙালি সমাজের গার্হস্থ্যজীবনের অপরিহার্য বিষয় ছিল।

এরপর চন্দ্রধর সাহেবেনের পরিবারের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলেন সেই সময় সাহেবেনে চন্দ্রধরের পত্নীর (সোনকার) জন্য বহু মূল্যবান অলঙ্কার উপহার দিলেন। সম্ভবত সেই সময় বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হলে উচ্চবিত্ত সমাজে পুত্রের মাতাকে মূল্যবান অলঙ্কার উপহার দিয়ে সম্মানিত করার প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল। চম্পকনগরে ফিরে এসে চন্দ্রধর পুত্রের বিয়ের আয়োজনের নির্দেশ দেন। কিন্তু বাসর রাতে পুত্রের মৃত্যুযোগের কথা স্মরণ করে সোনকা পুত্রকে বিয়ে না দেয়ার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করেন। মেয়েলি এ অযৌক্তিক যুক্তির বিরুদ্ধে চন্দ্রধর দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দেন দু'পক্ষের সর্বসম্মতিক্রমে বিয়ে স্থির হয়েছে, সোনকার শঙ্কা আছে, থাকবে কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধ ভাঙ্গার কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং তিনি বিপদ থেকে কীভাবে পুত্রকে রক্ষা করবেন সেই আশ্বাস স্ত্রীকে প্রদান করেন।

বাসর রাতে লখিন্দরের মৃত্যুযোগ লোক-পুরাণ নির্ধারিত ভবিতব্য। মায়ের মন এমনিতেই সন্তানের বিপদাশঙ্কায় সর্বদা আতঙ্কিত। ছয়পুত্র হারা জননী সোনকার আশঙ্কা আরও বেশি কারণ মনসার বরে সপ্তম যে পুত্র সোনকা লাভ করেছেন সেখানে শর্তই ছিল বাসর রাতে মনসা তাকে হরণ করবেন। এজন্য আশঙ্কা

আরও বেশি। এ কারণেই সোনকা কখনই অন্তর থেকে লখিন্দরের বিয়েতে সম্মতি দেননি। যদিও সদাগর এহেন বিপদ থেকে পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য লোহার বাসরঘর তৈরি করেছেন। কিন্ত কোনো নিরাপত্তাবলয়ই সোনকার অন্তরে আশা জাগাতে পারেনি। কেননা বাস্তববাদী সোনকা জানতেন দেবতা ও মানুষের মধ্যকার দ্বন্দ্বে মানব কখনই জয়ী হতে পারেন না। তারপরও সকল দুঃখ, যন্ত্রণা বুকে চাপা দিয়ে, সমস্ত বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে সমাজ, সংসার, স্বামী ও সন্তানের জন্য উৎসর্গীকৃত সোনকা একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্তানের মঙ্গল কামনায় সকল আচার-পার্বণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন।

ভাবী দম্পতির মঙ্গলার্থে হিন্দু সমাজে পুত্র বা কন্যার বিয়ের পূর্বে মাতা-পিতা কিছু ধর্মীয় সংস্কার বা আচারবিধি পালন করে থাকেন। বেহুলা লখিন্দরের বিয়েতেও এ সকল নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। নব দম্পতির মঙ্গলের জন্য এবং তাদের সম্পর্ক যেন যুগ যুগ ধরে অটুট থাকে এ উদ্দেশে বিয়ের পূর্বে যে সকল আচারবিধি পালন করা হয় তারমধ্যে অন্যতম-অধিবাস, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, ষোড়শ মাতৃকা ও নান্দীমুখসহ সকল বৈদিক নিয়ম কানুনগুলো সোনকা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন।

বিয়েতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বরকে স্নান করানোর পূর্বে শুদ্ধির জন্য নাপিত দ্বারা লখিন্দরকে ক্ষৌর কর্ম করানো হয়। কবির বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় বিবাহযাত্রার পূর্বে স্নানের নিমিত্তে লখিন্দরকে কনকাসনে বসানো হয় এবং এয়োগণ মিলে মঙ্গলগান ও জয়জোকার দিতে থাকেন। স্নান সজ্জা, মঙ্গালঘট, প্রদীপ নিয়ে এয়োরা অপেক্ষা করতে থাকেন। আনন্দ উল্লাসের সাথে তারা লখিন্দরকে স্বর্ণ নির্মিত আসনে বসিয়ে আমলকি, হরিতকি, গিলা, মেথি ও হলুদের সাথে সরিষার তেল মিশিয়ে ফেসপ্যাক তৈরি করে লখিন্দরের গায়ে-মুখে মাখিয়ে দেন। এরপর এয়ো কর্তৃক সুবর্ণের কলসিতে সাধা জলে লখিন্দরকে স্নান করানো হয়। লখিন্দরের স্নান সজ্জায় রাজকীয় ও আভিজাত্যের ছাপ ছিল। এ সময় চারিদিকে পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে, এয়োগণের মুহূর্মুহু উলুধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়। স্নানের পর লখিন্দরের অঙ্গচর্চায় চন্দন, চুয়া ও কস্তরী এবং কেশ চর্চায় ধুপের ধোঁয়া ব্যবহার করার উল্লেখ আছে। আধুনিক যুগের মতো সুগন্ধি দ্রব্য কিনতে পাওয়া যেতো না বলেই প্রাকৃতিক বা ভেষজ দ্রব্য ব্যবহার করার চল ছিল—

আগর চন্দন চুয়া কস্তরি বিশেষ।
ধুপের ধুয়া দিয়া শুখায়ে মাথার কেশ॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩৬৩)

সাধারণ আয়নায় লখিন্দরের মুখ দর্শন মানায় না বিধায় কবি চন্দ্রধরের সামাজিক প্রতিপত্তি এবং মর্যাদার কথা বিবেচনায় নিয়ে মানিক্য খচিত আয়না ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন কবি বিজয়গুপ্ত।

অলঙ্কারে আসক্ত শুধু নারীরা নয় তৎকালে পুরুষ সমাজেও নানা অলঙ্কার পরতে দেখা যেত। বিয়ের অনুষ্ঠানে তো বটেই এছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ছেলেদেরকে অলঙ্কার পরানোর চল ছিল। বর সাজে সজ্জিত করার সময় লখিন্দরকে বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত করা হয়—

সুবর্ণ টোপর মাথে কনক অঙ্গুরি হাতে,
গলে মণি মুকুতার হার।
বিরমল খারূ পায়ে কনকের খারূ তায়ে
সুবর্ণের কুণ্ডল দিল কানে।
কস্তুরি কুমকুম ছন্দে সর্ব্বাঙ্গ ভরিল গন্ধে
অঞ্জনে রঞ্জিত দুই আঁখি।
পারিজাত পুষ্পের মালা ভরিয়া সকল গলা
সাক্ষাতে মদন হেন দেখি।
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩৬৫)

লখিন্দর আজ এমন একটি গুরু দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন সেখানে মায়ের আশীর্বাদ খুব জরুরি এ জন্য তিনি মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে বিয়েতে যাত্রা করলেন। নতুন জীবনে প্রবেশ করতে গিয়ে বরের ভাবী জীবনের

সুখানুভূতির অন্তরালে বিরাজ করে শঙ্কা এবং ভাবনা। কনের বাড়ি যাওয়ার প্রাক্কালে লখিন্দরের অবস্থাও ঐ একই। এই বিদায়ক্ষণটি অনেক সময় কান্নাকাটিতে পরিণত হয় যা আবহমান বাঙালি সমাজের চিরন্তন রীতি। সামাজিক এ রীতির বর্ণনা কবি বিজয়গুপ্ত অত্যন্ত সংবেদনশীল হৃদয়ে ব্যাখ্যা করেছেন—

মায়ের ঠাই বিদায় মাগে শোনগ জননী।
বিদায় দেও যাই আমি নগর উজানি॥
মায়ে বলে শোন পুত্র বীর লখিন্দর।
উজানিতে যাবা তুমি লাগে মোর ডর॥
পুত্রের বোলে সোনকার স্থির নহে হিয়া।
আহা পুত্র বলি পড়ে ভূমে পাছাড় খাইয়া॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩৭১)

চাঁদ সদাগর তাঁর বংশ গৌরব ও মর্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন নিয়ে পুত্রের বিয়ের উদ্দেশে লখিন্দরকে নিয়ে উজানিনগরে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ বিয়ের অনুষ্ঠানে তাদের সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তারের সুযোগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করে থাকেন যা তাঁদের সম্মান বর্ধনের হাতিয়ার। কবির দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণভাবেই সেদিকে নিবদ্ধ ছিল আর সেকারণেই দেখা যায়, চাঁদ তার পুত্রের বিয়ের যাত্রায় পাঁজি হাতে ব্রাহ্মণ, হাতে অস্ত্র, কোদাল, প্রোজ্জ্বলিত মশাল, মাথায় জালসহ চারিশত কৈবর্ত, সাতশত সোনা রূপার গহনায় সজ্জিত ঘোড়া, তিনশত হাতি, তিনশত গাধা, শতশত বলদ, নয় হাজার উট, শতশত কুকুর, তিন হাজার গন্ধ বণিক, তিনশত ভাট, নয়শত ব্রাহ্মণ, চৌদ্দশত কুলীন সজ্জন, নয়শত মালি, তেরশত ময়ুর, দুইশত গাড়ুরিয়া ওঝা, চৌদ্দশত কামার, তেরহাজার কুরি, দুইশত কটড়া, নয়শত তেলি, দুইশত ধোপা, এগারশত গোয়ালা, তেরশত হালচাষী, নয়শত সুবর্ণ বণিক, তেরশত বারই, চারশত জেলে, তেরশত ডোম, একশত নাপিত, সাতহাজার নটী, এগারহাজার যোগী, দুইশত ছুতার, তিনশত করাতি, তিনশত কারিগর, এগারশত তাঁতি, আড়াই হাজার সোনা-রূপার নির্মিত দোলা, আশিখান সোনার চৌদোল, সাতখান সোনার পালঙ্ক, নয়শত নাইয়া, দুইশত ঢাক চলে শতেক মৃদঙ্গ, বাদ্যযন্ত্রসহ তেরশত বাদ্যকর সঙ্গে নিয়েছেন।

এ বর্ণনা রাজকীয় বর্ণনা সন্দেহ নেই। এ রাজোচিত বিবাহযাত্রার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন পেশাজীবী সম্প্রদায়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। বিবাহযাত্রায় যাত্রীদের যানবাহন বরাদ্দে শ্রেণিভেদ পরিলক্ষিত হয়। খাদ্য বিভাজন যেমন আর্থিক সংগতির উপর নির্ভর করত তদ্রূপ যাত্রীদের যানবাহন বরাদ্দ তৎকালে নির্ভর করত বংশ গৌরব ও আভিজাত্যের উপর। কবির দৃষ্টি এদিকে খুব তীক্ষ্ম্ভাবে নিবদ্ধ ছিল। সম্ভবত গন্ধবণিকদের স্থান তখন সমাজের উচ্চে ছিল। তাই গন্ধবণিকদের যাত্রার জন্য হাতি বরাদ্দ হয়েছে—

গন্ধবণিক সব রাজভোগে ভোলা।
কেহ হস্তীর পৃষ্ঠে চড়ে কেহ চড়ে দোলা॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩৬৮)

বরের সহযাত্রী হিসেবে চাঁদ জেলে ও ডোমদেরও সঙ্গে নিয়েছেন—

কালা কালা শরীর সব নাকের আগে রোম।
চারিশত জালুয়া চলে তেরশত ডোম॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩৬৯)

চাঁদ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। সাধারণ মানুষের অভিভাবক হিসেবে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সাথে চাঁদের সম্পর্ক ছিল মধুর। এ কারণেই সকল সম্প্রদায়ের মানুষ লখিন্দরের বিয়ের বরযাত্রী হয়েছেন। অত্যন্ত সুচতুর, বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন চাঁদ বরযাত্রী নির্বাচনে কোনো ত্রুটি রাখেননি। এছাড়া ব্যক্তি উদ্দেশ্যও কিছুটা

সক্রিয় ছিল। দেবী মনসার অভিশাপ চাঁদের মাথায় ছিল বলেই পুত্রের জীবনশঙ্কায় তিনি তেরশত সর্পভূক ময়ুর এবং দুইশত গাড়ুরিয়া ওঝা সঙ্গে নিয়েছিলেন—

তেরশত ময়ুর চলে মাথে তার বোঝা।
দুইশত চলিয়াছে গারড়িয়া ওঝা॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩৬৮)

এভাবে নানা বেষ্টনী এবং কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে চাঁদ লখিন্দরকে নিয়ে উজানিনগর কনের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। কনের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে বরপক্ষের সঙ্গে কন্যাপক্ষের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা কাটা-কাটি বা ঝগড়া-বিবাদ একটি সাধারণ ঘটনা বলেই সবাই জানে। এ বিবাদ আবার দু'পক্ষের মধ্যস্থতায় সমঝোতা হয়। বরপক্ষ উজানিনগরে সাহেবেনের বাড়িতে পৌঁছালে যথারীতি সাহেবেনের পুত্র হরিসাধু বরের পথ আটকিয়ে সামান্য পান-সুপারি দাবি করে ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ করেন। এটি বিয়ের অনুষ্ঠানের এক ঐতিহ্যিক অংশ।

প্রাক-বৈবাহিক কিছু আচার-পার্বণ কন্যার বাড়িতেও পালিত হয়। বেহুলার গাত্রহরিদ্রা ও স্নান অনুষ্ঠান বিয়ের দিনে সমাপ্ত হয়। যে নিয়মে ও যেভাবে লখিন্দরের স্নান এবং গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান হয়েছিল সেই একই নিয়মে বেহুলার স্নান এবং গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বেহুলার মা সুমিত্রা এবং তার ভাতৃবধূগণ মিলে বেহুলাকে নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা করলেন। মধ্যযুগে নারীর অলঙ্কার বাহুল্য ছিল। বিয়েতে উচ্চবিত্ত ঘরের কনেকে প্রচলিত প্রায় সকল অলঙ্কারে বিভূষিতা করা হতো।

কন্যাসাজের সময় কন্যার সখী এবং অন্যান্য সমবয়সী নানা রকম হাস্য-পরিহাস করে থাকেন। হাস্য-কৌতুকের উদ্রেক করে পরিবেশটাকে তারা আরও বেশি আনন্দময় করে তোলেন। গৃহগত জীবনে এরকম হাস্য পরিহাস অন্দরমহলের নারীদের জন্য ছিল বহু আকাঙ্ক্ষিত। তাদের জন্য এ অনুষ্ঠানটি সাময়িক আনন্দ দানের মাধ্যম ছিল। বেহুলা একেতো রূপে লক্ষ্মী এবং গুণে সরস্বতী তার ওপর নানা আভরণ এবং বসনে তাকে অপূর্ব লাগে। কন্যাকে সাজানোর পর লোকবিশ্বাস ও সামাজিক কুসংস্কার অনুযায়ী অমঙ্গল এবং অপদেবতার হাত থেকে বেহুলা ও লখিন্দরকে রক্ষা করার জন্য সুমিত্রা কিছু সংস্কার পালন করেন। পুরানো জোয়াল টানানো, আড়া-আড়িভাবে দুটি কলা গাছ বাধা, সিদ্ধ কলার বাকল ফেলে তার মধ্যে মুড়ে পীছার সলা পুতে দেওয়া এবং গোবর দ্বারা আবরিত করে রাখা স্থানে জামাইকে বসতে দেওয়া ইত্যাদি। মধ্যযুগে সমাজে কুসংস্কার বেশি ছিল। তাছাড়া চাঁদ সদাগর ও মনসার আদর্শিক দ্বন্দ্ব এবং লখিন্দরের ভবিতব্য সুমিত্রাকে নিরন্তর ভাবায়। তিনি কন্যার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে বেশ শঙ্কিত। মাতৃহৃদয় সারাক্ষণ সন্তানের মঙ্গল কামনায় ব্যস্ত। সমাজে যত সংস্কার-কুসংস্কার আছে সন্তানের মঙ্গল কামনায় মায়েরা সব কিছু বিশ্বাস করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। বেহুলা ও লখিন্দরকে বিপদ মুক্ত রাখতেই সুমিত্রার এ আয়োজন।

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য লখিন্দরকে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাওয়া হলো। কন্যা এবং বরপক্ষের দুজন ব্রাহ্মণ ছাঁদনাতলায় উপস্থিত ছিলেন। শাস্ত্র অনুযায়ী চাঁদ উত্তরমুখী এবং লখিন্দর পূর্বমুখী হয়ে ছায়ামণ্ডপে বসেছেন। ছাঁদনাতলার সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা বিশেষ করে পুত্রের পিতা কর্তৃক মাঙ্গলিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুত্রকে বিয়ের উপযোগী ঘোষণা করে বিয়ের অনুমতি দান করা হয়। নিয়মটি আজও হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে।

বরবরণ এবং কন্যা ছাঁদনাতলায় আগমনের দৃশ্যটি অত্যন্ত চমকপ্রদ। বরবরণের সময় অনুষ্ঠানে সাজ সাজ রব ওঠে, সকলের মধ্যে বিশেষ করে কন্যার পিতা এবং মাতার একদিকে ব্যস্ততা অন্যদিকে আনন্দ ও উল্লাস দর্শকদের চোখে পড়ার মতো। বরবরণের সময় কন্যার মাতা-পিতা তাঁদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে জামাইকে খুশি করার চেষ্টা করেন। লখিন্দরকে বরণ করার জন্য প্রথমে বেহুলার পিতা সাহেবেনে এবং পরে মাতা সুমিত্রাদেবী এয়োগণকে সঙ্গে নিয়ে জামাই বরণ করতে আসেন—

পাদ্য অর্ঘ আচমনি গন্ধ চন্দন।
ফল তাম্বুল বস্ত্র নানাবিধ ধন॥
... ...
জামাই বরিয়া সাহে মন কুতূহল॥
দুই পাশে নারীগণ দাঁড়াইছে সারি সারি ।
সুমিত্রায়ে বরিতে আইল লইয়া কুলনারী॥
কেহর হাতে ধান্য দূর্ব্বা কেহর হাতে ঘট।
আইয়গণ লইয়া আইল জামাইর নিকট॥
বিবাহের দিন জামাই ছুঁইতে দোষ নাই।
হাস্য কৌতুকে বরেন বেইলার জামাই॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩৮০-৩৮১)

সহচরীদের সঙ্গে নিয়ে সুমিত্রা লখিন্দরকে বরণ করলেন। আয়ুঘট সামনে রেখে ধানদূর্বা দিয়ে লখিন্দরকে বরণ করা হলো। জামাই বরণের সময় সুমিত্রা লখিন্দরের চোখে কাজল, সাতনল সুতা জড়ানো, নারকেল জল পান করানো, কপালে সরাসহ বরণ ডালা ছোয়ানোসহ যে সব আচার-পার্বণ করেছিলেন তার প্রত্যেকটি পর্ব বর-বধূর মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য কন্যার মাতা পালন করেন যা আজও হিন্দু সমাজে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালিত হয়। বিবাহমণ্ডপে জামাইকে দেখতে কুলনারীদের ভীড় সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। হাসি, ঠাট্টা, কৌতুকপ্রিয়তা এ অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ।

এরপর শুরু হয় জামাইকে নিয়ে আগত অতিথিদের মন্তব্য করার পালা। লখিন্দরকে দেখতে আসা আগত মহিলারা লখিন্দরকে নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করতে থাকেন। বিশেষ করে গ্রামীণ পরিবেশে বিভিন্ন শ্রেণির নারীদের মন্তব্য বেশ উপভোগ্যও বটে। বেহুলার স্বামী লখিন্দর সুদর্শন যুবক। বেহুলার এরূপ রূপবান স্বামী দেখে কেউ বা ঈর্ষায় জ্বলছেন কেউ আবার গোপনে বা প্রকাশ্যে লখিন্দরকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছা মনের মধ্যে লালন করছেন। মঙ্গলকাব্যগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে নারীগণের পতিনিন্দা, কারণে-অকারণে নিজ পতির নিন্দা করা তৎকালের নারীদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। বিবাহসভা অথবা অন্য কোনো স্থানে নায়কের দর্শনমাত্র বিবাহিত নারীগণ নিজ পতির সাথে তাকে তুলনা করে নিজেদের স্বামী দুর্ভোগের কথা স্মরণ করতেন। এর মধ্য দিয়ে নায়কের মর্যাদা বৃদ্ধি পেলেও, সামাজিক মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা সামাজিক-পারিবারিক ইতিহাসেরই অলিখিত প্রকাশ। বেহুলার রূপবান স্বামী দেখে জনৈক নারী তার বেশি বয়সের কথা অস্বীকার করে এই আশা ব্যক্ত করেছে যে, লখিন্দর যদি দিন কতক উজানিনগরে থাকেন তবে বেহুলাকে ভুলে লখিন্দর জনৈক নারীর প্রেমে মত্ত হবেন। লখিন্দরকে দেখে এক নারীতো তার স্বামীকে বলি দিতে রাজি এবং ভিক্ষা মেগে খাওয়ার জন্য লখাইয়ের দেশে যেতেও প্রস্তুত—

তাহারে দেখিয়া মোর গায়ে লাগে সলি।
লখাইর পায়ে কাটিয়া তাহারে দেই বলি॥
এ স্বামী কাজ নাই দেশে মাগি খাই।
মাগিয়া খাইতে আমি লখাইর দেশে যাই॥
মাগিয়া খাই যদি তবু মোর সুখ।
অনুক্ষণ দেখিব আমি লখাইর চন্দ্রমুখ॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩৮৩)

কবির এ সরস বর্ণনা যে বাস্তবানুগ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমেয় তৎকালে নিম্নবর্ণ সমাজের নারীরা ছিলেন ছলনাময়ী। নিজ নিজ পতি নিয়ে তারা সন্তুষ্ট ছিলেন না বলেই লখিন্দরকে দেখে আবেগে আপ্লুত হয়েছেন এবং সতীত্ব সম্পর্কে তারা যে খুব একটা সুদৃঢ় অবস্থানে ছিলেন তেমনটিও মনে হয় না। খানিকটা হলেও শৈথিল্য ছিল, তার কারণ সম্ভবত তখনকার দিনে নিম্নবিত্ত সমাজের নারীরা দাম্পত্যজীবনে সুখী ছিলেন না। এছাড়াও পরিবারে নারীদের তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না বলেই

তাদের মধ্যে হতাশা, ব্যর্থতা, অপূর্ণতা পরিলক্ষিত হতো। নিজের স্বামীকে নিয়ে অধিকাংশ নারী অসুখী ছিলেন। সম্ভবত সমাজের প্রয়োজনে এবং দৃষ্টান্ত সংস্থাপনের জন্য বেহুলাকে সতীত্ব তেজে মৃত স্বামীর পুনর্জীবন দান অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

কবি বিজয়গুপ্ত পরিবেশ সচেতন কবি। বেহুলা লখিন্দরের বিয়ের বর্ণনায় তিনি একজন প্রবীণ এয়োর ন্যায় গার্হস্থ্যজীবনের সমস্ত আচার, সংস্কারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের বিয়ের উদ্যোগ গ্রহণ থেকে শুরু করে বিয়ের আসরে ও অন্দরমহলে প্রত্যেকটি জায়গায় সামাজিক আচার সংস্কার ও নিয়মনীতি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিজয়গুপ্ত সর্বত্র গ্রামীণ ও ঘরোয়া পরিবেশে কাব্যের কাহিনি ও ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বিয়ের বর্ণনায় কবি বাঙালি ঘরের বিবাহ-অনুষ্ঠানের সনাতন নীতি অনুসরণ করেছেন। কবি এত সূক্ষ্মভাবে বিয়ের আচার-পার্বণগুলো বিশ্লেষণ করেছেন যাতে তাঁকে একজন অভিজ্ঞ পার্বণিক বললেও অত্যুক্তি হবে না।

গোধূলিলগ্ন বিয়ের উপযুক্ত সময়, এ সময়ে নানা বাদ্য-বাজনা এবং জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে বিচিত্র আসনে বসে সখীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে বেহুলা ছাঁদনাতলায় আগমন করেন। ছাঁদনাতলায় কন্যা আগমনের দৃশ্যটি অত্যন্ত চমকপ্রদ। এর পরের অনুষ্ঠান সাতপাক যে পর্বটি কবি অতি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। সাতপাক শুধু সাতটি পাক নয় এই পাকের মধ্য দিয়ে বর-বধূ পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। সাতপাকে বরকে প্রদক্ষিণ করার সময় চারিপাশে দণ্ডায়মান পরিজন ও অতিথিবৃন্দ বর-কন্যাকে ফুল ছিটিয়ে অভিবাদন জানান। কন্যা হাত জোড় করে বরের পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করেন। সাতপাকের পরের অনুষ্ঠান শুভদৃষ্টি এ পর্বটিও অত্যন্ত চমকপ্রদ। শুভযোগে দু'জন দৃষ্টি বিনিময় করেন। তাছাড়া বেহুলা-লখিন্দরের শুভদৃষ্টির এই শুভক্ষণে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হয় যা মঙ্গলের প্রতীক মনে করা হয়।

শুভকাজ সংঘটনের মুহূর্তে অনেক সময় অশুভ লক্ষণ চোখে পড়ে যা সব সময় যে খারাপ বার্তা আনে তেমনটি নয় কিন্তু বেহুলা-লখিন্দরের বিয়ে নির্বিঘ্নে সংঘটিত হওয়ার কথা নয়। কারণ এখানে দেবতা মানুষের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ নিহিত ছিল। বিয়ের আসরে এ অশুভ লক্ষণ প্রথম লক্ষ করেন বেহুলার মাতা সুমিত্রা কারণ মাতৃহৃদয় সন্তানের মঙ্গল চিন্তায় সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকে। তিনি প্রথম লক্ষ করেন লখিন্দরের মাথার ওপর থেকে ছাতা ভেঙ্গে পড়েছে যা অশুভ লক্ষণের প্রতীক ফলত এটা প্রমাণিতও হয়েছিল—

অশুভ নিকটে আইলে নানা দৈব লাগে।
পদ্মার দৃষ্টে লখিন্দরের মাথা ছত্রয়ে ভাগে॥
... ...
বিহার কালে ছত্রভঙ্গ বড়হি জঞ্জাল॥
ঘরে থাকি সুমিত্রায়ে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
বিহার কালে ছত্রভঙ্গ কর্ম্ম হইল নাশ॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৩৯৪)

এর মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের বাঙালির গার্হস্থ্যজীবনের কুসংস্কার আচ্ছন্ন বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

ছাঁদনাতলায় লখিন্দর একাধিকবার মূর্ছিত হয়েছেন। ফলে আনন্দের বিয়ের উৎসব মুহূর্হে শোকে পরিণত হয়েছে। লখিন্দরকে পুনরুজ্জীবিত করতে দৃঢ় প্রত্যয়ী বেহুলা তার বাবাকে অনুরোধ করেছেন মনসার পূজা দিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। আত্মপ্রত্যয়ী বেহুলার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি লখিন্দরের জীবন রক্ষা করবেনই।

স্বামীকে পুনর্জীবিত করতে বেহুলাকে কম কৃচ্ছ্র সাধন করতে হয়নি। মনসার থানে গিয়ে বেহুলা একে একে নিজের অঙ্গ কাটতে থাকেন। চরম সংকট মুহূর্তে যখন আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হয়েছেন তখনই মনসা কৃপা বর্ষণ করেছেন। আর লখিন্দর ফিরে পেয়েছেন তার জীবন। মধ্যযুগের কবিরা তাঁদের কাব্যে এমন অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ মাঝে মধ্যেই করেছেন। স্বামীর জীবন রক্ষার্থে বাঙালি নারীরা যে কতটা আত্মত্যাগ করতে পারেন বেহুলা তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বেহুলা যখন এ আত্মত্যাগে লিপ্ত তখনও বেহুলা

লখিন্দরের বিবাহ সম্পন্ন হয়নি। ভাবী স্বামীর জন্য বেহুলার এ আত্মত্যাগ পুরো নারী সমাজকে মহিমান্বিত করে।

লখিন্দর জীবন ফিরে পাবার পর বিয়ের পরবর্তী পার্বণগুলো পালিত হয়। সমস্ত আচার অনুষ্ঠান সমাপনের পর সাহেবেনে কন্যা সম্প্রদান করেন। বিয়েতে কন্যাসম্প্রদান পর্বটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। এতদিনের স্নেহে পালিত কন্যাকে জামাতার হাতে সমর্পণ করা একজন পিতার কাছে সত্যই বড় কষ্টের, বড় বেদনার। কন্যাসম্প্রদানের সময় পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করেন কন্যার পিতা পুরোহিতের সাথে সাথে একই মন্ত্র উচ্চারণ করে জামাতার হস্তের ওপর কন্যার হস্ত স্থাপন করে কন্যার সমস্ত দায়িত্ব জামাতার ওপর অর্পণ করেন। বাঙালি গৃহস্থ ঘরের এই বেদনাময় দিকটি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন কবি বিজয়গুপ্ত।

কন্যা সমর্পণের মধ্য দিয়ে বর কনেকে ছাঁদনাতলার মঞ্চ থেকে নামিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এরপর শুরু হয় স্ত্রী আচার পর্ব। গ্রামের আগত নারীরা বিশেষ করে দিদিমাশ্রেণি স্থানীয়রা নাতজামাইকে সাময়িক আনন্দদানের জন্য হাসি ঠাট্টার আয়োজন করে থাকেন। এটি গৃহগত কুলাচারের মধ্যে অন্যতম। এসব কুলাচারের মধ্য দিয়ে উপস্থিত দর্শক বর-বধূর পারস্পারিক আন্তরিকতা পরীক্ষা করেন। বিবাহোত্তর কিছু কুলাচার পালিত হওয়ার উল্লেখ করেছেন কবি বিজয়গুপ্ত তাঁর *মনসামঙ্গল* কাব্যে।

উৎসব সমাপনান্তে কন্যা বিদায়ের আয়োজন। এত দিনের স্নেহে পালিত কন্যাকে জামাতার হাতে সমর্পণ সত্যিই এক হৃদয়-বিদারকদৃশ্য। পুরুষপ্রধান এ সমাজে নারীর অবস্থান ছিল স্বামী-শ্বশুরের ওপর সম্পূর্ণরূপেই নির্ভরশীল। সেকালের মহিলারা ছিলেন একান্ত ভাবেই পরান্নভোগী। অসহায় ও পরনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকতে হতো তাদেরকে, মাতা-পিতার চিন্তা ছিল এখানেই তাইতো কন্যা বিদায়ের সময় সাহেবেনে এবং সুমিত্রা জামাতা লখিন্দরের হাত ধরে বেহুলাকে প্রতিপালনের জন্যই বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

পরকে আপন, অনাত্মীয়কে আত্মীয় করার মহান ব্রত নিয়ে একজন মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে আসে, স্বপ্ন দেখে নতুন পরিবেশে নিজের সংসার সাজানোর। বেহুলা পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নিয়ে শ্বশুর গৃহে যাচ্ছেন আত্মজার এ বিদায়ক্ষণে মা সুমিত্রার হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ।

আশৈশব স্নেহে লালিত পালিত কন্যাকে সমস্ত গার্হস্থ্য রীতি-নীতি এবং ধর্মশিক্ষা দিয়ে মাতা-পিতা যখন জামাতার হাতে তুলে দেন তখনও তাদের একমাত্র উপদেশ থাকে শ্বশুর, শাশুড়ি ও পতিসেবা। তাদের ধারণা পতি পরম গুরু, পতি বিনা নারীর অন্য কোনো গতি নেই। পতিসেবা পরম ধর্ম, এর থেকে আর কোনো বড় ধর্ম থাকতে পারে না। বস্তুত সতী সাধ্বী এবং পতিব্রতা নারীর মর্যাদা ছিল সমাজে সবচেয়ে ওপরে। অন্য আর যত গুণই থাক না কেন সতীত্ব এবং পতিপরায়ণ না হলে নববধূকে সমাজে ঘৃণিত হতে হতো। পতিসেবার এই মহান ব্রত নিয়ে বেহুলা বিচিত্র দোলায় চড়ে শ্বশুর বাড়ি এলেন। নব বধূর মুখ দেখে শাশুড়ি সোনকা অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বাঙালির চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী মণি-মানিক্য এবং নানা কুলাচার পালনের মধ্য দিয়ে গৃহের লক্ষ্মীকে বরণ করেন—

পুত্রবধূর মুখ দেখি সোনাই আনন্দিত।
মাণিক্য হস্তেত দিয়া বলিল ত্বরিত॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৪১২)

তারপর বেহুলার জীবনে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যে ক্ষণটি প্রত্যেক নারীর জীবনে পরম কাঙ্ক্ষিত, পরম প্রত্যাশিত। কিন্তু সতী সাধ্বী বেহুলার জীবনে এ ক্ষণটি ছিল চরম বিপর্যের। একদিকে স্বামীকণ্ঠে পতিব্রতা না হবার অভিযোগ অন্যদিকে অনুক্ষণ স্বামীর মৃত্যু চিন্তা। স্বামীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সদাজাগ্রত বেহুলা দায়িত্বে সর্বদা সচেতন। বেহুলার জীবনের এ ক্ষণটি জয়া সেনগুপ্তা বর্ণনা করেছেন এভাবে- 'সত্যভঙ্গ হবার শঙ্কায় বেহুলা স্বামীর সঙ্গে মিলনানন্দে বিরত থেকেছে, কাম-কাতর লক্ষ্মীন্দর, এর

আগে কেবল পতিব্রতা হবার জন্যই যে নারী তাকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে তাকেই পতিব্রতা না হবার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে'। (জয়া সেনগুপ্তা ; ১৯৯০ : পৃ : ২৮৪)

রজনী প্রভাত কালে তুমি যাইবা তোমার বাপের ঘরে
সব দুখ মোর বাপ মায়ের॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৪২৬)

বাসরে প্রায় সারারাত জেগে থেকেও বেহুলা শেষ রক্ষা করতে পারেননি। রাতের শেষ প্রহরে মনসার মায়ানিদ্রার প্রভাবে বেহুলা নিদ্রায় ঢলে পড়েছেন আর এ সুযোগে ভবিতব্য অনুযায়ী আপাত নিশ্ছিদ্র বাসরঘরে মনসার আদেশে কাল নাগিনী লখিন্দরকে দংশন করেছে, বিষের যন্ত্রনায় লখিন্দর ছটফট করছেন কিন্তু বেহুলা অঘোরে ঘুমাচ্ছেন, বিষে জর্জরিত হৃদয়ের আর্তি বেহুলাকে জানানোর জন্য লখিন্দর কাল নাগিনীর লেজ কেটে অভিজ্ঞান স্বরূপ বেহুলার আঁচলে বেঁধে রাখেন–

কালি নাগিনীর লেজ রাখিল কাটিয়া।
বেউলার আচলে লেজ রাখিল বান্ধিয়া॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৪২৫)

কাল নাগিনীর বিষের যন্ত্রণায় লখিন্দরের আর্ত চিৎকারেও যখন বেহুলার ঘুম ভাঙেনি তখন নিরপরাধ বেহুলাকে সন্দেহ করতে লখিন্দর কুণ্ঠিত হননি বরং সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে লখিন্দরের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে কী জানি বেহুলা হয়ত এটাই চেয়েছিল! জীবনের অকাল সমাপ্তিক্ষণে মাতা-পিতার চিন্তা লখিন্দরকে করেছে ব্যথিত ও মর্মাহত, অন্যদিকে বেহুলার চরিত্রের প্রতি সন্দিহান তাকে করেছে দুঃখ ভারাক্রান্ত ও অভিমানহত–

যেমন বাসনা ছিল তেমত তোমারে পাইল
সুখ ভোগ না ছিল কপালে
তোমার বাপের বাড়ি যাবা নানা সুখে থাকিবা
সবে দুঃখ রইল মোর মনে॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৪২৭)

জন্মালে মরতে হবে এটা জগতের চিরাচরিত নিয়ম কিন্তু মৃত্যু পথযাত্রী অশীতিপর বৃদ্ধও জীবন ফিরে পাওয়ার শেষ চেষ্টাটুকু করতে পিছপা হন না বরং জীবন রক্ষাকারী ঔষধের আশ্রয় নিতে অত্যুৎসাহী হয়ে ওঠেন। তবে সর্পাঘাতে ব্যক্তির মৃত্যু চিন্তা ভিন্ন এবং মারাত্মক। কথায় বলে যাকে কখনও সাপে কামড় দেয়নি সে সাপের বিষের যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে না। এ কারণে কোনো চেষ্টাই লখিন্দরের প্রাণ বাঁচাতে পারেনি। লোহার বাসরঘরে নববধূ পরমাসুন্দরী বেহুলাকে নিয়ে বাসর উৎযাপনের জন্য লখিন্দর যখন সোনার পালঙ্কে উপবেশন করছিলেন তখন তার মনে ছিল কত স্বপ্ন, কত সাধ কিন্তু হঠাৎ কালনাগিনীর ছোবলে সে-স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। নিরপরাধ মৃত্যুপথযাত্রী লখিন্দর আসন্ন মৃত্যুর কথা জেনেও ঘুমন্ত স্ত্রীকে জাগানোর অনেক চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। তাকে উপেক্ষা করে নববধূ ফুলশয্যায় ঘুমিয়ে আছে এটা স্মরণ করে লখিন্দর হয়েছেন ব্যথিত ও মর্মাহত। স্বাভাবিক নিয়মেই অকাল বিধবাকে তার মাতা-পিতা দ্বিতীয় দারগ্রহণ করাবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। নববধূ প্রথম স্বামীকে ভুলে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে নব আনন্দে জীবন অতিবাহিত করবে অথচ লখিন্দরের জীবনপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হওয়ার আগেই লোহার বাসর ঘরে বিষধর কালনাগিনীর ছোবলে নিভে যায়। এ সময় যন্ত্রণা কাতর লখিন্দরের সামনে ভেসে ওঠে পুত্রহারা জননীর মুখচ্ছবি, অকাল বৈধব্য বেহুলার মুখচ্ছবি। পর মুহূর্তেই পালঙ্কে নিদ্রিত স্ত্রী বেহুলার গায়ে ঢলে পড়েন লখিন্দর। কী নির্মম মৃত্যু! পুত্রের জীবন নিয়ে সোনকার শঙ্কা ছিল, ছিল আতঙ্কও ফলে চোখে ঘুম আসা অসম্ভব। দুঃখিনী মা সোনকা ভয়ে, আতঙ্কে, এবং দুর্ভাবনায় হয়ত সারারাত নিদ্রিত ছিলেন। না জানি কখন কোন দুঃসংবাদ আসে! এ শঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছিল বাসর ঘরে ভোররাতে পুত্রবধূর চিৎকারের মধ্য দিয়ে। নিশ্চিত কোনো অকল্যাণ ঘটেছে ভেবে ব্যথাতুরা জননী আলুথালুবেশে পুত্র-পুত্রবধূর লোহার বাসর

ঘরের কাছে ছুটে যান। সোনকার মাতৃহৃদয়ের বেদনাকে নীলকান্ত বেপারী বর্ণনা করেছেন এভাবে—'বাসর ঘরে প্রিয় পুত্র লখিন্দরের সর্প দংশনে মৃত্যুর কথা শুনে তিনি উন্মাদিনীর মতো বিলাপ করছেন। সনকার হৃদয় নিংড়ানো ব্যথার কি করুণ আর্তি! কবি বিজয়গুপ্ত অত্যন্ত সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সাথে সদ্য পুত্রহারা মাতার ক্রন্দনধ্বনি ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন'। (নীলকান্ত ; ২০০১ : পৃ. ১৫৫)। অত্যন্ত সংবেদনশীল হৃদয় দিয়ে কবি পুত্রহারা জননীর হৃদয়ের হাহাকার তুলে ধরেছেন—

বার্ত্তা পাইয়া সোনেকা আসিল লড় দিয়া।
আহা পুত্র বলি পড়ে ভূমে পাছাড় খাইয়া॥
সোনাই বলে পাইয়াছিলাম অখিলের নিধি।
দিয়া বঞ্চিত হইলা দারুণ বিধি॥
… … …
কান্দে সোনেকা রাণী বুকে হানে ঘা।
আর মোরে চন্দ্রমুখে না বলিলা মা॥
… … …
তুমি বিনে জিব নারে মুই অভাগিনী॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৪৩২-৪৩৩)

সপ্তম এবং জীবিত একমাত্র সন্তান লখিন্দরের মৃত্যুশোক সোনকাকে একেবারে দুমরে, মুচরে নিঃস্ব করে দিয়েছে। তিনি মাথা ঠুকরে, বুক চাপড়িয়ে, চুল ছিড়ে, গায়ের গহনা টেনে ছিড়ে আর্তনাদ করতে থাকেন। যা অন্য মায়ের জন্যও ব্যতিক্রম নয়। তার বেঁচে থাকা অসহ্য মনে হয়। সন্তানহারা মায়ের এ করুন আর্তনাদে আকাশ-বাতাসসহ প্রকৃতিও থমকে যায়। পারিবারিক এ বিপর্যয় উপস্থিত দর্শককেও কাঁদায়।

লখিন্দরের মৃত্যুতে চাঁদও মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন। পূর্বে ছয়পুত্রের মৃত্যু এবং মনসার কোপে চৌদ্দ ডিঙাসহ সমস্ত ধন সম্পত্তি হারানোর পরও তাকে এতটা ক্লান্ত বা বিপর্যস্ত দেখায়নি। সপ্তম পুত্র লখিন্দরের মৃত্যু চাঁদের অন্তরকে ক্ষত বিক্ষত করে, পুত্রশোকে চাঁদের আহাজারি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। দৈবরোষে জীবনে যে বিপর্যয় নেমে আসে, সেই বিশ্বাসনির্ভর জীবনের কথা অত্যন্ত দরদি ভাষায় কবি বিজয়গুপ্ত উপস্থাপন করেছেন। বাঙালির গৃহগত জীবনের হাহাকারময় বাস্তবতা এতে প্রতিফলিত হয়েছে—

শুনিয়া ধাইয়া আইল চান্দ সদাগর।
… … …
তাহার কারণে আমি তেজিব অন্তর॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৪৩৫)

পৃথিবীতে দুঃখী মা বাবা তাঁরাই যাদের জীবদ্দশাই সন্তানের মৃত্যু ঘটে। একজন পিতার কাছে সবচেয়ে কঠিন কাজ সন্তানের শব বহন করা। যে কাজটি জীবনে একবার নয় দু'বার নয় সাত-সাতবার করতে হয়েছিল চাঁদ সদাগরকে। এ কাজটা যে কতটা বেদনার কতটা কষ্টের তা একমাত্র চাঁদ সদাগরই অনুভব করেছিলেন।

লখিন্দরের গর্ভধারিনী, জনম দুঃখিনী মা সোনকা ছয় পুত্রের মৃত্যু শোক লখিন্দরের মুখ চেয়ে ভুলতে চেয়েছিলেন। অকস্মাৎ লখিন্দরের অকাল মৃত্যু সোনকার অন্তর্বেদনাকে আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। এ শোক সন্তপ্ত অবস্থা সোনকাকে ক্ষণিকের জন্য সামন্তপত্নীতে পরিণত করেছে। মুহূর্তের জন্য হলেও বিভ্রান্ত সোনকা শোকে, দুঃখে, যন্ত্রণায়, বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পুত্রের অকাল মৃত্যুর জন্য পুত্রবধূ বেহুলার কৃতকর্মকেই দায়ী করেন—

সোনাই বলে বেউলা তুমি লঘুচর জাতি।
বিহার রাত্রে খাইলা পতি নহে বাসি রাত্রি॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৪৩৫)

প্রকারান্তরে উদ্ধৃতিটির মধ্য দিয়ে বাঙালি গৃহগত জীবনে শাশুড়ি ও পুত্রবধূর সম্পর্কের টানাপাড়েন তথা দোষারোপ করার প্রবৃত্তি নির্দেশিত হয়েছে। বাঙালি শাশুড়িরা বিশ্বাস করতেন তাদের পুত্রসন্তানের জীবনে কোনো অমঙ্গল সংঘটিত হলে অথবা তাদের মৃত্যুর জন্য পুত্রবধূরা দায়ী। যদিও লখিন্দরের মৃত্যুর জন্য বেহুলা কোনো ভাবেই দায়ী নন তবু বেহুলার জীবনে এমন সংকটময় মুহূর্তে শাশুড়ি তার পুত্রের মৃত্যুর জন্য বেহুলাকেই দায়ী করেছেন। তবে বেহুলা শাশুড়ির এই তীব্র বাক্যবাণে আহত বা বেদনাহত না হয়ে, অভিমান না করে, অবলা অসহায়, বিপন্ন ও বিপর্যস্ত নারীর মতো চোখের জলে বুক না ভাসিয়ে এ অন্যায় অপবাদের জন্য জীবনের এই চরমক্ষণেও যুক্তিবাদী বেহুলা তার ওপর অর্পিত দোষারোপকে যৌক্তিক ভাষায় খণ্ডন করেছেন—

বেউলা বলে শাশুড়ি তুমি পরম দেবতা।
আমারে বলহ কেন হেন ছার কথা॥
নাগিনী দংশিল লখাই মোরে কর রোষ।
আর ছএ পুত্র মরে সেবা কার দোষ॥
পাটনেতে চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিল ধন কড়ি
সেই কালে মাতা আমি ছিলাম কার বাড়ি॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৪৩৪)

সদ্য বিধবা পুত্রবধূর ওপর শাশুড়ির অযৌক্তিক দোষারোপ চাপানোর এটি মৃদু প্রতিবাদ। তবে বেহুলার এ প্রতিবাদে ধৃষ্টতা বা ঔদ্ধত্য প্রকাশিত হয়নি বরং এটি তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়, অযৌক্তিক অপবাদের সামান্য যৌক্তিক প্রতি-উত্তর মাত্র। শাশুড়ির অপবাদে বেহুলা মোটেও বিচলিত নন বরং বাসর ঘরে স্বামীর আবেগাপ্লুত বাণী তার অন্তরকে করেছে ক্ষত-বিক্ষত। বাসর ঘরে লখিন্দর বেহুলার কাছে ক্ষুধার অন্ন চেয়েছিলেন, কত কষ্ট করে বেহুলা ভাত রান্না করেছিলেন কিন্তু লখিন্দর সে ভাত খেতে পারেননি। স্বামী আলিঙ্গন চেয়েছিলেন কিন্তু ধর্মসংস্কার ও লোকাচারের ভয়ে বেহুলা স্বামীকে আলিঙ্গন দিতে পারেননি এসব ভেবে বেহুলা ব্যথিত বটে তবে নিয়তির এই অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার দৃঢ় প্রত্যয়ও বেহুলা মনে মনে গ্রহণ করেছেন। বেহুলাকে সহমরণে যাবার প্রস্তাব দেয়া হলে কিছুটা বিচলিত হলেও নিয়তির কাছে হার মানতে বেহুলা রাজি নয়। মর্মান্তিক এ ভাগ্য বিপর্যয়ক্ষণে বেহুলা কাঁদতেও রাজি নয় বরং স্বামীকে যমের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে দৃঢ় সংকল্প। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে বিশ্বাসী বেহুলা নিশ্চিত তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কাছে দৈব বিধান নতি স্বীকার করবেই। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, সতীত্ব, আর সিঁথির সিঁদুর না মুছে বরং সিঁদুরকে শক্তিতে পরিণত করে বেহুলা মনে মনে দুঃসাহসিক সংকল্প করেছেন। সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তির শবদাহ করার বিধি নেই এই ধর্মীয় অনুশাসনের কথা শ্বশুরকে স্মরণ করিয়ে পতির শবকে কলার মাজুষে ভাসাবার প্রস্তাব দিলেন এবং নিজে শব সহযাত্রী হবেন এ দৃঢ় প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেন। বেহুলা দুর্মর সাধনায় অটল থেকে দেবলোকে গিয়ে স্বামীকে পুনর্জীবিত করবেন দীপ্র কণ্ঠে এ ঘোষণাও দেন। এখানেও বেহুলাকে প্রতিকুল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় স্বয়ং শ্বশুর চন্দ্রধর তাকে শুধু বিরোধিতা করেননি করেছেন বিরূপ মন্তব্যও। সতী বেহুলার চরিত্রে আঘাত হানতে চন্দ্রধরও দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী স্বামীগত-প্রাণা বেহুলা সেই সময় নিজের অপমানের চেয়ে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনা একমাত্র তপস্যা বলে মনে করেছেন। কটাক্ষ, তাচ্ছিল্য, সন্দেহ কোনো কিছুকেই তিনি পরোয়া করেননি। তবে প্রথমাবস্থায় চাঁদ এ প্রস্তাবে রাজি না হলেও পুত্রবধূর অনমনীয় মনোভাব এবং দৃঢ় সংকল্প দেখে লখিন্দরের শব ভাসাবার এবং বেহুলাকে শব সহযাত্রী হওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। বেহুলা মৃত স্বামীর সঙ্গে কলার মাজুষে যাবার প্রাক্কালে যখন শাশুড়ি সোনকার চরণে মেলানি চেয়েছেন তখনই সোনকার মাতৃত্ব জেগে উঠেছে। এ বিষয়টি চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন কবি দ্বিজ ষষ্ঠীবর। তিনি লিখেছেন—

না যাও না যাও বধূ মোরে না দেও দুঃখ।
তোমা দেখি বিস্মরিমু লক্ষ্মীন্দরের শোক

পুত্রশোকে তোমারে বলিলু টান টান।
তেকারণে বধূ বুঝি হয়েছে অভিমান॥
সোনা বলে বধূ তুমি আমার কথা রাখ।
লখাইয়ের বদলে তুমি মা বলিয়া ডাক॥
(দ্বিজ ষষ্ঠীবর ; ১৯৩৬ : পৃ : ১৩৫)

কবি ষষ্ঠীবরের এ বর্ণনা নিঃসন্দেহে মর্মস্পর্শী এবং হৃদয়বিদারক। কিন্তু কবি বিজয়গুপ্ত সোনকার হৃদয়ের হাহাকার বর্ণনা করেছেন ঠিকই কিন্তু বেহুলা যখন মৃত স্বামীর সহযাত্রী হতে চেয়েছেন তখন তিনি সদ্য বিধবা অল্পবয়স্কা পুত্রবধূকে নিষেধ করেননি। দুঃখিনী মা সোনকার হয়তো এটাই মনে হয়েছিল পুত্রবধূ তার মৃত পুত্রের জীবনদানের শেষ চেষ্টাটুকু অন্তত করবে। তাই স্বার্থপরের মতো পুত্রবধূ বেহুলার আসন্ন বিপদের চিন্তা না করে মৃত পুত্রের সহযাত্রী হতে সহায়তা করেছেন। সীমাহীন সাগর যাত্রার প্রাক্কালে এহেন বিপৎসংকুল অবস্থায় শত বাধা মাথায় নিয়েও বেহুলা কর্তব্যকর্মে ছিলেন অবিচল। অন্তহীন বেদনায় আহত হয়েও নিজের যন্ত্রণাকে চাপা দিয়ে শাশুড়িকে সান্ত্বনা দিয়েছেন কান্না কাটি না করার জন্য এবং নিজের শরীরের যত্ন নিতে। বিধবা জাদের অনুরোধ করেছেন শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি খেয়াল রাখতে। নিজ জীবনের সুখ ভোগ না হোক শাশুড়ির সেবা করতে না পারার দুঃখ বেহুলাকে ব্যথিত করেছে। জীবনের এই দুঃসাধ্য সাধনায় কৃতকার্য হওয়ার আর্তি জানিয়ে শাশুড়ির কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। সবশেষে শাশুড়িকে আশ্বস্ত করতে চারটি নিদর্শন রেখে গেছেন—

বেউলা বলে মাও তুমি প্রভুর জননী।
তোমা সেবা না করিলাম মুই অভাগিনী॥
... ...
সিজান ধানেতে যদি মেলয়ে অঙ্কুর।
তবে জানিবা বেউলা গেল দেব পুর॥
সিদ্ধ হরিদ্রায় যদি মেলিবেক গেজ।
তবে জানিলা বেউলা সাধিল নিজ কাজ॥
ভাজা কলুই যদি মেলিলেক পাত।
তবে জানিবা বেউলা জিয়াইল প্রাণনাথ॥
... ...
সকল প্রণাম করি চড়িল মাজুষে।
সতী সতী ধন্য ধন্য সকলে প্রশংসে॥
মাজুষে চড়িল বেউলা নাহি কিছু ভয়ে।
লখিন্দরের পাও বেউলা কোলে তুলি লয়ে॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৪৪৪)

বেহুলা স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে মৃত পতির প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য কলার মাজুষে করে অথই সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। পতিব্রতা সতী সাধ্বী বেহুলার এই দুর্মর সাধনা হতে নিবৃত্ত করার জন্য তার সমস্ত আত্মীয় স্বজন সকরুণ আকুতি জানিয়ে ব্যর্থ হলেন। ভেলার ওপর মৃত স্বামীর মাথা ক্রোড়ে করে গাঙ্গুরের জলে ভেসে চলেন বেহুলা। বুদ্ধিমতী এবং দায়িত্বান ব্যক্তিত্ব হিসেবে বেহুলার পরিচয় পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। জীবনের চরম সংকটমুহূর্তেও আবার বেহুলার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় কাক মারফত দুঃখী মাতা-পিতাকে পত্র প্রেরণের মধ্য দিয়ে। তার এ কঠিন সিদ্ধান্ত তার মাতা-পিতাকে জানানো কর্তব্য বলে বেহুলা মনে করেছিলেন—

মনে মনে ভাবে বেউলা চিন্তিয়া বিষাদ।
কোন মতে লিখিব আমি বিষম সম্বাদ॥
... ...
সাহেব কুমারী বেউলা বুদ্ধিতে আগলি।
নয়ানের কাজল দিয়া করিলেক কালি॥

আপোনে পণ্ডিত বেউলা লেখে নানা ভায়ে।
প্রথমে প্রণাম লেখে বাপ মায়ের পায়ে॥
… … …
না জানিলাম কোন দোষে বিধি হইল বৈরী।
বিবাহের রাত্রে আমি হইলাম কাঁচা রাঁড়ী॥
… … …
লোহার বাসরে স্বামী দংশিলেক নাগে॥
… … …
মড়া স্বামী জিয়াইব ভাসুর ছয় জন।
… … …
জিয়াইতে না পারি যদি না আসিব আর।
জলে ঝাপ দিয়া প্রাণ তেজিব আমার॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৪৪৮-৪৪৯)

আত্মত্যাগে কতটা কঠোর, দায়িত্বে কতটা একনিষ্ঠ এবং স্বামীর পরিবারকে কতটা ভালোবাসলে মাত্র একদিনের বৈবাহিক সম্পর্কের মূল্য দিতে বেহুলা এত বড় কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশে। শুধু নিজের স্বামী নয় মৃত ছয় ভাসুরের জীবন ফিরিয়ে আনতেও বেহুলা দৃঢ় সংকল্প। হয় তাদেরকে ফিরিয়ে আনবেন নয় জলে ঝাপ দিয়ে আত্মঘাতী হবেন। কী দৃঢ় সংকল্প! এখানেই বাঙালি নারীর মহত্ব প্রকাশ পাই। স্বামী সংসারের জন্য তারা নিজের জীবন বাজি রাখতেও প্রস্তুত। বেহুলা বাঙালি নারীর সেই মূর্ত প্রতীক। বেহুলার এই অকাল বৈধব্য, দৃঢ় সংকল্প এবং শব সহযাত্রী হওয়ার সংবাদে তার মাতা-পিতা ব্যথিত ও মর্মাহত। বেহুলার মাতা সুমিত্রার ধারণা তার একমাত্র আদরের কন্যার দুর্ভোগের জন্য পিতা সাহেবেনেই দায়ী। এ জন্য সুমিত্রা তার স্বামীকে ভর্ৎসনাও করেছেন এবং পুত্র হরিসাধুকে অনুরোধ করেছেন-তুমি আমার প্রাণের বেহুলাকে ফিরিয়ে এনে আমার প্রাণ রক্ষা করো—

কোথা গেলা আরে তুমি বানিয়া সদাগর।
আর ত না পাইলা বর পৃথিবী ভিতর॥
… … …
কোথা গেলা আরে পুত্র হরি সদাগর।
বেউলারে আনিয়া মোর প্রাণ রক্ষা কর॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৪৫২-৪৫৩)

হরি সাধু তার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে আদরের ছোট বোনকে খোঁজার জন্য বের হন এবং বেহুলার সাথে তার সাক্ষাৎও হয়। পরম মমতায় ভাই বোনকে আহ্বান করেন পিতৃগৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য। শঙ্খ- সিঁদুর হয়ত বেহুলাকে দেয়া সম্ভব নয় কিন্তু পিতৃগৃহে তার কোনো অযত্ন হবে না এমন প্রতিশ্রুতিও ভাই বোনকে দেন কিন্তু বেহুলা তার কর্তব্যে অবিচল—

হরি সাধু বলে বেউলা ফিরিয়া ঘরে আয়ে।
তোর লাগি কান্দিয়া বেয়াকুল হইল মায়ে॥
শঙ্খ বদলে দিমু সুবর্ণের চুড়ি।
সিন্দুর বদলে দিমু খাসা ফাউগের গুঁড়ি॥
বেউলা বলে ভাই তুমি না বল উচিত।
স্বামী অভাবে নারী জীবন কুৎসিত॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৪৫৩)

বেহুলার এ সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বাঙালি পরিবারের দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও পবিত্রতা। অন্যদিকে ভাইয়ের আহ্বানের মধ্যে সম্প্রদানকৃত কন্যা পিত্রালয়ে ফিরে এসে আশ্রিত থাকার প্রথাটি প্রতিফলিত হয়েছে।

আত্মবিশ্বাস এবং নিজের সতীত্বকে পুঁজি করে বেহুলা নিজের স্বামী ও ছয় ভাসুরের প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য মনসার পুরীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। বেহুলা পুত-পবিত্র ধর্মপরায়ণা সতী নারী। তার দৃঢ় বিশ্বাস স্বামীকে তিনি ফিরে পাবেনই। নিজের সতীত্বের প্রতি তার এই অসীম বিশ্বাস এবং দৃঢ় প্রত্যয় ঠিকই তাকে সমস্ত প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, পামর, অধার্মিক ও জুলুমবাজদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে, অনিদ্রায় অনাহারে কর্তব্যে অবিচল থেকে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়ার। বেহুলা দিনের পর দিন নদীতে ভাসমান, স্বামীর মৃত দেহে পচন ধরে হাড় থেকে মাংস খসে পড়তে থাকে। দুর্গন্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে তবুও বেহুলা হাল ছাড়ার পাত্রী নন। স্বামী পুর্নজীবন প্রাপ্ত হবেন এ বিশ্বাসের ওপর ভর করেই বেহুলার এ দুঃসাহসিক অভিযান। বেহুলার মানসিক শক্তির মূল প্রেরণাই হচ্ছে তার সতীত্ব ও সিঁথির সিদুঁর। বেহুলা একদিকে অনিশ্চিত পথের একমাত্র যাত্রী অন্যদিকে অনিন্দ্যসুন্দরী। একদিকে তার নবোদ্ভিন্ন যৌবনের প্রতি মানুষের লোলুপ দৃষ্টি অন্যদিকে স্বামীর গলিত শবের ওপর মাংসভুক প্রাণীর লোভ এই দুই শক্তিকে দলিত মথিত করে এগিয়ে চলেছেন কোথাও অনুনয়, কোথাও ক্রোধ, কোথাও বা অশ্রুজলকে সম্বল করে। কিন্তু নারীসুলভ কোমলতাকে কোথাও পরিহার করেননি। তার সতীত্বের তেজ এতটাই প্রখর যে অনেকেই সেই তেজে ভস্মীভূত হয়েছে। আস্তে আস্তে বেহুলার ভেলা দুশ্চরিত্র গোদার ঘাটে এসে উপস্থিত হয়। গোদা তাকে বিয়ে করে ঘরে তোলার প্রস্তাব দিলে বেহুলা তাকে অভিশাপ দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। এরপর বেহুলা ধনামনার ঘাট, টেটনের ঘাট এছাড়া আরও কত ঘাটে বেহুলা বিড়ম্বনায় পড়েন। এ সমস্ত ঘাটে বেহুলা দুষ্টু লোকের প্রলোভন থেকে নিজের বুদ্ধিমত্তা এবং সতীত্বের গুণে আত্মরক্ষা করেছেন। পরিশেষে মনসা নেতাকে বাঘের ছদ্মবেশে পাঠালেন লখিন্দরকে ভক্ষণ করতে। বেহুলা স্বামীর পরিবর্তে তাকে ভক্ষণ করার অনুরোধ করলে নেতা ব্যর্থ হয়ে চিল রূপে লখিন্দরের পাজরের অস্থি নিতে গেলে বেহুলা তার শাড়ির আঁচল দিয়ে আবৃত করে অস্থি রক্ষা করেন।

বুদ্ধিমতী বেহুলা বুদ্ধির প্রখরতায়, জ্ঞানের প্রসারতায়, তীক্ষ্ম দৃষ্টির বিচক্ষণতায়, ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তায় দীর্ঘ ছয় মাস অনিদ্রায়, অনাহারে, কঠিন বিঘ্ন সংকটের আবর্তে ঘুরেও নীতিভ্রষ্ট হননি, হননি ধৈর্যহারা বরং কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে করতে তিনি হয়েছেন খাঁটি সোনা। এভাবে ক্রমে ক্রমে বেহুলা অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে নেতার ঘাটে এসে উপস্থিত হয়ে স্বীয় বুদ্ধি এবং কাপড় কাচার পারদর্শিতা দিয়ে দেবসভার রজকিনী নেতার মন জয় করেন এবং নেতার পরামর্শ মতো কাজ করে বেহুলা দেবলোকে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। দেবলোকে বেহুলা নৃত্য-গীত পরিবেশন করে দেবতাদের সন্তুষ্ট করেন। বিশেষ করে মহাদেব বেহুলার নৃত্যে খুশি হন। কিন্তু দেবপুরীতেও বেহুলা পড়েন গভীর সংকটে। যে দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে স্বামীর পুনর্জীবন প্রাপ্তির বর প্রার্থনা করেছেন সেই মহাদেবই তার রূপে মুগ্ধ হয়ে আলিঙ্গন চেয়েছেন। প্রত্যুৎপন্নমতি বেহুলা এ সংকট থেকে নিজ বুদ্ধির জোরে মুক্তি পেয়েছেন মহাদেবকে পিতৃ সম্বোধনের মধ্য দিয়ে। বেহুলার এ আচরণে মহাদেব সন্তুষ্ট হন। এবং মহাদেবের নির্দেশে মনসা তার সমস্ত ক্রূরতা, ছলচাতুরি পরিহার করে বেহুলার পতি লখিন্দরকে পুনর্জীবন দান করেন। শ্বশুর চাঁদ সদাগরকে দিয়ে মনসার পূজা দেবে এ শর্তে বেহুলার মৃত ছয় ভাসুর, ধনজন চৌদ্দডিঙা মনসা বেহুলাকে ফিরিয়ে দেন। বেহুলা মধুকর নৌকায় চড়ে চম্পকনগরের ঘাটে এসে উপস্থিত হন। এতে পতিব্রতা বাঙালি নারীর অনমনীয় দৃঢ়তা ও চরিত্রগৌরব প্রতিফলিত হয়েছে। জয় হয়েছে সতীত্বের।

এ সংবাদ চাঁদের কাছে পৌঁছালে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে নদীর ঘাটে উপস্থিত হন। কিন্তু যখন তিনি অবগত হন যে, এর বিনিময়ে তাকে মনসার চরণে ফুল নিবেদন করতে হবে তখন তিনি আবার বিমর্ষ বদনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন—

যেই হস্তে পূজি আমি শিবের চরণ।
সেই হস্তে পদ্মার পূজা করিব কেমন॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৫৩০)

চন্দ্রধরের এ উক্তির মধ্যেই কিছুটা নমনীয়তা ও কোমলতা পরিলক্ষিত হয়। তারপর যখন বেহুলা সাশ্রুনয়নে শ্বশুরের পদতলে পতিত হয়ে অভাগিনীর প্রতি সদয় হওয়ার মিনতি করতে থাকেন তখনই দেবী তুল্য পুত্রবধূ বেহুলার কাছে চন্দ্রধরের পিতৃস্নেহ পরাজিত হয় এবং তাৎক্ষণিক ঘোষিত আকাশবার্তা শুনে চাঁদ কিছুটা হলেও নমনীয় হয়ে মনসার পূজা দিতে সম্মত হন—

বাম হস্তে পূজা আমি করিব তাহান॥
এতেক শুনিয়া পদ্মা বিরস বদন।
চান্দরে ডাকিয়া চণ্ডী বলিলা বচন।
তোমার ঠাই কহি শুন চাদো সদাগর॥
এক মূর্ত্তি আমি সেই নাহি অন্য পর॥
... ...
ভিন্ন ভেদ নাহি কিছু এক সমহর॥
এতেক দেখিয়া চান্দোর লাগে চমৎকার।
ভূমে পড়ি অষ্ট অঙ্গে করে নমস্কার॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৫৩৫)

দৈববাণী শুনে চাঁদের ক্রোধাগ্নি এবং বজ্রকঠোর মনোভাব কিছুটা হলেও বিগলিত হয়ে স্বেচ্ছায় মনসা পূজা করতে সর্বসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এরপর থেকে মর্ত্যলোকে মনসা পূজা প্রচলিত হয়। চাঁদের বাড়িতে এখন চাঁদের হাট। আনন্দের আতিশয্যে চাঁদ জ্ঞাতি কুটুম্বকে ভোজনের নিমিত্তে নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা বেহুলার চরিত্রে সন্দেহ করেন। মুহূর্তেই চাঁদের পরিবারের সকলের আনন্দ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। অতিথিগণ বেহুলাকে সতীত্বের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে বললে সতী বেহুলা নিজ পরিচয় জ্ঞাপন করে স্বর্গ থেকে প্রেরিত দিব্যরথে চড়ে স্বর্গালোকে গমন করেন—

পদ্মার বাদ খণ্ডিল বাদ হইল দূর।
এইক্ষণে যাব আমি মহাদেবের পুর॥
চম্পক নগরে আর না করিব ভোজন।
... ...
এতেক কহিতে রথ নামে আচম্বিত।
লখাইর হাতে ধরি বেউলা চলিল ত্বরিত॥
লখাই বেউলা শিবপুরে করিল গমন।
চান্দ সোনকা স্মরে পদ্মার চরণ॥
(বিজয়গুপ্ত ; ১৯৬২ : পৃ : ৫৪৩)

অবশেষে পিতৃস্নেহের কাছে পরাজিত হলেন প্রবল প্রতাপ ও প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী চন্দ্রধর। পুত্রবধূর স্নেহের কাছে হার মানলেন তিনি। দেবপুরী প্রত্যাগত বেহুলার সার্থকতার মহিমাকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা ছিল না চন্দ্রধরের। তাই বেহুলার একান্ত অনুরোধে এবং সেই মুহূর্তে আকাশে দৈববাণী শুনে চন্দ্রধর মনসার পূজা দিতে সম্মত হন। আর চন্দ্রধরের পূজা দেওয়ার মধ্য দিয়ে মর্ত্যলোকে মনসার পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়। পুত্রবধূর দৃঢ় চরিত্রবল ও কঠোর তপস্যার কাছে চাঁদ সদাগরকে মাথা নত করতে হয়। এই কাহিনির মধ্য দিয়ে *মনসামঙ্গল* কাব্যে বাঙালির গার্হস্থ্যজীবনের আচার-রীতি-নীতি, উৎসব-আনন্দ, ঝগড়া-বিবাদ ও লোকাচারের নানা দিক প্রতিভাসিত হয়েছে। গার্হস্থ্যজীবনের যে ইতিহাস ইতিহাসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়নি সেই সামাজিক ইতিহাসই কবির বদান্যতায় অসামান্য শিল্পরূপ পেয়েছে *মনসামঙ্গল* কাব্যে।

তথ্য নির্দেশ

অরবিন্দ পোদ্দার (অক্টোবর, ২০০৫) *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*, চতুর্থ মুদ্রণ, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, *কলিকাতা-০৯*

আনিসুজ্জামান	(ফেব্রুয়ারি, ২০০০) *বাঙালি নারী সাহিত্যে ও সমাজে,* প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা
আশুতোষ ভট্টাচার্য	(সেপ্টেম্বর, ২০০৯) *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* দ্বাদশ সংস্করণ, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা. লি. ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
আহমদ শরীফ	(নভেম্বর, ২০০৮) বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ৬৫, প্যারীদাস রোড, ঢাকা
জয়া সেনগুপ্তা	(ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০) *মনসামঙ্গলকাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী,* প্রথম প্রকাশ, বড়াল প্রকাশনী, ৩৬, বাংলা বাজার, ঢাকা
দীনেশচন্দ্র সেন	(১৯৮৬) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, নবম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা
নীলকান্ত বেপারী	(মে, ২০০১) *কবি বিজয়গুপ্ত জীবন ও সাহিত্যকর্ম,* প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
নীহাররঞ্জন রায়	(১৪১৪) *বাঙ্গালীর ইতিহাস,* আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৭৩
ফণীন্দ্রনাথ দাস ও গিরিশচন্দ্র দাস সম্পাদিত	(১৯৩৬) দ্বিজ ষষ্ঠীবরের *পদ্মাপুরাণ,* শ্রীহট্ট
বাসুদেব রায়	(এপ্রিল, ২০০৪) *মনসামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ,* পদ্মা কম্পিউটার এন্ড পালিকেশন্স লি. ৪৮, বাংলা বাজার, ঢাকা
মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া	(মে, ১৯৯১) *শ্রীরায় বিনোদ : কবি ও কাব্য,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা
মোহাম্মদ হাননান	(ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪) *মনসামঙ্গলকাব্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা
রাজেন্দ্রকুমার গুপ্ত সঙ্কলিত	(২০১১) কবি বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ* বা *মনসামঙ্গল,* রাজেন্দ্র লাইব্রেরি, ১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, কলিকাতা-০১
শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পা:	কবি বিজয়গুপ্তের (১৯৬২) *পদ্মাপুরাণ,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা
শ্রীমন্তকুমার জানা	(জানুয়ারি, ২০১১) *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ),* ওরিয়েন্ট বুক কো.প্রা. লি, ৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-০৯
সুকুমার সেন সম্পাদিত	বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের (১৯৫৩) *মনসাবিজয়,* এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা

খ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল*

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে *মনসামঙ্গল* কাব্য সর্বপ্রাচীন হলেও সর্বপ্রধান ধারা হিসেবে *চণ্ডীমঙ্গল* স্বীকৃত। দীর্ঘকাল ধরে বাঙালি সমাজে *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্য প্রচলিত এবং জনপ্রিয়তার দিক থেকেও প্রশংসিত। দেবী মনসার মতো চণ্ডীও কোনো পৌরাণিক দেবী নন, লৌকিক দেবী এবং মঙ্গলকাব্যের দেবীগণের মধ্যে তার অবয়ব সর্বাপেক্ষা জটিল। দেবী চণ্ডীর প্রকৃত নাম অভয়া। তবে মঙ্গলকাব্যের অভয়া বা চণ্ডী মহিষাসুর বিনাশিনী নন তিনি অরণ্যবাসিনী বা বিন্ধ্যবাসিনী। প্রাচীন *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের রচয়িতাগণ তাঁদের কাব্যকে *অভয়ামঙ্গল* নামে অভিহিত করেছেন বেশি। চণ্ডী লৌকিক দেবী, ব্রতকথার দেবী, পরবর্তীকালে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তিনি মঙ্গলকাব্যের দেবীতে পরিণত হয়েছেন। চণ্ডীর ব্রতকথা খুব সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করলে এ কাহিনিতে সমাজ বিবর্তনের একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করা যায়। *চণ্ডীমঙ্গল* একটি পরিপক্ব কাহিনি। কালকেতু উপাখ্যান ধনপতির উপাখ্যান অপেক্ষা প্রাচীন হলেও ধনপতি উপাখ্যান মুখ্য বলে সমালোচকগণ মনে করেন। তবে লৌকিক চণ্ডী পূজার ব্রত সমাজে কখন শুরু হয়েছিল সে-সম্পর্কে নানা মতভেদ আছে। সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ মনে করেন ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে চণ্ডীপূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল এবং ষোড়শ শতাব্দীর কালপর্বেই চণ্ডী মঙ্গলকাব্যের দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। গঠন কৌশলের দিক থেকে *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যকে সর্বাপেক্ষা সার্থক মঙ্গলকাব্য বলা যায় কারণ মঙ্গলকাব্যের নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যগুলি *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে নিহিত। এ কাব্য প্রধান দুটি খণ্ডে বিভক্ত দেবখণ্ড এবং নরখণ্ড। দেবখণ্ড সাধারণত সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে শুরু। এ ছাড়াও এতে বর্ণিত আছে নীলাম্বরের অভিশাপ প্রাপ্তি এবং হরগৌরীর সংসারযাত্রার বর্ণনা। নরখণ্ডে দুটি কাহিনি বর্ণিত হয়েছে আক্ষেটিক খণ্ড বা কালকেতু উপাখ্যান এবং বণিক খণ্ড বা ধনপতি-শ্রীমন্ত উপাখ্যান। দেবী প্রথমে ব্যাধ সমাজে পূজিত হন তবে এতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না উচ্চবর্ণের সমাজেও তাঁর প্রতিষ্ঠা চাই। ফলে পরবর্তীতে উচ্চবর্ণের সমাজেও দেবী পূজিত হন। অনার্য সমাজ থেকে দেবী ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রবেশ করলেন। কারণ উচ্চবর্ণের সমাজে প্রতিষ্ঠা না পেলে যথার্থ দেবীর মর্যাদা পাওয়া সম্ভব নয়। তাই মনসার মতোই চণ্ডীও বণিক সমাজে আশ্রয় নিলেন। কারণ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তখন প্রায় ক্ষমতাচ্যুত এবং বণিক সম্প্রদায় অর্থকৌলীন্যের জোরে সমাজে উচ্চ আসনে ও উচ্চমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি মানিক দত্ত উত্তরবঙ্গীয় ধারার কবি। মানিক দত্তের প্রাচীনত্ব নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক থাকলেও *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের শ্রেষ্ঠকবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (আনু. ১৫৪০-১৬০০ খ্রি.) স্বয়ং মানিক দত্তকে *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যধারার আদি কবি হিসেবে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—

জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দো কালিদাস।
কর জুড়ি বন্দিব পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥
মানিক দত্তকে করিয়ে পরিহার।
বড়ু সর্ব্বানন্দকে করিল নমস্কার॥
হেন সব কবিদের বন্দিয়া চরণ।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥
(মুকুন্দরাম : ১৯৭৪ ; পৃ : ২৬)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যিনি দ্বিজ মাধব নামে খ্যাত তাঁর প্রকৃত নাম মাধবাচার্য। তিনি পূর্ববঙ্গীয় কাব্যধারার একজন অন্যতম কবি। কবির জন্মস্থান গঙ্গাতীরবর্তী বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামে বলে মনে করা হয় তবে পরবর্তীকালে তিনি সপ্তগ্রাম ছেড়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এবং চট্টগ্রাম থেকেই কবির পুথি *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গীয় ধারার কবি মুকুন্দরাম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচিত *অভয়ামঙ্গল* কাব্যটি একটি আদর্শ সৃষ্টি। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের দেবখণ্ডে আছে পৌরাণিক উপাখ্যান এবং নরখণ্ডে কালকেতু এবং ধনপতি সদাগর উপাখ্যান। এ কাব্যের প্রতিটি খণ্ডে সিঞ্চিত আছে গার্হস্থ্যজীবন রস যার সুধা পান করে ব্যক্তি তথা সমাজ ফিরে পায় তাদের জীবনীশক্তি।

দেবখণ্ডে বিধৃত গার্হস্থ্যজীবন

দেবখণ্ড আরম্ভ হয়েছে প্রধানত সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার মধ্য দিয়ে। এরপর ক্রমান্বয়ে ত্রিভুবন ও দেবাসুর নর সৃষ্টির পর দক্ষের কন্যা সতীর সঙ্গে শিবের বিয়ে, শ্বশুর জামাতার মনান্তর, বিনা নিমন্ত্রণে দক্ষের যজ্ঞানুষ্ঠানে সতীর আগমন ও আত্মোৎসর্গ, শিব-অনুচরের হাতে দক্ষের নিগ্রহ, পর্বতের গৃহে পার্বতী নামে সতীর পুর্নজন্মলাভের ঘটনা। তপস্যার জন্য হিমালয় পর্বতে শিবের গমন, পার্বতীর কঠোর তপস্যা, শিবের তপস্যা-ভঙ্গ এবং শিব পার্বতীর বিয়ে; এবং বিয়ের পর ঘর জামাই রূপে শ্বশুরালয়ে শিবের বসবাস, গণেশ ও কার্তিকের জন্ম অতঃপর মেনকার সঙ্গে পার্বতীর মনান্তর, সপরিবার শিবের কৈলাস প্রস্থান, কৈলাসে দারিদ্র্যের সংসারে পার্বতীর ক্লেশ ইত্যাদি দেবখণ্ডের আলোচ্য বিষয়। *চণ্ডীমঙ্গলের* তিনটি খণ্ডেরই মূল বিষয় হচ্ছে পারিবারিক তথা গার্হস্থ্যজীবনরসের প্রস্রবণ।

মঙ্গলকাব্যে পরিবার জীবনের চিত্র আছে বিভিন্ন স্থানে। তার মধ্যে *চণ্ডীমঙ্গলের* স্থান বহু ওপরে। *চণ্ডীমঙ্গলে* পরিবারিক জীবন চিত্র প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। পারিবারিক জীবন কাঠামো উপস্থাপনায় মুকুন্দরামের সফলতা সবার শীর্ষে। *চণ্ডীমঙ্গলের* তিনটি খণ্ডের প্রাণকেন্দ্রে স্থাপিত হয়েছে গার্হস্থ্যজীবন চিত্র। দেবখণ্ডে দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহ ত্যাগ, পার্বতীর সঙ্গে শিবের বিয়ে প্রভৃতি পুরাণাশ্রিত ঘটনা বিধৃত হয়েছে। উমা-মহেশ্বরের বিয়ের কাহিনি কালিদাসের মতো মহাকবিও উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কবি মুকুন্দরামও ঐ একই উপকরণ নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শিব-পার্বতীর গার্হস্থ্যজীবন বর্ণনার মধ্য দিয়ে হতদরিদ্র বাঙালি পরিবারের চিত্র অঙ্কন করেছেন। সাহিত্য-সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত শিব-পার্বতীর পারিবারিক জীবন চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন এভাবে—'দরিদ্র ব্রাহ্মণের দাম্পত্য জীবন, শ্বশুরালয়ে কন্যার লাঞ্ছনা, পারিবারিক কলহ প্রভৃতির একটি রসোজ্জ্বল চিত্র পৌরাণিক অবকাঠামোর মধ্য দিয়ে কবির মৌলিক প্রতিভার পরিচয় বহন করেছে। শিবগৌরীর দাম্পত্য জীবন বর্ণনায় কবি বারবার তাঁদের দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রসঙ্গ টেনেছেন বটে তবে কোথাও এ দারিদ্র্যজনিত দুঃখ বড় হয়ে ওঠেনি'। (ক্ষেত্রগুপ্ত : ১৪১৩ ; পৃ : ১৮-২০)। রূপে গুণে অনন্যা দুহিতা সতীর সাথে শিবের বিয়েকে পিতা দক্ষ কখনোই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি—

ষোড়শ কন্যার মধ্যে মুখ্য সুতা সতী
ধর্মমোক্ষ-হেতু হৈলা আপনে প্রকৃতি'॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৯)

প্রত্যেক পিতা তার আদরের কন্যাকে একজন প্রতিষ্ঠিত সদ্বংশজাত, সুদক্ষ পাত্রের হাতে সমর্পণ করতে চান। কোন পিতা-মাতা চান তাঁর আদরের পুত্রীকে দরিদ্র-ভিখিরির হাতে তুলে দিতে? তাইতো শিবের সাথে সতীর বিয়ের ব্যাপারে দক্ষের কোনো সম্মতি ছিল না। অবশেষে নারদ মুনির অনুরোধে প্রজাপতি দক্ষ সতীকে মহাদেবের হাতে তুলে দিতে সম্মত হন। বিয়েতে তিনি মেয়ের সুখের জন্য যৌতুক হিসেবে নানা ধন প্রদান করেন—

নারদের উপদেশে দক্ষ প্রজাপতি
মহাদেবে বিবাহ দিলেন কন্যা সতী।
নানাধন জৌতুকে পুরিয়া অভিলাষ
বরকন্যা দক্ষমুনি পাঠাইলা কৈলাস'।
(*চণ্ডীমঙ্গল* ; ২০০৭ : পৃ : ৯)

শুরুতেই দক্ষ-শিবের (শ্বশুর-জামাই) সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত তিক্ত। শ্বশুর-জামাইয়ের এ দা-কুমড়া সম্পর্ক সতীর গার্হস্থ্যজীবনে বিপর্যয় আনে। শিবকে সতীর যোগ্য স্বামী হিসেবে দক্ষ কখনোই মন থেকে স্বীকৃতি দেননি। এ জন্যই কারণে-অকারণে লোক সভাতেও দক্ষ শিবকে অপমান করতে ছাড়েননি—

নারদে কহিব কী তার বাক্যে দিলাঙ ঝি
… … …
ত্রিভুবনে এক ধন্যা অপাত্রে দিলাঙ কন্যা
তনু শুকাইল অনুতাপে॥
শিবের নাহি জানি আদি মূল কী বা জাতি কী বা কুল
নাঞি জানি কেবা মাতা পিতা॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৯)

শ্বশুর-জামাতার সম্পর্ক দেখে মনে হয়-'শ্বশুর-জামাতা হইল ভূজঙ্গ-নকুল'।(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ :১০) তাঁরা চিরদিন একে অপরের বৈরী। তাইতো দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করে ত্রিলোকের সকলকে নিমন্ত্রণ করেন বাদ দেন কেবল মহাদেব এবং সতীকে। বাঙালি পরিবারতন্ত্রের কবি মুকুন্দরামই প্রথম দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক রূপকেই ফুটিয়ে তুলেছেন বিনা নিমন্ত্রণে সতীর পিত্রালয়ে গমনের মধ্য দিয়ে। বাঙালি মেয়ে পিতৃগৃহে যাওয়ার জন্য সর্বদাই উদগ্রীব, এর জন্য তারা নিমন্ত্রণ প্রত্যাশী নন। কবি মুকুন্দরাম সতী চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাঙালি বিবাহিত কন্যার অন্তর্বেদনার চিত্র তুলে ধরেছেন। সতী পিতৃগৃহে যাওয়ার অনুমতি চাইলে শিব তাঁকে অনুমতি দিলেন না। তবে সতীও বড্ড নাছোড়বান্দা, তিনি পিতৃগৃহে যাবেনই। স্বামীর নিকট হতে কোনো আশ্বাসবাণী না পেয়ে ক্রুদ্ধ সতী শিবের বিনা অনুমতিতেই পিতৃগৃহে রওনা দিলেন। সেই সময় স্বামীর বিনা অনুমতিতে পিতৃগৃহে যাওয়া নারীর ধৃষ্টতারই লক্ষণ ছিল যা সতী করেছিলেন। অবশেষে একজন দায়িত্ববান স্বামী হিসেবে শিব বাধ্য হয়ে সঙ্গী উপকরণ যুগিয়ে সন্ধি করলেন। নির্বিঘ্নে সতী পিতৃগৃহে উপস্থিত হলেন। দীর্ঘদিন পর মেয়ে শ্বশুর বাড়ি থেকে বাবার বাড়ি এসেছেন সবাই উল্লসিত। মিলন ঘটলো মা-মেয়ে এবং ভগ্নিদ্বয়ের—

পাইল বাপের গ্রাম শুনিঞা সতীর নাম
প্রসূতি ধাইল বেগবতী
… … …
জতেক বহিনীগণ সভে কইল আলিঙ্গন
ঘরের কুশল জিজ্ঞাসন।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১১)

মা-বোনদের সাথে কুশলাদি বিনিময়ের পর সতী যান তাঁর পিতার কাছে এবং পিতার চরণে প্রণতি করলেন। পরক্ষণেই অভিযোগের সুরে নিজ পতি শিবকে কেন এ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করা হয়নি জানতে চাইলেন তিনি। নিজের স্বামীর সম্মান আদায় করতে পিতার কাছে সতীর এ অভিযোগও বেশ বাস্তবসম্মত। অত্যন্ত পরিতাপের সাথে দক্ষের নিকট সতীর অনুযোগ—

সবারে আসিতে যজ্ঞে কৈলা নিমন্ত্রণ।
অন্য জামাতারে দিলা বস্ত্র অলঙ্কার
শিবপক্ষে ভাল নহে তোমার ব্যবহার।
দুষ্ট দৈবফলেতে তোমার আমি ঝি
না করিল পূণ্যকর্ম নিবেদিব কী।
এমত শুনিঞা দক্ষ সতীর বচন
সকোপে বলেন বাণী শুনে সর্বজন'॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১২)

কিন্তু অভিমানী সতীর অনুযোগের কোনো মূল্যই দিলেন না দক্ষ। বরং সতীসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সামনেই দক্ষ জামাতা মহাদেবের নিন্দা করতে থাকেন। দক্ষের এ আচরণ সতীর কাছে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা মনে হলো। সতী হলেন আরও বেশি অপমানিত, হলেন ক্ষুব্ধও—

উচিত কহিতে কথা মনে পাছে পাও ব্যথা
জেবা ছিল কপালে লিখন॥
তোমার কর্মের গতি স্বামী হইল বামপথি
তারে যজ্ঞে আনি কী কারণ॥
শিবের পরিধান বাঘছাল গলাএ হাড়ের মালা
বিভূতি ভূষণ যার অঙ্গে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১২)

প্রত্যেক নারীর জীবনে স্বামী পরম আরাধ্য। কোনো নারীই পতি নিন্দা সহ্য করতে পারেন না, তা তিনি দেবলোকের হোন বা নরলোকের। বরং পতির গর্বে নারী হন গর্বিত। যজ্ঞস্থলে শিব সর্ববন্দিতা হয়েও পিতার মুখে স্বামীর নিন্দা শুনে রাগে, ঘৃণায়, ক্ষোভে, অভিমানে, অপমানে সতী প্রাণ ত্যাগ করেন। আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে সতীর এ এক নীরব প্রতিবাদ। সতীর আত্মাহুতির সংবাদে ক্রোধে উন্মত্ত মহাদেব তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে মস্তকস্থিত একটি জটা ছিন্ন করে ভূমিতে নিক্ষেপ করেন, এ ছিন্ন-জটা হতে বীরভদ্রের উদ্ভব হয়। বীরভদ্র শিবের অনুচরদের নিয়ে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করতে যান। বীরভদ্র ভৃগুর শ্মশ্রু ও পূষণের দন্ত উৎপাটন এবং অস্ত্রাঘাতে দক্ষের শিরশ্ছেদ করেন। পরে দক্ষের ছিন্ন শির যজ্ঞের অগ্নিতে ভস্ম করেন। অবশেষে দক্ষ পত্নীর কাতর ক্রন্দনে এবং দক্ষের পিতা ব্রহ্মার অনুরোধে শিব দক্ষের প্রাণ দান করেন বটে তবে শিব নিন্দা কলুষিত স্বমুণ্ড থেকে বঞ্চিত করে ছাগমুণ্ড করেন। সতী শোকে ক্রুদ্ধ শিব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে নৃত্য করতে থাকেন। তাতে সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার প্রায় উপক্রম হলে বিষ্ণু তাঁর চক্র দ্বারা সতীর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করতে থাকেন। সতীর দেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষের নানা স্থানে নিক্ষিপ্ত হয়। যেখানে যেখানে সতীর দেহাংশ পতিত হয় সেখানে এক একটি মহাপীঠ গড়ে ওঠে। এভাবে ভারতবর্ষের একান্নটি স্থানে একান্নটি মহাপীঠ স্থাপিত হয় যা আজও ভারতবর্ষে পবিত্র স্থান হিসেবে পূজিত। দক্ষগৃহে দেহ ত্যাগের পর সতী হিমালয়ের গৃহে হিমালয়পত্নী মেনকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। যথাসময়ে পার্বতী-রূপে সতী ভূমিষ্ঠ হলেন। পার্বতী তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে গৌরবর্ণ লাভ করলেন। কিছুকাল পর শিব তপস্যার জন্য হিমালয় পর্বতে এলে হিমালয় পার্বতীকে নিয়ে শিবের পূজা করেন। পার্বতী ও তাঁর সখীরা মিলে শিবের আরাধনা করতে থাকেন। পার্বতী সারাক্ষণই মহাদেবের চিন্তায় ও সেবাই আত্মমগ্ন থাকেন। কিন্তু মহাদেব কখনোই পার্বতীর দিকে সম্যকরূপে দৃষ্টিপাত করেননি। যদিও পার্বতী রূপে গুণে অনন্যা, তাঁর গায়ের রং এতটাই উজ্জ্বল যে, অঙ্গের শোভায় অন্ধকার দূরীভূত হয়—

বিমল অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কার শোভা
অন্ধকার করয়ে বিনাশ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৫)

গৃহী শিবের গৃহিণীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন কারণ দক্ষযজ্ঞে পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনে সতীর দেহত্যাগে সতীকে হারিয়ে শিব ছোট্ট বালকের মতো মাটিতে লুটিয়ে কেঁদেছেন এবং সে কান্নায় যে সুর বেজেছে তা 'গৃহের সুর, তার মধ্যে রুদ্রের বিশ্বনৃত্যের তাল নেই'। (ক্ষেত্রগুপ্ত : ১৪১৩ ; পৃ : ৫১) শিব কেবলই পত্নী শোকে অস্থির—

অধোমুখে বার্ত্তা নন্দী কন মহেশ্বরে।
লোটাইয়া কাঁদেন শিব মহীর উপরে॥
(মুকুন্দরাম : ১৯৭৪ ; পৃ : ৬০)

দক্ষযজ্ঞের কাহিনির মধ্যে শিব-পার্বতীর বিয়ের বীজ উপ্ত ছিল। গিরিরাজ পার্বতীর বিয়ে নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন। প্রত্যেক মাতা-পিতা তাঁর কন্যাকে সুপাত্রে পাত্রস্থ করতে উদগ্রীব থাকেন। গিরিরাজের উৎদ্বেগের মধ্যদিয়ে বাঙালি কবি মুকুন্দরাম বাঙালি পিতার উৎকণ্ঠাকেই প্রকাশ করেছেন। অবশেষে নারদমুনি গিরিরাজকে নিম্লোক্ত বাণী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে আশ্বস্ত করেন—

কৃতাঞ্জলি মুনিবরে জিজ্ঞাসেন গিরি
কোন বরে বিবা দিব মোর কন্যা গৌরী।
হেমন্তের বাক্য শুনি বলেন নারদ
গৌরী হৈতে বাড়িবেক তোমার সম্পদ।
অচিরাত হবে গৌরী শিবের ঘরনি
অর্ধ-অঙ্গ দিবে হর-গৌরীকে আপনি॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৬)

শিব-পার্বতীর সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের। দক্ষের মুখে পতি নিন্দা শুনে অপমানে, ঘৃণায় সতী দেহ ত্যাগ করে পর্বতের গৃহে পার্বতী নামে পুনর্জন্ম লাভ করেন। বার বার তিনি শিবকেই পতি হিসেবে পেতে চান। শিবকে পাওয়ার জন্য পার্বতী কঠোর তপস্যায় মগ্ন হন। অথচ গিরিরাজ পার্বতীর বিয়ে নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। পার্বতীর কঠোর সাধনায় দেবাদিদেব মহাদেব খুশি হয়ে তাকে স্ত্রীর স্বীকৃতি দিতে মনস্থির করেন—

প্রসন্ন তোমারে গৌরী মাল্য দেহ মোরে॥
তপস্যায় বশ আমি হইলাঙ তোমারে।
অঞ্জলি করিয়া গৌরী বলেন শঙ্করে।
কৃপা করি যদি মোরে দিবে বর দান।
আমার পিতারে নাথ করহ প্রমাণ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২০)

পার্বতীর তপস্যায় খুশি হয়ে শিব তাঁকে বরমাল্য দেওয়ার জন্য পার্বতীকে অনুরোধ করেন। তবে পার্বতীও কম বিচক্ষণ নন, তিনি কৌশলে তাদের বিয়ের তত্ত্ব তাঁর পিতার কাছে পাঠানোর জন্য শিবকেই অনুরোধ করেন। কারণ বিয়ের তত্ত্ব প্রথমে পাত্র পক্ষ থেকেই যাওয়ার নিয়ম যুগ যুগ ধরে সমাজে চলে আসছে। শিব গৌরীর কথামতো নারদকে পাঠালেন গিরিরাজের কাছে। নারদকে বিয়ের তত্ত্ব নিয়ে গিরিরাজ গৃহে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কবি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তুলে ধরেছেন। নারদ হিমালয়ে গিয়ে পার্বতীর পিতাকে ঘটনা সবিস্তারে অবগত করলেন। নারদ কর্তৃক সমস্ত ঘটনা অবগত হয়ে গিরিরাজ ভীষণ খুশি হলেন এবং অতিদ্রুত পার্বতীর বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানান এবং বৈদিক রীতি অনুযায়ী বিয়ের সমস্ত নিয়ম সংস্কার পালন করার নির্দেশ দেন। পাঁজিপুথি দেখে প্রথমে বিয়ের লগ্ন-তিথি নির্ধারণ করা হয় যা গার্হস্থ্যজীবনে সুখ সমৃদ্ধির জন্য অপিহার্য মাঙ্গলিক প্রথা—

আসিঞা মুনিগণ করিল শুভক্ষণ
বান্ধিল বিচিত্র ছান্দলা।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২০)

শিব সব সময় তাঁর ভক্তকে চমক দিতে পছন্দ করেন। বিয়ের পূর্বে শিব এমন ছলনা করলেন যে, অতিথিবৃন্দ এবং প্রতিবেশীরা শিবকে দেখে ভীষণ অবাক হলেন। তাঁর বসন-ভূষণ এবং শারীরিক অবয়ব দেখে সবাই সমালোচনা করতে থাকেন। কেউ সম্মুখে কেউ পশ্চাতে। পার্বতীকে অনেকে কুপরামর্শ দিয়েও বিভ্রান্ত করেছেন। শিবের সাথে কোনো আত্মীয়-স্বজন এমনকি বন্ধু-বান্ধবকে না দেখে উপস্থিত জনতা তাঁকে এতিম হিসেবে প্রতিপন্ন করেন—

কাহার পুত্র হর না জানি কোথা ঘর।
না দেখি ভাই বন্ধুজনে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৯)

বিয়ের আসরে শিবকে দেখে অভ্যাগতদের শিবের পারিবারিক অবস্থান সম্পর্কে বুঝতে কিছু বাকি থাকে না। তাঁর দরিদ্রতা এবং আচার-আচরণ, বসন-ভূষণ দেখে সবাই পার্বতীর ভাগ্যকেই দোষারোপ করেন—

ভিক্ষার অনুসারে ভ্রময়ে ঘরে ঘরে
করিয়া ডম্বরু বাজনা॥
দারুণ কর্মগতি ইছিলে হেন পতি
তোমারে বিধি বিড়ম্বনা॥
বসন বাঘছাল গলাএ হাড়মাল
উত্তরী জার বিষধরে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৯)

শাস্ত্রানুযায়ী বিবাহকার্য সংঘটনে কিছু আচার-পার্বণ পালন করার নিয়ম সমাজে প্রচলিত আছে যা গার্হস্থ্যজীবনের অপরিহার্য অংশ। হর-গৌরীর বিয়েতে যে সমস্ত আচর, বিধি-বিধান পালিত হয় সেগুলি মর্ত্যলোকের ব্রাহ্মণ্য সমাজে পালিত আচার-পার্বণেরই অনুরূপ। কন্যার বিয়েতে গিরিরাজ নব-দম্পতির মঙ্গলার্থে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী যে সমস্ত আচার পার্বণ পালন করার নিয়ম প্রচলিত আছে সেগুলি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। আচার-পার্বণগুলোর মধে অন্যতম-অধিবাস, ষোড়শ মাতৃকা এবং নান্দীমুখ।

সকল অমঙ্গল এবং দোষ-ত্রুটি পরিহার করে শুভদিনে, শুভক্ষণে হরিদ্রাজুত ধুতি পরিয়ে গৌরীকে অধিবাসে বসানো হয়। শঙ্খ, বেণু-বীণা মৃদঙ্গ ভেরীসহ নানা বাদ্য-বাজনের এক অপূর্ব আবহ অধিবাাসের অনুষ্ঠানে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা—

শঙ্খ বেণু বীণা মৃদঙ্গ ভেরি নানা
বাজনে হইল কোলাহল।
....
মেলিয়া জত মুনি করিয়া বেদধ্বনি
করিল গন্ধাধিবাসনে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২০)

গার্হস্থ্যজীবনের পরিপূর্ণতা দিতে বৈবাহিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হর-গৌরীর বিয়েতে নব-দম্পতি মঙ্গলার্থে পালিত বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান এবং স্ত্রী আচার দর্শনে দেবলোক এবং নরলোকের বিয়ের পদ্ধতির মধ্যে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমাপনের পর এয়োগণ মিলে স্ত্রী-আচার পালন করেন। স্ত্রী আচারের মধ্যে অন্যতম -জলসাধা, হাতে মঙ্গল সূতা বাঁধা, হলুদ কোটা—

কক্ষেতে হেমবারি মেনকা সুন্দরী
জল সহে ঘরে ঘরে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২০)

এরপর এয়োগণ মিলে কন্যার হাতে মঙ্গল সূত্র বেঁধে দেন—

আইঅ সব মিলি করিআ হুলাহুলি
মঙ্গল সূত্র বান্ধে করে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২০)

স্ত্রী আচারে জলসহা এবং কন্যার হাতে মঙ্গল সূতা বাঁধা এ আচার দুটি অভিজাত সমাজে প্রয়োগ করা হয়েছে যেটি আক্ষেটিক খণ্ডে অনুসৃত হয়নি।

বরবরণ প্রসঙ্গটি কন্যার পিতার আর্থিক সংগতির ওপর নির্ভর করে। পর্বতরাজ বিভিন্ন বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়ে জামাইকে বরণ করেন—

বসন অঙ্গুরি মালা দিয়া গিরি

করিল বরের বরণ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২১)

জামাইকে ছাঁদনাতলায় আনার পর প্রথমে গিরিরাজ কর্তৃক বরকে বরণ করা হয় এরপর মেনকা এয়োগণকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন স্ত্রীআচার পালনের মধ্য দিয়ে জামাইকে বরণ করেন। কিন্তু জামাই বরণ করতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। জামাইয়ের বসন-ভূষণ দেখে মেনকা স্তম্ভিত, কম্পিত। গৌরীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে মেনকার চোখের জল ক্ষণে ক্ষণে ঝরতে থাকে—

অঙ্গের ভূষণ দেখি বিষধরগণে।
অস্থিভস্ম বিভূষণ দেখি কলেবর
হইআ বিরসমুখি চিন্তিত অন্তর॥
কান্দে মেনকা গৌরীর মায়া মোহ।
ঝলকে ঝলকে নয়নে পড়ে লোহ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২১)

ছাঁদনাতলায় নতুন জামাইয়ের এরূপ হেয়ালিপনা কন্যার মাতাকে বড়ই চিন্তিত করে, করে উদ্বিগ্নও। শিবের এ রূপ দেখে মেনকা স্তম্ভিত এবং কাঁদতে কাঁদতে গৃহে প্রবেশ করে স্বামীর কাছে অভিযোগ করেন—

হেন বরে গৌরী দিল কি দেখি সম্পদ।
বাপ হইআ মূঢ়মতি কইল কন্যাবধ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২১)

ঐ সময় জামাইয়ের বেশ দেখে মেনকার মনে হয়েছিল কন্যাকে বোধ হয় বধ করা হলো। তবে পরবর্তীতে বোঝা গেল শিবের এ বেশে বিয়ে করতে আসা তাঁর ছলনারই রূপান্তর। শিব সব সময়ই নতুন নতুন চমক দিতে পছন্দ করেন। আগত অতিথিরা জামাইয়ের এ চেহারা ও আচার-আচরণ দেখে কানাকানি করতে থাকেন। শাশুড়ি মেনকাও জামাইয়ের চেহারা দেখে হতভম্ব, কন্যার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত মনে করে স্বামীর কাছে সকল অভিযোগ অনুযোগ উত্থাপন করেন। সর্বজ্ঞ শিব সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন এবং নন্দীর সুপরামর্শে ভুবন-মোহনরূপ ধারণ করেন। মুহূর্তের মধ্যে সকলেই আবার শিবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। শিবের এ রূপান্তর তাঁর স্বরূপ উপলব্ধিরই বহিঃপ্রকাশ।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে তিনটি বিয়ের কাহিনি সংযোজন করেছেন। কালকেতু-ফুল্লরা এবং ধনপতি-খুল্লনার বিয়ের পাশে তিনিই প্রথম *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে দেবখণ্ডে পুরাণবর্ণিত শিব কাহিনিতে হর-পার্বতীর বিয়ে বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে প্রথা ভেঙে দুটি লৌকিক কাহিনির মধ্যে নারীগণের পতিনিন্দা অধ্যায়টি সংযোজন করে নতুন মাত্রা দান করেছেন। শিবের মদন-মোহন রূপ দেখে যুবতী থেকে শুরু করে বিধবা, বৃদ্ধা সবাই শিবের সাথে নিজ পতির তুলনা করে কিছুক্ষণ আগে যারা গৌরীর দুর্ভাগ্য মনে করে বেদনায় কাতর ছিলেন তারাই এখন গৌরীর সৌভাগ্য ও নিজেদের দুর্ভাগ্য স্মরণ করে স্বামীর নানা দুর্বলতার কথা উত্থাপন করে নিজেদের দুঃখের, ক্ষোভের ও হতাশার চিত্র ব্যক্ত করেছেন—

সবে বলে গৌরী বর পাইয়াছে ভাল
… … …
এক আইয় বলে হেদে গোদা মোর পতি
কোয়া জ্বরের ঔষধ সদাই পাব কতি।
… … …
এক আইয় বলে আমার কর্ম মন্দ
অভাগিয়া স্বামী মোর দুই চক্ষু অন্ধ।
… … …
এমন সময় আইল বুড়ি একজন

দেখিআ বরের রূপ জাগিল মদন।
… … …
এমন সময় আইল বিধবা জন সাত
… … …
রূপে গুণে নাতিনী আমার ঘরে আছে
হেন বরে বিভা দিআ রাখি নিজ কাছে॥
দেখিআ বরের রূপ জতেক যুবতী
মনে মনে নিন্দা করে আপনার পতি॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২২)

নারীগণের পতিনিন্দায় তাদের বঞ্চনা, হতাশা ও ব্যর্থতার চিত্র সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সম্ভবত দাম্পত্য জীবনে তারা সুখী ছিলেন না এবং মনের মতো স্বামী তারা পাননি বলেই জীবনের অপ্রাপ্তিজনিত হতাশা থেকে নিজ নিজ পতিনিন্দায় ব্যাকুল হয়েছেন। নানা কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর অবশেষে গৌরীকে ছাঁদনাতলায় আনা হলো এরপর বিয়ের সমস্ত নিয়ম কানুন একে একে পালন করা হলো।

সাতপাক, শুভদৃষ্টি ও মালাবদলের পর কন্যা সম্প্রদানের মধ্য দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। বিবাহরীতিতে কন্যা সম্প্রদান পর্বটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। এত দিনের স্নেহলালিত্যে পালিতা কন্যাকে জামাতার হাতে সম্প্রদান করা সত্যিই কষ্টের এবং বেদনার। কিন্তু হর-গৌরীর বিয়েতে ব্যতিক্রম সৃষ্টি হয়। এ বিয়েতে সৃষ্টির সকল জীব খুশি, স্বর্গের দেবগণ থেকে আরম্ভ করে মর্ত্যের সকল প্রাণী হর-গৌরীর বিয়েতে আনন্দ-উল্লাস করেন। তাইতো কন্যা সম্প্রদানের সময় গিরিরাজকে বিষণ্ণ দেখায়নি। তিনি আনন্দের সাথেই কন্যাকে শিবের হাতে তুলে দেন—

ব্রহ্মা পুরোহিত হৈল বাক্যের বিধান।
হিমালয় আনন্দে করেন কন্যা দান॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২২)

বিয়ে সমাপনান্তে হর-গৌরী ক্ষীর অন্ন ভোগ করে পরম আনন্দে ফুল শয্যায় রাত অতিবাহিত করেন।

শিবকে গিরিরাজ নানা উপঢৌকনসহ উত্তম বসন ভূষণ প্রদান করেন। এ ছাড়াও সেই সময় অভিজাত সমাজে কন্যার সাথে দাস-দাসী প্রেরণের নিয়ম ছিল, গিরিরাজ তার আদরের কন্যা পার্বতীর যেন কোনো কষ্ট না হয় এজন্য পার্বতীর সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য জয়া-বিজয়া ও পদ্মাবতী নাম্নী তিন জন সহচরীকে প্রেরণ করেন—

ঝারী থালা ধেনু শয্যা দিল নানা দান।
উত্তম আওয়াস শিবে দিল হেমদান।
জয়া বিজয়া সখি দিল পদ্মাবতী।
সমর্পিল গিরিরাজ বিনয়ে পার্বতী॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২২)

দেবখণ্ডে দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ, পার্বতীর সঙ্গে শিবের বিয়ে প্রভৃতি পুরাণাশ্রিত ঘটনা বিধৃত হয়েছে। কবি মুকুন্দরাম পুরাণ আশ্রিত উপকরণ নিয়ে বাঙালি পারিবারিক জীবনের একটি নিখুঁত ও বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন। দরিদ্র শিব-পার্বতীর দাম্পত্য জীবন, এরই মধ্যে গণেশ ও কার্তিকের জন্ম, শ্বশুরালয়ে আশ্রিত মায়ে-ঝিয়ের দ্বন্দ্ব ও লাঞ্ছনাসহ পারিবারিক কলহের একটি রসোজ্জ্বল চিত্র পৌরাণিক পটভূমির মধ্য দিয়ে কবি উপস্থাপন করেছেন-

ঘরে জাওঙাঞি রাখিআ পূষিব কতকাল।
প্রভাতে ভাতেরে কান্দে কার্তিক গণাই॥
… … …

ভাত কাপড় কত না জোগাব বার মাস।
… … …
দুই পুত্র তিন দাসী স্বামী শূলপাণি।
… … …
রাঁধ্যা বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা॥
আজি হইতে তোমার দ্বারে দিল কাঁটা॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২৫)

পিতৃ ও মাতৃস্নেহে লালিত আদরের কন্যাকে জামাইয়ের হাতে সম্প্রদানের মধ্য দিয়ে যেমন পিতা-মাতার অধিকার অনেকটাই শিথিল হয়ে যায় তদ্রূপ ঐ বিবাহিত কন্যা যদি পিতৃগৃহে আশ্রিত থাকেন তবে পিতার সাথে সম্পর্ক ভালো থাকলেও মায়ের সাথে সম্পর্ক অনেক সময় তিক্ততায় পরিণত হয়। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ওপরের ছত্রটিতে। পার্বতী জননী মেনকা মেয়ে-জামাই এবং নাতি-নাতনির জন্য ভাত জোগাতে জোগাতে অতিষ্ঠ। এ নিয়ে নিত্যই পার্বতীর সাথে তার বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। খাবার নিয়ে খোটা পার্বতীও আর সহ্য করতে পারছেন না তাই রাগে, অভিমানে মায়ের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে (অর্থাৎ কখনো আর বাবার বাড়ি আসবেন না এমন প্রতিজ্ঞা করে) পার্বতী শিবের সাথে কৈলাসে ফিরে গেলেন। পার্বতী-মেনকার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কবি আমাদের চারপাশে বিরাজমান মায়ে-ঝিয়ের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন। বিবাহিত কন্যা দীর্ঘ দিন পিতৃগৃহে থাকলে মায়ে-ঝিয়ের সুন্দর সম্পর্কও যে অচিরেই তিক্ততায় পরিণত হয় উল্লিখিত ছত্রে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মায়ে-ঝিয়ের এ দ্বন্দ্ব গার্হস্থজীবনে নিয়ে আসে চরম অশান্তি ও বিপর্যয়। পরিশেষে তাদের মধ্যে হয় বিচ্ছেদ। যদিও এ বিচ্ছেদ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কারণ মা-মেয়ের সম্পর্কে যতই ঘুন ধরুক না কেন সেটি সাময়িক। প্রবাদ আছে দুটি পাত্র একসাথে থাকলে ঠোকাঠুকি লাগে। ফলে পারিবারিক জীবনে একত্র বসবাস করতে গেলে মনোমালিন্য হওয়া যেমন স্বাভাবিক আবার সে মনোমালিন্য মিটে দ্রুত পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া আরও বেশি স্বাভাবিক।

শিব-পার্বতীর দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বার বার তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা বলেছেন। শিব-পার্বতীর সংসারে অভাব আছে, আছে অনটনও কিন্তু রসিকতার কমতি নেই। শিবের ভোজন রসিকতা, স্বামী-স্ত্রীর কলহ বর্ণনায় তিনি হাস্য-রসের উদ্রেক করে পাঠকের দুঃখ ভুলিয়েছেন। শিব-পার্বতীর সংসারে অভাব নিত্যসঙ্গী তাইতো বাধ্য হয়ে শিবকে ভিক্ষা বৃত্তি বেছে নিতে হয়। শিবের ভিক্ষা যাত্রা, ভিক্ষান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং ভিক্ষান্নে স্ত্রী-পুত্রসহ আনন্দে শিবের দিনাতিপাত পরিবার রসের এ সুন্দর আলেখ্য যেমন বাস্তব তেমনি বড় করুণ ও নির্মম—

কেহ দিল চালু কড়ি কেহ দিল ডাল বড়ি
কুঁপি ভরি তৈল দিল তেলি।
লবনিঞা দেয় লোন ঘৃত দধি গোপগণ
… … …
বেলা হৈলা দুইপর মহাদেব আইলেন ঘর
কার্তিক আইলা আগুয়ান।
… … …
দেখিয়া মুড়কি খই দুঁহে আইলা ধাওয়াধাই
কন্দল বাড়িল দুই ভাই।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২৬)

মহাদেব ভিক্ষার দ্রব্য নিয়ে ঘরে ফিরলে মোদক সম্প্রদায় থেকে প্রাপ্ত খই নিয়ে কার্তিক-গণেশের মধ্যে কন্দল বেধে যায়। পার্বতী তাদের প্রবোধ দিয়ে খই ভাগ করে দেন। খাবার নিয়ে দু'ভাইয়ের কাড়াকাড়ির মধ্য দিয়ে কবি হত-দরিদ্রের পারিবারিক চিত্র প্রকাশ করেছেন। পার্বতী ভিক্ষালব্ধ চাল-ডাল রান্না করেন, পরম তৃপ্তিতে সবাই আহার করে সুখে নিদ্রা যায়। এ বর্ণনা নিঃস্ব রিক্ত এক অসহায় গৃহস্থের যাপিত

পারিবারিক জীবনের চিত্র। পরের দিন প্রত্যুষে অলসস্বভাব ভোজনলোলুপ গৃহকর্তাটি ভিক্ষায় যেতে চাইলেন না। গত দিনের ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে খাবারের এক বিশাল আয়োজনের দিবা-স্বপ্ন দেখতে থাকেন। আর এ জন্যই পার্বতীর সাথে শিবের কলহ লেগেই থাকে। শিব-পার্বতীর সংসারে দারিদ্র্যকেই বড় সমস্যা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এই দরিদ্র ব্যক্তিটি একেবারেই কর্মবিমুখ। শ্বশুরগৃহে নিশ্চিন্ত আহারাদির উত্তম ব্যবস্থায় শিব দারুণ খুশি ছিলেন। কিন্তু পত্নীর তাড়নায় শিবকে নিজ গৃহে ফিরে এসে ভিক্ষায় বেরুতে হয়। এর মধ্য দিয়ে কর্মবিমুখ গৃহস্থের অলসতা-নিস্পৃহতার নিখুঁত চিত্র রূপায়িত হয়েছে। কর্মে শিবের যতটা অরুচি ও অনীহা খাদ্য গ্রহণে ঠিক তাঁর ততটাই রুচি, তবে আহার কোথা থেকে আসবে শিবের সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। ভোজনপটু শিব নানা ব্যঞ্জনের আস্বাদ নিতে ক্লান্তিহীন। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে মানুষের ঘরের কথা এমনকি হেঁসেলের কথাও স্থান পেয়েছে। আর এ চিত্র শুধু লৌকিক জীবনধারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, লৌকিক জগৎ ছাড়িয়ে অলৌকিকে অর্থাৎ দেব-দেবীর জীবন যাত্রায়ও সমভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই লৌকিক জগতের বাইরে যে অলৌকিক জগৎ, পার্থিব জগতের বাইরে আছে যে, অপার্থিব দেবদেবীর রাজত্ব, সে জগৎও মানবিক রস চিন্তা ও ভোগ তৃপ্তিতে সিঞ্চিত হয়েছে। তাইতো কবি মুকুন্দরামের শিব যেমন অলস তেমনি লোভী। ঘরে খুদকণা পর্যন্ত নেই জানার পরও গৌরীকে নিম্নোক্ত খাদ্য রান্নার আদেশ দেন শিব—

আজি গণেশের মা রান্ধিবে মোর মত
নিমে শিমে বাগ্যনে রান্ধিআ দিবে তিত।
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর
… … …
নটিআ কাঁঠাল বিচি সারি গোটা দশ
ফুলবড়ি দিহ তায় আর আদারস।
… … …
ঘৃত জীরা সান্তলনে রান্ধিবে পালঙ্গ
ঝাট স্নান কর গৌরী না কর বিলম্ব।
গোটা কাসন্দি তায় জামিরের রস
এ বেলা আমার মত রান্ধ বেঞ্জন দশ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২৬)

উপর্যুক্ত খাদ্যতালিকায় যে বর্ণনা আছে সেখানে অতি সাধারণ বাঙালি গৃহস্থ পরিবারের নিরামিষ অথচ পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারের বর্ণনা নিহিত আছে। উল্লেখিত ছত্রে কবি যে সকল পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের তালিকা এবং রান্নার বিবরণ তুলে ধরেছেন তাতে তাঁকে একজন অভিজ্ঞ পুষ্টিবিদ এবং রন্ধনশিল্পী বললেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে কোর্মা, পোলাও ও মাছ-মাংসের বর্ণনা নেই। এ বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি গ্রাম বাংলার এক সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থের পরিচয় তুলে ধরেছেন হর-পার্বতীর সংসার যাত্রার মধ্যে দিয়ে। দরিদ্র সংসারের পুরুষ কর্তাটির এ প্রত্যাশায় হয়তো অসঙ্গতি ছিল, তবে আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন এ প্রত্যাশা ভিখিরি শিবের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ ভাবনা তো ভাবনায়। তার মধ্যে চাওয়া-পাওয়ার চুল চেরা বিশ্লেষণ থাকতে পারে না। এ জন্যই শিব পার্বতীর কাছে এ ধরনের অযৌক্তিক আবদার করেন। ভোজন রসিক বাঙালির এই অতি সামান্য প্রার্থনাও যেন স্বপ্ন, অলীক যাকে লালন করেই সুখ। শিবের এই আবদারের প্রত্যুত্তরে পার্বতীর কথায় তারই আভাস পাওয়া যায়-

রন্ধন করিতে ভাল কহিলে গোসাঞি
প্রথম পত্রে জাহা দিব তাহা ঘরে নাঞি॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২৬)

বোঝা যাচ্ছে ঘরে অন্ন রান্নার সম্বল নেই অর্থাৎ চাল বাড়ন্ত, ব্যঞ্জন তো দূরের কথা। ষোড়শ শতকে রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কারণে বাঙালির ঘরে অন্নাভাব হয়তো এত প্রকটভাবে না থাকলেও কবি মুকুন্দরামের জীবন চিত্রে দেখি কবি স্বয়ং ভাগ্যের ফেরে অথবা কর্মদোষে জীবনের কোনো এক সময়ে

প্রচণ্ড অর্থকষ্টে এবং অন্নকষ্টে দিনাতিপাত করেছেন। যা তিনি কখনোই মেনে নিতে বা ভুলতে পারেননি। হর-পার্বতীর সংসার জীবনের এ দুঃসহ স্মৃতি কবির অতীতের স্মৃতিরই রোমন্থন বলে মনে হয়। এ জন্যই কবি মুকুন্দরামের কাব্যে কোনো তালিকাই নিছক তালিকা হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে এক অনবদ্য জীবন-গীতিকা। আর এই জীবন-গীতিকা দেবলোককে পর্যন্ত স্পর্শ করতে ছাড়েনি। এ অভাব অনটন হর-পার্বতীর সংসার জীবনে কলহ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। এ কলহ হতে নিষ্কৃতি পেতেই বোধ হয় পার্বতীর ওপর অভিমান করে শিব গৃহ ত্যাগ করার বাসনা করেছেন-

আমি ছাড়িব ঘর জাইব দেশান্তর
কি মোর ঘরকরণে॥
... ...
কতেক ঘরে আনি লেখা নাঞি জানি
দেড়ি অন্ন নাহি থাকে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২৭)

পারিবারিক কলহ কতটা চরম পর্যায়ে পৌঁছালে গৃহকর্তা স্ত্রী ও সন্তানাদি ছেড়ে গৃহত্যাগী হওয়ার বাসনা করেন। তার প্রমাণ পরিস্ফুট হয়েছে ওপরের অংশে স্বভাবতই স্বামী গৃহত্যাগী হতে চাইলে স্ত্রীর মনে শান্তি থাকার কথা নয়। যেখানে হর-পার্বতীকে ইহলোক-পরলোকের শ্রেষ্ঠ দম্পতি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। সেই পরিবারের গৃহস্বামী শিব সংসারের নিত্য কলহ থেকে নিষ্কৃতির জন্য পার্বতীকে ত্যাগ করে দেশান্তরী হতে চান। শিবের ধারণা এতে যদি পার্বতীর দুঃখ-বেদনার অবসান হয়। এ পরিস্থিতিতে পার্বতীর দুঃখ-বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর স্বগতোক্তিতে—

দারুণ কর্মের দোষে হইলাঙ দুঃখিনী
ভিক্ষার ভাতে দারুণ বিধি করিল গৃহিণী।
... ...
দুঃখ জৌতুক দিআ বাপা বিভা দিল গৌরী।
দোষ ঘাটী কিছুই নাঞি পাপ পরমাদ
কি কারণে পাই পদ্মা এত অপবাদ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২৭)

যিনি সর্বশক্তির আধার সেই দশভুজা পার্বতীকেও স্বামীর সংসারে নিত্য গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। এহেন পরিস্থিতিতে পার্বতীও একজন সাধারণ গৃহবধূর ন্যায় দুঃখ করতে থাকেন। পার্বতীর ধারণা তাঁর কর্মের দোষেই এমন স্বামী কপালে জুটেছে যদিও তিনি তপস্যা করেই মহাদেবকে পতি হিসেবে পেয়েছেন। মেয়ের সুখের জন্য পার্বতীর বাবা গিরিরাজ নানা যৌতুক দিয়ে তাঁকে বিয়ে দিয়েছেন তবুও তাঁর কপালে সুখ নেই এজন্য তিনি নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করেন এবং একজন সাধারণ বাঙালি গৃহবধূর ন্যায় স্বামী ও বিধাতাকে অভিসম্পাত করেন। এ সরস বর্ণনা একজন জীবনবাদী কবির পক্ষেই সম্ভব। জীবন-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ পার্বতী যখন সবকিছু ছেড়ে মেয়েদের শেষ আশ্রয়স্থল বাপের বাড়ি যেতে চেয়েছেন তখনই সখী পদ্মা তাকে অনুরোধ করেছেন নিজেকে প্রকাশ করার—

শুনগো শিখরি সুতা কহিয়ে ভবিষ্যকথা
তোমার পূজার ইতিহাস
সপ্তদ্বীপে যুগে যুগে তোমার অর্চনা আগে
আপনি করহ প্রকাশ।
দ্বাপর যুগের শেষে কলিঙ্গ-রাজার দেশে
বিশ্বকর্মা রচিত দেহারা
মঙ্গলচণ্ডিকা রূপে স্বপ্ন কহিআ ভুপে
পূজা নিবে দৈবদুঃখহরা।
পশুর লইবে পূজা সিংহরে করিবে রাজা

… … …
প্রথমে কলির অংশে জন্মাবে আক্ষটি বংশে
ইন্দ্রের কুমার নীলাম্বরে
… … …
তালভঙ্গ করি ছলা দিবে কন্যা রত্নমালা
ছলিয়া আনিবে বসুমতী
খুল্লনা হইব খ্যাতি হব গন্ধবান্যা জাতি
বিবাহ করিব ধনপতি
পতি জাব দেশান্তর ঘরে সতা সতন্তর
বহুবিধি দিব তারে দুঃখ
… … …
শ্রীপতি হইব সুত সঙ্গে লইআ তরি সাত
চলিবেন বাপের উদ্দেশে
… … …
শুনিঞা পদ্মার বাণী আনন্দিত নারায়ণী
বিশ্বকর্মে করিলা স্মঙরন॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২৮)

— উদ্ধৃতিটির মধ্যেই নিহিত আছে মর্ত্যে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রাপ্তির দিক নির্দেশনা। পদ্মার পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা অনুযায়ী চণ্ডী মর্ত্যে একটার পর একটা ঘটনা ঘটাতে থাকেন এবং মর্ত্যে দেবীর অধিষ্ঠান হতে থাকে। দেবীর প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মানবের যাপিত জীবনের কিছু অনুষঙ্গ আলোচিত হয়েছে যা কবিগণ খুব মমতার সাথে সন্নিবিষ্ট করেছেন। মানব জীবনের এই যাপিত ঘটনা গার্হস্থ্যজীবন রূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

আক্ষেটিক খণ্ডে বিধৃত গার্হস্থ্যজীবন

যে কোনো মহৎ ও সৃজনশীল শিল্পকর্ম সময় তথা কাল-সাপেক্ষ। কবি বা শিল্পীর শিল্পকর্মে সমসাময়িক বিষয়, সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, পারিবারিক তথা নিজস্ব দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রতিফলন থাকা স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবেই স্বীকৃত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতাব্দীর তথা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ষোড়শ শতাব্দী বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কাল। বাংলায় সুলতানী শাসনের অবসানে তখন মুঘল সাম্রাজ্যের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এই সময়ই সম্রাট হুমায়ুন বীরদর্পে ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় প্রবেশ করেন। কিন্তু ঘনঘন রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন এবং যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলাদেশে ব্যাপক অরাজকতা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য অব্যাহত গতিতে বাড়তে থাকে। এরপর সম্রাট আকবর বাংলা বিজয়ের জন্য ১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মুনিব খাঁর নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ করেন। মুঘল বাহিনীর সঙ্গে এ যুদ্ধে দাউদ খাঁ জয়ী হন। কিন্তু মেদিনীপুরে মুঘল বাহিনীর সাথে দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে সম্রাট দাউদ খাঁ পরাজিত হন। এভাবে বাংলায় মুঘল শক্তির উত্থান হলেও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে বেশ সময় লাগে। ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মানসিংহ বাংলায় প্রেরিত হন। বাংলার 'সুবাহ্‌দার মানসিংহের সামরিক বিচক্ষণতার ফলে দীর্ঘ বিশ বছর পরে বাংলায় রাষ্ট্রিক একনায়কত্বে শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপিত হয়'। (শ্রীমন্ত ; ২০১১ : পৃ : ৩৩০)

একদিকে আকবরের শাসনামলে তাঁর সেনাপতিদের লোভ লালসা অন্যদিকে রাজ্যহীন আমীর ওমরাহগণের দেশ লুণ্ঠন ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালির সাধারণ জীবনযাত্রাকে করে বিপর্যস্ত। এমনই এক রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সাক্ষী কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। ফলত মুকুন্দরাম বিরচিত *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যটিতে তৎকালীন রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের চিত্র বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। কবি নিজেও ডিহিদার মামুদ সরীপের অত্যাচারে নিজ এলাকা দামুন্যা ছাড়তে বাধ্য হন এবং পথিমধ্যে নিদারুন দুঃখ-দৈন্যের

শিকার হন। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কতটা প্রতিকূল হলে একজন কবি তাঁর সাতপুরুষের ভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য হন তা কবি গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ অংশে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী করে বর্ণনা করেছেন—

সহর সেলিমাবাজ তাহাতে সজ্জনরাজ
নিবসে নেউগি গোপীনাথ।
তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি
মিরাস পুরুষ ছয় সাত॥
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে লোল ভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-মহীপ॥
... ...
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া॥
নাঞি মানে প্রজার গোহারি॥
... ...
পোতদার হইল যম টাকা আড়াই আনি কম
পাই লভ্য খায় দিন প্রতি॥
... ...
প্রজা হইল বিকলিত বেচে ধান্য গোরু নিত্য
টাকার দ্রব্য দশ দশ আনা॥
... ...
দামিন্যা ছাড়িয়া যায় সাঙ্গে রামা নন্দী' ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে॥
... ...
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা॥
... ...
তৈল বিনে করি স্নান কেবল উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে॥
... ...
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়া জাই
আরড়ায় হইল উপনীত॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৩-৪)

ডিহিদার পদে মামুদ সরীপের নিযুক্তি, রাজকর্মচারীদের অত্যাচার, জমির মাপ ও টাকার অবমূল্যায়ন, অনাবাদি জমির ওপর কর আরোপের মতো সংকটময় মুহূর্তে নিয়োগী গোপীনাথ নন্দীকে বন্দি ও পলায়নের সকল পথ বন্ধ করে পাহারাদার নিয়োগ করা হলে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বন্দিজীবন থেকে মুক্তির প্রয়াসে বসতভিটা ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কবির এ সিদ্ধান্ত তাঁর জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়ারই নামান্তর। পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত দেশান্তরী কবিকে এসময় দেবী চণ্ডী স্বপ্নে দেখা দিয়ে কাব্য লিখতে নির্দেশ দিলেন। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কবি *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে দেবতার মহিমাকৃতী লিখতে গিয়ে মর্ত্যধামের চিরপরিচিত লৌকিক জগৎ সংসারের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না বিজড়িত মানব-মানবীর জীবন চিত্রকে উপস্থাপন করেছেন। মানব রসের অপরিমেয় শৈল্পিক দিক উন্মোচন ও মানবতার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অগ্রগামী। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে কবিমানস-রূপান্তরের এক বৈপ্লবিক ইতিহাসের চিত্র প্রচ্ছন্ন আছে। এ কাব্যে কবি যে ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন তা তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন নয় বরং সবগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশের একজন প্রতিনিধি হিসেবে কবি মুকুন্দরাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বপ্রণোদিত হয়ে স্বশ্রেণির রীতি-নীতি অন্ত্যজ সমাজে আরোপ করেছেন। দ্বিজ মাধব যেখানে ব্যাধ সমাজের নীতি-আদর্শ অনুসরণ করে কালকেতুর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ধর্মকেতুকে সঞ্জয়কেতুর বাড়িতে পাঠিয়েছেন সেখানে মুকুন্দরাম কালকেতুর বিয়ে সংঘটনে ব্রাহ্মণ্য নীতির প্রয়োগ করে ঘটকের মাধ্যমে প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন। দ্বিজ মাধব

ধর্মকেতুর মৃত্যু স্বাভাবিক নিয়মে একজন ব্যাধের যেভাবে ঘটে সিংহের আক্রমণে সেভাবে দেখিয়েছেন—যদিও নিদয়া উচ্চবর্ণসুলভ হিন্দু আদর্শ অনুসরণে স্বামীর চিতায় অনুমৃতা হয়েছেন সেখানে মুকুন্দরাম ধর্মকেতুর প্রাকৃত মৃত্যুতে সন্তুষ্ট না হয়ে তাদেরকে বারাণসীতে পাঠিয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আরোপ করেছেন। কবি মুকুন্দরাম সম্পর্কে আহমদ শরীফের মন্তব্য 'আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সতেরো শতকেও উঁচুমানের ছিল না বলেই মুকুন্দরাম *চণ্ডীমঙ্গল* লিখে অর্থাৎ ফুল্লরার দারিদ্র্যদুঃখ বর্ণনা করে, কালকেতুর অবয়ব, শক্তি ও সাহস বর্ণনা করে, মুরারিশীলের কাপট্য ও অসততা এবং ভাঁড়ুদত্তের খলতা ও ধূর্ততা দেখিয়ে আর খুল্লনার সারল্য ও বিদ্বিষ্ট সপত্নীর পীড়নচিত্র দিয়ে পাঠককে মুগ্ধ করেছেন'। (আহমদ শরীফ ; ২০০৮ : পৃ : ৩৯৪)

সাধারণত শিবজায়া দেবীচণ্ডীর মাহাত্ম্যকীর্তন বর্ণনা করাই হচ্ছে *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। চৈতন্যপূর্ব যুগের প্রথম মঙ্গলকাব্য *মনসামঙ্গল* এবং চৈতন্য-উত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠকাব্য *চণ্ডীমঙ্গল*। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের আক্ষেটিক খণ্ডে কালকেতু ও ফুল্লরার জীবন চিত্র বিশদভাবে বর্ণিত আছে। নেশাখোর, দরিদ্র ও ভিখেরি শিবের ঘরে সতিনের যন্ত্রণায় উত্যক্ত চণ্ডী পদ্মার পরামর্শে মর্ত্যে নিজ পূজা প্রচারের জন্যে কূটকৌশলে শিবপুজোর পুষ্পচয়নকারী নিরপরাধ নীলাম্বরকে শাপভ্রষ্ট করালেন। শিব নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন মর্ত্যে গিয়ে ব্যাধের ঘরে কালকেতু নামে জন্ম গ্রহণ করো। সিদ্ধ হলো দেবী চণ্ডীর অভিপ্রায়। নীলাম্বর মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করলেন ধর্মকেতুর পুত্র কালকেতু রূপে। নীলাম্বর-পত্নী ছায়াও অনুগামিনী হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন অন্য এক ব্যাধ সঞ্জয়কেতুর কন্যারূপে। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে কালকেতু কর্তৃক পূজা পেয়ে চণ্ডী ব্যাধ বা অনার্য সমাজে দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন বটে তবে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না তখন সখী পদ্মা আবার পরামর্শ দিলেন দেশের উন্নত শহর উজানি নগরে ধনী বণিক পরম শিবভক্ত ধনপতিকে দিয়ে পূজা আদায় করতে পারলে নাম ও যশ উভয়ই বৃদ্ধি পাবে। পদ্মার পরামর্শ অনুযায়ী চণ্ডী তাঁর লক্ষ্যে এগুতে থাকেন এবং ধনপতিকে দিয়ে মর্ত্যে পূজা প্রচার করে উচ্চ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেন। এভাবে কাহিনি বর্ণনার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের কথকতা ও গার্হস্থ্যজীবন চিত্র।

অভিশাপগ্রস্ত হয়ে মর্ত্যে জন্ম গ্রহণের পর নীলাম্বর ও ছায়াদেবীর নতুন পরিচয় হলো কালকেতু ও ফুল্লরা নামে। কালকেতু শৈশব থেকেই অজেয় বীর, অমিত তার শক্তি, দুর্জয় সাহস তার। সে শশারু তাড়িয়ে ধরে, পশুগুলির দিকে সে বাটুল ছুড়ে মারে ; বাঘ, ভল্লুক নিয়ে খেলা করে। মাত্র এগারো বছর বয়সেই সে ফুল্লরার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ফুল্লরা সুন্দরী, গৃহ কর্মে নিপুণা ; বস্তুত ফুল্লরা কালকেতুর গৃহিণী হওয়ার সর্বাংশে উপযুক্ত। কালকেতু দরিদ্র কিন্তু সংসারে শান্তির কমতি নেই। পশু শিকার করে কালকেতু জীবিকা নির্বাহ করেন। অভাবের সংসারে ফুল্লরাও কিন্তু বসে থাকেন না। সে স্বামীর সহযোগী হয়ে মাংসের পসার নিয়ে গৃহে গৃহে এবং হাটে বিক্রি করে যা পায় তা দিয়ে সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে কোনো রকমে সংসার চালান। অভাব-অনটনের মধ্যেও শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামীকে নিয়ে ফুল্লরার একান্নবর্তী সুখের সংসার। তাইতো বিবাহোত্তর পুত্রবধূর গুণপনা, সম্বল অর্জনে কালকেতুর সামর্থ্য এবং তাদের সুখী দাম্পত্যজীবন নিরীক্ষণ করে গার্হস্থ্যজীবনের সকল দায়িত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে নিশ্চিন্তে ধর্মকেতু-নিদয়া পরকালের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছেন অনায়াসে। এই প্রারম্ভিক কাহিনি ও তার পরবর্তী কালকেতু-ফুল্লরা যৌথ জীবনকথা অবলম্বন করেই এগিয়েছে আক্ষেটিক খণ্ডের কথকতা।

মুকুন্দরামের কৃতিত্ব এই যে, তিনি পারিবারিক জীবনের নিস্তরঙ্গ সামান্যতম আয়োজনকে রসাবেদনে অসামান্য করে তুলেছেন। আক্ষেটিক খণ্ডের শুরুতেই ধর্মকেতু এবং নিদয়ার গার্হস্থ্যজীবন চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। হতদরিদ্র হলেও তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত মধুর, সংসারে কোনো অশান্তি ছিল না। জীবনবাদী কবি মুকুন্দরাম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং হৃদয় দিয়ে হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করে তাদের জীবন চিত্র বর্ণনা করেছেন। নিদয়ার পুত্র কালকেতু চণ্ডীর দাস হবে এটা তার মাতা নিদয়ারই প্রতিশ্রুতি। এমন প্রতিশ্রুতি প্রদান করেই নিদয়া চণ্ডীর আশীর্বাদে গর্ভবতী হয়েছেন—

তোমার পাইয়া বর হয় যদি বংশধর
তোমার করিআ দিব দাস॥
কহিগো সত্যবাণী ঔষধ আমি জানি
কুমার জনম কারণ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৩৯)

মধ্যযুগের কাব্যপাঠে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে বেশির ভাগ নারী মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছেন কোনো না কোনো দেব বা দেবীকে সন্তুষ্ট করে। এ ক্ষেত্রে নিদয়াকেও দেখি দেবী চণ্ডীর স্তুতি করে তাঁর আশীর্বাদে গর্ভবতী হয়েছেন এবং সন্তান প্রাপ্তির পর নিদয়া নিজের পুত্রকে চণ্ডীর দাস করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। সন্তান প্রাপ্তির বর পেয়ে নিদয়া অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং দেবীকে নিম্লোক্ত উপহার সামগ্রী প্রদান করলেন–

নিদয়া পাএ পড়ি তণ্ডুল ডালি বড়ি
দিলেন কড়ি চারিপণ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৩৯)

উল্লিখিত বিবরণে দেবতারাও যে উপঢৌকন গ্রহণ করেন তার ইঙ্গিত আছে। সেই সময় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কড়ির প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। যথানিয়মে দেবীর আশীর্বাদে ধর্মকেতুর পত্নী নিদয়া গর্ভবতী হলেন। নিদয়া যখন গর্ভবতী তখন কবি নিদয়ার সমস্ত ঘটনার সাক্ষী হয়ে একজন মায়ের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার বর্ণনা দেন। মধ্যযুগে রচিত সকল মঙ্গলকাব্যে অধিকাংশ কবি নারীর গর্ভবর্ণনা ও প্রসবকালীন অবস্থার সূক্ষ্ম বর্ণনা দিতে গিয়ে কিছু সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-প্রথা উল্লেখ করেছেন। কবি মুকুন্দরাম নিদয়ার গর্ভবর্ণনা করতে গিয়ে প্রথম মাস থেকে একেবারে নবম মাস পর্যন্ত নিদয়ার শারীরিক পরিবর্তন চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন–

প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।
দ্বিতীয় মাসের বেলা করে কানাকানি॥
তৃতীয় মাসের বেলা করে ভুতলে শয়ন।
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
....
ছয় মাসে কাঞ্জী করঞ্জায় জায় মন॥
... ...
নয় মাসে নিদয়ারে সাধ দেয় ব্যাধ'।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৩৯)

মঙ্গলকাব্যধারায় গর্ভবর্ণনা এক গতানুগতিকতায় পরিণত হয়েছে। *মনসামঙ্গল*, *চণ্ডীমঙ্গল* এবং *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে এ বিষয়টি অত্যন্ত দরদ দিয়ে কবিগণ বর্ণনা করেছেন। তবে, নিদয়ার গর্ভবর্ণনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে কবি মুকুন্দরামের বিচক্ষণতা এবং অনুভূতিপ্রবণতা পাঠককে শুধু আশ্চর্যান্বিতই করে না, করে অভিভূতও। এ বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত যে, নারী জীবনে পূর্ণতা আসে তার মাতৃত্বে। মধ্যযুগের কবিরা নারীর এই মাতৃত্বের রূপকে সন্তান সম্ভাবনার কাল থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বপর্যন্ত গভীর অনুধ্যানে অনুভব করেছেন। গর্ভধারণকারী একজন নারী শুধুই মা, সেখানে ধনী-দরিদ্রের কোনো পার্থক্য নেই। সে-জন্যই *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে ব্যাধ নারী নিদয়ার সাথে ধনপতি সদাগরের সোহাগিনী পত্নী ধনীর দুলালী খুল্লনার কোনো পার্থক্য নেই। নারীদের গর্ভকালীন অবস্থার যে বর্ণনা কবিরা অত্যন্ত মমতার সাথে পর্যবেক্ষণ করেছেন তার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, একজন মা দিনে দিনে, মুহূর্তে মুহূর্তে তার সন্তানের বেড়ে ওঠার যে অনুভূতি অনুভব করেন তা শুধু শারীরিক উপলব্ধিই নয় মানসিকও সেখানে শঙ্কা আছে, ভীতি আছে এবং আরও আছে কবে সুস্থ সন্তানটির মুখ দেখবে তার আনন্দ। এ আশা থেকেই প্রত্যেক মা গর্ভকালীন যন্ত্রণাদায়ক সময় অতিবাহিত করেন। এ অবস্থায় নারীর এই বাহ্যিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গী কিছু বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া। কবিরা সেই পরিবর্তনের ছবিটা স্পষ্ট করে তুলেছেন

মঙ্গলকাব্যের পাতায়। গর্ভধারণকালীন খাদ্যে অরুচি, শারীরিক অস্বস্তি ও দুর্বলতা, অখাদ্যে রুচির সঙ্গে পঞ্চমাসে পঞ্চামৃত, সাতমাসে সপ্তামৃতসেবন ও সাধভক্ষণের ইতিবৃত্তও বর্ণনা করতে কবিরা ভোলেননি। আক্ষেটিক খণ্ডে নিদয়ার গর্ভবর্ণনার বিবরণ প্রায় সকল কবি দিয়েছেন। দ্বিজ মাধবের কাব্যে নিদয়ার গর্ভবর্ণনার এক বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর কালকেতুরূপে নিদয়ার গর্ভে দিন দিন বাড়ছে। পরিবর্তিত হচ্ছে নিদয়ার শারীরিক অবয়ব। কবির দৃষ্টিতে গর্ভকালীন সময়ে নিদয়ার শারীরিক অবস্থা—

দিনে দিনে কুচের আগে পাণ্ডুর বর্ণ ধরে।
গমন মন্থর বল নাহিক শরীরে॥
আলস হইল দেহ শোয়ে ঘন ঘন।
অন্নের ঘ্রাণ মাত্র উড়য়ে জীবন॥
এক দুই তিন চারি পঞ্চমাস হইল।
চিন চিন করি ব্যথা উদরে জন্মিল॥
প্রসব বেদনায়ে রামার পোড়য়ে বদন।
উ-উ বাপ মাও বোলি ডাকে ঘন ঘন॥
যতেক ব্যাধের নারী আসিয়া ধরিল।
চণ্ডিকার প্রসাদে রামা পুত্র প্রসবিল॥
(দ্বিজমাধব ; ১৯৫২ : পৃ. ৩৫)

একজন গর্ভবতী মা সন্তান ধারণকালে কতটা কষ্টে দশমাস অতিবাহিত করেন তা কবিকঙ্কণ তাঁর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে নিদয়ার মনের কথা নামক অনুচ্ছেদে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে নিদয়ার শারীরিক, মানসিক পরিবর্তনসহ খাবারে রুচি-অরুচির তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। উঠতে বসতে নিদয়ার মাথা ঘোরে, কিছু কিছু খাবারে অরুচি এবং কিছু কিছু খাবার খেতে তার ইচ্ছা হয়। যেমন, পোড়া মাছ তার সাথে জামিরের রস, করঞ্জা, খই, মহিষের দই, পুই ডগা, পাকা তাল এ সব আবদার নিদয়া নিবেদন করে তার প্রাণপ্রিয় স্বামী ধর্মকেতুর কাছে। এ ছাড়াও নিদয়ার খেতে ইচ্ছে করে চাকা চাকা (চাকা করে কাটা) মূলা, বেগুন, আমড়া, চালতা, আমসি, কাসুন্দি, কুল, করঞ্জা, থোর, ইলিশ মাছ, ক্ষীর, নারকেল দিয়ে তেলে ভাজা পিঠা, দুধ গুড় তিল মিশায়ে লাউ, দুধ দিয়ে খুদের জাউ, চিড়া, চাঁপাকলা এবং দুধের সর। আর্থিক দুরবস্থার কারণে ধর্মকেতু তার স্ত্রীর চাহিদা মতো সমস্ত খাবারের আয়োজন হয়ত করতে পারেননি, তবে তিনি তার সাধ্যমত নিদয়ার পছন্দের কিছু খাবারের আয়োজন করেন নিদয়ার সাধ অনুষ্ঠানে। গর্ভকালীন আপনজন কাছে না থাকলে গর্ভবতীরা যে কতটা অসহায় বোধ করে তা নিদয়া মর্মে মর্মে অনুভব করেন। নিদয়া তার বেদনার্ত হৃদয়ের আর্তি স্বামীর কাছে ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

নিকটে নাহিক মাতা কারে কব দুঃখ কথা
পিসি মাসি বহিনী-মাতুলী
জ্ঞাতিবন্ধু নাহি আর যে সহে ঘরের ভার
বিধি মোরে করিল প্রতিকুলী॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪০)

উল্লিখিত ছত্রে স্পষ্ট যে, নিদয়া শুধু তার স্বামীকে নিয়ে একক পরিবারে বসবাস করতেন। কাব্যে শ্বশুর-শাশুড়ি ও দেবর-ননদের কোনো উল্লেখ নেই। তার ভরসার একমাত্র ব্যক্তি তার স্বামী। গর্ভকালীন গর্ভবতী নারীর পাশে আত্মীয়-পরিজন থাকা প্রয়োজন। একান্নবর্তী পরিবার এজন্য খুব জরুরি। নিদয়ার উক্তির মধ্য এমন আভাস পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে নারীর গর্ভকালীন এবং প্রসবকালীন অবস্থার মাঝে সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানের বর্ণনা প্রায় সকল কবি উপস্থাপন করেছেন। সাধারণত পাঁচমাসে পঞ্চামৃত, সাতমাসে সপ্তামৃত এবং নয়মাসে সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানের বর্ণনা প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যে প্রচলিত রীতিতে পরিণত হয়েছে। এ অনুষ্ঠানটির পরিসর ও আড়ম্বর সাধারণত গৃহকর্তার আর্থিক সংগতির ওপর নির্ভর করে। সাধ্যের মধ্যেই মানুষকে সাধ পূরণ

করতে হয়। *চণ্ডীমঙ্গলের* আক্ষেটিক খণ্ডে ধর্মকেতু পত্নী নিদয়ার সাধভক্ষণের বর্ণনা দ্বিজ মাধব দেননি। সম্ভবত গরীবের সংসারে সাধ আহ্লাদ বলে কিছু থাকতে নেই এ দৃষ্টিকোণ থেকে কবি বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছেন। কিন্তু জীবনবাদী কবি মুকুন্দরাম জীবনকে উপভোগ করেছেন অন্যভাবে, তাইতো তিনি নিদয়ার সাধভক্ষণের এক নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। দরিদ্র হলেও জীবনতৃষ্ণা যে মিথ্যা নয় বরং পরম সত্য, জীবনবাদী কবি সেটা ভোলেননি। ব্যাধ নারীর সাধভক্ষণেও কবি তাঁর স্বশ্রেণির রীতি প্রয়োগ করেছেন। শত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও নিদয়া তার সাধের কথা প্রাণপ্রিয় স্বামী ধর্মকেতুর কাছে ব্যক্ত করেছেন। শিশুর জন্মপূর্ব যতগুলি অনুষ্ঠান পালিত হওয়ার রীতি ভারতীয় শাস্ত্রে বিদ্যমান তার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই প্রসূতি মা ও তার গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গলের জন্য পালিত হয়। ধর্মকেতুও তার সাধ্য অনুযায়ী প্রিয়তমার সাধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে—

গর্ভের দেখিয়া ভর মনে বড় লাগে ডর
ক্ষুধা ত্রিশা নাহি দিনা দশ
আপনার মত পাই তবে গ্রাস কত খাই
পোড়া মীনে জামিরের রস।
... ...
যদি পাই পিঠা ঘোল পাকা চালিতার ঝোল
প্রাণ পাই পাইলে আঁমসি॥
... ...
নিদয়ার সাধ হেতু ঘরে জায় ধর্মকেতু
চাহিয়া আনিল আয়োজন
আপনি রাঁধিয়া ব্যাধ নিদয়ারে দিল সাধ
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৩৯-৪০)

লক্ষণীয় খাবারের এ তালিকায় কোনো আড়ম্বর নেই, নেই তেলের পর্যাপ্ত ব্যবহার। তেলের ভাণ্ডার নেই বলেই সম্ভবত মাছ, গোধিকা এবং সজারু পোড়া আর কিছু সাধারণ গরীব বাঙালির নিত্যদিনের সামান্য খাবার দিয়েই নিদয়া তার সাধ পূরণ করতে চেয়েছেন। উল্লেখ্য, মঙ্গলকাব্যে নারীদের সাধভক্ষণে সজারুর শিক পোড়া কেউই খেতে চায়নি। এ বাসনা একান্তই এক ব্যাধনারী নিদয়ার। একজন জীবনবাদী প্রথম শ্রেণির মানবপ্রেমী কবি হিসেবে মুকুন্দরাম নিদয়ার এ বাস্তবিক বাসনাকে উপেক্ষা করতে পারেননি, এখানে ব্যাধ জীবনের চিত্র বর্ণনায় কবির বাস্তব প্রীতির পরিচয় মেলে।

দ্বিজ রামদেব অবশ্য খুব সংক্ষেপে নিদয়ার সাধভক্ষণ প্রসঙ্গ এনেছেন। ধর্মকেতু নিজেই তার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করেছেন তার খাদ্যবাসনার কথা–

সেইকালে ধর্মকেতু জিজ্ঞাসে কথন।
কিবা বস্তু খাইতে প্রিয়া ল এ তোর মন॥
পতি মুখে শুনি রামা মধুর বচন।
মৃগমাংস প্রতি মজ্জিছে মোর মন॥
তেতলি সহিতে যদি তাহা খাইতে পারি।
এহি অভিলাষ প্রভু কইলাম তোমার ঠাই॥
(দ্বিজ রামদেব : ১৯৫৭ ; পৃ : ৪৭)

এই অংশেও কবিকঙ্কণ বর্ণিত নিদয়ার সজারুর শিক পোড়া সুলভ মৃগমাংস খাবার বাসনা বেশ বাস্তবসম্মত যার মধ্য দিয়ে ব্যাধ সমাজের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

কালকেতুর জন্ম উপলক্ষ্যে নিদয়ার জীবনে অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হলো। দশ মাস দশদিনে পূর্ণ হলো নিদয়ার গর্ভ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সমস্ত লক্ষণ দেখা দিল। ভয় এবং শঙ্কায় নিদয়া কষ্টকর সময়

অতিবাহিত করতে থাকেন। তার শরীর বাড়তে থাকে। বসলে উঠতে পারেন না, সারাক্ষণ ভূমিতে লোটায়, সখীগণ এসে তেলজল মালিশ করতে থাকে—

হইল উদর ভারি বসিলে উঠিতে নারি
শুইলে ফিরাইতে নারি পাশ।
চাহিতে না পারি হেঁট সূঁচে যেন বিন্ধে পেট
দূর হইল জীবনের আশ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪০)

প্রসববেদনায় নিদয়া ছটফট করছেন। তার জীবন যায় যায় অবস্থা, এমতাবস্থায় একজন মা-ই বুঝতে পারেন সন্তান ধারণের আনন্দ এবং বেদনা মিশ্রিত অনুভূতির কথা। নিদয়া যখন প্রসববেদনায় কাতর এ অবস্থায় ধাত্রী ও বৈদ্য-পথ্য আনার জন্য নিদয়া ধর্মকেতুকে অনুরোধ করেন—

আমার বচন শুন পার্খিরে ডাকিআ আন
জেবা জানে প্রসব সন্ধান।
খুঁজিআ নগরে জ্ঞানী করহ ঔষধপানি
নিদয়ার রাখহ পরান॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪০)

একজন আদর্শ স্বামী হিসেবে ধর্মকেতু নিদয়ার কষ্টে সমব্যথী হয়ে কলিঙ্গ রাজ্যে গেলেন ডাক্তার-বৈদ্য আনার জন্য। পথে চণ্ডী মায়াবিনী হয়ে অপেক্ষা করলে, ধর্মকেতু চণ্ডীর চরণে লুটিয়ে পড়েন এবং নিদয়ার প্রাণরক্ষার বিনীত অনুরোধ জানান। চণ্ডী নিদয়ার শারীরিক অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে ধর্মকেতুর পর্ণকুটিরে পদার্পণ করেন। ধর্মকেতু দেবীকে অনুরোধ করেন—

কৃপা কর ঠাকুরাণি জে জান ঔষধ পানি
নিদয়ার রাখহ জীবনে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪০)

প্রসববেদনা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চণ্ডী নিদয়াকে মন্ত্রপূত জল পান করান। এই মন্ত্রপূত জল পান করার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হলো নিদয়ার সন্তান—

কেবল পুণ্যের ফল নিদয়া খাইল জল
কুমার পড়িল ভূমিতলে॥
উঙা উঙা ডাকে সুত দুহেঁ হইলা প্রমোহিত
জায়াপতি সফলমানস॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪০)

পৃথিবীতে যে-কোনো নবজাতকের আগমন অত্যন্ত সুখকর এবং আনন্দের। নিদয়া এবং ধর্মকেতু নবজাত পুত্র সন্তানের জনক-জননী হলেন, সংগত কারণেই সংসারে আনন্দের সীমা নেই। সন্তানের মঙ্গল কামনায় ধর্মকেতু স্নান করে পূতপবিত্র হয়ে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেন। অতঃপর শিশু জন্মের পর একে একে নানা আচারধর্মের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন মুকুন্দরাম। এতে মধ্যযুগের বাঙালি হিন্দু পরিবারের গার্হস্থ্যজীবনের বিচিত্র রূপ অঙ্কিত হয়েছে। সেইসাথে মুকুন্দরাম সন্তান জন্ম-পরবর্তী যে সকল অনুষ্ঠান পালনের বিবরণ দিয়েছেন সেখানে তিনি ব্যাধ পরিবারে ভদ্রঘরের শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বরপূর্ণ ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজের নিখুঁত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নবজাতকের নামকরণ এবং কর্ণবেধ করানো বাঙালি সমাজে এক চিরন্তন রীতি। গণক ডেকে নবজাতকের নামকরণ এবং জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করা হয়। এছাড়াও নাড়িচ্ছেদ, গোমুণ্ড স্থাপন এবং সন্তানের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠী পূজার আয়োজনও করা হয়। পুত্রের মঙ্গলহেতু ধর্মকেতু পূজান্তে সন্তানের জন্য পরমেশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন—

পুত্র হইল ধর্মকেতু হরষিত মনে।
… … …
সঘনে হুলুই পড়ে নাভির ছেদনে।
গোমণ্ডে স্থাপিলা ষষ্ঠি দ্বার ডানিভাগে
পূজা করি ধর্মকেতু তাঁরে বর মাগে।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪১)

ধর্মকেতু-দম্পতি পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম একত্রিশ দিন কোনো না কোনো অনুষ্ঠান পালন করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম ষ্যাঠারা, নবনত্তা, ষষ্ঠীপূজা, অন্নপ্রাশন ও নামকরণ। সাধারণত নবজাতকের জন্মের ষষ্ঠদিনের রাত্রে তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় পালিত এক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের নাম ষ্যাঠারা। তৎকালে মায়েদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল এই রাত্রে বিধাতা সন্তানের ভাগ্যলিপি লিখতে আসেন। বিধাতা যেন নবজাতকের ভাগ্যে খারাপ কিছু না লিখেন সেজন্য সন্তানের মা এবং ধাত্রী সারা রাত জেগে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পালন করতেন বিধাতাকে খুশি করার জন্য। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার নবম দিনে প্রসূতি নখ কেটে স্নান করে শুদ্ধবস্ত্রে আলতা সিঁদুর পরে পূতপবিত্র হয়ে সন্তানের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেন যা নবনত্তা নামে পরিচিত—

নয় দিনে নর্তা কৈলা সূত-শুভহেতু।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪১)

দেবী ষষ্ঠী প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ রূপা কার্তিকেয় ভার্যা। ইনি শিশুদের প্রতিপালনকারিণী মাতৃকা বিশেষ। শিশুর মঙ্গল কামনার্থে জন্মের ষষ্ঠ ও একত্রিশতম দিবসে এ দেবীর অর্চনার বিধান আছে। কালকেতুর জন্মের একত্রিশতম দিনে নিদয়া ষষ্ঠী দেবীর পূজা করেন—

ষষ্টিপূজা একতির্সা কৈল একমাসে ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪১)

কিরাতনন্দন দিনে দিনে বাড়তে থাকে। 'ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে' এবং ক্ষণে খেলে ব্যাধ পুত্র। এভাবে দুই তিন চার পাঁচ মাস গত হয়ে ছয় মাসে পদার্পণ করলেই ব্যাধ দম্পতি পুত্রের অন্নপ্রাশনের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হলেন। পুত্রের বয়স ছয় মাস পূর্ণ হলে ধর্মকেতু খুব আড়ম্বরের সাথে না হলেও ছাগ-মেষ বলি দিয়ে পুত্রের অন্নপ্রাশন করান। পুত্রের নামকরণের জন্য এ অনুষ্ঠানে ধর্মকেতু গণক নিয়ে আসেন। গণক পাঁজিপুথি দেখে, তিথি নক্ষত্র বিচার করে পুত্রের নামকরণ করেন কালকেতু। একজন সদ্‌বংশজাত ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি হিসেবে মুকুন্দরাম ব্যাধ নন্দনের নামকরণ, কর্ণবেধ ও অন্নপ্রাশনে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রয়োগ করছেন। ধর্মকেতু খুশি হয়ে পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনায় গণককে দক্ষিণা প্রদান করে। এ প্রথাটিও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত—

চারি পাঁচ মাস গেল ছয় পরবেশ
অন্নপ্রাশন কৈল দিআ ছাগ মেষ।
গণক আইয়া নাম থুইল কালকেতু
গণকে দক্ষিণা দিল পরমাই হেতু॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪১)

কালকেতুর বয়স সাত আট মাস পার হয়ে নয় মাস হলো। এই নয় মাস বয়সে কালকেতুর নতুন দাঁত ওঠে, দশ মাসে সে হামাগুড়ি দিতে থাকে। এগারো মাস অতিক্রান্ত হয়ে যখন এক বছরে পড়ল তখন কালকেতুকে বাড়ি রাখা যায় না। সে হামাগুড়ি দিতে দিতে অন্যের বাড়ি খেলতে যায়। দুই তিন বছর পূর্ণ হলে শিশুদের সাথে সে ভল্লুক সরভ ধরে খেলে। পঞ্চম বছরে পালিত হয় কালকেতুর কর্ণবেধ অনুষ্ঠান। অভিশাপগ্রস্ত হয়ে মর্ত্যলোকে ব্যাধের ঘরে জন্ম নিলেও কালকেতু দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্রের মর্ত্যরূপ। তাই তার তেজ, দীপ্তি, সাহস, শক্তি চণ্ডীর কৃপায় অতুলনীয়। তার দেহ যেন মত্ত হাতির মতো, দুই বাহু যেন লোহার শাবল। সন্তানের ওপর যেন কোনো অপশক্তি বা পাড়া-পড়শির নজর না লাগে এজন্য কালকেতুর

মা কুসংস্কারবশত কালকেতুর গলায় জালের কাঠি এবং হাতে লোহার সিকলি বেঁধে দেন যা শিক্ষা-সংস্কারহীন অন্ত্যজ শ্রেণির চিত্র বহন করে -

শীল রূপ গুণ বাড়া   বাড়ে যেন হাথি-কড়া
জিনি শ্যাম চামর কুন্তল।
বিচিত্র কপাল তটি   গলাএ জালের কাঁঠি
করে জুত লোহার সিকলি॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪১)

যেহেতু কালকেতু ব্যাধনন্দন, পশু শিকার তাদের জাত পেশা সে কারণেই ধর্মকেতু পুত্রকে এ পেশায় দীক্ষিত করতে শুভ দিন, ক্ষণ, তিথি, নক্ষত্র দেখে গণক ডেকে পুত্রের হাতে ধনুর্বাণ তুলে দিলেন—

গণক আসিঞা ঘরে   শুভদিন শুভবারে
ধনুদিল ব্যাধসুত-করে॥
ফোঁটা দিয়া বিন্ধে বেঁজা   ছুড়িতে শিখএ নেজা।
চামের চৌতুলা শোভে শিরে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪১)

গণক ডাকা এবং তিথি-নক্ষত্র বিচার ও শুভ দিন-ক্ষণ দেখার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রয়োগ করা হয়েছে। দীক্ষিত ধনুর্ধারীর মতো ধনুর্বাণ হাতে পেয়েই কালকেতুর ইচ্ছা হলো বাবার সাথে বনে গিয়ে পশু শিকার করার। পশু শিকারে কালকেতু এতটাই দক্ষ যে, সে তাড়িয়ে হরিণ শিকার করে। সমালোচক ক্ষেত্রগুপ্ত কালকেতুর পশু শিকারের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-'কালকেতু বীর এবং শিক্ষাসংস্কারহীন বর্বর। এই বর্বরতা তার বীরত্বেরও বিশেষণ। কালকেতুর যুদ্ধজয় প্রায়ই অস্ত্রপ্রয়োগের নৈপুণ্যের অপেক্ষা রাখে না। মুষ্ট্যাঘাতে সিংহব্যাঘ্রকে পরাজিত ও নিহত করাতেই তার কৃতিত্ব'। (ক্ষেত্রগুপ্ত ; ১৪১৩ : পৃ. ৭২-৭৩)। কালকেতু বড় হয়েছেন, ধর্মকেতু চিন্তিত। কবে পুত্রকে একজন সুপাত্রীর হাতে তুলে দিতে পারবেন। একদিন ধর্মকেতু কালকেতুকে নিয়ে নিদয়ার সঙ্গে হাটে যান। এখানেই নিদয়ার সই হীরাবতীর কাছে উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান পান ধর্মকেতু।

কালকেতু ও ফুল্লরার বিয়ে উপলক্ষ্যে মধ্যযুগের বাংলার গার্হস্থ্যজীবনের চমৎকার চিত্র অঙ্কন করেছেন মুকুন্দরাম। ছেলে-মেয়ে বড় হলে তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য মাতা-পিতা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কালকেতুর বয়স যখন এগারো বছর তখনই ধর্মকেতু কালকেতুর বিয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিয়েতে উভয় পরিবারের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন হয় যাকে ঘটক বলে অভিহিত করা হয়। ঘটকের প্রধান কাজই হচ্ছে উভয় পরিবারের সদস্যদের দোষগুলো আড়াল করে গুণকে অধিক গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা। কালকেতু ও ফুল্লরার বিয়ের ঘটক সোমাই পণ্ডিত উভয় পরিবারের পুরোহিত, নমস্য এবং সম্মানী ব্যক্তি। ধর্মকেতু পুত্রের বিয়ের পূর্বের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রায় পুরোটাই বৈদিক নির্দেশানুসারে সম্পন্ন করেছেন এমনকি বিবাহোৎসবের মধ্যেও উচ্চবর্ণসুলভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। একদিন ধর্মকেতু সোমাই পণ্ডিতকে অনুরোধ করেন—

সোমাঞি পণ্ডিত সনে বসি এক স্থলে
চরণে ধরিআ ধর্মকেতু কিছু বলে।
সপ্ত পুরুষে ওঝা তুমি পুরোহিত
দেবের সমান বুঝি তোমার ইঙ্গিত।
সুতের বিভার হেতু করি অভিলাষ
কিরাতনগরে কর কন্যার তপাষ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪২)

বিয়ে সংঘটনে বর্ণ, গোত্র ও সমাজ-সংস্কৃতি দেখার প্রচলন ছিল। মধ্যযুগে এ নিয়ম খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতো। কিরাতনগরে অনার্য ব্যাধ সম্প্রদায়ের বসবাস বেশি ছিল। কালকেতুর বিয়ের পাত্রী

কিরাতনগরে সন্ধান করার মধ্যে ধর্মকেতুর মাথায় এ বিষয়টি ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়। সেকারণে ধর্মকেতু সোমাই পণ্ডিতকে কিরাতনগরে কন্যার খোঁজ করতে অনুরোধ করেন। সোমাই পণ্ডিতের তখনই মনে পড়ে কিরাতনগরে সঞ্জয়কেতুর কন্যা ফুল্লরার কথা। সঞ্জয়কেতুও কন্যার বিয়ে নিয়ে বড্ড চিন্তিত। এমতাবস্থায় সোমাই পণ্ডিতকে দেখে সঞ্জয়কেতু খুশি হয়ে নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করেন—

সঞ্জমকেতুর ঘরে উত্তরিল দ্বিজ।
বরিল সঞ্জম তার পদ সরসিজ॥
কহেন সঞ্জমকেতু দিব এক কাজ।
ফুল্লরার বর খোঁজ উজ্জোগ তোমার॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪২)

এ সুযোগে সোমাই পণ্ডিত অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সুকৌশলে পাত্রপক্ষের পিতৃকুলের পরিচয় এবং যোগ্যতা সম্পর্কে সঞ্জয়কেতুকে অবহিত করেন—

চন্দ্রকেতু পিতামহ পিতা ধর্মকেতু
তাঁর পুত্র কালকেতু গুণযশ-হেতু।
… … …
অর্জুন সমান যার ধনুকের খ্যাতি।
… … …
খুজিয়া পাইল জেন হাঁড়ির মুঞ্চের সরা॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪২)

পৃথিবীতে প্রত্যেক মাতা-পিতা চান তার কন্যাকে সৎ এবং যোগ্য পাত্রের হাতে তুলে দিতে। সৎ পাত্রে পাত্রস্থ করতে পারলে কিছুটা হলেও মাতা-পিতা শান্তি পান। সঞ্জয়কেতু তার পারিবারিক এবং সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে কালকেতুকে অনেক যোগ্য পাত্র মনে করে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে মনস্থির করলেন। শাস্ত্রানুযায়ী বিয়ের পূর্বে পাঁজিপুথি দেখে শুভ দিন, ক্ষণ ও তিথি নির্ধারণ করা হয়। বিয়ে সংঘটনে ঘটক নিয়োগ ও শুভ দিনক্ষণ নির্ধারণে মুকুন্দরাম স্বশ্রেণির রীতি ব্যাধ-জীবনে প্রয়োগ করে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের আদর্শ ব্যাধ সমাজে প্রয়োগ করেছেন। ফলে রবিবার ত্রয়োদশী তিথির এক শুভক্ষণে ফুল্লরার বিয়ের দিন ধার্য করা হয়—

কন্যাদরশনি দিআ করিল লগন।
ত্রিয়োদশি রবিবার তারকা রেবতী
বিভায় সঞ্জয়কেতু দিল অনুমতি॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪২)

ঘটক ডেকে বিয়ের দিন-ক্ষণ স্থির করা ও পাঁজিপুথি বিচার করে শুভতিথি নির্ধারণের মধ্যেও ব্রাহ্মণ্যশাসিত রীতি-নীতি বিরাজমান। ভারতীয় সমাজে বিয়েতে পণ প্রদান করার নিয়ম সেই ঋগ্‌বেদের কাল থেকে প্রচলিত। একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও জনগণ এ বিভীষিকা থেকে মুক্তি পায়নি। তবে অবস্থা অনুযায়ী পণের ধরন ভিন্ন হয় মাত্র। ব্যাধ সম্প্রদায় তৎকালে অত্যন্ত দরিদ্রশ্রেণির পর্যায়ভুক্ত। সম্ভবত এ কারণেই ঐ সমাজে যৎসামান্য পণ জামাইকে দেওয়ার প্রচলন ছিল। কালকেতু-ফুল্লরার বিয়ে স্থির হলে ফুল্লরার পিতা সঞ্জয়কেতু ও মাতা হীরাবতী দু'জনে পরামর্শ করে ঘটকের কাছে নিম্নলিখিত পণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন—

একে চাহে আরে পায় বলে হিরাবতী।
সঞ্জমকেতুর সনে নিবড়িল যুক্তি।
পণের নিয়ম কৈল দ্বাদশ কাহন
ঘটকালী পাবে ওঝা দ্বাদশ পণ।
পাঁচগা গুবাক দিব গুড় তিন সের॥

(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪২)

উল্লিখিত বিবরণে সামান্য হলেও নারীকে মূল্যায়ন করার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কন্যা বিয়ের প্রাক্কালে সঞ্জয়কেতু-হীরাবতী বরপক্ষকে পণ প্রদানের বিষয়ে পরামর্শ করেন। এটি উন্নত মানসিকতার পরিচায়ক। নারী-পুরুষের যৌথ সিদ্ধান্তে একটি সংসার সুখের হয় তাদের আচরণ থেকে এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায়।

গার্হস্থ্যজীবনের মূল শর্তই হলো বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যুগল সৃষ্টি করা। মধ্যযুগে বিয়ের বয়সদৃষ্টে অনুমান করা যায় বাল্যবিবাহ সেই সময়ে সমাজে প্রচলিত ছিল। কালকেতুর বিয়ে হয় মাত্র এগারো বছর বয়সে। অধিবাস, গন্ধঅধিবাস স্ত্রী-আচার, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, বরযাত্রীর শোভাযাত্রা সবই বিয়ের অঙ্গ। মঙ্গলকাব্যধারায় বিয়ের ঘনঘটা ছিল আরও বেশি বিস্তৃত এবং উজ্জ্বল। *মনসা, চণ্ডী, শিবায়ন* প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে বিয়ের সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে। সুযোগ পেলেই কবিগণ প্রাণ উজাড় করে বিয়ের সামাজিক ও শাস্ত্রিক প্রসঙ্গ টেনে এর নিয়মকানুনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। *চণ্ডীমঙ্গলে* আক্ষেটিক খণ্ডে অনভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি কালকেতু-ফুল্লরার অনাড়ম্বর বিয়েতে জৌলুসের কিছুটা ঘাটতি থাকলেও শাস্ত্রাচার ও স্ত্রীআচারের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। কালকেতু ও ফুল্লরার বিয়েতে বৈদিকরীতি অনুযায়ী সমস্ত নিয়ম-কানুন ও আচার-পার্বণ মেনে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। এতে মুকুন্দরামের স্বশ্রেণির জীবনধারার অভিজ্ঞতার প্রভাব পড়েছে।

অধিবাস হচ্ছে বিয়ে বা গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি শুভ কাজের পূর্বে পালিত হিন্দু সংস্কার বিশেষ। কালকেতু-ফুল্লরার বিয়েতে ঘটক সোমাই পণ্ডিত বন্ধুসহ অধিবাসের ডালা নিয়ে কিরাতনগরে সঞ্জয়কেতুর বাড়িতে উপস্থিত হন। ঘটক কর্তৃক তত্ত্ব পাঠানোর মধ্যেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিহিত—

লৈয়া অধিবাস-ডালা কিরাতনগরে গেলা
বন্ধু মেলে সোমাঞি ব্রাহ্মণে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪৩)

গন্ধ-অধিবাস অনুষ্ঠানটি শুভক্ষণে ছাঁদনাতলায় পঞ্চ উপাচার দ্বারা পালিত হয়—

শুভক্ষণে বান্ধেন ছান্দনা॥
... ...
পুজি পঞ্চ উপচারে পূজে অন্য দেবতারে
শুভক্ষণে গন্ধাধিবাসন॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪৩)

ষোড়শ মাতৃকা অর্থ ষোল জন দেবী। হিন্দু শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধে ষোল প্রকার বস্তু দান করা হয়। নান্দীমুখ একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। হিন্দু শাস্ত্রে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, বিয়ে, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি শুভ কর্মাদির পূর্বে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কালকেতুর বিয়েতে নান্দীমুখ করা হয়। নান্দীমুখ করতে উপকরণ হিসেবে লাগে ধান, শিলা, দূর্বা. পুষ্পমালা, দধি, দুগ্ধ, সিঁদুর, শঙ্খ, কাজল, তাম্র, গোরচনা, চামর, দর্পণ ও লালসূতা।

বৈদিক শাস্ত্রমতে যত প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আছে পুত্রের বিয়েতে ধর্মকেতু-দম্পতি এবং কন্যার বিয়েতে সঞ্জয়কেতু দম্পতি একে একে সব অনুষ্ঠান সমাপন করেন। সমস্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে ধর্মকেতু নিজের সাধ্য অনুযায়ী পুত্রকে বর সাজে সজ্জিত করেন—

মুকুটমণ্ডিত শির কালকেতু মহাবীর
বন্দে কালু দ্বিজের চরণ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪৩)

শুভক্ষণে কালকেতু মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে বাউরি দোলায় চড়ে কিরাতনগরে সঞ্জয়কেতুর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। বরের আগমনে কিরাতনগরীর নারীরা উলুধ্বনি দিয়ে বরকে স্বাগত জানান। যেহেতু

কালকেতুর বিয়ে ছিল একেবারেই অনাড়ম্বর তাই কোনো আতশ বাতি বা সজ্জিত আলোর ঝলকানি না থাকলেও পর্যাপ্ত প্রদীপের আলো ছিল। বিয়ের অনুষ্ঠানে বরকে বরণের সময় সবার মধ্যে হুলুস্থুল রব ওঠে। এয়োরা উলুধ্বনি ও শঙ্খ বাজিয়ে বরকে স্বাগত জানায়। এরপর স্বস্তিবাক্য পাঠের মাধ্যমে কন্যাপক্ষ বরকে বরণ করে—

চৌদিকে দেউটি জলে বসিল কুঞ্জর-ছালে
বন্ধুজন মেলি কুতূহলে॥
স্বস্তিবাক্য দ্বিজ করে বরণ করিল বরে
বীড়ধড়ি ফটিক-কুণ্ডলে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪৩)

সেই সময়ে কালকেতুকে বাঘের চামড়ার ওপর বসতে দেয়া অনার্য ব্যাধ সংস্কৃতিকে বুঝালেও বর্তমানে কিন্তু এটা আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবেই স্বীকৃত। হিন্দু বিবাহরীতিতে যত প্রকার মাঙ্গলিক পর্ব আছে তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক পর্ব হচ্ছে মালাবদল এবং সাতপাক। ফুল্লরা পান দিয়ে মুখ ঢেকে ছাঁদনাতলায় এসে খুব ধীর গতিতে বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন, প্রতিবার স্বামীর পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম জানায় তারপর মুখের পান আস্তে আস্তে নামিয়ে দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হয়। দৃষ্টি বিনিময়ের পর হয় মালাবদল। বিয়েতে সাতপাক পর্বটি শুধু সাতটি পাক নয় এটি সুখে-দুঃখে উভয়ে উভয়ের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি। এ সময় উপস্থিত অতিথি ও সধবা নারীগণ ফুল ছিটিয়ে এবং উলুধ্বনি দিয়ে বর-কনেকে সাদর সম্ভাষণ জানান। এ বর্ণনা উচ্চ ব্রাহ্মণ্যসমাজে পালিত আচার-পার্বণের অনুরূপ—

শিরে দিয়া দূর্বা ধান নিছিআ পেলিল পান
গলে তুলি দিল ফুলমালা॥
... ...
চৌদিকে ব্যাধের নারী উচ্চস্বরে বলে হরি
ছামনী হইল কন্যাবরে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪৩)

কন্যা দানের মধ্য দিয়ে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। সঞ্জয়কেতু হাসি মুখে আনন্দের সাথে কন্যাকে দান করে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করেন। কন্যাদানের পর যৌতুক হিসেবে সঞ্জয়কেতু জামাইকে একখানা ধনুক এবং তিনখানা খরশান বাণ প্রদান করেন। ব্যাধ সঞ্জয়কেতু কর্তৃক জামাইকে ধনুক ও খরশান বাণ প্রদানের মধ্য দিয়ে কবি ব্যাধ সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন।

বিয়ে সমাপনান্তে বর-কনেকে ঘরে এনে মাছ-মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এরপর নব দম্পতি ফুল-শয্যায় রাত অতিবাহিত করে—

দুহে প্রবেশিয়া ঘরে মীনমাংস ভোগ করে
রাত্রি গেল কুসুমশয্যায়॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪৪)

বিয়ের পরের দিন ধর্মকেতু পুত্রবধূকে নিয়ে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য বেয়াই সঞ্জয়কেতুর নিকট বিদায় নিলেন। বিবাহানুষ্ঠানে সবচেয়ে করুণ ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য হচ্ছে কন্যা বিদায়। ফুল্লরার বিদায়ের প্রাক্কালে হীরাবতী কন্যাকে কোলে নিয়ে কাঁদতে থাকেন এবং ব্যাধ সমাজের রীতি অনুযায়ী কন্যার সাথে পাথরে ভরে আমানি দেন—

পাথরে আমানি ভরি দিল সঞ্জমের নারী
ফুল্লরারে কোলে করি কান্দে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪৪)

আচার-পার্বণ সমাপ্ত হলে কালকেতু শ্বশুর-শাশুড়ির নিকট হতে বিদায় ও আশীর্বাদ নিয়ে সস্ত্রীক নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন। কালকেতুর মা নিদয়া ধান-দূর্বা এবং পান দিয়ে পুত্রবধূকে বরণ করেন। পদার্পণ করলেন ফুল্লরা নতুন জীবনে। লক্ষ্মীমন্ত পুত্রবধূ পেয়ে নিদয়া খুব খুশি। নিদয়া আরও খুশি হলেন এ জন্য যে, ফুল্লরা কাজ-কর্মে অত্যন্ত নিপুণা। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজ হাতে সামলে শাশুড়িকে মুক্ত রেখেছেন। অল্প দিনের মধ্যেই হাটে বিকিকিনি দায়িত্বটাও বুঝে নিয়েছেন—

শাষুড়ি জেমন ভনে তেনমত বেচে কিনে
শিরে কাঁধে মাংসের পসরা॥
মাংস বেচি আনয়ে কড়ি চালু লয়ে ডালি বড়ি
তৈল লোন আনয়ে বেসাতি।
... ...
ফুল্লরা আইল ঘরে নিদয়া জিজ্ঞাসা করে
কহে বামা হাটের বিবরণ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪৪)

ফুল্লরার হাটে গিয়ে মাংস কেনা-বেচার মধ্য দিয়ে ব্যাধ-সমাজের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এ দায়িত্ব ফুল্লরা উত্তরাধিকার সূত্রে তার মা ও শাশুড়ির নিকট হতে পেয়েছেন। ফুল্লরা হাটে শুধু মাংস বিক্রি করেন তা নয় বরং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে বাজার সওদাও করে আনেন। ফুল্লরা তার সামর্থ্য অনুযায়ী অভাবী মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য শাক, বেগুন, কচু, মূলা, থোর এবং কাঁচকলা ক্রয় করেন। সেগুলো নিজ হাতে রান্না করে শ্বশুর, শাশুড়ি এবং স্বামী কালকেতুকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ান। শুধু বাইরের কাজে নয় একজন আদর্শ গৃহিণীর ন্যায় গৃহকর্মের সকল দায়িত্ব ফুল্লরা নিজ হাতে পালন করেন। ফুল্লরার এসব গুণপনা দেখে নিদয়া খুব খুশি হন, নিশ্চিন্তে সংসারের সকল দায়িত্ব ফুল্লরার ওপর অর্পণ করে অনায়াসে বারাণসী বা কাশী গমনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন—

মুক্তিপদে দিয়া মন শিব ভাবে অনুক্ষণ
শুনে প্রভঞ্জন উপাখ্যান
ছায়া সঙ্গে ধর্মকেতু ভাবিলেন মুক্তি হেতু
বারাণসী করিল পয়ান॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪৪)

ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি শাসিত মুকুন্দরাম ধর্মকেতু দম্পতির বারাণসী গমনের মধ্য দিয়ে তাদেরকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়েছেন। শ্বশুর-শাশুড়ি বারাণসী গমন করলে ফুল্লরা কিছুটা একাকিত্ব বোধ করেন, সারাক্ষণ অন্যমনস্ক থাকেন, চুল বাঁধেন না। কিন্তু দায়িত্ব কর্তব্য থেকে কখনই সরেননি ফুল্লরা। সহায় সম্বলহীন পরিবারে বাস করেও কালকেতু-ফুল্লরা দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ছিলেন অধিক সচেতন তাই শ্বশুর-শাশুড়ির জন্য মাসে মাসে মাসোহারা পাঠাতে ফুল্লরার কখনই ভুল হয়নি—

দম্পত্যে লোটায়্যা কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
মাসে মাসে পাঠান সম্বল॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪৪)

ফুল্লরার অভাবী সংসারে ভোজনপটু কালকেতুর খাদ্যতালিকা পাঠককে শুধু বিস্মিতই করে না, করে অভিভূতও। একজন সুগৃহিণী ও দায়িত্বসম্পন্ন স্ত্রী হিসেবে ফুল্লরার জুড়ি নেই। দূরদর্শী ফুল্লরা কালকেতুর পদধ্বনি পেয়েই একজন আদর্শ স্ত্রীর ন্যায় স্বামীর আহারের সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখেন। কালকেতুর ভোজনে বসার দৃশ্যও অত্যন্ত চমৎকার। প্রথমেই মোচড়িয়ে গোঁফ দুটো ঘাড়ে বেঁধে নেন। এরপর ফুল্লরা একে একে রান্না করা খাবার কালকেতুর সামনে হাজির করেন। কালকেতু মনের আনন্দে তৃপ্তিসহ সেসব খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করেন। তার খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়াকে নীলিমা ইব্রাহিম ব্যাখ্যা করেছেন এ ভাবে : '*চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের নায়ক কালকেতুও একটি শ্রেণী-প্রতিনিধি। নীচ ব্যাধ জাতির সন্তান কালকেতু দারিদ্র্যপীড়িত লাঞ্ছিত

মানবাত্মা। তার জীবনের একমাত্র কামনা উপযুক্ত শিকার পাওয়া এবং মাংস বিক্রী করে উদর পূর্তি করা। কালকেতুর আহারের বর্ণনায় তার অমার্জিত, অনার্য চরিত্রকে মুকুন্দরাম তুলে ধরেছেন। আসরে অভুক্ত, অর্ধভুক্ত শ্রোতার সামনে এক অতিরঞ্জিত ভোজন দৃশ্যের অবতারণা করে একদিকে তাদের কাল্পনিক তৃপ্তিদান করেছেন অপরপক্ষে কালকেতুর পাশবজীবন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন'। (নীলিমা; ১৯৯০ : পৃ. : ১১৮)—

সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিআ পাথরা
ব্যঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা।
… … …
এক শ্বাসে তিন হাণ্ডি আমানি উজাড়ে।
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ
সুপ ছয় হাঁড়ি তায় মিসাইয়া লাউ।
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া
সারি কচু ঘণ্টে মিশা করঞ্জা আমড়া।
অম্ল খাইয়া বীর জায়ারে জিজ্ঞাসে
রন্ধন কর্য্যাছ ভাল আর কিছু আছে।
আনিঞাছি হরিণ দিআ দধি এক হাঁড়ি।
তাহা দিআ খাও বীর ভাত তিন হাঁড়ি॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৪৫- ৪৬)

এ বর্ণনা ব্রাত্য সমাজের ভোজনপটু এক ব্যাধের খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা যা পাঠকের কৌতূহল বাড়ায়, অনাবিল হাসিতে উদ্ভাসিত করে কিন্তু ঘৃণার উদ্রেক করে না। কালকেতুর খাবার গ্রহণের মধ্যে হত-দরিদ্রের ব্যবহৃত তৈজসপত্রের উল্লেখ আছে। আহারের পর কালকেতু আচমন এবং শেষে হরিতকী খেয়ে মুখ শোধন করে সুখে নিদ্রা যান।

কালকেতুর বীরত্বে এবং পশু শিকারের বিভিন্ন কৌশলে পশুগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পশুরাজের কাছে আবেদন করেন। পশুগণ তাদের সন্তান স্বামী হারানোর কষ্ট রাজার কাছে অত্যন্ত বেদনার সাথে ব্যক্ত করেন। বনের সকল পশুর সাথে কালকেতুর যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে বার বার কালকেতুর জয় পশুদেরকে আরও বেশি ভীত করে অবশেষে তারা দেবীচণ্ডীর শরণাপন্ন হয়ে তাদের নিবেদন ব্যক্ত করে—

মাগু মৈল পো মৈল দুটি নাতি শেষে॥
কান্দয়ে ভল্লুক শিরে মারে করাঘাতি।
… … …
শ্বাশুড়ী ননদ মরে দেওর ভাসুর।
পতি গেল রতিসুখ বিধি কৈল দূর॥
ছিল মাত্র অভাগীর কোলে এক পো।
পাশরিতে নারিগো তাহার মায়া মো॥
(মুকুন্দরাম : ১৯৭৪ ; পৃ : ২০২-২০৩)

পশুপাখির মধ্য দিয়ে নর-নারীর বেদনা প্রকাশ পেলেও নারীর সেই চিরাচরিত স্বামী-পুত্রহীন অসহায়ত্বের জীবন হরিণীর কান্নার মধ্য দিয়ে কবি প্রকাশ করেছেন। এখানেই মুকুন্দরামের কৃতিত্ব ও জীবনরসিক হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। পশুগণের এ দুঃখ-বেদনার অনুভূতি পাঠককে বেদনায় ভারাক্রান্ত করে। তাদের বেদনার সাথে মনুষ্য-বেদনার কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। পশুদের বেদনার মধ্যদিয়ে কবি বাঙালি নর-নারীর বেদনার চিত্র তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। পশুদের রক্ষা করতে দেবীচণ্ডী গোধিকা রূপধারণ করেন। ঐ দিন কোনো শিকার না পেয়ে রাগে, অভিমানে, দুঃখে কালকেতু গোধিকাকে পুড়িয়ে খাওয়ার জন্য জালে বেঁধে গৃহে নিয়ে আসেন। কালকেতু-ফুল্লরার জীবন-বাস্তবতাকে সিরাজ সালেকীন

বর্ণনা করেছেন এভাবে-'সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য নিয়ে বসবাস করে কিরাত জনগোষ্ঠীর মানুষ কালকেতু। অরণ্যনির্ভর জীবনে সংগ্রহবৃত্তির অনিশ্চয়তা তাকে আকুল করে, বিব্রত রাখে। দারিদ্র্য, অনিশ্চিত আরণ্যক জীবন, দুর্বল অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে দেবী আসেন বাণিজ্যপুঁজি, বিত্তবেসাত-বাজার ও তার আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে। শিকারি দিনের শেষে গোধিকারূপ চণ্ডীকে নিয়ে ঘরে ফেরে কালকেতু। এখনো কালকেতু-ফুল্লরা ব্যস্ত দিনানুদিন অন্নচিন্তায়। পাশেই বাজার আছে ; কিন্তু টাকা কই'? (সিরাজ ; ২০২০ : পৃ : ৪৬) এমতাবস্থায় কালকেতুর মাথায় আসে ধার করার চিন্তা। তিনি ফুল্লরার সাথে পরামর্শ করেন তার সখীর বাড়ি থেকে কিছু খুদ ধার করার। এর সাথে 'রান্ধিবে মুড্যাতি সাক হাঁড়ী দুই তিন'। শিকারকৃত গোধিকাটি করা হবে শিকপোড়া, এ সব পরামর্শ এক সহায়সম্বলহীন ব্যাধ দম্পতির অসহায়ত্বের বহিঃপ্রকাশ। এরপর কালকেতু বাজারে যান বাসি মাংস বিক্রির জন্য। একটু লক্ষ করলেই প্রত্যক্ষ করা যায় কালকেতুর সুসময় এবং দুঃসময়ের সমব্যথী হয়েছেন ফুল্লরা।

সৃষ্টির শুরু থেকেই মেয়েরা যে শুধু গৃহিণী বা গৃহবধূ হয়েই জীবন কাটাতো তেমনটি নয় বরং গৃহস্থালি কাজ-কর্ম সমাপ্ত করে পারিবারিক জীবনকে আরও সুন্দর, সুখী এবং সুসংহত করার জন্য তারা স্বামীর সহযোগী হতো। ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অনভিজাত প্রায় সকল নারী সাংসারিক কাজ-কর্মের পাশাপাশি অর্থ উপার্জনের জন্য পুরুষের মতো বাইরে বের হতো। সেই প্রাচীনযুগের সাহিত্য চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* এমনকি বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যেও এর নিদর্শন মেলে। অবশ্য নিম্ন শ্রেণির মেয়েদের মধ্যে এ প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয় কারণ নিম্নবিত্তের মানুষেরা সামাজিক বিধি-নিষেধ তেমন তোয়াক্কা করত না। বিশেষ করে *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের আক্ষেটিক খণ্ডে মানুষের জীবন যাত্রার যে চিত্র পাওয়া যায় সেখানে খেটে খাওয়া নিম্ন বৃত্তিধারী মানুষের চিত্র বেশি। উদরের জ্বালা নিবৃত্ত করাই এসব খেটে খাওয়া মানুষের একমাত্র চিন্তা। মুকুন্দরামের অমর সৃষ্টি ফুল্লরা গরিব ব্যাধ কালকেতুর ঘরনি। তাই স্বামীর শ্রমকে কিছুটা লাঘব এবং বনে গিয়ে পশু শিকারের জন্য বাড়তি সময় প্রদানের জন্যই ফুল্লরা হাটে ঘুরে ঘুরে শিকারলব্ধ মাংস বিক্রি করতেন। আর সেই সময়টুকুতে কালকেতু বনে ঘুরে ঘুরে শিকার খুঁজতেন। যে দিন শিকার পেতেন সে-দিন তাদের খাবার জুটত আর যে দিন শিকার না পেতেন সে-দিন তাদেরকে উপোস থাকতে হতো অথবা অন্যের কাছ থেকে খুদ ধার করতে হতো।

এমন এক দুর্দিন আসে ফুল্লরার জীবনে যে দিন সামান্য খুদ ধার করতে সখীর বাড়িতে যান ফুল্লরা। সখীকে কাছে পেয়ে বিমলার মা ভীষণ খুশি হন। ফুল্লরার সখী কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলে ফুল্লরা ভাগ্যের নির্মমতার চিত্র তুলে ধরে বিধাতাকে দোষারোপ করেন—

আইস আইস বলিআ ডাকেন তারে সই
দেখিতে লাগয়ে সাদ এতদিন বই।
বিধাতা করিল মোরে দরিদ্রের কান্তা
চারি প্রহর করি সই উদরের চিন্তা।
শিরে তৈল দিআ তার বান্ধিল কবরী
সরস সিন্দুর ভালে দিল সহচরী।
আঁচল ভরিআ সই দিল খই মুড়ি
চাপিআ বসিল দোহে চৌখাণ্ড পিড়ি।
ফুল্লরা দুকাঠা চালু মাগিল উধার
কালি দিহ বল্যা সই কৈল অঙ্গিকার॥
আইসহ প্রাণের সই বৈস গো বহিনি
মোর মাথে গোটা কথো দেখহ উকিনি।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৫৫)

মুকুন্দরাম অত্যন্ত মর্মস্পর্শী করে দুই সইয়ের কথোপকথন, তাদের পিঁড়ি পেতে বসার ভঙ্গি এমনকি সইয়ের মাথার উকুন বাছার বর্ণনার মধ্য দিয়ে সমাজের একেবারে নিম্ন-নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন চিত্র উপস্থাপনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিমলার মা ফুল্লরাকে আপ্যায়ন করেন আঁচল ভরে খই ও মুড়ি দিয়ে। দারিদ্র্যের

কষাঘাতে জর্জরিত ফুল্লরা এয়োতির চিহ্ন সামান্য তেল সিঁদুরও হয়ত দীর্ঘদিন জোটাতে পারেননি তাই সখী পরম যত্নে ফুল্লরার সিঁথিতে তেল-সিঁদুর দিয়ে খোঁপা বেঁধে দেন। ফুল্লরার দৈন্য-দশা পাঠককে ব্যথিত করে, করে মর্মাহতও। গার্হস্থ্যজীবনের মর্মস্পর্শী এ সরস বর্ণনা একজন জীবনবাদী কবির পক্ষেই সম্ভব।

ফুল্লরা শুধু বিকিকিনিতেই আদর্শ তা নয় গৃহিণী হিসেবেও সমান প্রশংসার দাবিদার। তাইতো নিদয়া ফুল্লরার হাতে সংসারের দায়িত্বভার তুলে দিতে বিন্দুমাত্র ভাবেননি। ফুল্লরাও তার দক্ষতা এবং বিচক্ষণতা দিয়ে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব সামলিয়েছেন। গৃহকর্মে সুনিপুণা ফুল্লরা অত্যন্ত পতিব্রতা। হিন্দু শাস্ত্র-অনুসারে মেয়েদের জীবনে স্বামী পরম আরাধ্য। কালকেতু ফুল্লার প্রাণ। এই ধ্যান-জ্ঞানে বিশ্বাসী ফুল্লরা পরম মমতায় ও শ্রদ্ধায় সামর্থ্য অনুযায়ী স্বামীর সেবা-যত্নে কোনো ত্রুটি রাখেন না। যেদিন কালকেতু শিকার জোটাতে পারেননি সেদিন স্বামীর ব্যথায় ব্যথিত হয়েছেন বটে তবে নিজেদের দারিদ্র্যের কথা ভেবে কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কোনো উপায় দেখেননি। শত দুঃখের মধ্যেও ফুল্লরা স্বামীকে কখনো দোষারোপ করেননি বরং 'ফুল্লরা তাহার দুঃখের জন্য ভগবানকে বার বার অভিসম্পাত দিলেও, এমন কি মৃত্যু কামনা করিলেও, সেইজন্য তাহার স্বামীকে এতটুকুও দায়ী করে নাই। স্বামীর ও স্বামীর সংসারের প্রতি যথার্থ প্রেম আছে বলিয়াই তাহা সে কদাচ করিতে পারে না। নারীদিগের পতিনিন্দা যে মঙ্গলকাব্যের অন্যতম লক্ষণ, তাহারই নায়িকা হইয়া ফুল্লরাকে এ বিষয়ে অটুট সংযম রক্ষা করিতে দেখিয়া তাহার এই দুঃখের জীবনের মধ্যেও স্বামীপ্রেম যে কত গভীর ছিল, তাহাই অনুমিত হয়। অতএব স্বামীপ্রেম যেখানে সত্য সেখানে সাংসারিক দুঃখ এই ব্যাধ-নারীর কাছে কিছুই নহে'। (আশুতোষ ; ২০০৯ : পৃ : ৪২১)

অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট এবং অভাব অনটনের মধ্যেও ফুল্লরার সংসারে শান্তি ছিল, ছিল স্বস্তিও। কালকেতু ছিলেন ফুল্লরার প্রাণ, স্বামীকে ফুল্লরা প্রাণাধিক ভালোবাসতেন, ভক্তি ও শ্রদ্ধাতেও ছিলেন অবিচল। কালকেতুও ফুল্লরাকে খুব ভালোবাসতেন। এই নির্ঝঞ্ঝাট সংসারে যখন ফুল্লরা দেখলেন এক ষোড়শী কন্যা (চণ্ডী) অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে তাদের পর্ণকুটির আলো করে আছে—

সই গৃহে চালু সের করিআ উধার
সম্ভ্রমে ফুল্লরা আইসে কুড়িআর দুয়ার।
বামবাহু নাচে তার ঘোরে বাম আঁখি
কুঁড়্যার দুয়ারে দেখে রাকাচন্দ্রমুখী।
… … …
তুমি গো ফুল্লরা যদি দেহ অনুমতি
এক স্থানে কথোকাল করি গ বসতি।
হেন বাক্য হইল যদি অভয়ার তুণ্ডে
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে।
হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা
দূরে গেল খুধা তৃষ্ণা রন্ধনের ত্বরা।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৫৮)

আত্মপরিচয় দিয়ে চণ্ডী ফুল্লরার গৃহে কিছুদিন অবস্থান করার অনুমতি চান। দেবীর এ প্রস্তাব শুনে ফুল্লরার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে ফুল্লরার ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং রান্নার তাগিদ বিলীন হয়ে যায়। ফুল্লরা বিমলার মার গৃহ হতে খুদ ধার নিয়ে নিজের কুটিরে এসে অপূর্ব রমণী মূর্তি দেখে হতবাক। ফুল্লরা দেবীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে দেবী প্রত্যুত্তরে কালকেতুকেই দোষারোপ করেন এবং সে তাকে গৃহে নিয়ে এসেছে বলে স্বীকারোক্তি দেন, ব্যাধের কুটিরে কিছুদিন থাকার সিদ্ধান্তও নেন,—এসব শুনে ফুল্লরার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে যায়। কারণ ফুল্লরার সংসারে অভাব আছে, আছে অনটনও তবু এত দুঃখের মধ্যেও স্বামী কালকেতুর প্রেম ভালোবাসা ফুল্লরার জীবনে পরম পাথেয়। ফুল্লরার ভয় এ সুখটুকুও যদি তার জীবনে সহ্য না হয়। তাইতো ফুল্লরা সহজ সরল সাদামাটা বক্তব্যে সতী, সীতা, সাবিত্রীর কাহিনি বলে, বিভিন্ন নৈতিক বক্তৃতা দিয়ে পরগৃহবাস হতে দেবীকে প্রতিনিবৃত্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কপট ভাষায় চণ্ডী সতিন

গঙ্গার যন্ত্রণায় সংসারে টিকতে না পেরে গৃহত্যাগী হয়েছেন এবং স্বামী তাঁকে গঙ্গার ভয়ে মোটেও ভালোবাসেন না একথা ফুল্লরার কাছে ব্যক্ত করলে সহজ-সরল ব্যাধ-বধূ ফুল্লরা তাকে প্রতিবাদী হওয়ার এবং নিজের অধিকার আদায় করে নেওয়ার পরামর্শ দেয়—

সতিনি কন্দল করে দুগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি॥
কোপে কইলে বিষপান আপনি তেজিবে প্রাণ
সতিনির কি হইবে হানি॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৬০)

বাস্তববাদী ফুল্লরার এ উক্তির মধ্য দিয়ে সপত্নীবিদ্বেষের চিত্র বর্ণনার পাশাপাশি তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মমর্যাদার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলে মনে হয়। সেই সাথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার তীব্র প্রতিবাদ দেখে পাঠক বিস্মিত হয়। এছাড়াও উক্ত উক্তিটির মধ্যে নারী স্বাধীনতার প্রশ্নটিও উঁকি দেয়। যদিও মধ্যযুগে নারী পরাধীন ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান মোটেও সুখপ্রদ ছিল না। তারা কোনো না কোনো ভাবে অন্য ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল। মধ্যযুগে নারীর অবস্থান সম্পর্কে আবদুল জলিলের অভিমত —'পুরুষ প্রধান সমাজে নারী ছিল পরান্নজীবী ও অসহায়। সারাজীবন তার কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না। কন্যারূপে পিতার, জায়ারূপে স্বামীর এবং মাতারূপে পুত্রের অভিভাবকতায় কাটত তার জীবন' (জলিল; ১৯৯৬ : পৃ. ১১৬)। নারী এ পরনির্ভরশীলতা থেকে বর্তমান যুগেও যে মুক্তি পেয়েছে সেটা বলা যুক্তিযুক্ত হবে না, তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানসিকতা এবং রুচির কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয়েছে। তাছাড়া আধুনিক যুগে অনেক মেয়ে এখন অর্থনৈতিকভাবেও স্বাবলম্বী। কিন্তু মধ্যযুগে নারী প্রকৃত অর্থেই ছিল পরান্নজীবী এবং পরনির্ভরশীল। বিশেষ করে হিন্দু সমাজে এর কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। হিন্দু সমাজে মেয়েরা বিয়ের পর একান্ত ভাবেই স্বামীর ওপর ছিল নির্ভরশীল।

মধ্যযুগে নারীরা স্বামীধর্ম পালনে একান্তভাবে স্বামীর অনুগামী ছিলেন। পতিব্রতা নারী স্বামীকে পরম দেবতা বা ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি করতেন। স্বামী ছাড়া তাদের আর কোনো গতি ছিল না। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে স্বামীর ওপর নারীর নির্ভরশীলতার উল্লেখ আছে। সতিনের যন্ত্রণায় চণ্ডী যখন স্বামী গৃহ পরিত্যাগ করে সামান্য ব্যাধের ঘরে আশ্রয় লাভের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন তখন সহজ সরল পতিব্রতা ফুল্লরা দেবীকে সবকিছু ভুলে স্বামী সোহাগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন—

স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার বিধাতা॥
স্বামী পরম ধন বিনে স্বামী অন্য জন
কেহ নহে সুখ মোক্ষ দাতা॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৬০)

স্বামী সম্পর্কে এ অন্ধবিশ্বাস শুধু ফুল্লরার একার নয় এ বিশ্বাস অধিকাংশ বাঙালি নারীর। মধ্যযুগে বেশির ভাগ নারী বিশ্বাস করতেন স্বামীই তার জীবনের পরমদেবতা, তার জীবনের এক ও একমাত্র গতি, নারীর বসন-ভূষণও স্বামী-এ বিশ্বাসেই তারা বেঁচে থাকার প্রেরণা পেতেন। স্বামীকে তারা ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করতেন।

মধ্যযুগে অনেক নারীকে সতিনের ঘর করতে হতো। চণ্ডীকে ষোড়শী কন্যা রূপে দেখে ফুল্লরা এ ভয় পেয়েছিলেন যদি সতিনের যন্ত্রণায় কালকেতুকে হারাতে হয়। এজন্যই ফুল্লরা ধর্মের কাহিনি এবং স্ত্রীর জীবনে স্বামীর গুরুত্ব সম্পর্কে দেবীকে বিভিন্ন নীতিবাক্য শোনান। রামায়ণের সীতাকে শত দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, গ্লানি ও বিভিন্ন অপবাদ সহ্য করতে হয়েছে জানিয়ে ফুল্লরা এগুলোর দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই যখন কোনো কাজ হলো না তখন ফুল্লরা তার সংসারের সাংবাৎসরিক দুঃখের কাহিনি শোনালেন। ফুল্লরা বিশ্বাস করেছিলেন হয়তো দেবী তার দুঃখের কাহিনি শুনে নিবৃত্ত হবেন—

বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা
… … …
মাঁস না বিকায় সভে করে নিরামীষ।
… … …
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস
বেঙচের ফল খাইআ করি উপবাস।
আষাঢ়ে পুরিল আসি নব মেঘ জল
ভাল গেরস্তের নাঞি জোড়এ সম্বল
মাঁসের পসরা লৈয়া ভ্রমি ঘরে ঘরে
কিছু খুদ কুড়া মিলে উদর না পুরে।
… … …
বড় অভাগ্য মনে গুনি বড় অভাগ্য মনে গুনি
কত কত খায় জোঁক নাঞি খায় ফণী।
শ্রাবণে বরিখে ঘন দিবস রজনী
… …. …
হেন কালে মৃগ মারে পাপ কর্ম ফলে।
… … …
ভাদ্রপদ মাসে রামা দুরন্ত বাদল
নদনদী একাকার আট দিকে জল ।
মাঁসের পসরা লৈয়া ফিরি ঘরে ঘরে
… … …
আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা প্রতি ঘরে ঘরে।
মহিষ ছাগল মেষ দিআ উপচারে।
উত্তমবসন বেশ করয়ে বনিতা
অভাগি ফুল্লরা করে সম্বলের চিন্তা।
… … …
কার্তিক মাসেতে হৈল হিমের জন্ম
জগ-জনে কৈল শীতনিবারণ বসন
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়
অভাগি ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।
… … …
পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজন
… … …
বৃথা বনিতা জন্ম বৃথা বনিতা জন্ম
ধুলিভয়ে নাঞি মেলি শয়নে নয়ন।
… … …
নিদারুণ মাঘ মাস নিদারুণ মাঘ মাস
সর্বজন নিরামিষ করে উপবাস।
ফাল্গুনে দুগুণ শীত খরতরা খরা
খুদ সেরে বান্ধা দিল মাটিয়া পাথরা।
… … …
বনিতা পুরুষ অঙ্গ পিড়এ মদন
আমার পীড়িত অঙ্গ উদর দহন।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৬১-৬২)

এ বর্ণনার মধ্যদিয়ে ষোড়শ শতকের বাংলার অনার্য-ব্যাধ সম্প্রদায়ের গার্হস্থ্যজীবনের নির্মম বাস্তবতা, তাদের দারিদ্র্য, অসহনীয় জীবন, সাংবাৎসরিক সংকট অসামান্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

সমালোচক স্মৃতিকণা চক্রবর্তী বলেছেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম রচিত 'ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ অংশটি কোনোভাবেই গতানুগতিক বারোমাসের নিছক দুঃখ বর্ণনা হয়ে ওঠেনি। শুধু প্রথারক্ষার বিষয় করে না রেখে কবিকঙ্কণ ফুল্লরার বারমাস্যাটিকে মানবমনস্তত্ত্বের জারক রসে জারিত করে তাকে নবরূপ দান করেছেন। ফুল্লরা বারমাসের দুঃখ কথা শোনাচ্ছে তার সতীন সম্ভাবনার আশঙ্কা থেকে ভয়কল্পিত সতীনকে, যার রূপের আলোয় আঁধার ঘর উদ্ভাসিত, যার গায়ে ঝলমলে রত্ন আভরণ। এক অসম রণের দুর্ভাবনায় ফুল্লরা মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত।' (স্মৃতিকণা ; ২০১১ : পৃ. : ১৬০)। ব্যাধ-দম্পতির জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কালকেতু-ফুল্লরার সংসারে অভাব ছিল সত্য কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে কোনো টানাপড়েন ছিল না। আজ যখন এক সুন্দরী রমণী হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসে তার সংসারের সমস্ত সুখ শান্তি ধূলিসাৎ করতে চাইছে তখনই ফুল্লরা মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন এবং দেবীকে তার ভাঙা ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করেন। কোনো অনুরোধে যখন কাজ হলো না তখন ফুল্লরা কাঁদতে কাঁদতে গোলাহাটে তার স্বামীর কাছে হাজির হন—

বিষাদ ভাবিআ কান্দে ফুল্লরা রূপসী।
নয়নের ঘামে ঘামিল মুখশশী।
... ...
সবিস্ময় হইআ জিজ্ঞাসা করে বীর॥
সাসুড়ি ননদি নাঞি নাঞি তোর সতা
কা সনে কন্দল করি চক্ষু কৈলে রাতা॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৬২)

ফুল্লরার সংসারে শাশুড়ি-ননদ কেউ নেই। নির্ঝঞ্ঝাট তার পরিবার ফলে ফুল্লরার চোখে অশ্রু কেন ? সেকালে বেশির ভাগ পরিবারের বিশেষ করে উচ্চবংশোদ্ভূত পরিবারের কর্তা এবং কর্ত্রী সংসারের সমস্ত ভার পুত্র এবং পুত্রবধূর ওপর অর্পণ করে নিশ্চিন্তে কাশী গমন করতেন মোক্ষ লাভের উদ্দেশে। ঈশ্বর আরাধনায় জীবনের বাকিটা সময় অতিবাহিত করতেন তারা। তবে শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-দেবর পরিবৃত সংসারে কর্তৃত্বের দাবি নিয়ে শাশুড়ি ও বধূর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মনোমালিন্য কম হতো না। ফুল্লরাকে কাঁদতে দেখে কালকেতুর ভর্ৎসনার মধ্যদিয়ে পরোক্ষভাবে তেমন আভাসই পাওয়া যায়। অর্থাৎ শাশুড়ি, ননদ বা সতিনের উপস্থিতিতে পরিবারে দ্বন্দ্ব থাকবে এটা অতি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ফুল্লরা তো এ সব ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত। তবে সন্দেহপ্রবণতা থেকেই ফুল্লরা কালকেতুকে জিজ্ঞাসা করেন—

কাহার সোলস্যা কন্যা আনিআছ ঘরে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৬২)

উক্তিটির মধ্যদিয়ে মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে একজন নারী এই প্রথম প্রতিবাদের সুরে কথা বললেন। যদিও কালকেতু ফুল্লরার দাম্পত্য-জীবন ছিল অত্যন্ত মধুর, ভিত্তি ছিল সুদৃঢ়। অবর্ণনীয় দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও তারা শান্তিতে বসবাস করতেন। সংসারে শাশুড়ি-ননদ না থাকায় ফুল্লরার স্বাধীনতায়ও কোনো বাধা ছিল না। কালকেতু ফুল্লরার একান্তই নিজস্ব। অভাব অনটনের সংসারটাও ছিল ফুল্লরার খুবই আপন। তাই শত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও এটাই ছিল ফুল্লরার সবচেয়ে বড় অহংকার। তারপরও কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার কোনো অভিযোগ-অনুযোগ যে ছিল না তা কিন্তু নয় বরং পারিবারিক জীবনে স্বামী স্ত্রীকে কী চোখে দেখতো *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে ফুল্লরার উক্তির মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে তা প্রমাণিত হয়েছে—

সন্তোষে বসায় খাটে দোষ দেখি নাক কাটে।
দণ্ডে রাজা বনিতার পতি॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৬০)

কথাটির সত্যতা কালকেতুর উক্তির মধ্যদিয়ে প্রমাণিত হয়। গোলাহাটে অকস্মাৎ ফুল্লরা যখন ঘরে অপূর্ব সুন্দরী রমণী আনার অভিযোগে কালকেতুকে অভিযুক্ত করেন তখন কালকেতু রাগে, অভিমানে, ক্রোধে ফুল্লরাকে শাসান নিম্নোক্ত উক্তিতে—

মিথ্যা বাক্য হইলে কাটিব তোর নাসা।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৬২)

স্ত্রীর সামান্য অপরাধেই তৎকালে পুরুষেরা স্ত্রীকে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিতেন কালকেতুর এ উক্তির মধ্য দিয়ে সেটাই প্রমাণিত হয়।

বাঙালি হিন্দু সমাজে স্ত্রীর ওপর স্বামীর সর্বময় কর্তৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায় পর্যটক জে. এস. স্ট্যাভোরিনাস-এর লেখা থেকে। তিনি লেখেন—'এ দেশে স্ত্রীর ওপর স্বামীর সর্বময় ক্ষমতা। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিয়ম আছে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকেও অনুমৃতা হতে হয়। এ কারণে স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গে অগ্নিদগ্ধ বা জীবিতাবস্থায় সমাধিস্থ করা হয়ে থাকে। কোন বিধবা নারী সমাজের এই পৈশাচিক বিধানের বলী হতে অস্বীকৃতি জানালে সমাজে তার ভীষণ অপযশ হয় এবং এজন্য সারাজীবন তাকে আত্মীয়-স্বজনের গঞ্জনা সহ্য করতে হয়।' (গোপিকারঞ্জন; ১৯৯৯: পৃ: ৮৫)

তবে বাংলা মঙ্গলকাব্য পাঠ করলে দেখা যায় নারীর মর্যাদা বা নারীর শ্রমের মূল্য উচ্চবিত্ত সমাজে তেমনটা পরিলক্ষিত না হলেও নিম্ন-নিম্নবিত্ত সমাজে কিছুটা হলেও মূল্যায়ন করা হতো। অন্তত কালকেতু-ফুল্লরার জীবন ও জীবনযাত্রার মান পর্যালোচনায় এ সত্যটুকু অনুমিত হয়। গুজরাট নগরের রাজা হবার আগে কালকেতুর যে জীবন তা নিতান্তই শ্রমজীবী মানুষের জীবন ছিল। নিম্নকোটি মানুষের প্রতিনিধি হয়ে কালকেতু-ফুল্লরার নৈতিক বন্ধন যে কতটা সুদৃঢ় ছিল তা তাদের দাম্পত্য জীবন থেকে প্রমাণিত হয়। ফুল্লরার সংসারে অভাব ছিল কিন্তু অশান্তি ছিল না; ছিল না শাশুড়ি-ননদ এবং সতিনের যন্ত্রণা। এজন্যই কালকেতু ছিলেন তার একান্তই নিজের এবং অন্য কোনো নারীর উৎপাত তিনি সহ্য করতে অভ্যস্ত নন। কালকেতু ঘরে এসে অপূর্ব নারী মূর্তি দেখে বিস্মিত হলেন এবং স্বগৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানালেন। কালকেতু প্রথমে খুব বিনয়ের সাথে ব্যাধ জাতির অবস্থা বর্ণনা করে অতঃপর দেবীকে তার গৃহত্যাগের অনুরোধ জানিয়েছেন—

আমি ব্যাধ নিচ জাতি তুমি রামা কুলবতী
... ...
ব্যাধের মন্দিরে কিবা হেতু॥
ব্যাধ হিংসক রাড় চৌদিকে পশুর হাড়
এ ঘর সসান সমান
কহি আমি সত্যবাণী এই ঘরে ঠাকুরাণী
ছুঞিলে উচিত হয় স্নান॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৬২)

উল্লিখিত চিত্রে ব্যাধসূত কালকেতুর সারল্য ও সহায় সম্বলহীন অনার্য ব্যাধ-সম্প্রদায়ের বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। ব্যাধের পর্ণকুটিরে পবিত্রতার লেশ মাত্র নেই, এতটাই নোংরা ও অপবিত্র যে একজন উচ্চবংশজাত বধূ যদি সে কুটিরে প্রবেশ করেন তাহলে কুটির থেকে বের হওয়ার পর তাঁকে স্নান করতে হবে। এ বর্ণনা দেওয়ার পরও আগন্তক নারী নিজ গৃহে ফিরে যেতে রাজি না হওয়ায় কালকেতু ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যার জন্য ধনুকে শর যোজনা করতেই দেবী স্বমূর্তি ধারণ করে বললেন 'আমি চণ্ডী আইলাম তোরে দিতে বর' আর নির্দেশ দিলেন—

পূজিহ মঙ্গলবারে করাইহ জাত।
গুজরাট নগরেতে তুমি হবে নাথ॥

(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৬৫)

এভাবেই দীর্ঘ সমাজ পরিক্রমা শেষে কবিকঙ্কণ মঙ্গলকাব্যের অনড় প্রথাবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে ফিরে এলেন। এরপরের ঘটনাগুলো কালকেতুকে দেবীর মানিক অঙ্গুরি প্রদান। অতঃপর এ অঙ্গুরি মুরারি শীলের কাছে বিক্রয় করতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হওয়া, দেবীর সহায়তায় মানিক অঙ্গুরি সাত কোটি টাকায় বিক্রয় এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে গুজরাট নগর নির্মাণ এবং প্রজাদের সন্তানের ন্যায় প্রতিপালনের জন্য দেবী চণ্ডীর নির্দেশনা—

মানিক অঙ্গুরি সপ্ত নৃপতির ধন।
ভাঙ্গাইয়া কাটাইহ গুজরাট বন॥
বাসা সত জনে দিবে কড়ি চালু ধান।
পালিবে সকল প্রজা পুত্রের সমান॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৬৩)

কালকেতুর নগর পত্তনের ব্যাপারে বাস্তববোধ ও প্রথানুসৃতির মধ্যে সন্ধিবন্ধন-প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ভীষ্মদেব চৌধুরী কালকেতুর নগর পরিকল্পনায় প্রধানত দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন—'প্রথম বৈশিষ্ট্যটি হলো সমাজের আন্তর্কাঠামোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সমাজ-অন্তর্গত মানুষের শ্রেণীবিন্যাস ও অর্থনৈতিক জীবন। দ্বিতীয়টি নগরের অবকাঠামোগত দিক—প্রধানত সৌন্দর্যবোধ ও ঔচিত্যজ্ঞান-শাসিত 'টাঁউন-প্লানিং' বা নগর-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন'। (ভীষ্মদেব : ১৯৯১ ; পৃ : ১৮৬) কালকেতুর নগর পরিকল্পনায় সৌন্দর্যবোধের প্রথম নিদর্শন অপ্রয়োজনীয় বৃক্ষনিধন এবং নগরের সৌন্দর্যবৃদ্ধি, ফলমূলের চাহিদাপূরণের জন্য ফলজবৃক্ষ, দেবতার অর্ঘ্য নিবেদনের জন্য পুষ্পবৃক্ষের সংরক্ষণ যা কালকেতুর সৌন্দর্যবোধ ও ঔচিত্যজ্ঞানের পরিচয় দেয়। এরপর নির্মিত হয় কালকেতুর রাজপ্রাসাদ। তালজাতীয় বৃক্ষাকৃতি সুউচ্চ প্রাচীরঘেরা প্রাসাদটি চতুঃশালা'য় বিন্যস্ত। অন্তঃপুরে নির্মিত হলো চারঘাট বিশিষ্ট শান-বাঁধানো বিশাল সরোবর। উত্তরে খিড়কি, পূর্বে সিংহদ্বার। এরপর রত্নসিংহাসনযুক্ত 'চণ্ডিকার দেউল'। কালকেতুর রাজপ্রাসাদ ও চণ্ডীর দেউল নির্মাণের পর একে একে নির্মিত হয়েছে বামভাগে দুর্গামেলা, ডান পাশে নাটশালা, বিষ্ণুর দেউল; নগরীর সিংহদ্বারে নির্মিত হয়েছে জলাশয়, প্রতিটি বাড়ির পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নির্মিত হয়েছে কূপ। 'নগর-চত্বরে গড়ে উঠেছে শিব-মন্দির, অনাথমণ্ডপ ও অন্নশালা; গৃহবাসীদের জন্য তৈরী হয়েছে দিঘল মন্দির—যা পরিচিত হবে প্রবাসীদের সম্মিলন-ক্ষেত্ররূপে' (ভীষ্মদেব : ১৯৯১ ; পৃ : ১৮৬) ইটের পাঁজা তৈরি করে কাঠ আগুনে পুড়িয়ে তৈরি করা হয়েছে ইট, সেই ইট দিয়েই নির্মিত হয়েছে সৌধময় নগরী। সমাজবিন্যাসের সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা হচ্ছে নবাগত মুসলমান সমাজ-সম্বন্ধীয় চিন্তা-চেতনা। মুকুন্দরামের সমকালে রাজধর্ম ছিল ইসলাম। কালকেতুকে তার নগরে সর্বধর্মের মানুষকে আহ্বান করে যে এনেছে, তা মুকুন্দরামের ঔচিত্য-শাসিত মনস্তত্ত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। কালকেতু মুসলমানদের জন্য নগরীর পশ্চিম দিকটি নির্বাচন করেছে এর মধ্যেও কবির পরধর্ম-জ্ঞান ও ঔচিত্যবোধ ক্রিয়াশীল ছিল। তাই নগরের পবিত্র পশ্চিম প্রান্তে মুসলিম অধিবাসীদের জন্য নির্মিত হয়েছে মসজিদ, আবাসগৃহ, বৈঠকখানা ও রন্ধনশালা—

বীরের পাইআ পান বৈসে যত মুসলমান
পশ্চিম দিগ বীর দিল তারে।
আইসে চড়িআ তাজি সৈয়দ মোলনা কাজী
... ...
ফজর সময়ে উঠি বিছাই লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৭৮)

এভাবেই নির্মিত হলো একটি পরিকল্পিত নগর যে নগরকে রামরাজ্য অযোধ্যা ও কৃষ্ণের প্রাসাদ দ্বারকা নগরীর সাথেও তুলনা করা হয়েছে।

নগর নির্মিত হলো বটে তবে সে নগর ছিল প্রায় জনশূন্য। জনবল ছাড়া নগরের কোনো মূল্য নেই তাই শুরু হলো নগরে প্রজা পত্তনের আকুল প্রচেষ্টা। জনসমষ্টিকে বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থা, নানাজাতির আগমন ও বৃত্তিবৈচিত্র্য। দেবী চণ্ডী প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অতিবর্ষণের ফলে জলপ্লাবন ঘটিয়ে কলিঙ্গদেশের জনগণকে দেশত্যাগে বাধ্য করলেন। দৈব অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণই দেশত্যাগের প্রবল প্রেরণা যোগাল। প্রজাগণ জানতেন, কলিঙ্গরাজ দুর্দৈবপীড়িত প্রজাবৃন্দের খাজনা মাফ করবেন না উপরন্তু কালকেতুর রাজ্যে নানাবিধ সুবিধা ভোগের প্রত্যাশায় আকৃষ্ট হয় জনগণ। কলিঙ্গ দেশাগত বুলান মণ্ডলকে আন্তরিকভাবে আহ্বানের মধ্যেই নিহিত ছিল কালকেতুর আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রের প্রত্যাশা—

শুন ভাই বুলন মণ্ডল
আইস আমার পুর   সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব হেমকুণ্ডল।
আমার নগরে বৈস   জত ভূমি চাষ চষ
সাত সন বই দিয় কর
হাল পীছে এক তঙ্কা   না করিহ কারে শঙ্কা
পাটায় নিসান মোর ধর।
নাঞি দিহ বাউড়ি   রয়্যা বস্যা দিও কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।
…   …   …
পার্বনি পঞ্চক-জাত   ওড়া-লোন সানা-ভাত
ধানকাটী কলমে-কসুরে
জত বেচ চালু ধান   তার নাহি নিব দান
অঙ্ক নাহী বাড়াইব পুরে।
জত বৈসে দ্বিজবর   তার নাহি নিব কর
চাষভূমি বাড়ি দিব দান
হইয়া ব্রাহ্মণের দাস   পূরিব সবার আশ
জনে জনে সাধিব সম্মান।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৭৬-৭৭)

কালকেতুর এই নগর নির্মাণকল্পে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ব্যক্তি নিষ্পেষণ স্মৃতি ক্রিয়াশীল ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ কারণে কালকেতু তার রাষ্ট্রপরিচালনায় এক উদার-নীতি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ; সাত বছরের জন্য মওকুফ করেছেন আবাদি জমির ওপর ধার্য কর, ডিহিদার নিয়োগ প্রথা বাতিল করেছেন, বিলোপ করেছেন পার্বণিক কর, লবণ-কর, পাইকের ব্যয়-নির্বাহের জন্য প্রজার দেয় কর, ধানকাটার জন্য নির্ধারিত কর, হিসেবে ভুল হতে পারে আশঙ্কায় নির্ধারিত অগ্রিম কর (কলম-কসুরে)। আজকের মতো তৎকালেও হয়ত স্বীকৃত ছিল কৃষককে প্রণোদনা দেওয়ার রেয়াজ। এজন্য সকল প্রকার প্রণোদনা কৃষিতে দেওয়ার ঘোষণা দেন কালকেতু। কৃষি অর্থনীতির উন্নয়ন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণের প্রতিশ্রুতি সেই কথারই প্রমাণ দেয়। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় কালকেতু প্রথমেই আহ্বান জানান বুলান মণ্ডলকে, তারপর একে একে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে আগমন ঘটে তেলি, কামার, কুম্ভকার, মালি, বারুই, নাপিত, মোদক, শঙ্খবেণ্যা, গন্ধবেণ্যা, কাঁসারি, সাপুড়ে, মৎস্যজীবী, দরজি, ছুতার, পাটনি, চণ্ডাল, গায়েন এমনকি লম্পট পুরুষেরও। একটি উন্নত সমাজ পরিচালনায় যা কিছু প্রয়োজন তার সব কিছুই ছিল গুজরাট নগরে। (দ্র. ভীষ্মদেব : ১৯৯১; পৃ. ১৮৬-১৮৭) যে সকল বৃত্তিজীবী এবং ব্যবসায় সম্প্রদায় কালকেতুর গুজরাট নগরে এসে শহরটিকে ঋদ্ধ করেছে তার মধ্য দিয়ে ষোড়শ শতকের বাংলার সমাজ-বিন্যাসের অতি তথ্যসমৃদ্ধ চিত্তাকর্ষক ছবি দৃষ্টিগোচর হয়। কালকেতু সামন্তশাসকের প্রতিনিধি হিসেবে নগরের মধ্যমণিরূপে অবস্থান করলেও কবির প্রত্যাশা ও দেবীর নির্দেশনায় সর্বসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই প্রজাদের মণিকোঠায় স্থান লাভ করেছে। বুলান মণ্ডলের প্রতি আহ্বানের মধ্য দিয়ে কালকেতু একই সাথে গুজরাট রাজ্যে ইসলাম ও সনাতন ধর্মের মানুষের মধ্যে

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সম্প্রীতির ঐক্য স্থাপন করেছেন। হিন্দুধর্মের বর্ণভিত্তিক সাম্প্রদায়িক বিভাজনে প্রথমে আছে ব্রাহ্মণ যারা শিক্ষা বিস্তার ও পূজা-পার্বণের সাথে সংশ্লিষ্ট, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) সম্প্রদায় যুদ্ধ-বিদ্যা ও ব্যবসার সাথে, আর বৈশ্যরা ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। এ ছাড়াও শূদ্র শ্রেণির বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের আগমন ঘটে গুজরাট রাজ্যে যারা বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত থেকে নগরের অর্থনীতিতে অবদান রাখে। সম্ভবত মুরারিশীল ঐ সময় সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী ছিলেন যিনি ষোড়শ শতকে সাত কোটি টাকা দিয়ে মানিক অঙ্গুরি ক্রয় করেছিলেন। দৈব ধনে ধনী হয়ে কালকেতুর দ্রব্যক্রয়ের মধ্যদিয়েও তৎকালের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়।

গুজরাট নগরের সমাজবিন্যাসে সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক চমক হচ্ছে নবাগত মুসলিম সম্প্রদায়ের আগমন। প্রায় তিনশত বছরের সহাবস্থানের ফলে মুসলমান জাতি যে বাঙালি সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে ধর্মগত ঐক্যের সাথে নানা বৃত্তিগত ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা দিতে কবিকঙ্কণের ভুল হয়নি। তবে আশ্চর্যের বিষয় যে, কবি তাদের বর্ণনায় কোনো সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বা তিক্ত মনোভাবের পরিচয় দেননি। হিন্দু-মুসলিমের সহাবস্থান দৃষ্টে মনে হয় সে যুগে হিন্দু সমাজে উদার পরমতসহিষ্ণুতা ও সুস্থ সংহতিবোধ প্রচ্ছন্ন ছিল। মুকুন্দরামের ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতায় মামুদ সরীপের অত্যাচারের যে ক্ষত ছিল কবি তা নিজের অন্তরেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন সেখানে কোনো সাম্প্রদায়িকতার ছাপ পড়েনি। মুকুন্দরাম মুসলমাদের জীবনযাত্রার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা যেমন বাস্তব তেমনি সহৃদয়। তাদের ধর্মপরায়ণতার সাথে গোঁড়ামির সংমিশ্রণও ছিল তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণও কবির দৃষ্টি এড়ায়নি—

বড়ই দানীষবন্দ কেহোনা করয়ে দ্বন্দ্ব
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি
ধরয়ে কম্বুজ-বেশ শিরে নাহি রাখে কেশ
... ...
জার দেখে খালি মাথা তা সনে না কহে কথা
সারিআ দণ্ডের মারে বাড়ি।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৭৮)

তবে কখনো কখনো কবি মুসলমানদের আচার-ব্যবহারের অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে যে কটাক্ষ করেছেন তা নেহাতই হাস্য-রসাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচ্য 'ভুঞ্জিআ কাপড়ে মুছে হাত'। গুজরাট নগরে বসবাসরত মুসলমানদের বংশগত ও বৃত্তিগত অবস্থানের ওপর সমাজে তাদের অবস্থান নির্ভর করে। সম্ভ্রান্ত, ভদ্র ও নিষ্ঠাবান মুসলমানের নিত্য দিনকৃত্য ও সমাজ সংস্কৃতির বর্ণনাও কবি উল্লেখ করেছেন—

সোলেমানী মালা ধরে জপে পীর পেগম্বরে
পিরের মোকামে দেই সাঁজ।
... ...
বসিল অনেক মিঞা আপন টবর নিঞা
কেহো নিকা কেহো করে বিহা
মোললা পড়াইয়া নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলিমা পড়িআ।
করে ধরি করা ছুরি মুরগী জবাই করি
দশ গণ্ড দরে পায় কড়ি
বকরি জবাই জথা মোললাকে দেয় মাথা
দরে পায়ে কড়ি ছয় বুড়ি।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৭৮)

মুসলমান সমাজের ধর্মীয় আচার-পার্বণ ও সমাজ সংস্কৃতি বর্ণনায় একজন ব্রাহ্মণ কবি ছিলেন অকৃপণ। গুজরাট নগরে নির্দ্বিধায় তারা তাদের আচার-পার্বণ পালন করেছেন। নামাজ রোজা, এমনকি নিকার (বহু বিবাহের ইঙ্গিত) উল্লেখের মধ্য দিয়ে কবির সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়

বর্তমান কালে জীবিকার জন্য মুসলমানেরা নানা ধরনের যে বৃত্তি অবলম্বন করেন তার ভিত্তিপত্তন বোধ হয় মুকুন্দরামের আমলেই হয়েছিল। কালকেতুর রাজত্বে এই দুই প্রতিবেশী স্ব স্ব পেশা বা বৃত্তি ও ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠান পালন করে পরম সৌহার্দ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাদের মধ্যে বিরোধের কোনো চিহ্ন ছিল না। একজন ব্রাহ্মণ রচিত কাব্যে হিন্দু-মুসলমানের এ সম্প্রীতি, অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহৃদয় চিত্রণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই বলা যায় কাব্যের কাঠামোর মধ্যে থেকেও গুজরাট নগর নির্মাণের বর্ণনায় আবার কবিকঙ্কণ সমাজের কাছে ফিরে গেলেন। যাত্রা শুরু হলো এক অসাম্প্রদায়িক নগর সভ্যতার। যেখানে বিশেষ কোনো সম্প্রদায় বিশেষ কোনো সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। কাউকে কোনো অমর্যাদা করা হবে না, সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখা, সকলকে সমান সুযোগ সুবিধা দেয়ার প্রতিশ্রুতিও ছিল। দেবী চণ্ডীরও নির্দেশ ছিল প্রজাদের পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করা। সম্ভবত কবির অন্তরে একটি আধুনিক ক্যাণরাষ্ট্রের স্বপ্ন নিহিত ছিল যা গুজরাট নগর স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।

এই নবগঠিত নগরের গার্হস্থ্যজীবনের পরিপ্রেক্ষিত কবিকঙ্কণ তৈরি করেছেন, কিন্তু তার বিস্তৃত বিবরণের অবকাশ তাঁর ছিল না। কেননা মঙ্গলকাব্যের সনাতন কাব্যকাঠামোর অনুশাসন মান্য করতে হয়েছে কবিকে। রাজ্যাভিষেকের পর দেবী চণ্ডীর প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়ে গেলে অভিশপ্ত নীলাম্বর-ছায়ার মর্ত্যরূপ কালকেতু-ফুল্লরার স্বর্গে প্রত্যাবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ফলে পুত্র পুষ্পকেতুর হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে কালকেতু-ফুল্লরার স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় আক্ষেটিক খণ্ডের।

ধনপতি উপাখ্যান বা বণিক খণ্ডে বিধৃত গার্হস্থ্যজীবন

কালকেতু উপাখ্যানে দেবীচণ্ডীর পূজা মর্ত্যে প্রচারিত হলো বটে তবে তা অন্ত্যজ ব্যাধসমাজে ; প্রত্যন্ত ও সংকীর্ণ অঞ্চলে, কলিঙ্গ জনপদ এবং দরিদ্র সমাজে। এ সমাজের পূজা পেয়ে দেবী পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। পদ্মা তখন দেবীকে পরামর্শ দিলেন দেশের উন্নত শহর উজানিনগরে ধনী বণিক এবং পরম শিবভক্ত ধনপতিকে দিয়ে পূজা আদায় করতে পারলে নাম ও যশ উভয়ই বৃদ্ধি পাবে। পদ্মার উপদেশ অনুযায়ী চণ্ডী তাঁর লক্ষ্যে এগুতে থাকেন। বিশ্লেষকের ব্যাখ্যায় বিষয়টি প্রতিভাত হয়েছে এভাবে : 'ধনপতি উপাখ্যানে চণ্ডী ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তরে প্রবেশ করেছেন, এই সমাজের প্রভাবশালী বিধায়কদের নিকট স্বীকৃতি লাভের প্রচেষ্টা করেছেন ; তাই এই সংগ্রামটা আর পূর্বের ন্যায় দুটো স্বতন্ত্র সামাজিক আদর্শ ও সমাজের সংগ্রাম নয়, একই সমাজের অন্তর্গত দুটো শক্তির সংঘাত। সমাজের বাইরে থেকে সংঘাতটা সমাজের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে। ধনপতি সমাজে প্রচলিত শৈবধর্মাশ্রয়ী সওদাগর ; আর মঙ্গলকাব্যসমূহের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের প্রমাণ যে, সেকালে বণিকরা সমাজে প্রতিপত্তিশালী এবং সম্ভবত ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সংস্কৃতির ধারক ছিলেন। সুতরাং স্বীকৃতি লাভের প্রত্যাশী চণ্ডীর একমাত্র লক্ষ্য, এই বর্ণের প্রভাব খর্ব করা এবং অনার্যের ধর্ম ও প্রাণধর্মী জীবনাদর্শকে তাদের দিয়ে মানিয়ে নেওয়া। ধনপতির দ্বিতীয় স্ত্রী খুল্লনাকে ধনপতির প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শের প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। সপত্নীর অত্যাচারে অরণ্যে বিচরণকালে খুল্লনা চণ্ডীর কৃপা লাভ করে এবং ফিরে এসে চণ্ডীর পূজার্চনা প্রচলনে ব্রতী হয়। তাই একই পরিবারের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আদর্শ পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলো'। (অরবিন্দ ; ২০০৫ : পৃ : ৭৪-৭৫)। আক্ষেটিক খণ্ডে বা কালকেতু উপাখ্যানে দেবী চণ্ডীর মাত্র একজন ব্রতদাস ছিল। কিন্তু বণিক খণ্ডে দেবীর একজন ব্রতদাস ও একজন ব্রতদাসী। ব্রতদাস হলেন দেবনট মালাধর এবং ব্রতদাসী ইন্দ্রসভার নর্তকী রত্নমালা, কাহিনিতে যথাক্রমে ধনপতির দ্বিতীয় স্ত্রী এবং তার একমাত্র পুত্র শ্রীমন্ত। ধনপতি বিবাহিত, পত্নী লহনা ইছানি নগরের অধিবাসী এক বণিক কন্যা। পায়রা ওড়াতে ওড়াতে ধনপতি একদিন ইছানি নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে লহনার খুল্লতাত ভগিনী খুল্লনাকে দেখে ধনপতির বিয়ে করার ইচ্ছা হলো। ধনপতি পুরোহিত এবং পরামর্শদাতা জনার্দন ওঝার সহায়তায় খুল্লনাকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর দিনই রাজার আদেশে ধনপতি গৌড়ে যেতে বাধ্য হন এবং সেখানে এক বছর অবস্থান করেন। প্রথমাবস্থায় লহনা খুল্লনাকে সাদরে গ্রহণ করেন কিন্তু দাসী দুর্বলার চক্রান্তে তাদের সম্পর্ক খুব বেশি দিন টিকেনি। লহনার

ধারণা খুল্লনা হতে তার স্বামী সৌভাগ্য বিনষ্ট হবে, তাই পথের কাঁটা যেভাবেই হোক দূর করতে হবে। খুল্লনা কুলক্ষণা এ অপবাদ দিয়ে ধনপতির লেখা জাল চিঠি দেখিয়ে লহনা দুর্গ্রহ কাটানোর ছল করে খুল্লনার নীচ বেশ, নীচ আহার এবং নীচ শয্যার বিধান করে নগরের বাইরে গিয়ে ছাগল চরাতে বাধ্য করেন। এভাবে প্রায় এক বছর কেটে গেল, খুল্লনার একনিষ্ঠতায় চণ্ডী সুপ্রসন্ন হয়ে বিদ্যাধরীদের দিয়ে খুল্লনাকে চণ্ডীর পূজাব্রত শিখিয়ে দিলেন। পরে দেবী ধনপতিকে স্বপ্নে দেখা দেন, খুল্লনার ওপর খুব অত্যাচার হচ্ছে এরূপ স্বপ্ন দেখার পর আর বিলম্ব না করে ধনপতি গৃহে ফিরে এলেন। খুল্লনাও স্বামী সোহাগে সোহাগিনী হলেন। কিছু দিন পর ধনপতি তাঁর পিতার শ্রাদ্ধের আয়োজন করেন এবং অনেক অতিথি আমন্ত্রিত হলেন। অতিথিগণ ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন বটে তবে অন্নাহার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। কেননা খুল্লনা এক বছর অরক্ষিত অবস্থায় বনে বনে ছাগল চরিয়েছেন। তাই জ্ঞাতি-গোষ্ঠী তার চরিত্রে সন্দেহ করছেন। নিজের চরিত্র শুদ্ধির জন্য খুল্লনাকে অনেক পরীক্ষা দিতে হলো। কিন্তু জ্ঞাতিরা এ সকল পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি। অবশেষে খুল্লনা অগ্নি পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের চরিত্রশুদ্ধির প্রমাণ দিলেন। উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। মাস কতক পর ধনপতিকে রাজভাণ্ডারের প্রয়োজনে আবার সিংহলে যাত্রা করতে হলো। খুল্লনা তখন ছয় মাসের গর্ভবতী। সমুদ্র যাত্রার পূর্বে স্বামীর মঙ্গলের জন্য খুল্লনাকে চণ্ডীর পূজায় রত দেখে লহনা স্বামীর চোখে খুল্লনাকে বিষ প্রতিপন্ন করতে স্বামীকে পূজার সংবাদ দেন পরমশৈব ধনপতি তখনই আক্রোশ প্রকাশ করেন—

পূজাগৃহদ্বারে উপনীত ধনপতি
জয় দিআ পূজে চণ্ডী খুল্লনা যুবতী।
রোষজুত ধনপতি দেখি সন্নিধানে
ঘট ছাড়ি ভগবতী রহিলা গগনে।
দেখি ধনপতি দত্ত জ্বলে কোপানলে
লঙ্ঘিয়া চণ্ডীর বারি ধরে তার চুলে।
ভূতলে পড়িয়া বারি গড়াগড়ি জায়
নিকট হইআ সাধু ঠেলে বাম পায়।
কেমন দেবতা বল পূজিস ঘটবারি
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহী করি।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৯৮)

শুরু হলো দেবতা-মানুষের দ্বন্দ্ব। ধনপতি দেবীর ঘট পায়ে ঠেলে ফেলে দেন। এ অপরাধে চণ্ডী ভীষণ ক্ষুব্ধ হন এবং ধনপতিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সমুদ্র বক্ষে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি এবং বানডেকে তার ছয় ডিঙা ডুবালেন। অবশেষে একটি ডিঙা নিয়ে কোনো রকমে ধনপতি সিংহল পৌঁছালেন। সমুদ্রবক্ষে দেবী ধনপতিকে মায়াদৃশ্য দেখালেন। একটি বিশাল পদ্মপাতায় এক অপূর্ব সুন্দরী ষোড়শী কন্যা একটি হাতিকে বারবার গিলছে এবং উগরাচ্ছে। সিংহল রাজসভায় ধনপতিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হয়, কিন্তু বিধিবাম কমলে-কামিনী প্রদর্শন করতে না পারার অপরাধে এবং মিথ্যা বলার অভিযোগে সিংহলরাজ ধনপতিকে কারাবন্দি করেন।

ধনপতি সিংহলে কারাবন্দি, এ দিকে উজানিনগরে ধনপতির অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী খুল্লনা পুত্র সন্তানের জননী হয়েছেন। স্বামীর অবর্তমানে খুল্লনা সযত্নে পুত্রকে মানুষের মতো মানুষ করেছেন। পুত্র বিদ্যা-বুদ্ধিতে অত্যন্ত পণ্ডিত হয়েছেন। গুরুর সাথে নানা শাস্ত্র নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। একদিন গুরু-শিষ্য তর্কাতর্কিতে ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীমন্ত ব্রাহ্মণ জাতিকে কটাক্ষ করলে ক্রুদ্ধ জনার্দন তাকে জারজ বলে গালি দেন। শ্রীমন্ত অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন পিতার সন্ধান করে আপনার জন্ম অপবাদ ঘুচাবেন। অনেক নির্বন্ধের পর মাতার সম্মতি এবং রাজার আদেশ নিয়ে শ্রীমন্ত পিতৃ-অন্বেষণে সিংহল অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাত্রা পথে কোনো বিঘ্ন না ঘটলেও সিংহল বন্দরের মোহনায় শ্রীমন্তও কমলে-কামিনী দেখলেন কিন্তু সঙ্গীরা আর কেউ দেখেননি। তার অবস্থাও তার পিতার মতো হলো। এবার রাজা এতটাই রাগান্বিত

হলেন যে, শ্রীমন্তকে প্রাণদণ্ড দিতে চাইলেন। কিন্তু দেবীর বিরোধিতায় রাজা ঐ আজ্ঞা পালন করতে ব্যর্থ হলেন। উপরন্তু দেবীর রোষে রাজবল সমূলে ধ্বংস হলো। অবশেষে রাজা সালবান মহামায়া দেবীকে প্রসন্ন করে তার পূজা করতে অঙ্গীকার করেন এবং শ্রীমন্তের হাতে তার একমাত্র কন্যা সুশীলাকে সমর্পণ করেন। রাজা ধনপতিকে মুক্তি দিলেন। বহুদিন পর পিতা-পুত্রের মিলন হলো। বণিক প্রধান ধনপতি পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীমন্তকে শেষ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলো। উজানি রাজা বিক্রমকেশরী আবদার করলেন, তাকে সেই দেশের মাটির ওপর কমলে-কামিনী দেখাতে হবে। শ্রীমন্তের ভক্তিতে প্রসন্ন দেবী মশানে তাঁর কমলে-কামিনী রূপ সকলকে দেখালেন। রাজা বিক্রমকেশরী খুশি হয়ে তার কন্যাকে শ্রীমন্তের হাতে সমর্পণ করলেন। কলিকালে মর্ত্যভূমিতে দীর্ঘদিন অবস্থান বড়ই কষ্টসাধ্য এ সত্য উপলব্ধি করে দেবী চণ্ডী খুল্লনা, শ্রীমন্ত এবং তার দুই পত্নীকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার পূর্বে ধনপতিকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন, লহনার গর্ভে তাঁর বংশধর পুত্র সন্তান জন্মাবে। এভাবে বণিক সমাজে চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হলো। *চণ্ডীমঙ্গলের* তিনটি আখ্যানের মর্মবাণী হচ্ছে বিবাহিত নারীর অন্তর্বেদনা এবং গার্হস্থ্যজীবনাচরণ। কাহিনির প্রত্যেকটি খণ্ডে ছত্রে ছত্রে গার্হস্থ্যজীবন চিত্র প্রতিবিম্বিত। এভাবে কাহিনি বর্ণনার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে ধনপতি উপাখ্যানের গার্হস্থ্যজীবন চিত্র।

একটি সমাজের গার্হস্থ্যজীবন পর্যালোচনায় সেই সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবস্থাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী যখন *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যটি লিখেন তখন তিনি নিজেই রাজনৈতিক সংকটের শিকার হয়ে ডিহিদার মামুদ সরীপের অত্যাচারে পিতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। দেশের আর্থিক অবস্থা ছিল বিপর্যস্ত। ধান গরু কেনার মানুষ নেই। খাজনার চাপ প্রবল। দেশে সুবিচার নেই, প্রজারা গ্রাম ত্যাগের পরিকল্পনা করায় চৌকিদার টহল দিতে থাকে এমনি এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে তালুকদার শ্রীমন্ত খাঁর পরামর্শে কবি স্বভূমি পরিত্যাগ করেন। কিন্তু দেশের উজানিনগর যে নগরকে সমৃদ্ধ নগর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল বলে মনে হয় কারণ এখানে অভাব-অনটনের তেমন চিহ্ন নেই। প্রধানত ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কালপর্বে *চণ্ডীমঙ্গলের* প্রধান কাব্যগুলি রচিত হয়েছে। এ শতাব্দীতে বাংলার অর্থনীতি মুঘল আধিপত্য ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পরিচালিত হতো। বাংলার অর্থনীতি কৃষি প্রধান হলেও শিল্প ও বাণিজ্যনীতিও সমৃদ্ধ ছিল। মুঘল আমলে সাধারণত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রচলিত ছিল। তবে সাধারণ মানুষ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করতে পারতেন না। স্বর্ণ মুদ্রাকে মোহর বলা হতো যা ধনী ও জমিদারদের কাছে গচ্ছিত থাকত। দেবী চণ্ডী কালকেতুকে যে সাতঘড়া ধন দিয়েছিলেন সেগুলি আসলে মোহর ছিল। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে টাকার ব্যবহারও দেখা যায়। মুরারী শীল সাত কোটি টাকা দিয়ে কালকেতুর নিকট হতে মানিক অঙ্গুরি কিনেছিলেন। তবে দৈনন্দিন জীবনে লেনদেনের মাধ্যম ছিল কড়ি। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে দুর্বলার বেসাতি অংশে দুর্বলা যখন বাজারে যায় তখন পঞ্চাশ কাহন কড়ি নিয়ে যায়। দুর্বলা যে সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করে তা আমাদের বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য এবং নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী-নালা-খালবিল থেকে প্রাপ্ত মিঠা পানির দেশি মাছ। মুদ্রার একক বড় হিসেবে পণ ও কাহন এবং ছোট একক হিসেবে গণ্ডা ব্যবহৃত হতো। সাধারণ মানুষ কড়ির অভাবে দ্রব্য বিনিময় করতেন। মূল্যবান ধাতু যেমন সোনা ও রূপা পরিমাপের একক রতি এবং তেল, ঘি, চাল ও ডাল পরিমাপের একক সের।

ধনপতি সদাগর ধনী বণিক; ভোগীও বটে। প্রথম স্ত্রী ঘরে থাকা সত্ত্বেও তিনি নির্দ্বিধায় দ্বিতীয়বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, পায়রা ওড়াতে ভালোবাসেন। ভালোবাসেন সস্ত্রীক পাশা খেলতে। দুই স্ত্রী রয়েছে তার, পিতা গত হয়েছেন। এছাড়াও দাস-দাসী নিয়ে ধনপতির একান্নবর্তী সুখের পরিবার। উজানিনগরের রাজা বিক্রমকেশরীর রাজ্য ও তার ব্যক্তি পরিচয় থেকে বোঝা যায় অর্থনৈতিক অবস্থা—

উজানি নগর   অতি মনোহর
বিক্রমকেশরী রাজা

শোল উপচারে নিত্যে পূজা করে
কৃপা কৈল দশভুজা॥
জেন রঘু রাজা হেন পালে প্রজা
কর্ণের সমান দাতা
যুধিষ্ঠির বাণী শুকদেন জ্ঞানী
প্রসন্ন মঙ্গলা মাতা॥
... ...
পাথরের গড় উচ্চতর বড়
কাঙ্গুরা পুরট শোভা
পাথর খিচনি জেন দিনমুনি
চৌদিকে মানিক-আভা॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১১২-১১৩)

এমন এক রাজ্যের বাসিন্দা ধনপতি সদাগর যিনি 'বংশানুক্রমে রাজার যোগানদার বেনিয়া অর্থাৎ অর্ডার সাপ্লায়ার'। (সুকুমার ; ১৯৯৫ : পৃ : ৪৩৬) কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের বদৌলতে বণিক শ্রেণির হাতে প্রচুর নগদ পয়সা ছিল। অর্থনৈতিকভাবে সমাজে তাদের অবস্থান ছিল সর্বোচ্চে। কবিকঙ্কণের কাব্যে গৃহবধূ লহনার উক্তিতে তার শ্বশুরকুলের বর্হিবাণিজ্যের একটি তথ্য পাওয়া যায়—

সসুরা আছিলা রঙ্ক আনিতা চন্দন শঙ্খ
সাজন করিআ সাত নায়
বেচা কিন্যা হইলে ধনী ইহা ভালে আমি জানি
কি বুঝাব অবলা তোমায়।
তঙ্কা চাহি প্রতি হাটে বস্যা খাইতে নাঞি আঁটে
জদি হয় কুবেরের ধন॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : : ১৯৪)

দ্বিতীয়বার বিয়ে করে ঘরে নতুন বধূ আনার সাথে সাথেই নববধূ খুল্লনাকে সতিনের হাতে সমর্পণ করে রাজাজ্ঞা পালনের জন্য ধনপতিকে গৌড়রাজ্যে বাণিজ্যযাত্রায় যেতে হলো। রাজা বিক্রমকেশরী একজোড়া সারি শুক পক্ষী পেয়েছেন—

রাজা বলে হেন পক্ষ কভু নাঞি দেখি
... ...
রাজা বলে ঝাট আন সুবর্ণ পঞ্জর
ঘৃত অন্ন দিয়া পক্ষ পালিব সত্বর॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১২৯)

এই পক্ষীর জন্য সুবর্ণ পঞ্জর তৈরির কারিগর উজানিনগরে না থাকায় ধনপতিকে সারি শুকের জন্য সুবর্ণ পঞ্জর সংগ্রহে গৌড়নগরে যেতে হয়। গৌড়রাজের নিকট ধনপতি নিজের এবং রাজার পরিচয় দিয়ে সুবর্ণ পঞ্জর প্রাপ্তির আবেদন জানালে রাজা প্রীত হয়ে কারিগরদের আদেশ দেন সুবর্ণ পঞ্জর তৈরির। কারিগরগণ রাজাকে জানান দশ-বিশ জন রাত দিন পরিশ্রম করলেও সুবর্ণ পঞ্জর তৈরি করতে ছয় মাস সময় লাগবে ফলে ধনপতি সংসার ভুলে স্ত্রীদের ভুলে প্রায় এক বছর গৌড়রাজ্যে অবস্থান করেন পরে দেবী চণ্ডী কর্তৃক স্বপ্ন দর্শনে খুল্লনার ওপর অত্যাচারের কথা অবগত হয়ে উজানিনগরে ফিরে আসেন। রাজ্যে ফিরে এসে দুই স্ত্রী নিয়ে বেশ সুখেই দিন যাপন করছেন কিন্তু রাজ্যে চন্দনের অভাব হওয়ায় আবার রাজাজ্ঞা পালনের জন্য ধনপতিকে সিংহলে বাণিজ্য যাত্রায় যেতে হয়। প্রকৃত বাণিজ্য যাত্রা বলতে যা বোঝায় ধনপতির জীবনে সিংহল যাত্রায় তা নিহিত ছিল। এবার বাণিজ্য যাত্রায় যেতে দিতে খুল্লনার মন সায় দিচ্ছিল না কারণ খুল্লনা অনেক অমঙ্গল চিহ্ন দেখেছিলেন। এজন্য খুল্লনা স্বামীর মঙ্গল কামনায় দেবী চণ্ডীর পূজা দেন। পরম শৈব ধনপতির কাছে খুল্লনাকে হেয় প্রতিপন্ন করার নিমিত্তে লহনা খুল্লনার চণ্ডী পূজার বার্তা স্বামীকে প্রেরণ

করেন। খবর প্রাপ্তির সাথে সাথে ধনপতি পূজারত খুল্লনাকে ভর্ৎসনা করেন এবং চণ্ডীর ঘট পায়ে ঠেলে ফেলে দেন যা খুল্লনার কাছে আরও বেশি শঙ্কার। এমন এক পরিস্থিতিতে স্বামীর জীবন সংশয় মনে করে খুল্লনা তাকে বাণিজ্য যাত্রায় নিষেধ করেছেন—

প্রাণনাথ সিংহল গমনে নাহি সাধ
স্বকীয় চন্দন শঙ্খ দিআ হব নিরাতঙ্ক
রাজস্থানে লইব প্রসাদ
ভাণ্ডারে আছএ নীলা মসার নিকষশিলা
মানিক বিদ্রুম মরকতে
জত আছে নিজাগারে দেহ নিঞা নৃপবরে
সুখে থাক নিজ জায়া সাথে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৯৩)

উদ্ধৃতাংশটিতে একদিকে ধনপতির বাণিজ্যযাত্রায় পত্নী খুল্লনার শঙ্কা অন্যদিকে তাদের পরিবারে গচ্ছিত সম্পদের পরিমাণ যা দ্বারা অন্তত একবার বাণিজ্যযাত্রা থামিয়ে গচ্ছিত সম্পদ দ্বারা রাজাজ্ঞা পূরণ করা যেতে পারে বলে খুল্লনা প্রস্তাব করেছেন। আর্থিক সংগতি কতটা ভালো হলে পত্নী এমন সিদ্ধান্ত স্বামীকে দিতে পারেন খুল্লনার প্রস্তাবে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

মনসামঙ্গল কাব্যের নায়ক চাঁদ সদাগর এবং *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের বণিক খণ্ডের ধনপতি ও শ্রীমন্ত-এর বাণিজ্য যাত্রা উপলক্ষ্যে বাণিজ্যতরীর সুবিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগর চৌদ্দ ডিঙ্গা এবং ধনপতি সপ্ত ডিঙ্গা নিয়ে সিংহলে বাণিজ্য যাত্রা করেন। এদের প্রত্যেক ডিঙ্গার একটি করে নাম ছিল তবে দুই বহরেরেই প্রধান তরীর নাম ছিল মধুকর। সদাগর নিজে এ মধুকর তরীতে অবস্থান করতেন। তরীগুলো মূল্যবান গজদন্ত ও স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা খচিত থাকত যা দ্বারা একটি সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুমান করা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যে সব সময়ই অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন বাংলার বণিক সম্প্রদায়। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে জানা যায় কীভাবে বাংলার সুচতুর বণিকেরা বিদেশের মূল্যবান দ্রব্যের পরিবর্তে তাদের সাধারণ পণ্যদ্রব্য বিনিময় করে লাভবান হয়েছেন। নৌ-শক্তি ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বর্হির্বাণিজ্যে বাংলার বণিকেরা অর্থশালী হয়ে উঠেছিলেন। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে সেকালের বর্হির্বাণিজ্যে আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলো হলো বাংলার কৃষিজ ও কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য-কুরঙ্গ, নারকেল, আকন্দ, বয়ড়া, পাটজাত দ্রব্য, হরিণ, পায়রা, কাচ, চিনি, লবণ—এছাড়া বিভিন্ন প্রকার ফল ও মসলা। আমদানি দ্রব্যগুলির মধ্যে অন্যতম হাতি, ঘোড়া, বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান পাথর (নীলা, মুক্তা, মানিক্য ও শঙ্খ)।

উজানিনগরে বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে চণ্ডীর পূজা প্রচারের জন্যে চণ্ডীর ইচ্ছায় স্বর্গের নর্তকী রত্নমালা মর্ত্যে ইছানিনগরে লক্ষপতি ও রম্ভাবতীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন—

দেখিতে দেখিতে ভস্ম হৈল রত্নমালা।
রিতুবতী হইআছে রম্ভা বাইনানি
... ...
নবম দিবস রিতু হইল অবশেষ
তার গর্ভে রত্নমালা করিল প্রবেশ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১১১)

—কবি এখানে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যা আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুরূপ। মহিলারা ঋতুবতী হওয়ার নবম দিনে গর্ভবতী হতে পারেন কবি সে তথ্য প্রদান করেছেন। এ থেকে কবির বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে কিছুটা হলেও কবি জ্ঞান রাখতেন অথবা নিজ জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সক্রিয় ছিল বলে অনুমান করা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে কবির এ

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে আশার আলো বিকিরণ করে। রম্ভাবতী গর্ভবতী, গর্ভাবস্থায় একজন মায়ের শারীরিক, মানসিক এবং দৈহিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। শারীরিক দুর্বলতা, সুখাদ্যে অরুচি এবং অখাদ্যে রুচি এগুলো অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কবি মুকুন্দরাম গর্ভবতী মায়ের এ পরিবর্তনগুলো সংবেদনশীল হৃদয় দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

কোনো এক শুভক্ষণে রম্ভাবতী অপূর্ব সুন্দরী এক কন্যা সন্তান প্রসব করেন। তৎকালে এমনকি বর্তমান যুগেও দম্পতিরা প্রথম সন্তান হিসেবে পুত্র সন্তানের প্রত্যাশা করে থাকেন। তখনকার দিনে লোকেদের ধারণা ছিল পুত্র সন্তান না থাকলে নরকবাস হয় এবং পরকালে পিণ্ডজল দানের কেউ থাকে না। এজন্য পুরুষেরা বহুবিবাহ করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। যদিও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় পুত্র সন্তান জন্ম দেয়া না দেয়ার সাথে নারীর কোনো হাত নেই। তবে রম্ভাবতী কন্যা সন্তান প্রসব করার পর ব্যতিক্রমী দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কন্যা জন্মগ্রহণের পর মাতা-পিতাসহ এলাকার সকলে আনন্দিত হন। কন্যার যেন কোনো অমঙ্গল না হয় এবং কোনো অশুভ শক্তি যেন কন্যাকে ক্ষতি করতে না পারে এজন্য আতুর ঘরে গোমুণ্ড স্থাপন করা হয়। পাড়া-পড়শি সকলে আনন্দ-উল্লাস করতে থাকেন। আনন্দের সাথে হুলাহুলির মধ্য দিয়ে নব জাতকের নাড়িচ্ছেদ করা হয়। এরপর সন্তান-জন্মপরবর্তী অনুষ্ঠানগুলি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালিত হয়েছে—

গোমুণ্ড স্থাপিলা দ্বারে পূজে ষষ্টি-বুড়ি।
হুলাহুলি দিআ কইল নাড়ির ছেদন
… … …
ছয় দিনে ষষ্টি পূজা কইল জাগরণে
… … …
নত্যা কৈল নয় দিনে মনের হরিষে
খুল্লনা বলিআ নাম থুইল পূর্ণমাসে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১১১)

দিনে দিনে কন্যা মনোহর বেশ ধারণ করতে থাকে। কন্যার রূপ দেখে মাতা-পিতা একদিকে যেমন খুব খুশি হন আবার সাধারণ বাঙালি মাতা-পিতার ন্যায় চিন্তায় চোখের ঘুম হারিয়ে ফেলেন—

দিতে নাঞি উপমা খুলনা রূপের সীমা
বদনে চান্দের করে আল।
… … …
কুচ দাড়িম্বের ফল মাঝা মৃগরাজ তুল
উরুযুগ জিনি রামকলা॥
… … …
চরণে মঞ্জীর বাজে স্বর্গবিদ্যাধরী সাজে
যৌবন বাড়ায় দিনে দিনে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১১২)

গুরুগৃহে অথবা কোনো টোলে গিয়ে খুল্লনার বিদ্যা শিক্ষার উল্লেখ কাব্যে কোথাও নেই। তবে ধনপতির জাল চিঠি যখন খুল্লনার হাতে দেওয়া হয় তখন খুল্লনা চিঠির অক্ষর দেখে বুঝতে পারেন এ লেখা তার স্বামী ধনপতির নয়। এ থেকে স্পষ্ট যে, খুল্লনা সামান্য হলেও লিখতে পড়তে বা অক্ষর সম্পর্কে ধারণা রাখতেন। খুল্লনা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছেন এবং পিতা লক্ষপতি এবং মাতা রম্ভাবতীর ভাবনা বাড়ছে। বিবাহযোগ্য কন্যা ঘরে থাকলে সৎ পাত্রে তাকে পাত্রস্থ করার জন্য প্রত্যেক মাতা-পিতা ভাবনায় নাওয়া খাওয়া ভুলে যান। সৎ বংশে, সৎ পাত্রে কন্যা দান করলে কন্যার কোনো গঞ্জনা হয় না এ বিশ্বাস থেকেই প্রত্যেক মাতা-পিতা বিয়ের সময় পাত্র-পাত্রীর বংশ মর্যাদা দেখে থাকেন—

লক্ষপতি বলে মোর সফল মানস
নাহি জানি কন্যা মোর হয় কার বশ।
কুলে শীলে দোষহীন লয় জেই জন
তার ঘরে কন্যা যদি করি সমর্পণ।
... ...
অকুলীনে দিলে সুতা থাকএ গঞ্জন॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১১২)

ধনপতি-খুল্লনার বিয়েতে ঘটকালি করেছিলেন জনাই পণ্ডিত। বিয়ে সংঘটনে এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘটকগণ কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষকে সামাজিক প্রথার দোহাই দিয়ে যে কোনো শাস্ত্র নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দিতেন। *কবিকঙ্কণচণ্ডীতে* ধনপতি ও খুল্লনার বিয়েতে এমন সব বিধানের উল্লেখ দেখা যায়। জনাই পণ্ডিত দোজবর ধনপতির সাথে খুল্লনার বিয়ের প্রস্তাব পাড়ার পূর্বেই খুল্লনার পিতা লক্ষপতিকে শাস্ত্রের বিভিন্ন বিধান শুনিয়ে তাঁকে মানসিক ভাবে বিভ্রান্ত করেছিলেন ফলে দোজবর ধনপতির সাথে তার স্নেহের কন্যা খুল্লনাকে বিয়ে দিতে লক্ষপতি কোনো আপত্তিই তুলতে পারেননি। এ তথ্য দৃষ্টে তৎকালে শাস্ত্রাচারের প্রতি মানুষের অগাধ বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়—

শুন হে অবুধ লক্ষপতি
বার বৎসরের সুতা তোর ঘরে অস্থিতা
কেমনে আছহ শুদ্ধমতি॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১১৫)

এরপর জনাই পণ্ডিত কত বৎসরে কন্যা বিয়ে দিলে পুণ্য সঞ্চয় হয় আর কত বৎসরে বিয়ে দিলে পাপ হয় তার একটি পরিসংখ্যান লক্ষপতির সামনে উপস্থাপন করেন নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য-

সপ্ত বৎসরের কন্যা বিভা দিলে হয় ধন্যা
তার পুত্র কুলের পাবন।
... ...
নবম বৎসরে যদি বর পাই যথাবিধি
তনয়া করিয়ে সম্প্রদান।
তার পুত্র দিলে জল সুরলোকে পাই স্থল
পিতৃলোকে হয় বহুমান॥
... ...
না করি সে কর্ম ভাল এগার বৎসর গেল
অপযশ করিলে সঞ্চয়
দ্বাদশ বৎসর বেলা রজস্বলা হয় বালা
পুরুষেরে নাঞি করে ভয়।
... ...
বর দেখি অভিরাম যদি করে কন্যা কাম
পায় পিতৃ নরকে যন্ত্রণা॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১১৫-১১৬)

ঘটক প্রদত্ত এ বিধানে পাপ-পুণ্যের বিচারের চেয়েও আর একটি বিষয় খুব স্পষ্ট সেটি হচ্ছে মেয়েরা একটু বড় হলে অর্থাৎ রজস্বলা হলে তারা একটু প্রতিবাদী হয়ে যেতে পারে, স্বামীকে হয়ত অতটা ভয় পাবে না এ বিষয়টি পুরুষ প্রধান সমাজে ক্রিয়াশীল ছিল। এটা মেয়েদেরকে দমিয়ে রাখারই একটি চক্রান্ত। তাই ঘটক প্রদত্ত বিধান শুনে লক্ষপতি মানসিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন এবং পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য আদরের কন্যাকে দোজবর পাত্রের হাতে সমর্পণ করতে মনস্থ করেন। অবশেষে ঘটকের নিকট হতে বণিক প্রধান ধনপতির অর্থ, সম্মান ও গৌরব বিবেচনা করে স্বীয় কন্যাকে ধনপতির হাতে সমর্পণ করতে লক্ষপতি রাজি হন। রাজি

হওয়ার আরও একটি কারণ ছিল গণক পাঁজিপুথি বিচার করে দেখেন খুল্লনার বৈধব্য যোগ আছে। ফলে গণক দ্বিতীয় বা দোজবর পুত্রের হাতে কন্যা সমর্পণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাই কন্যার পিতা ঘটকপ্রদত্ত সকল বিধান বিবেচনায় নিয়ে ধনপতির হাতে কন্যা সমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মাতা রম্ভাবতী কখনই এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারেননি। কারণ একজন মা কখনই তার কন্যাকে দোজবরের হাতে তুলে দিতে পারেন না। সতিনের ঘরে কন্যা সম্প্রদান করা আর কন্যাকে বাঘের মুখে ছেড়ে দেওয়া একই কথা। তার চেয়ে ভালো গলায় কলসি বেঁধে গঙ্গার জলে ডুবে মৃত্যুবরণ করা—

খুল্লনা বাঁন্ধিআ গলে ঝাঁপ দিব গঙ্গাজলে
নাঞি দিব দারুণ সতীনে॥
... ...
দু তিন সতিন জার বিফল জীবন তার
দিন ব্যের্থ না জায় কন্দলে
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১১৭)

সতিনের ঘরে কন্যা দিলে তার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। সুন্দর ও সুস্থ দিন সতিনের ঘরে কামনা করা অকল্পনীয় কারণ কন্দল ছাড়া কোনো দিনই সতিনের ঘরে সূর্য অস্ত যায় না। এ বাস্তবতা মধ্যযুগের বাঙালির গার্হস্থ্যজীবনের এক নৈমিত্তিক বিষয়। তাইতো সতিনের ঘরে কন্যা সম্প্রদান করতে রম্ভাবতীর ঘোর আপত্তি। অবশেষে গণকের বিধান শুনে রম্ভাবতীও কন্যা সমর্পণ করতে আর কোনো আপত্তি করলেন না—

গণক কহিল মোরে দিবে দ্বিতীয় বরে
বিচারিএ বিধবা লক্ষণ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১১৭)

ঘটকের শাস্ত্রীয় বিধান এবং খুল্লনার বিয়ের বয়স দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় প্রাচীন ও মধ্যযুগে সমাজে বাল্যবিবাহ জনপ্রিয় ছিল এবং বারো বছরের পূর্বে কন্যাকে বিয়ে দিলে পুণ্য সঞ্চয় হয় বলে সর্ব সাধারণের মধ্যে মনগড়া বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। সবকিছু দৈব নির্ধারিত মনে করে কন্যার কল্যাণে রম্ভাবতী ধনপতির হাতে খুল্লনাকে বিয়ে দিতে রাজি হলেন। তবে সেই সময়ে বিয়ের আগে হবু জামাতাকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে এনে লক্ষপতি দম্পতি শুধু দুঃসাহসেরই পরিচয় দেননি বরং ঘটিয়েছেন আধুনিকতার উন্মেষ। এ অসাধ্য সাধনের মধ্য দিয়ে রম্ভাবতীর রুচি ও পারিবারিক মূল্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে—

সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় দিল রম্ভাবতী
নিমন্ত্রিআ জামাতারে আনে লক্ষপতি
বসাইল জায়া তারে লোহিত কম্বলে
কেহ জল দেয় কেহ চরণ পাখালে॥
... ...
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রম্ভা বসিতে আসন।
রব দেখা আইয়গণ আনন্দে মোহিত॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১১৭–১১৮)

তৎকালে মাতা-পিতা বিশ্বাস করতেন বারো বছরের পূর্বে কন্যাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসাতে পারলে পুণ্য অর্জন করা যাবে। খুল্লনা আসন্ন বৈশাখে বারোতে প্রবেশ করবে এজন্য লক্ষপতির তাড়া ছিল বেশি কারণ বৈশাখের পূর্বেই খুল্লনাকে বিয়ে দিতে হবে। পাঁজিপুথি দেখে গণক যখন ঘোষণা দেন আগামী এক বছরের মধ্যে তেমন কোনো শুভযোগ নেই লক্ষপতির মাথায় তখন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে এবং তিনি তখনই নিম্নোক্ত উক্তি করেন—

বৈশাখে হইব কন্যা বারতে প্রবেশ
ফাল্গুনে করহ লগ্ন কহিল বিশেষ।
লগ্ন করেন ওঝা শুভক্ষণ গনি।

গণিঞা নির্ণয় কৈল উত্তর ফল্গুনী।
পূজা পাইআ গেলা ওঝা আপন ভুবনে
কহিল সকল কথা ধনপতি স্থানে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১২১)

বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হওয়ার পর উভয় পরিবারে বৈদিক এবং স্ত্রী-আচার পালনের ধুম পড়ে যায়। সমস্ত আচার-পার্বণ মেনে ধনপতি ও খুল্লনার বিয়ে সম্পন্ন হয়। তবে আচার পালনে অনেকটা আভিজাত্যের ছোঁয়া ছিল। ধনপতির বাড়ি থেকে অধিবাসের যে সজ্জা আসে সেখানে মঙ্গলগীত গাইতে গায়েনরাও আসেন—

অধিবাসের লইআ সাজ চলিল ঘটকরাজ
কুলীন পণ্ডিত পুরোহিত
আগু পাছু সারি সারি সজ্জ লয়ে জায় ভারি
গায়েনে মঙ্গল গায় গীত॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১২১)

বরের বাড়ির সজ্জা ও তত্ত্ব দিয়ে খুল্লনার অধিবাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়—

সকল দোষহীন হইল শুভ দিন
ধরে কন্যা মনোহর বেশ
হরিদ্রারঞ্জিত ধূতি পরাইল রম্ভাবতী
বৈসে রামা জনক সকাশে।
খুল্লনার গন্ধ-অধিবাস॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১২২)

বরের বাড়ি হতে অধিবাসের তত্ত্ব আসার পর কন্যার অধিবাস সম্পন্ন হওয়ার মধ্যে উভয় পরিবারের আভিজাত্য প্রকাশ পেয়েছে। এটা ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সংস্কৃতিরও একটি অংশ। তবে অনার্য ব্যাধ সম্প্রদায়ের বিয়েতে অর্থাৎ কালকেতু উপাখ্যানেও কালকেতু-ফুল্লরার বিয়েতে অধিবাসের তত্ত্ব পাঠানোর ইঙ্গিত পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

ধনপতি বিয়ের সাজে সজ্জিত হয়ে গাম্ভারীর পীঠে চড়ে কন্যার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। বরকে ছাঁদনাতলায় লোহিত কম্বলে বসতে দেয়া হলো। চারদিকে জয় জয় ধ্বনি, ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র পাঠ করছেন, বরযাত্রীরা আনন্দ-উল্লাস করছেন, ছাঁদনাতলার আচার-পার্বণ শেষে লক্ষপতি অঙ্গুরি, বাজুবন্দ, বসন-ভূষন, চন্দন দিয়ে জামাইকে বরণ করলেন—

অঙ্গুরি অঙ্গদ হার ভূষণ চন্দন
দিআ লক্ষপতি করে বরের বরণ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১২৪)

সাতপাক, শুভদৃষ্টি, মালাবদল এবং কন্যা সম্প্রদানের মধ্য দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় তারপর নবদম্পতি কুসুম-শয্যায় রাত অতিবাহিত করেন—

দম্পত্যে প্রবেশে ঘরে খিরখণ্ড ভোগ করে
কুসুমশয়নে গেল রাতি॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১২৫)

আমরা ইতঃপূর্বেও লক্ষ করেছি যে, মধ্যযুগে বাংলা মঙ্গলকাব্যধারায় নারীগণের পতিনিন্দার বিষয়টি কাব্যাঙ্গিকের অনিবার্য অংশে পরিণত হয়েছিল। বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ*-এ, জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে এবং অন্যান্য কবির রচনায় নারীগণের পতিনিন্দার বিষয়টি সংযুক্ত আছে। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যধারায় দ্বিজমাধব, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, মুক্তারাম সেন প্রমুখ কবির রচনায়ও নারীগণের পতিনিন্দার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। *শিবমঙ্গল*, *ধর্মমঙ্গল* এমনকি ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গলকাব্যেও* পতিনিন্দার বিষয়টি বাদ যায়নি।

প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেই নারীগণের পতিনিন্দার বিষয়টি একই রূপে, একই গ্রন্থনে উপস্থাপিত। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যধারায় হর-পার্বতী এবং ধনপতি-খুল্লনার বিয়েতেও পতিনিন্দার কাহিনি গ্রথিত। দ্বিজমাধবে ধনপতি-খুল্লনার বিয়েকে কেন্দ্র করে ধনপতির রূপ দেখে নারীদের দীর্ঘশ্বাস পড়েছে—

বরণ করয়ে তবে রম্ভাল বাণ্যানী।
সাধুর রূপ দেখিতে ভোলে যথ সীমন্তিনী॥
দয়মন্তী বোলে মোর কি ছিল কপালে।
স্বামী বৃদ্ধ হইল মোর যৌবনের কালে॥
পৃষ্ঠে কুজ পক্বকেশ লড়য়ে দশন।
অবিরত হস্তপদ কম্পিত সঘন॥
(দ্বিজমাধব ; ১৯৫২ : পৃ : ১২৮-১২৯)

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে তিনটি বিয়ে সংঘটিত হয়েছে। কালকেতু-ফুল্লরা এবং ধনপতি-খুল্লনার বিয়ের পাশে তিনিই প্রথম *চণ্ডীমঙ্গলের* দেবখণ্ডে পুরাণ-বর্ণিত শিব কাহিনিতে হর-পার্বতীর বিয়ের দৃশ্য যোজনা করেন। সেখানেও শিবের মদনমোহন রূপ দেখে উপস্থিত নারীগণ গৌরীর সৌভাগ্য এবং নিজেদের দুর্ভাগ্য মনে করে শোকে কাতর হয়ে নিজ নিজ পতিনিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে। লৌকিক খণ্ডে ধনপতি-খুল্লনার বিয়ে সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই ধনপতির সৌন্দর্য দেখে নারীগণ নিজ নিজ কপালকে দুষে আপন পতির নিন্দায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন—

সবে বলে খুল্লনার বর মিল্যাচে ভাল।
মদনমোহন রূপে ঘর কর্য্যাচে আল॥
এক জুবতি বলে সই মোর কর্ম মন্দ।
অভাগিআ পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ॥
... ...
আর জুবতি বলে সই গোদা মোর পতি।
কোয়াজ্বরের ঔষধ সদাই পাব কতি।
গোদে তৈল দিতে কত তুলিব নাকার॥
... ...
এক জুবতি বলে সই মোর কর্মের দোষে ।
খাট ভাতার ঢেঙ্গা মাগু দেখ্যা লোক হাসে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১১৮)

সম্ভবত মধ্যযুগে নারীরা বিবাহিত জীবনে সুখী ছিলেন না। নিজ নিজ পতি নিয়ে সুখে ছিলেন না বলেই অন্যের সুদর্শন পতি দেখে কখনো হিংসা, কখনো ঈর্ষা আবার কখনো বেদনা ও বিষাদে অথবা জীবনে অপ্রাপ্তিজনিত হতাশায় অথবা মাতা-পিতার প্রতি অভিমানবশত নিজ নিজ পতি নিন্দায় জমানো দুঃখ উৎগীরণ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে মঙ্গলকাব্যে গার্হস্থ্যজীবনের এক দুঃখ-আচ্ছাদিত অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে।

বিয়ের পর দিন সকলের আশীর্বাদ নিয়ে ধনপতি সস্ত্রীক নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনের পর নববধূকে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুজন মিলে নানা উপহার দিয়ে বরণ করেন। স্বদেশে আসার পরই ধনপতিকে রাজাজ্ঞা পালনের জন্য নববধূকে রেখে গৌড়ে গমন করতে হলো। ধনপতি লহনার ওপর খুল্লনার সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে গৌড়ের উদ্দেশে যাত্রা করেন। প্রথমাবস্থায় লহনা খুল্লনাকে সাদরে গ্রহণ করলেও দাসী দুর্বলার প্ররোচনায় সপত্নী খুল্লনার ওপর অমানুষিক অত্যাচার করতে থাকেন। লহনার স্নেহ অচিরেই গরলে পরিণত হয়। লহনা তার সই লীলাবতীকে দিয়ে জাল চিঠি লিখে খুল্লনাকে দেন। সপত্নী লহনার চক্রান্ত এবং চিঠির ভাষা ও লিপি দেখে খুল্লনা সমস্ত ঘটনা বুঝতে পেরেও দৈহিক বলের কাছে পরাজয় স্বীকার করে সমস্ত কষ্ট মাথা পেতে নেন। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও স্বামীর প্রতি খুল্লনার প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল অটল এবং অবিচল। স্বামীর প্রতি নারীর এ উৎকণ্ঠা নারীকে মহিমান্বিত করে। স্বামীর

প্রতি অগাধ বিশ্বাস থেকেই খুল্লনা বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বামী কখনই তাকে এত নিষ্ঠুর আদেশ দিতে পারেন না। এ বিশ্বাসের জোরেই খুল্লনার দুঃখ-তপস্যার তিমির রাত অতিবাহিত হতে থাকে। তবে লহনার সমস্ত কথাই যে, খুল্লনা নির্বিচারে মেনে নিয়েছেন তা কিন্তু নয়। তিনি প্রতিবাদ করেছেন, কলহ করেছেন সর্বোপরি মল্ল যুদ্ধ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু খুল্লনা ছিলেন শারীরিক দিক দিয়ে লহনার চেয়ে দুর্বল তাই মল্ল যুদ্ধে খুল্লনা লহনার সাথে পেরে ওঠেননি। এখানেই খুল্লনার পরাজয় এবং লহনার জয় হয়েছে। সপত্নীর বিদ্বেষের বাষ্পে খুল্লনার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। স্বামীর অনুপস্থিতে সতিন সতিনের ওপর কতটা নির্দয় হতে পারেন, কী অমানুষিক যন্ত্রণা দিতে পারেন লহনা তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। লহনা খুল্লনাকে ঢেঁকিশালে শয়নের ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হননি তাকে ছাগল চরাতে বাধ্য করেছেন। খেতে দিয়েছেন পোড়া ছাইমাখা দুর্গন্ধযুক্ত তণ্ডুল। জল দিয়েছেন ভাঙা নারকেলের মালায়। কখনও কখনও অন্ন-ব্যঞ্জন দিয়েছেন তবে লবণ ছাড়া। জ্বরে খুল্লনার গা পুড়ে গেলেও ছাগল চরানো থেকে রক্ষা পাননি। সপত্নী বিদ্বেষের এমন করুণ চিত্র পাওয়া যায় *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের বণিক খণ্ডে—

পুরান খুদের জাউ কিছু আছে কোন
সকল ব্যঞ্জনে বাঁজি না দিয়াছে লোন।
… … …
কিছু খায় কিছু পেলে খুল্লনা সুন্দরী
তৃণের শয্যাতে তার গেল বিভাবরী।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৪১)

বাংলার গার্হস্থ্যজীবন সম্পর্কে মুকুন্দরাম অত্যন্ত সচেতন। নারীর মান-অভিমান নিবৃত্ত করার জন্য কী পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন সম্ভবত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর বেশ ভালোই জানা ছিল। এই অভিজ্ঞতা তিনি আরোপ করেছেন ধনপতি চরিত্রে। প্রথম স্ত্রীর অনুমতি না নিয়ে দ্বিতীয়দার গ্রহণ করা অন্যায় এবং সম্ভবত সেই সময়ও বিষয়টি অনৈতিক বলে বিবেচিত হতো। তাই ধনপতি প্রথমা স্ত্রী লহনাকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে সম্মতি আদায় করেন। নারীরা অল্পতেই তুষ্ট, মিষ্টি কথা এবং সামান্য উপহার পেলেই তারা স্বামীর জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেন—

পরিতোষে লহনারে দিল পাট সাড়ি
পাঁচ পল সোনা দিল পরিবারে চুড়ি।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১২০)

লহনা চরিত্র সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন যে, 'লহনা চরিত্রটি মুকুন্দরামের কল্পনায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রকৃতি সরল, জীবন সম্পর্কে গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিবার শক্তি তাহার নাই। যখন শুনিতে পাইল, স্বামী তাহার সপত্নী আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন সে পা ছড়াইয়া বসিয়া নিতান্ত বালিকার মত কাঁদিতে লাগিল। আাবার পর মুহূর্তেই চুড়ি গড়াইবার জন্য স্বামীর নিকট হইতে পাঁচ পল সোনা এবং পরিধানের জন্য একখানি পাটশাড়ি পাইয়াই আশ্বস্ত হইল'। (আশুতোষ ; ২০০৯ : পৃ. ৪৩৩)। যদিও অলঙ্কার ও শাড়ির প্রতি নারীদের আলাদা দুর্বলতা থাকে কিন্তু লহনার মতো নির্বোধ নারী পৃথিবীতে বিরল। ধনপতিও স্বার্থপরের মতো স্ত্রীর ভালোবাসার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁদের দাম্পত্য জীবনে স্বার্থের পথে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করলেন তা তিনি অনুমান করতে পারলেন না এর বিষ কতটা তীব্র হলো। লহনাও তার বালিকা সুলভ সহজ-সরল প্রকৃতির জন্যই নির্দ্বিধায় সপত্নী খুল্লনাকে গৃহে বরণ করে নেন। কিন্তু এটাও সত্য, যে নির্বোধ সে অন্যের বুদ্ধিতে চলে নিজের সংসারে অশান্তি বয়ে আনে। লহনার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হলো। ধনপতি লহনাকে শুধু গয়না শাড়ির প্রলোভন দেখিয়েছেন তা নয় মিথ্যা বাক্য বলতেও তাঁর জিহবা আড়ষ্ট হয়নি। তিনি স্ত্রীকে এ বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, রান্না করতে করতে তার চেহারা মলিন হয়ে গেছে। সে সাজগোজ করার সময় পায় না এমনকি মাথা চিরুনি পর্যন্ত করতে পারে না। তাই তাকে সাহায্য এবং রান্নার কাজ করার জন্য একজন দাসী আনা প্রয়োজন—

রন্ধনের তরে আমি আন্যা দিব দাসী।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১১৯)

যেহেতু ধনপতি উজানিনগরের বণিক সমাজের প্রধান, তাই তার চাল-চলন আহার-বিহার শয্যা সবই রাজকীয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের আহারে শুক্তো এবং অম্বল বা টক থাকা আবশ্যক। ভোজনে শুক্তো দিয়ে শুরু এবং অম্বল দিয়ে সমাপ্তি:

লহনা কনক থালে জোগায় ওদন।
সুবর্ণের বাটিতে দুবলা দেই ঘি।
... ...
প্রথমে শুকুতা ঝোল দিল ঘণ্ট সাক।
প্রশংসা করএ সাধু বেঞ্জনের পাক।
ঘৃতে জবজব খায় মীন মাংস বড়ি।
অম্বল খাইআ পিঠা জল ঘটী ঘটী
দধি খায় ফেনি তায় শুনি মটমটী॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১১৯-১২০)

আমরা জানি যে, তেতো জাতীয় খাবার রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, টক বা চাটনি হজম শক্তি বৃদ্ধি করে। সম্ভবত মধ্যযুগেও জনমনে খাদ্য বিষয়ে এ ধারণা সক্রিয় ছিল। ধনপতির চলন-বলন, আহার বিহার, বাড়ি-ঘর, শয়নমন্দির সব কিছুর মধ্যে আভিজাত্যের ছোঁয়া বিদ্যমান। ধনপতিকে কনক থালায় ভাত এবং সুবর্ণের বাটিতে তরকারি জোগান দেয়া হতো। যেটা আভিজাত্যের নিদর্শন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক। ভোজন শেষে ধনপতি আচমন এবং মুখ শোধনের জন্য কর্পূর ও তাম্বুল তথা পান খান। এরপর বিনোদ মন্দিরে শয়ন করতে যান—

ভোজন করিআ সাঙ্গ কৈল আচমন
কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন॥
... ...
বিনোদ মন্দির মাঝে করিল শয়ন॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১২০)

মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাচারিতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রাধান্য বিস্তার করেছে। নারীদের প্রতিবাদ করাকে ধৃষ্টতা বলে গণ্য করা হতো। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় তারা নিজের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করতে দু'বার ভাবতেন না। তাইতো গৃহে পত্নী থাকা সত্ত্বেও ধনপতি দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ বা আফসোস করেননি। বহুবিবাহ সেকালে বিত্তশালী ব্যক্তির বিলাস ছিল। ধনপতি ভোগী, প্রেমে তার একনিষ্ঠতা নেই। খুল্লনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পূর্বেই দীর্ঘদিন তার গৃহ ছেড়ে প্রবাসজীবনে অবস্থান করার প্রয়োজন হলো। গৃহের কথা ভুলে, স্ত্রীদের কথা ভুলে প্রবাসে নতুন করে ভোগ বিলাসে মত্ত হলেন তিনি। ফলে দাম্পত্য সুখ তার জীবনে খুব বেশি স্থায়ী হয়নি।

লক্ষপতি কন্যার বৈধব্য যোগ আছে মনে করে খুল্লনাকে দোজবর পাত্রের সাথে বিয়ে দেন যা ছিল খুল্লনার কাছে অপমানের এবং দুঃখের। এই দুঃখবোধ এবং স্বামীবিচ্ছেদ তাকে আরও বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং তীক্ষ্ম হতে সহায়তা করেছে। লহনা-খুল্লনার বিবাদে সপত্নী বিদ্বেষের শোচনীয় যে চিত্র কবি উপস্থাপন করেছেন তা যেমন মর্মান্তিক তেমনি বেদনাদায়ক। এ বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি বহুবিবাহ-পীড়িত বাঙালি গার্হস্থ্যজীবনের এক কলঙ্কময় অধ্যায় উন্মোচন করেছেন। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিগত যৌবনা পত্নী যুবতী সতিন খুল্লনার ওপর চালিয়েছেন অত্যাচারের স্টিমরোলার। আর এই তুষের আগুনে আরও ঘি যুগিয়েছে দাসী দুর্বলা। সে উভয় পত্নীকে কুপরামর্শ দিয়েছে। দুর্বলা দাসীর স্পষ্ট জবাব যে ঘরে সতিনী

আছে সে ঘরে যদি দুই সতিনের মধ্যে কন্দল বাধানো না যায় তাহলে উক্ত ঘরের দাসীকে পাগল বলে সাব্যস্ত করা হয়—

জেই ঘরে দু-সতিনে না বাজে কন্দল।
সেই ঘরে রহে দাসী সে বড় পাগল॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৩২)

স্বাভাবিক ভাবেই দাসী দুর্বলা এ সুযোগটি কাজে লাগায়। সে দূতী হিসেবে একজনের কথা অন্য জনের কাছে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করতে থাকে। প্রথমা পত্নী লহনার রূপ-যৌবন বিগত হওয়ার মুখে ধনপতি খুল্লনাকে ঘরে আনেন। স্বাভাবিক কারণেই নবযৌবনা খুল্লনার ওপর ধনপতির আকর্ষণ বেশি থাকে। খুল্লনার প্রতি ধনপতির এই গভীর মনোযোগ এবং লহনার প্রতি অবহেলা লহনাকে আরও বেশি প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলে। লহনা বিদ্বেষের আগুনে দগ্ধ হতে হতে সুযোগ বুঝে খুল্লনার ওপর প্রতিশোধ নিতে তৎপর হয়। তাদের দুই সতিনের এ চুলোচুলি বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

দেখিয়া হুড়াহুড়ি বড় ঘরের বহুড়ি
নারীগণ পলায় ত্রাসে॥
(মুকুন্দরাম : ১৯২১ ; পৃ : ১৪৩)

বাড়ির কন্দল বাড়ির বাইরে এলে পাড়া-পড়শি ছুটে এসে কন্দল থামানোর বাহানা করে কন্দলকে উৎসাহিত করে মজা পাবে এটাই স্বাভাবিক। কন্দল করতে লহনা-খুল্লনা কেউ কারো চেয়ে কম নয়। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার জন্য পরাজয় খুল্লনারই হয়। লহনা স্বামীর প্রেয়সীকে খেতে পরতে চরম কষ্ট দিয়েও ক্ষান্ত হননি শেষ পর্যন্ত খুল্লনাকে ছাগল চরাতে পাঠিয়ে হিংসা কিছুটা প্রশমিত করেছেন। লহনার সপত্নী বিদ্বেষের আরও একটি কারণ সক্রিয় ছিল সেটি তার বন্ধ্যাত্ব। লহনা সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত- 'লহনা নিঃসন্তানা-সন্তানের অভাবে তাহার নারীত্ব অপূর্ণ রহিয়াছে ; সেইজন্য যে কোনও প্রকৃতির ক্রূর এবং নিষ্ঠুর আচরণই তাহা দ্বারা সম্ভব হইতে পারিতেছে। অতিক্রান্ত যৌবনা নিঃসন্তানা নারীর অতৃপ্ত মাতৃত্ব অসহায় সপত্নীর বিরুদ্ধে এক আদিম হিংস্র রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। মুকুন্দরামের রচনায় ইহা যেমন বাস্তব, তেমনই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরামের লহনা-খুল্লনার সপত্নী বিবাদ বিষয়ক দুইটি পদ হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, তাঁহার সংসারেও দুই সপত্নী ছিল'। (আশুতোষ ; ২০০৯ : পৃ. : ৪৩৩) —

একজন সহিলে কন্দল জায় দূর।
বিশেষে জানএ চক্রবর্তী ঠাকুর॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৬২)

সুতরাং লহনা এবং খুল্লনার মধ্যে সপত্নী বিদ্বেষের যে প্রত্যক্ষ চিত্র পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যায় কবি সমাজ-পরিবেশ এবং তাঁর নিজের পারিবারিক জীবন হতেই এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। সেই জন্যই লহনা-খুল্লনার সপত্নী বিবাদের চিত্র তিনি এতটা জীবন্ত করে উপস্থাপন করতে পেরেছেন।

বহুবিবাহজনিত সাংসারিক জ্বালা-যন্ত্রণা, সতিন কণ্টক এবং স্বামীর পরনারী লুব্ধতা সত্ত্বেও স্বামীই ছিল একজন নারীর জীবনে পরম আরাধ্য এবং পাথেয়। বস্তুত নারী ছিল পরান্নজীবী, পায়ের নিচে মাটি থাকতো না বলেই তাদের ভিত ছিল দুর্বল। তাই যে-কোনো উপায়ে স্বামীকে বশীভূত করে অধিকার আদায় করতে তারা মরিয়া হয়ে উঠতো। আর এ অধিকার হারানোর ভীতিবশতই নারীরা জড়িয়ে পড়তো নানাবিধ তুকতাক, ঔষধকরণ, মারণ উচাটনের মতো আদিম মানবগোষ্ঠী থেকে আগত জাদুবিদ্যাকেন্দ্রিক টোটেম, ফুল, ফল, জল ও তেল পড়ার মতো টোটেমে। স্বামীকে বশে রাখতে ঔষধ প্রবন্ধ করে লহনা যাতে ধনপতির কণ্ঠহার এবং খুল্লনার বিষনজরে পড়ে তার জন্য লহনা বশীকরণ উপাচার আনে সখী লীলাবতীর কাছ থেকে—

ঔষধ করিআ তোর সাধিব সম্মান।
... ...
সাধু হব কিঙ্কর খুল্লনা হব চেড়ি।
পত্রিকা ভাসাইআ আন্য হরিদ্রার মূল
যতনে আনিহ শ্মশানের তিল ফুল॥
ইহা বাট্যা দিহ সাধু-খুল্লনার বসনে
খুল্লনা পড়িব সাধুর বিষ-নয়ানে।
... ...
সোহাগ বাড়িব তোর দূর্গার সমানে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৩৫)

শুধু স্বামী বশীকরন ঔষধ নিয়ে লহনা ক্ষান্ত হননি এছাড়াও লীলাবতীর নির্দেশ অনুযায়ী লহনা খুল্লনাকে ছাগল চরাতে এবং খুঞ্চার ধূতি পরতে বাধ্য করে। এমনকি তাকে পুরানো খুদের জাউ সাথে বিভিন্ন প্রকার তরকারি দিলেও তাতে কোনো লবণ ও তেল দেওয়া হয় না। ফলে তা খাবার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। মূলত খুল্লনাকে শাস্তি প্রদানের জন্যই লহনার এ ব্যবস্থা। ঐ খাবার খুল্লনা কিছু খায় কিছু ফেলে দিয়ে কোনো রকমে বেঁচে থাকে। দুর্বলার কাছে খুল্লনার এরকম দুর্গতির কথা শুনে খুল্লনার মাতা রম্ভাবতী অত্যন্ত পীড়িত হন। একজন মায়ের কাছে তার সন্তান কতটা সাধনার, কতটা প্রিয় তা একমাত্র মা ব্যাখ্যা করতে পারেন। সেই সন্তান যদি কষ্টে থাকে, অনাদরে, অবহেলায় থাকে এবং তার ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয় তাহলে মায়ের বেঁচে থাকার আর কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। খুল্লনার মায়ের উক্তির মধ্য দিয়ে এমনিই আভাস পাওয়া যায়—

খুল্লনার তাপে আমি ত্যজিব পরাণ॥
সাজায়ে কাহারে দিলুঁ কনকের ডালি।
সাধের খুল্লনা ঝিয়ে কেবা দেয় গালি॥
সোনার পুতলি মোর আঁধারের বাতি।
কেন বা ঝিয়েরে মোর মারে কিল লাথি॥
(মুকুন্দরাম : ১৯২১ ; পৃ : ১৪৫)

এমন আদরের সন্তানকে যদি কেউ কষ্ট বা গালি দেয় সেই যন্ত্রণা একজন মায়ের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। বাঙালি গৃহগত জীবনে মায়ের কাছে সন্তানের স্থান অত্যন্ত চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে উল্লিখিত কাব্যাংশে।

মঙ্গলকাব্যে নায়িকার বারমাস্যা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিগণ একটি নির্দিষ্ট ছক নির্ধারণ করে রেখেছেন। যেখানে নায়িকার সাংবাৎসরিক দুঃখ-বেদনার কাহিনি বর্ণিত আছে। কোথাও কোথাও সুখের কাহিনিও বর্ণিত হয়েছে। যেমন ধনপতি উপাখ্যানে সুশীলার বারমাস্যা বর্ণনায় সুখের কাহিনি স্থান পেয়েছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যে ফুল্লরার বারমাস্যা ছাড়াও ধনপতি অংশে সংযোজিত হয়েছে আরও দুটি বারমাস্যা। একটি খুল্লনার অপরটি শ্রীমন্তের স্ত্রী সুশীলার। খুল্লনার বারমাস্যায় স্থান পেয়েছে ধনপতির গৌড়ে প্রবাসকালে খুল্লনার ওপর সতিনী লহনার অত্যচাােরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ।

প্রত্যেক ঋতু বদলের সাথে সাথে প্রকৃতিতেও আসে নানা পরিবর্তন। কখনো তা সুখের কখনো দুঃখের। সুখের পরিবর্তন খুল্লনাকে স্পর্শ করে না। তার মনে একদিকে প্রিয় প্রবাসে থাকার বেদনা ও উৎকণ্ঠা এবং অন্যদিকে সতিনের যন্ত্রণা। খুল্লনা তার কষ্টকে বনের তরুলতা, ভ্রমর ও কোকিলের সাথেও ভাগ করে নেন। অবশেষে চণ্ডী তার মাতা রম্ভাবতীর বেশ ধরে খুল্লনাকে সাক্ষাৎ দিয়ে মুক্তির পথ পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেন। খুল্লনার সর্ব্বশী ছাগল হারিয়ে যাওয়া, সেই ছাগল খুঁজতে গিয়ে দেবকন্যার সাক্ষাৎ পাওয়া এবং তাদের কাছ থেকে দেবীচণ্ডীর মাহাত্ম্য ও পূজা করার পদ্ধতি জেনে নেওয়া সব কিছুর মধ্যেই আছে চণ্ডীর রহস্য এবং খুল্লনাকে তার সকল কষ্ট থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণের ইঙ্গিত। খুল্লনা একনিষ্ঠচিত্তে চণ্ডীর পূজা করেন

এতে চণ্ডী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে স্বামী ফিরে পাবার এবং পুত্র সন্তান লাভের বর প্রদান করেন। লহনাকেও চণ্ডী স্বপ্নে দেখা দেন এবং খুল্লনাকে কেন এত শাস্তি দিচ্ছে এজন্য ভর্ৎসনা করেন—

যারে সমর্পিল পতি   তার কৈলে দুর্গতি
স্বামী আইলে পাবে প্রতিফল।
...   .
সদাগর আইলে দেশে   ঘুচিবেক লাসবেশ
ইহার উচিত পাবে শাস্তি।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৪৮-১৪৯)

স্বপ্নে চণ্ডীকে দেখে লহনা ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন। তাইতো বন থেকে খুল্লনাকে ফিরতে দেরি দেখে লহনা নিজেই বনে গমন করেন এবং খুল্লনাকে দেখে নিম্নোক্ত উক্তি করেন—

দেখিআ তোমার মুখ   পাসরিল সব দুখ
কোল দেহ আসিআ বহিনি।
আজি হৈতে তুমি প্রাণ   ইথে মোর নাহি আন
বৈরিভাব না করিহ মনে
জার সনে বারমাস   এক ঘরে করি বাস
অবশ্য কন্দল তার সনে।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৫০)

লহনা তার ছোট বোন তথা সতিনকে প্রিয় বাক্য বলে সান্ত্বনাও দেন। যে ঘরে সতিন থাকে সেখানে একটু দ্বন্দ্ব কন্দল হবে এটাই স্বাভাবিক তুমি এ কন্দলকে বৈরীভাব মনে করো না। খুল্লনাকে আবার পূর্বের ন্যায় আদর সোহাগও করতে থাকেন। খুল্লনাকে হরিদ্রা, কুঙ্কুম তেল মাখিয়ে স্নান করান, মাথায় আমলকি দিয়ে কেশ মার্জন করে দেন, স্নান করার পর উত্তম বসন পরিধান করতে দেন। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করে দুই সতিনে একসাথে খেতে বসেন। লহনা খুল্লনাকে থালা ভরে ভাত এবং বাটি ভরে তরকারি সাথে আরও দেন রুই মাছের মাথা। লহনার এ আচরণ এবং ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানবিক গুণ সম্পন্ন লহনাকেই পাঠক আবার ফিরে পায়। এর মধ্য দিয়ে পারিবারিক সৌহার্দ্যের, সম্প্রীতির ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। লোকজীবন-অভিজ্ঞ কবি এভাবে পারিবারিক জীবনের বিপরীতমুখী দুটি ছবিই উপস্থাপন করেছেন তাঁর কাব্যে। পরিবর্তিত লহনার আচরণ—

হরিদ্রা চন্দন তৈল আনিল দুবলা
খুল্লনার অঙ্গে দিআ দূর কৈল মলা।
স্নান করি পওের রামা পবিত্র বসন।
...   .
পঞ্চাশ বেঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন
থালায় ওদন বাটী ভরিআ ব্যঞ্জন॥
কিরা দিআ রুই-মুড়া দিল খুল্লনারে।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৫০)

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করে দয়িতারা তার প্রিয়তম এবং পুত্র সন্তানকে খাওয়ান। অনেক সময় অতিথিকে আপ্যায়নের জন্য রকমারি খাবার রান্না করতে দেখা যায় কিন্তু সতিনের জন্য পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করা এবং রুই মাছের মুড়ো দিয়ে তাকে আপ্যায়ন করা বাংলা সাহিত্যে বোধ হয় মুকুন্দরামই লহনাকে দিয়ে এ কাজ করিয়েছেন। যা সাহিত্যে নতুন সংযোজন। ভোজন শেষে আচমন এবং কর্পুর-তাম্বুল দিয়ে মুখ শোধন করে তারা প্রমোদ শয্যায় শয়ন করেন।

পতি বিরহে খুল্লনার দুঃখ দেখে চণ্ডী গৌড়নগরে গমন করলেন। চণ্ডী লহনা এবং পদ্মা খুল্লনার বেশ ধরে স্বপ্নে ধনপতিকে ধিক্কার দিলেন—

পরস্ত্রী-লুব্ধ হইআ পাসুরিলে নিজ জায়া
সুখে আছ গউড় নগরে॥
… … …
মিছা কর শিবপূজা তোর নিন্দা করে রাজা
মুখ না দেখাইয় (নিজ) দোষে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৫২)

স্বপ্ন দেখে ধনপতি অত্যন্ত বিচলিত হন এবং তৎক্ষণাৎ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পতির আগমন বার্তা দূত মুখে শুনে লহনা দাসী দুর্বলা কর্তৃক সখী লীলাবতী হতে সংগৃহীত স্বামী বশীকরণ ঔষধ কাজে লাগাতে উদ্যোগী হন। স্বামী সান্নিধ্যে যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেক নারী যথা সম্ভব নিজেকে পরিপাটি করে সজ্জিত করেন। স্বামী যদি দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকেন তাহলে রমণীদের সাজ-সজ্জা আরও বেড়ে যায়। দীর্ঘদিন প্রবাস জীবনের পর ধনপতি নিজ রাজ্যে আগমন করলে লহনা ও খুল্লনার সাজ-সজ্জার বহর বেড়ে যায় আরও বেশি। তাদের যত অলঙ্কার ছিল সবগুলো অলঙ্কার তারা স্বামী সান্নিধ্যে যাবার পূর্বে সজ্জার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকার ফুল দিয়ে কবরী বাঁধেন। ধনপতি সদাগর স্বদেশে ফিরবার পূর্বে দাসী দুর্বলাকে প্রকৃত পক্ষে একজন কুটনি দূতীর ভুমিকা পালন করতে দেখা যায়। দূতী একবার লহনা এবং অন্যবার খুল্লনাকে বিভিন্ন ভাবে প্ররোচিত করতে থাকে।

খুল্লনার সাজ :

সুরঙ্গ পাটের জাদে বিচিত্র কবরী বান্ধে
মালতী মল্লিকা চাঁপা গাভা
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দর ফোঁটা
চৌদিগে চন্দন বিন্দু শোভা।
… … …
পরে দিব্য পাট সাড়ি কনকের গড়ি চুড়ি
দু-করে কুলপী শোভে শঙ্খ
হিরা নিলা মুতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কলেবরে মলয়জ পঙ্ক
… … …
সুনাদ নূপুর পায় কুঞ্জরগামিনী জায়
লহনা সুনিতে পাইল সাড়া।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৬২)

তৎকালে প্রচলিত সকল বস্ত্র, অলঙ্কার এবং প্রসাধনী দিয়ে খুল্লনা নিজেকে সুশোভিত করে স্বামীর সামনে উপস্থিত হলেন।

লহনার সাজ :

আনিল ভাণ্ডার হৈতে আভরণ পেড়া॥
… … …
দোছুটি করিয়া পরে বার হাত সাড়ী।
দুর্ব্বলা মাজয়ে কেশ লয়ে প্রসাধনী॥
বাম করে হেম দণ্ড রসাল দর্পণী।
… … …
বাছিয়া পরিল মেঘ-ডম্বরু কাপড়॥
যতনে পরয়ে রামা কজ্জল সিন্দুর।
… … …
মণিময় হার কুচযুগলে লোটায়॥
বসনে তুলিয়া রামা বান্ধে পয়োধর।

বিনোদ কাঁচলী পরে তাহার উপর॥
(মুকুন্দরাম : ১৯২১ ; পৃ : ১৫৮-১৫৯)

অলঙ্কার আড়ম্বর নারীর সব সময় ছিল, আছে এবং থাকবে। তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারের মধ্যে অন্যতম হলো—অঙ্গদ, কঙ্কণ, কেয়ূর, মণিময় হার প্রভৃতি। বস্ত্রের মধ্যে বিশেষ করে উচ্চবিত্ত সমাজে তসর এবং মেঘ-ডম্বুর শাড়ির কদর ছিল লক্ষণীয়। নানা প্রকার ফুল দিয়ে কবরী বাঁধার এবং অন্যান্য সাজেও ফুলের ব্যবহার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রসাধনীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অগুরু, চন্দন, কর্পূর, তাম্বুল, সিঁদুর ও কাজল।

রন্ধনশিল্পে মেয়েদের আগ্রহের কমতি ছিল না কোনো দিনই। রান্না করে স্বামী, সন্তান এবং শ্বশুর শাশুড়িকে খাওয়াতে মেয়েরা সব সময় পছন্দ করেন এবং কাজটি করে তারা খুব আনন্দ উপভোগ করেন। তাদের রান্না খেয়ে যদি স্বামী শ্বশুর বা আত্মীয় পরিজন খুশি হন বা প্রশংসা করেন তাহলে তো বউ ঝির আনন্দের সীমা থাকে না। ধনপতি যখন খুল্লনাকে রান্না করার আদেশ দিলেন তখন খুল্লনা সানন্দচিত্তে রন্ধনশালায় গেলেন রান্নার জন্য। কিন্তু বাধ সাধে লহনা, তার ধারণা খুল্লনা রান্নার কাজে ততটা পারদর্শী নয়। আত্মীয়-স্বজনদের রান্না করে খাওয়ানোর মতো সুগৃহিণী খুল্লনা এখনো হয়ে ওঠেনি। লহনা যে শুধু এ ভয় পাচ্ছিলেন তা নয়, ঈর্ষাবোধ এখানে কিছুটা ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু ধনপতি তাঁর সিদ্ধান্তে ছিলেন অটল, তিনি লহনার কথায় কোনো পাত্তাই দেননি। খুল্লনা রান্না ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে গঙ্গাজলে স্নান করে পূত-পবিত্র হয়ে, চণ্ডীকার পূজা করে একনিষ্ঠচিত্তে রান্নার আয়োজন করেন। সাহায্যকারী হিসেবে সাথে থাকে দাসী দুর্বলা। দেবতাকে স্মরণ করে, চুলার পাশে পূর্ণপাত্র রেখে প্রভুর (স্বামীর) আদেশ অনুযায়ী খুল্লনা রান্না আরম্ভ করেন—

পতির আদেশ ধরি   রান্ধেন খুল্লনা নারী
স্মঙরিআ সর্বমঙ্গলা
লোন ঘৃত তৈল ঝাল   আনি নানা বস্তু হার
অনুচরী জোগায় দুবলা॥
বাগ্যন কুমুড়া কচা   কাঁচকলা তাহে মোচা
বেসারি পিঠালি ঘন কাঠি
ঘৃতে সন্তলন তধি   দিআ গিঙ্গু জিরা মেথি
শুক্তার রন্ধন পরিপাটি॥
…   …   …
ভাজ্যা চিতলের কোল   কাতলা মাছের ঝোল
মান বড়ি মরিচ ভূষিত।
বোদলি হিলিঞ্চা সাক   কাঠি দিআ ঘন পাক
সান্তনল কৈল কটু তৈলে
…   …   …
কলা-বড়া মুগ-সাঙলি   খিরোসা খিরের পুলি
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৬০)

একে একে খুল্লনা বিশ রকমের ব্যঞ্জন রান্না করেন। রান্নায় বিভিন্ন প্রকার শাকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় শাক সবকালে বাঙালিদের প্রিয় খাবার হিসেবে খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল, চাটনির উল্লেখও খাবার তালিকায় দেখা যায়। মসলার মধ্যে ঘি, তেল, মরিচ, আদা, লবণ, মেথি, হিঙ্গুজিরা ব্যবহৃত হতো। খুল্লনার হাতের রান্না খেয়ে জ্ঞাতি বন্ধুজন সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিশেষ করে ভাজা চিতল মাছের কোল, কাতলা মাছের ঝোল এবং মাংসের ব্যঞ্জন সবাই তৃপ্তি সহকারে ভোজন করেন। ভোজন শেষে আচমন এবং কর্পূর-তাম্বুল দিয়ে মুখ শোধন করেন। অতিথি আপ্যায়ন শেষ হলে ধনপতি আহারে বসেন। খুল্লনা কনক থালায় স্বামীর খাবার জোগান দেন। ধনপতিকে সুবর্ণের বাটিতে ঘি দেয়া হয়। থরে থরে বাটিতে সাজিয়ে

দেয়া হয় নানাবিধ ব্যঞ্জন। 'ভোজন করিআ সাধু করে উপহাস'। (মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৬১) সব শেষে ধনপতি কর্পূর-তাম্বুল খেয়ে শয্যা মন্দিরে গমন করেন। ধনপতিকে কনক থালায় খাবার ও সুবর্ণের বাটিতে ঘি প্রদান করার মধ্য দিয়ে বণিক সম্প্রদায়ের আর্থিক সংগতি কতটা ভালো ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ধনপতির সম্মান ও সামাজিক প্রতিপত্তি এবং মান মর্যাদার কথা বিবেচনায় রেখে কবি তাঁর শয্যামন্দির রচনা প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেছেন। দাসী দুর্বলা শয্যামন্দিরে শয্যা রচনা করে। খাট চন্দন দিয়ে সাজানো হয়, বিভিন্ন প্রকার ফুল ছিটিয়ে পাতা হয় বিছানা, পাটের মশারি যার মাঝখানে লাল পাট ডোরা কাটা। শিয়রে মণিময় দীপ জ্বলে, এছাড়াও থাকে জল ভরা গাড়ু বা ঘটি, যা দেখে মনে হয় দেবরাজ ইন্দ্রের ভবন—

খাট করে চন্দনে ভূষিত।
সুগন্ধি ধূপের ধূমে আমোদিত কৈল ধামে
... ...
চৌদিকে উচ্ছিত স্থলে মণিময় দীপ জ্বলে
জেন দেখি ইন্দ্রের
... ...
কিাত কথুরায় বান্ধ উপরে টানায় চান্দা
বিছায় মালতি জুতি॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৬১)

প্রত্যেক নারী নিজেকে সুন্দর ও পরিপাটি রূপে সজ্জিত করে স্বামীর সান্নিধ্যে গিয়ে সুখ অনুভব করেন। লহনা-খুল্লনার সাজ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এ জন্য নারীগণ তাদের যত প্রকার অলঙ্কার ও প্রসাধনী আছে স্বামী সান্নিধ্যে যাওয়ার পূর্বে সেগুলো ব্যবহার করতে কোনো কার্পণ্য করেন না। খুল্লনা শয়ন মন্দিরে যাওয়ার পূর্বে নিম্নলিখিত অলঙ্কার ও প্রসাধনী ব্যবহার করেন—

সুরঙ্গ পাটের জাদে বিচিত্র কবরী বান্ধে
মালতী মল্লিকা চাঁপা গাভা
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দুর ফোঁটা
চৌদিগে চন্দন বিন্দু শোভা॥
... ...
হিরা নিলা মূতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কলেবরে মলয়জ পঙ্ক॥
... ...
সুনাদ নূপুর পায় কুঞ্জরগামিনী জায়
লহনা সুনিতে পাইল সাড়া॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৬২)

খুল্লনা এভাবে অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে শয়নমন্দিরে উপস্থিত হলেন। শয়নমন্দিরের দু'দিকে সারি সারি প্রদীপ জ্বলছে, খুল্লনা বাটি ভরে অগুরু চন্দন, হাতে তাম্বুলের বাটা এবং সুবাসিত জল নিয়ে ধীরে ধীরে স্বামীর শিয়রে গিয়ে বসেন। দীর্ঘদিন প্রবাস জীবন যাপনের পর এই প্রথম ধনপতির সাথে খুল্লনার একান্তে সাক্ষাৎ। সাক্ষাতের পর দীর্ঘ দিনের জমাকৃত সুখ-দুঃখ মান-অভিমান তারা নিংড়াতে থাকেন। অতঃপর ধনপতিকে খুল্লনা জাল চিঠি প্রদান করেন যেখানে উল্লেখিত আছে খুল্লনাকে অত্যাচারের নির্দেশনা। চিঠি দেখে ধনপতি রাগে-দুঃখে, ক্ষোভে লহনাকে তিরস্কার করেন। ধনপতি গৌড়ে প্রবাসকালে সতিনী লহনা খুল্লনার ওপর সাংবাৎসরিক যে অমানুষিক অত্যাচার করেছেন তার পুঙ্খানুপঙ্খ বর্ণনা খুল্লনা ধনপতির নিকট উপস্থাপন করেছেন—

প্রথম জ্যৈষ্ঠে গেলা প্রভু গড়াতে পঞ্জর।
প্রবলা সতিনী ঘর হইল স্বতন্তর॥

ছাগল রাখিতে পত্র আইল জেই দণ্ডে।
… … …
আষাঢ়ে গর্জএ ঘন নাচএ ময়ূর
… … …
ছাগল চরাত্যে স্থান নাহীক অবনি।
শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনি
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।
… … …
প্রচণ্ড বাদল ঝড় ভাদ্রপদ মাসে
… … …
ভাদ্র-মাসের বৃষ্টিধারা বাজে জেন শেল
আশ্বিনে করিল নাথ বড় মনোরথে
শুনিলু পঞ্জর লয়্যা তুমি আইস পথে।
… … …
বিনু তৈলে কেশ মোর হইল জটাভার।
কার্তিক মাসেতে হৈল হিমের প্রকাশ
ছয় মাস খুঞা বাস হয়্যা গেল গুড়া
… … …
পৌষে করএ লোক নানা উপভোগ
সভার বসন বিধি করিল সংযোগ।
… … …
মাঘমাসে অনিবার সদাই কুঝটি
… … …
কেশে ধর্য্যা লহনা মারিল কীল লাথি।
ফাল্গুনে দীঘল শীত মলয় পবন
খণ্ড খণ্ড হইল মোর খুঞার বসন।
… … …
শয়ন ঢেকীশালে প্রভু শয়ন ঢেকীশালে
নিদ্রা নাহি হয় খুদ্যা পিপীলিকার জালে।
চৈত্রে চাতক জল মাগে জলধরে
… … …
বনিতাপুরুষ-অঙ্গ পিড়এ মদন
আমার পীড়িত অঙ্গ উদরদহন।
শুভচন্দ্র হইল মোর প্রবেশে বৈশাখ
চণ্ডীর কৃপায় দূর হইল বিপাক।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ : পৃ : ১৬৭-১৬৮)

এখানে স্বামী সোহাগিনী নারীর সপত্নী প্রসঙ্গে স্বামীর কাছে উত্থাপিত অভিযোগ বর্ণিত হয়েছে। এটিও তৎকালীন গার্হস্থ্যজীবনের দাম্পত্য-সম্পর্কের এক নিগূঢ় বাস্তবতা। বাস্তব রসের কবি মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে এভাবেই নানা দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের নানা প্রান্তকে কাব্যে তুলে ধরেছেন। স্মৃতিকণা চক্রবর্তী প্রসঙ্গত লিখেছেন যে, ‘ফুল্লরা ও খুল্লনার বারমাস্যার তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় ফুল্লরার বারমাস্যার অনেক ছত্রের হুবহু বসে গেছে খুল্লনার বারমাস্যায়। এটি কবির ব্যক্তিগত পুচ্ছগ্রাহিতার নিদর্শন’। (স্মৃতিকণা ; ২০১১ : পৃ : ১৬১)। তবে খুল্লনার সারা বছরের দুঃখ, যন্ত্রণা ও কষ্টের বিবরণ এবং চিঠি জাল করার বিস্তারিত ঘটনা শুনে ধনপতি মর্মাহত হয়ে লহনাকে কটুবাক্য শুনাতেও দ্বিধাবোধ করেননি। ফলে স্বামীর ওপর অভিমান করে লহনা গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন—

অভিমানে লহনা অনল সম জ্বলে

খুল্লনারে গঞ্জিআ নিঠুর বাক্য বলে।
খুল্লনা লইআ তুমি সুখে কর ঘর
বিদায় করিআ আমি জাইব নাইয়র॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৬৯)

ধনপতি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান। রাগান্বিত ও অভিমানী স্ত্রীকে তুষ্ট করায় তিনি পারদর্শী। এই পারদর্শিতা সুখী দাম্পত্যজীবনের একটি কৌশল হিসেবেই আচরিত হতো বলে মনে করা হয়। বড় রানী লহনা অভিমান করেছেন শুনে ধনপতি নিত্য কর্ম সমাপ্ত করে প্রথমে লহনার দ্বারে উপস্থিত হয়ে লহনাকে ডাকতে থাকেন। অভিমানী লহনা স্বামীর ডাক শুনেও প্রত্যুত্তর করেননি। ধনপতি স্ত্রীকে ভোলাতে একশ ভাগ পারদর্শী যা তার কথোপকথনে বোঝা যায়—

ব্যবস্থা করিআ রান্ধ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
জেই দিন প্রিয়ে তুমি না কর রন্ধন
সেই দিন নহে মোর উদর পূরণ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৭২)

সংসারে মান-অভিমান, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, পাওয়া না পাওয়া, হতাশা-ব্যর্থতা থাকবে এবং এর মধ্য দিয়েই জীবন অতিবাহিত হবে। সুখ-দুঃখকে ভাগাভাগি করে এগিয়ে চলাই হচ্ছে সংসার। ধনপতি লহনার যন্ত্রণাকে নিজের সাথে ভাগ করে নানা উপদেশ বাণী দ্বারা তাকে ভোলাতে চেয়েছেন। লহনাকে শান্ত করতে তিনি রামায়ণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সতিন কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে দশরথের বংশ প্রায় ধ্বংস হতে বসেছিল। কন্দল কখনও সংসারে শান্তি আনতে পারে না। তৎকালে সামন্তবাদী সমাজে একজনের দুই তিন স্ত্রী থাকাটাও ততটা দোষের কিছু না। তাছাড়া ধনপতি লহনার অনুমতি নিয়েই দ্বিতীয়দার গ্রহণ করেছিলেন—

তোর অনুমতি লৈয়া   করিল দোয়জ বিভা
...   .
ধনবান জার পতি   সেই জায়া ভাগ্যবতী
বিবাহ করএ দুই তিন
এক বধূ পুত্রবতী   সভার উত্তম গতি
সতিনের পুত্র নহে ভিন॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৮৫)

লহনার মা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না তাই ধনপতি লহনাকে অনুরোধ করেছিলেন সতিনের সন্তানকে নিজ সন্তানজ্ঞানে আদর ও স্নেহদ্বারা বড় করে পুণ্য অর্জন করতে। পরোক্ষভাবে হলেও এখানে ধনপতি লহনার নারীত্বে আঘাত করেছেন সতিনের সন্তানকে আদর-স্নেহ করে পুণ্য অর্জন করার কথা বলে। দুইজন মিলেমিশে নিজেদের সুখ-দুঃখকে ভাগাভাগি করে পালাক্রমে সংসারের কাজকর্ম করলে সুখ অনিবার্য। যে সংসারে নিত্য অশান্তি বিরাজ করে সেখানে লক্ষ্মী বাস করতে পারেন না। সেখানে সর্বদাই রোগ-শোক, দুঃখ-যন্ত্রণা এবং অশান্তি বিরাজ করে।

শ্রদ্ধার সাথে মৃতের উদ্দেশে দান করাই শ্রাদ্ধ; হিন্দু শাস্ত্রানুসারে মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির নিমিত্তে পালনীয় অনুষ্ঠান। দ্বিজমুখে ধনপতি পিতৃশ্রাদ্ধ শুদ্ধির কথা শুনে জ্ঞাতি-কুটুম্বকে আমন্ত্রণ জানান। শুভ দিনে শুভক্ষণে তিল, তুলসী, গঙ্গাজল, কুশ-বটু-রম্ভাফল এবং যব, দূর্বা, কুসুম, চন্দন, ধূপ, দীপ, ঘৃত-দধি প্রভৃতি দ্রব্যাদির আয়োজন করে বণিকনন্দন পিতৃশ্রাদ্ধ করতে বসেন। পিণ্ডদান এবং ব্রাহ্মণকে বস্ত্রদান করলে মৃত ব্যক্তির আত্মা শান্তি পায় এ জন্য ধনপতি ব্রাহ্মণকে বহু সম্মান করে বস্ত্র দান করেন—

পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপে   গন্ধ গঙ্গাজল সিপে
দান করে কনক বসন
...   .
অর্ঘ্য গন্ধ দিআ দান   দ্বিজ করে সাবধান

পাত্র বুঝি করে সম্প্রদান
জথাবিধি পিণ্ডদান শ্রাদ্ধ হইল সমাধান
ব্রাহ্মণে করেন বহু মান।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৭৯)

শ্রাদ্ধ শেষে অন্ন গ্রহণের প্রাক্কালে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মান্ধ কিছু পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাধ সাধেন, তাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন খুল্লনা অরক্ষিত অবস্থায় বনে বনে ছাগল চরিয়েছেন ফলে তার চরিত্র নিয়ে জনশ্রুতিতে সন্দেহ জেগেছে। জনগণের সন্দেহ দূরীকরণে তাকে রামায়ণের সীতার মতো অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে। এ প্রস্তাবে ধনপতি হোচট খেলেও সতী খুল্লনা মোটেও বিচলিত হননি। খুল্লনা উপস্থিত জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য নিজের সতীত্বের পরীক্ষা দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। চিন্তিত ধনপতিকে খুল্লনা অভয়বাণী দেন—

খুল্লনা বলেন প্রভু করি নিবেদন।
এক ভাবে সেবি যদি চণ্ডীর চরণ॥
বিপদভঞ্জিনী দুর্গা কহে চারিবেদে।
পরীক্ষায় ভয় নাহি তাঁহার প্রসাদে॥
(মুকুন্দরাম : ১৯২১ ; পৃ : ১৮৫)

অতঃপর পরীক্ষাদানের জন্য জতুগৃহ নির্মাণ করা হলো। উপস্থিত নারীগণ খুল্লনার জন্য আক্ষেপ করতে থাকেন। ভয়ে ও শঙ্কায় তারা ভাবতে থাকেন আগুনে প্রবেশ করার পর খুল্লনার অবস্থা কেমন হবে, তার কত কষ্ট হবে, খুল্লনা আদৌ বাঁচবে কিনা ? যেখানে তিলমাত্র আগুনে পুরো লঙ্কা পুড়ে ছাই হয়েছিল সেখানে খুল্লনা কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবেন। ধনপতি খুল্লনাকে পরীক্ষা দিতে নিষেধ করেছেন। ভয়ে-আতঙ্কে খুল্লনার মা তাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। সমাজ মানুক আর নাই মানুক চরম বিপদের দিনে মা তার কন্যাকে নিজ গৃহে নিয়ে যাবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু খুল্লনা পরাজয় স্বীকার করার পাত্রী নন—

নিজ ধন দিতে দিতে তুমি হবে রঙ্ক।
ভুবন ভরিয়া মোর রহিবে কলঙ্ক॥
... ...
উজানী জুড়িয়া মোর বহিবে গঞ্জন॥
(মুকুন্দরাম : ১৯২১ ; পৃ : ১৮৫)

সতীত্ব এবং সততার গুণে আগুন খুল্লনাকে স্পর্শ করতে পারেনি। সতী দেহ অগ্নি স্পর্শ করা মাত্র অগ্নি তুষারের ন্যায় শীতল হয়ে যায়। খুল্লনাকে সবাই ধন্য ধন্য করতে থাকেন। এই অংশে বাস্তবতা নয়, ধর্মের বিশ্বাস ও রামায়ণের প্রভাব যে পড়েছে তা বলাই বাহুল্য। মুকুন্দরাম বাস্তবনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কাব্যপ্রকরণের এই ঐতিহ্য অস্বীকার করতে পারেননি। তাছাড়া যুগে যুগে দ্বিচারিণী হওয়ার অভিযোগে নারীদেরকেই সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এ অভিযোগ কোনো পুরুষের প্রতি কখনো করা হয়নি অথবা তাদেরকে কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়নি। ধনপতি এক বছর গৌড়ে গিয়ে সংসার ভুলে, স্ত্রীদের ভুলে ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিলেন কিন্তু স্বদেশে আসার পর তাকে কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়নি। অথচ পুরুষ প্রধান এ সমাজ সতীত্বের পরীক্ষা দিতে খুল্লনাকে অগ্নিকুণ্ডে যেতে বাধ্য করেছেন। খুল্লনা সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর জ্ঞাতি-কুটুম্বদের অনুরোধে রন্ধনশালায় রান্না করতে যান। সাহায্যকারী হিসেবে সাথে থাকে দাসী দুর্বলা। খুল্লনা একে একে পঞ্চাশ রকমের ব্যঞ্জন রান্না করেন। সুবর্ণের গাড়ুতে করে লহনা জ্ঞাতি কুটুমদের ঘি জোগান দেন। খাবারে প্রথমে শুকুতা এবং পরে শাকের ঘণ্ট দেয়া হয়। এরপর মাছ ও মাংস। ভাজা মাছ এবং মাংসের ব্যঞ্জনে ধনপতির ভবন গন্ধে আমোদিত হয়। সকলে খুল্লনার রান্নার প্রশংসা করেন। ভোজন শেষে মুখ শুদ্ধির জন্য দেয়া হয় কর্পূর-তাম্বুল—

ভোজন করিআ সাঙ্গ কৈল আচমন
কর্পূর-তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন॥

(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৯১)

তবে খুল্লনা একদিক দিয়ে সুখী ছিলেন, সতীত্ব নিয়ে তার স্বামী তাকে সন্দেহ করেননি। এ নিয়ে তাদের দাম্পত্য জীবনেও কোনো প্রভাব পড়েনি। তিনি পূর্বের ন্যায় স্বামী সোহাগে সোহাগিনী হলেন। প্রত্যেক মেয়ের জীবনে গর্ভধারণ অন্যতম পরম প্রাপ্তি। বলা হয় মেয়েদের জীবনে পূর্ণতা আসে মাতৃত্বে। এ সময়টি তাদের জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণ। ধনপতি উপাখ্যানে খুল্লনার জীবনেও কোনো এক মধুমাসে এসেছিল এমন এক মাহেন্দ্রক্ষণ। গর্ভবতী একজন মায়ের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী অত্যন্ত সংবেদনশীল হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। কালকেতু-উপাখ্যানে ব্যাধ নারী নিদয়ার গর্ভধারণ-উত্তর শারীরিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছিলেন মুকুন্দরাম। এখানে তাঁর বর্ণনায় উচ্চ সমাজের নারী-প্রতিনিধি খুল্লনার খাবারে অরুচি ও শারীরিক দুর্বলতা প্রকাশ করে লিখেছেন—

প্রথম গর্ভে ভর   শুয়্যা থাকে নিরন্তর
সদাই বদনে উঠে হাই
দিনে দিনে বল টুটে   ইসতে নেকার উঠে
নাহি জানি কফ পিত্ত বাই॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২১৪-২১৫)

সমস্ত বাধা-বিপত্তির পর ধনপতির সংসারে যখন সুখের হাওয়া বইতে শুরু করে তখনই রাজাজ্ঞা আসে বাণিজ্যের জন্য ধনপতিকে দক্ষিণ পাটনে যাত্রা করতে হবে। রাজার নিকট অনেক অনুনয়-বিনয় করেও ধনপতি এ যাত্রা থেকে নিষ্কৃতি পাননি। ঘোর বিপদের আশঙ্কা করে খুল্লনা দক্ষিণ পাটনে ধনপতির এ যাত্রাকে মন থেকে মেনে নিতে না পেরে স্বামীকে এ যাত্রা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেছেন—

প্রাণনাথ সিংহল গমনে নাহি সাধ।
স্বকীয় চন্দন শঙ্খ,   দিআ হব নিরাতঙ্ক,
রাজস্থানে লইব প্রসাদ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৯৩)

ধনপতি যখন সিংহল যাত্রা করেন তখন খুল্লনা ছয় মাসের গর্ভবতী। কারণে অকারণে নারীদের চরিত্রে সন্দেহ করা মধ্যযুগে সাধারণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হতো। তাছাড়া খুল্লনা বিনাদোষে দোষী সাব্যস্ত হয়ে নিজেও একবার নিষ্ঠুর সমাজকে সতীত্বের পরীক্ষা দিয়েছেন। সংগত কারণেই বুদ্ধিমতী খুল্লনা নিজেকে বিপদ মুক্ত রাখার জন্য স্বামী বিদেশ যাত্রার পূর্বে ধনপতিকে গর্ভপত্র লিখে দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। স্বামীর নিকট হতে খুল্লনার এ গর্ভপত্র লিখে নেবার মধ্যে দিয়ে খুল্লনার জাগ্রত বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে—

পত্র লিখি সদাগর দিল তার হাথে
স্বস্তি স্বস্তি করি রামা পত্র নিল মাথে।
পত্র লৈয়া জায় রামা আপনার বাসে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৯৫)

রসিক ধনপতি প্রদেয় গর্ভপত্রে কন্যা সন্তান হলে তার নাম কী রাখবে এবং তাকে কেমন পাত্রের হাতে পাত্রস্থ করবে আর যদি কন্যা না হয়ে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে তার নাম কী রাখবে এবং সদাগরের রাজ্যে ফিরতে যদি দ্বাদশ বছর কেটে যায় তাহলে উদ্ধার করার জন্য পুত্রকে দক্ষিণ পাটনে যাওয়ার নির্দেশনা দিয়ে যায়—

জখন তোমার গর্ভ হইল ছয়মাস।
সেইকালে নৃপাদেশে করিল প্রবাস॥
জদি কন্যা হয় শশিকলা নাম থুয়্যা।
উত্তম বংসজ দেখি ঝিএ বিভা দিহ॥

জদি পুত্র হয় নাম থুইয় শ্রীপতি।
পড়াইআ শুনাইআ পুত্র করিহ সুমতি॥
… … …
এ বার বৎসরে জদি নহে আগমন।
আমার উর্দিশে জাবে দক্ষিণ পাটন॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ১৯৪)

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী অত্যন্ত সংবেদনশীল হৃদয় দিয়ে গর্ভাবস্থায় খুল্লনার অন্তর্বেদনার কথা প্রকাশ করেছেন। প্রথম গর্ভাকালীন সময়ে একজন নারী বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হন। সন্তান গর্ভে বৃদ্ধির সাথে সাথে মায়ের শারীরিক বিভিন্ন উপসর্গের সাথে দেখা দেয় নানা শঙ্কা ও ভীতি। কবি গর্ভবতী মায়ের এ উপসর্গগুলো অত্যন্ত বাস্তব করে উপস্থাপন করেছেন। খাবারে অরুচি, সদায় নেকার ওঠা, দিনে দিনে বল বা শক্তি কমতে থাকা, উঠলে বসতে না-পারা ঘটনাগুলো অত্যন্ত চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেছেন কবি—

প্রথম গর্ভে ভর শুয়্যা থাক নিরন্তর
… … …
দিদি গো ইবে বড় সঙ্কট পরান
মাতা পিতা দুরন্তর স্বামী গেলা দেশান্তর
তুমি সবে জীবন নিদান।
উদর হইল ভারি উঠ্যা দাণ্ডাইতে নারি
… … …
গর্ভের দেখিআ ভর মনে লাগে বড় ডর
খুধা তৃষা নাহি এক মাস॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২১৪-২১৫)

গর্ভকালীন খুল্লনার মাতা-পিতা কাছে নেই। স্বামী ধনপতিও বাণিজ্য উপলক্ষ্যে সিংহলে অবস্থানরত এ জন্য খুল্লনার আশঙ্কা আরও বেশি। তার এ দুর্দিনে একমাত্র ভরসা সতিন লহনা।

একজন মায়ের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং সন্তানের সুস্থতা ও মানসিক গঠনের কথা বিবেচনায় রেখে গর্ভবতী মায়ের খাবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তাছাড়া এ সময় মায়েদের খাবারে অরুচি দেখা দেয়। বিভিন্ন সময়ে গর্ভবতী মায়ের খাবারে রুচির ওপর নির্ভর করে খাবার প্রস্তুত করা হয়। মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যপাঠে জানা যায় শাকের প্রতি এ সময়ে নারীদের রুচি বেশি থাকে। হয়ত সেই সময় গর্ভবতী নারীরা শাকের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে বুঝে-শুনেই শাক-সবজির প্রতি আকৃষ্ট হতেন অথবা রুচি বৃদ্ধির বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতেন। খাদ্য-খাবারের বিষয়ে উচ্চবিত্ত পরিবারের গর্ভবতী মায়েরা সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ প্রত্যেক মায়ের প্রত্যাশা তার গভৃস্থ সন্তান সঠিক পুষ্টি পেয়ে সুস্থাবস্থায় পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হোক। বিভিন্ন প্রকার শাক পাট, পালঙ্গ, নালিতা, নট্যা, রাঙ্গা, তিত পলটা, বনপুই, হিনচা, কলমী, লাউ ডগাসহ বিভিন্ন শাকের বিররণ আছে এই আখ্যানে—

নট্যা রাঙ্গা তোলে পাট পালঙ্গ নালিতা
তিত পলতার ডর্গা তুলিল পলতা।
সাজ্যাতা পাজ্যাতা বন-পুই তুলে বলা
হিনচা কলমী শাক তোলে ডানিকলা।
… … …
ডগী ডগী তোলে পুই পুনকা কাঁচড়া।
কোমল কাঁকুড়ি-ডগা তুলিল করেলা
নাউ ডগা তোলে কিছু কচি কচি বলা।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২১৫)

ধনপতি উপাখ্যানে খুল্লনার সাধ-ভক্ষণের বর্ণনায় লহনা খুল্লনাকে খাদ্যাভিলাষের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। প্রত্যুত্তরে খুল্লনা যা বলেছেন তা বেশ অভিনব এবং চমকপ্রদ। খুল্লনা পান্তা খেতে চেয়েছেন, পাকা কলাও আছে তার খাদ্য তালিকায়। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন শাক, মাছের ফরমাশ এবং আরও কিছু খাবারের উল্লেখ—

কহি নিজ সাধ শুন গো দাসী।
পান্ত ওদন ব্যঞ্জন বাসি॥
বাথুয়া ঠনঠনি তেলেতে পাক।
ডগি ডগি তোল ছোলার শাক॥
মীন চড়চড়ি কুমড়া বড়ি।
… … …
যদি পাই মহিষা দই
ফেলি চিনি তাহে মিশায়ে খই॥
পাকা চাঁপাকলা করিয়া জড়।
খেতে মনে সাধ করেছি বড়॥
… … …
আমড়া নোয়াড়ি পাকা চালিতা।
আমসী কাসন্দি কুল করঞ্জা॥
… … …
দুধে তিল গুঁড়ি মিশায়ে লাউ।
দধির সহিত খুদের জাউ॥
চিঁড়া পাকাকলা দুগ্ধের সর।
কহি দুয়া এই শুন গো আর॥
(মুকুন্দরাম : ১৯২১ ; পৃ : ২১৩-২১৪)

সোনার থালায় ভাত, সঙ্গে চাকা চাকা করে মুলোও বেগুনের তরকারি, দুধ তিল গুড় মিশিয়ে লাউ, দধির সঙ্গে তিলের জাউ, আমসি, কাসন্দি, কুল, করঞ্জা, আমড়া, চালতা, টক ইত্যাদি খাবার ছিল সাধ অনুষ্ঠানের তালিকায়। লহনা গর্ভবতী খুল্লনাকে সাধ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার শাক, মাছ ভাজি, চড়চড়ি ও বিভিন্ন প্রকার টকসহ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করে খাওয়ান। খুল্লনার সাধ অনুষ্ঠানের রান্না ও পরিবেশনায় আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

খুল্লনার গর্ভ দশমাস পূর্ণ হলো। প্রসব পূর্বকালীন একজন নারীর অন্তর্বেদনার কথা কবিকঙ্কণ খুল্লনার উক্তির মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন :

পূর্ণ হইল দশ মাস ইন্দ্রসুতা গর্ভবাস
ভুঞ্জিল আপন কর্ম্ম-ফলে।
পশুপতি মারুত লড়ে অনুক্ষণ ব্যথা পড়ে।
লোটায় খুল্লনা মহিতলে॥
সখী-স্কন্ধে দিয়া কর আসে যায় বাড়ীঘর
কেহ অঙ্গে দেয় তৈল পানী॥
… … …
সংশয় জীবন-আশা হইল মরণ-দশা
বুকে পিঠে বিন্ধে যেন বাণ॥
(মুকুন্দরাম : ১৯২১ ; পৃ : ২১৫)

খুল্লনাকে সূতিকা কক্ষে নেয়া হলো। প্রসব বেদনায় খুল্লনা অত্যন্ত কাতর তবু দেবী চণ্ডীর একনিষ্ঠ ভক্ত চণ্ডীকে স্মরণ করতে খুল্লনার ভুল হয়নি। প্রাণরক্ষার জন্য বার বার দেবীর কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছেন। দেবীও ভক্তের ডাকে স্থির থাকতে না পেরে সূতিকা কক্ষে এসে খুল্লনাকে আশিস দিলেন এবং

শিরে দিলেন পানি। দেবী ব্রাহ্মণীর বেশে এসেছেন তবুও দেবীকে চিনতে খুল্লনার ভুল হয়নি। অবশেষে দেবী প্রদত্ত ঔষধ খেয়ে খুল্লনা বিপদ মুক্ত হলেন এবং গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো—

চণ্ডীর ঔষদে তার খণ্ডিল বিপদ।
চণ্ডিকা স্মঙরিয়া রামা দিল ধর্মশূল
ভূতলে পড়িল তার গর্ভের ফলফুল।
উমা উমা ডাকে শিশু পড়িআ ভূতলে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২১৬)

মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে প্রথাবদ্ধ কিছু ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। যেখানে দেবতার মন্ত্রপূত জল পান করে গর্ভবতী নারীরা সন্তান প্রসব করেন। কখনো কখনো দেব-দেবী প্রসূতির দিকে কৃপা দৃষ্টিতে তাকালেও গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ফলে প্রথাবদ্ধ বর্ণনায় প্রচলিত কাব্য-কাঠামোর অনুবর্তন ঘটেছে এতে।

শিশুকে বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য এবং কোনো অশুভ শক্তি যাতে বাচ্চাকে ক্ষতি করতে না পারে সে জন্য সূতিকা গৃহে গোমুণ্ড স্থাপন করা হলো। তারপর হৈ হুল্লোড় করে বাচ্চার নাড়িচ্ছেদ করা হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সন্তানের মঙ্গল কামনায় কিছু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পালন করা হয় যা ব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক নির্দেশিত। এর মধ্যে অন্যতম-ষষ্ঠীপূজা, সপ্তঋষি, অষ্ট কলাই এবং নবনত্তা-এসব অনুষ্ঠান অন্ত্যজ শ্রেণির পারিবারিক জীবনেও আচরিত হতে দেখেছি আমরা—

সপ্তদিনে সপ্ত ঋষি করিআ বন্দনা
আটদিনে আটকলাইআ করিল লহনা।
নত্তা কৈল নয় দিনে মনের হরিষে
একইষা করিল তার একইষ দিবসে।
দিনে দিনে আন বেশ সাধুর নন্দন
কৌতুকে খুল্লনা দেয় ভূষণ চন্দন॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২১৭)

হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নবজাতকের ভাগ্য গণনা ও নামকরণ একটি সুপ্রচলিত ধারা হিসেবে সমাজে স্বীকৃত হয়ে আসছে। শ্রীমন্তের জন্ম গ্রহণের পর যথারীতি জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে জ্যোতিষী এসে পুরাণ শাস্ত্রাদি পড়ে, রাশি নক্ষত্র বিচার করে নবজাতকের নামকরণ এবং ভবিষ্যৎ গণনা করেন-

পুরোধা পণ্ডিতগণে   সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণে
লিখে তারা শিশুর জাওয়াতি।
মকরে ধরণীসুত   বুধে চান্দ গুরুজুত
মেষে লিখে প্রচণ্ড কিরণে।
…   …   …
সকল বিদ্যায় ধীর   সত্য বাক্যে যুধিষ্ঠির
দানে হবে কর্ণের সমান।
শুকদেব সম জ্ঞানী   কুবের সমান ধনী
দীর্ঘজীবী মার্কণ্ড সমান।
…   …   …
রূপে অভিনব কাম   ইচ্ছায় শ্রীপতি নাম
থুঅ্যা সবে চলিলা ভবনে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২১৭)

নামকরণ অনুষ্ঠান আমরা কালকেতু উপাখ্যানেও প্রত্যক্ষ করেছি। তবে নবজাতকের গুণপনা নির্দেশনায় পুরাণের ব্যবহার ঘটেছে এখানে। বিপ্রগণ শ্রীমন্তের জন্মের তিথি নক্ষত্র ও পাঁজিপুথি বিচার করে কিছু শুভ লক্ষণ দেখেন যা পৌরাণিক বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। শ্রীমন্ত সকল বিদ্যায় পারদর্শী হবে, সততায় ধর্মবীর যুধিষ্ঠিরসম, দানে মহাবীর কর্ণের তুল্য এবং জ্ঞানে শুকদেবসম, অর্থে হবে

ধনকুবেরসম আর আয়ুষ্মানে হবে মার্কেণ্ডের সমান। শ্রীমন্ত জ্ঞানে-গুণে-সততায় অর্থে-বিত্তে অনেক বড় হবে এ আশীর্বাদ করে বিপ্রগণ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীমন্তের জন্ম পত্রিকা প্রস্তুতকরণে পৌরাণিক প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। পৃথিবীতে শ্রীমন্তের আগমন লহনা ও খুল্লনাকে দীর্ঘদিন স্বামী পরবাসে থাকার বিরহবোধ থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। লহনা ও খুল্লনা পুত্রের বয়স ছয় মাস পূর্ণ হলে অন্নপ্রাশন এবং এক বছর পূর্ণ হলে জন্ম তিথি পালন করেন। জন্ম তিথি পালন অনুষ্ঠানটি মুকুন্দরাম প্রথম বণিক খণ্ডে সংযোজন করেন। এটি সন্তানকে আনন্দদানের জন্য পালনীয় একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান—

তিনি চারি মাস জায় উলটীআ দেয় পাশ
আনবেশ সাধুর নন্দন
জায় মাস পাঁচ চারি রূপে অতি মনোহারী
ছয়মাসে করাল্য ভোজন।
… … …
হৈল একাদশ মাস বদনে ইসত হাস
বারমাসে আইল জন্মতিথি॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২১৮-২১৯)

এরপর লহনা ও খুল্লনা দু'সতিন যুক্তি করে পুত্রের কর্ণভেদ অনুষ্ঠান শুভযোগে পালনের জন্য দনাই পণ্ডিতকে আদেশ দেন। শ্রীমন্তের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন পুত্রের শ্রবণভেদ অনুষ্ঠানও পালিত হয়।

শিক্ষা অর্জনের মতো আধুনিক মানুষের মৌলিক অধিকার মধ্যযুগে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত না হলেও অপ্রচলিত ছিল না। তবে বিদ্যার্জন আজকের মতো এতটা সহজসাধ্য ছিল না সেকালে। শিক্ষা বা বিদ্যাচর্চার বেশি অধিকার ছিল রাজা-বাদশাহ বা অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। গুরুগৃহ বা টোলে গিয়ে অথবা বাড়িতে পণ্ডিত রেখে অভিজাত পরিবার তাঁদের সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। সাধারণত সন্তানের বয়স চার-পাঁচ বছর পূর্ণ হলে অভিভাবকেরা মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে পণ্ডিত ডেকে সন্তানদের হাতেখড়ি দিতেন। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিকে ফলাহার দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। ফলাহার শেষে আগত অতিথিরা পুত্র-কন্যাকে আশীর্বাদ করতেন তারা যেন সকল শাস্ত্রে শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে দেশ ও জাতির সম্মান রক্ষা করতে পারে। যথা নিয়মে শ্রীমন্তের বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হলে খুল্লনা দনাই পণ্ডিতকে ডেকে পুত্রকে উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার আদেশ দেন। পিতার অনুপস্থিতিতে শ্রীমন্তের শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্যার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। বরং মাতা খুল্লনা ও লহনার অত্যধিক যত্ন ও আদরে সুস্থ ও সবল দেহে উপযুক্ত পরিবেশে মায়ের আদর্শে শ্রীমন্ত বড় হতে থাকে। খুল্লনা পণ্ডিতকে অতিরিক্ত সম্মানী দিতেও মনস্থির করেন। মায়ের একটিই অনুরোধ পুত্র যেন সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রকৃত মানুষ হয়। দনাই পণ্ডিতও খুল্লনার আদেশ মেনে শ্রীমন্তকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাকে প্রকৃত মানুষ করার অঙ্গীকার করেন। শ্রীমন্তের হাতেখড়ি অনুষ্ঠান শুভদিন শুভক্ষণ দেখে পালন করা হয়—

আচার বিনয় দীক্ষা জতনে করাইবে শিক্ষা
জাকু ছিরা তোমার নিলয়ে॥
… … …
জত চাহ ধন দিব নিবেশ করিআ মন
সুতে মোর দেহ বিদ্যাদান॥
… … …
শুনি বাক্য খুল্লনার দ্বিজ কৈল অঙ্গীকার
হাথে-খড়ি দিল শুভক্ষণে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২২২)

শুভক্ষণে শুরু হয় শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষা। শ্রীমন্তের শিক্ষার প্রতি ভক্তি, একনিষ্ঠতা, বিদ্যানুরাগ এবং গুরুর প্রচেষ্টায় খুব অল্প সময়েই শ্রীমন্ত সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করে। সাথে ছিল শ্রীমন্তের দু-জন মায়ের আশীর্বাদ—

গুরুবাক্যে দিয়া কর্ণ চিনিল অনেক বর্ণ
অষ্টশব্দি সুবন্ত পানিন॥
... ...
নিবিষ্ট করিয়া মন লিখে পড়ে অনুক্ষণ
বিদ্যা বিনে নহে অন্যমনা॥
পড়িল ব্যাকর্ণ-টিকা গণবৃত্তি সমাসিকা
অমর জুমর বর্ণ নানা
জানিতে সন্ধির তত্ত্ব পড়িল উজ্জ্বলদত্ত
... ...
ক্ষুদ্র কাব্য পড়ি দ্রুত মাঘ পড়ে মেঘদূত
নৈসধ কুমারসম্ভব॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২২২-২২৩)

এ ছাড়াও প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের জন্য শ্রীমন্ত বামন দণ্ডী, ভারবি, কালিদাস, জয়দেব প্রমুখ পণ্ডিতগণের শাস্ত্র পড়তে থাকে। ছন্দতত্ত্ব, অলঙ্কার শাস্ত্র এমনকি অভিধান শাস্ত্রও অধ্যয়ন করে শ্রীমন্ত—

পড়িল বামন দণ্ডী কবির কবিত্বখণ্ডি
নানাছন্দে পড়িল পিঙ্গল।
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২২৩)

অচিরেই শ্রীমন্ত সর্ববিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করে অশেষ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন। অন্যদিকে অভিজাত পরিবারের সন্তান হিসেবে তার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধও ছিল প্রবল। অল্প বয়সেই শ্রীমন্তের মধ্যে জন্মেছে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। গুরুর অযৌক্তিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে করেছেন তীব্র প্রতিবাদ—

টীকার বিচার গুরু না বল ঝটিত
কেন বা প্রভুর ইচ্ছা হব অনুচিত॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২২৪)

এ কথা শোনার পর গুরু ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ভুলে শ্রীমন্তকে ঢেমন, জারজ বলে গালি দিতে থাকেন এবং পাঠশালা ত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু শ্রীমন্তও ছাড়ার পাত্র নয়, গুরুকে অন্যায় বাক্য বলার প্রত্যুত্তরে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন—

পঞ্চাশ কাহন কড়ি খাও মাসে মাস।
আমি যদি জারুয়া তোমার জাতি নাশ॥
বুঝিয়া না কহ কথা হইআ পণ্ডিত।
কোপেতে বাধিত হইআ বল অনুচিত॥
উচিত বিচারে নাহী পরিবাদ বল।
ঢেমনের ঘরে হে কেমনে খাও জল॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২২৪)

গুরুর কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে শ্রীমন্ত প্রতিজ্ঞা করলেন হয় পিতাকে গৃহে ফিরিয়ে আনবেন নতুবা প্রাণ বিসর্জন দেবেন। এ প্রতিজ্ঞা থেকে তাকে কেউ নিবৃত্ত করতে পারলেন না। এ দিকে শ্রীমন্তের মাতা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করে ছেলের অপেক্ষায় আছেন। দুর্বলার কাছে পুত্রের কোনো সংবাদ না পেয়ে খুল্লনা

চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েন, মায়ের মনে নানাবিধ আশঙ্কা দেখা দেয়। দুর্বলাকে সাথে নিয়ে খুল্লনা নিজেই গুরুগৃহে উপস্থিত হন। সেখানে খুল্লনা নিজেও গুরু কর্তৃক হন নিগৃহীত—

কুলের রমণী　　কুল কলঙ্কিনী
জলাঞ্জলি দিলি লাজে।
ভ্রমিলি গহনে　　ছাগ রাখি বনে
ভ্রমিলি সেই অভ্যাসে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২২৫-২২৬)

নাছোড়বান্দা পুত্রকে কিছুতেই কেউ সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারেননি। অবশেষে অভিমান মাখা রুদ্ধ কণ্ঠে জননীর নিকট গিয়ে শ্রীমন্ত বললেন—

বন পোড়ে দেখে জন　　গুপ্তে পোড়এ মন
জীবনে নাহিক প্রয়োজন।
জারুয়া বলিআ গালি　　মুখে যেন চুন-কালী
করিল পণ্ডিত অপমান
তেজিব মনের দুঃখ　　না দেখিব লোকমুখ
করিব মাহুর বিষ পান॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২২৭)

শ্রীমন্তের বিরহতাপিত মনস্তাপে খুল্লনাও সমভাবে ব্যথিত। তাই পুত্রের এ সংকল্পে খুল্লনা পুত্রকে পিতৃ অন্বেষণের অনুমতি না দিয়ে পারেননি। শ্রীমন্ত তার মায়ের এবং নিজের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে সিংহল যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সবশেষে শ্রীমন্ত রাজার কাছে যান অনুমতি লাভের জন্য। রাজার নিকট শ্রীমন্ত নিম্নোক্ত নিবেদন পেশ করেন—

পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ জপতপ পিতা।
পিতা মহাগুরু পিতা পরম দেবতা॥
... ...
দেহ অনুমতি রায় দেহ অনুমতি।
বাপের উদ্দিশ আশে জাব লঘু গতি॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২৩২)

প্রথমে রাজা বারো বছরের ছোট বালককে পিতৃ অন্বেষণে যেতে দিতে রাজি ছিলেন না। পরে শ্রীমন্তের একনিষ্ঠ পিতৃভক্তি দেখে রাজা অনুমতি না দিয়ে পারেননি—

শ্রীমন্তের পিতৃভক্তি দেখিআ নৃপতি।
সাধু সাধু বলি রাজা দিল অনুমতি॥
(*চণ্ডীমঙ্গল* ; ২০০৭ : পৃ : ২৩২)

পথে খরচের জন্য রাজা এক মণ সোনা দিলেন এবং আলিঙ্গন করে শ্রীমন্তকে আশীর্বাদ করলেন যেন অতিসত্বর পিতা-পুত্রের মিলন হয়। পথ খরচের জন্য এক মণ সোনা প্রদানের মধ্য দিয়ে উজানিনগরের অর্থনৈতিক অবস্থ যে কতটা সমৃদ্ধ ছিল তা খুব সহজেই বোঝা যায়।

মাতা ও রাজার অনুমতি নিয়ে মাত্র বারো বছরের পুত্র শ্রীমন্ত পিতার খোঁজে সিংহল অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে যাতে ছেলের কোনো বিপদ আপদ না হয় এজন্য যত প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আছে খুল্লনা সেগুলির কোনোটিই বাদ দেননি। বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে খুল্লনা পুত্রকে যাত্রার অনুমতি দেন।। পিতা-পুত্র মুখোমুখি হলে উভয়কে চিনতে ও জানতে যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য অভিজ্ঞান স্বরূপ খুল্লনা একটি অঙ্গুরি শ্রীমন্তকে প্রদান করেন—

জাতপত্র অঙ্গুরি বাপের নিদর্শন॥
তণ্ডুল অষ্ট দূর্বা দিল তার হাতে।
বিপদসাগরে জেন চণ্ডী হয় চিত্তে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২৩৫)

শ্রীমন্ত তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পৌরুষের বলেই মাত্র বারো বছর বয়সে পিতৃ-অন্বেষণে সিংহল অভিমুখে যাত্রা করেন। সীমাহীন শক্তির আধার চণ্ডীর আশীর্বাদ লাভ করায় তার পক্ষে যে-কোনো অসম্ভবকে সম্ভব করা, যে-কোনো অসাধারণ শক্তি অর্জন করা, যে-কোনো গুণে গুণান্বিত হওয়া কঠিন নয়। সিংহলে যাওয়ার পথে শ্রীমন্তও তার পিতার মতো কমলে কামিনী দেখতে পায় কিন্তু রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্বের প্রতিশ্রুতি পেয়েও সিংহলরাজকে সে মূর্তি দেখাতে ব্যর্থ হলে তাকেও রাজা মশানে দেন ; দেবী চণ্ডীর দাক্ষিণ্যে শ্রীমন্ত এ বিপদ থেকে উদ্ধার পায় এবং সিংহল রাজ চণ্ডীর মাহাত্ম্য বুঝে স্বীয় কন্যা সুশীলার সাথে শ্রীমন্তের বিয়ে দিতে মনস্থির করেন। চণ্ডীকে উদ্দেশ্য করে সিংহল রাজ নিম্নোক্ত উক্তি করেন—

তোমার বচন মাথে নিল আমি জোড়হাথে
সুশীলা করিল সমর্পণ॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২৭৯)

বিয়ের পূর্বে শ্রীমন্তের এক শর্ত ছিল। আগে শ্রীমন্ত তার পিতাকে খুঁজে বের করবেন তারপর বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন। কেননা পিতার অবর্তমানে তাকে এবং তার মাতাকে সমাজে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হচ্ছে। তাছাড়া শ্রীমন্ত তার মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পিতাকে নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন অথবা প্রাণ বিসর্জন দেবেন। অবশেষে গণক হতে শ্রীমন্ত অবগত হলেন তার পিতা কারাগারে বন্দি আছেন। শ্রীমন্ত পিতৃঅন্বেষণে কারাগারে গেলেন। সিংহল রাজ সাত ঘর বন্দিকে শ্রীমন্তেরর সামনে এনে পিতাকে খুঁজে নিতে বলেন। মায়ের বলা কিছু চিহ্ন মিলিয়ে শ্রীমন্ত তার পিতাকে শনাক্ত করেন। পিতা-পুত্রের সাথে দীর্ঘ বারো বছর পর মিলন হলো। শ্রীমন্ত পিতাকে প্রশ্ন করেন কী কারণে তিনি সিংহল আসলেন কী কারণেই বা তিনি দীর্ঘ বারো বছর কারাবাস করলেন? ধনপতিও কিছু স্মৃতি শ্রীমন্তের কাছে ব্যক্ত করেন—

রাজার ভাণ্ডারে নাহী শঙ্খ চন্দন।
তরণী সাজিআ আইনু দক্ষিণ পাটন॥
... ...
নাহী পুত্র বন্ধ্যা মোর প্রথম যুবতি।
কনিষ্ঠা বনিতা মোর ছিল গর্ভবতী॥
জখন তাহার গর্ভ হইল ছয় মাস।
সেই কালে নৃপাদেশে কৈল পরবাস॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২৮৭)

শ্রীমন্তের আর বুঝতে বাকী রইল না যে ইনিই তার পিতা ধনপতি। এরপর শ্রীমন্ত তার মাতা প্রদত্ত অভিজ্ঞান অঙ্গুরি ও পত্র ধনপতিকে প্রদান করেন। পত্রটি পড়ার পর ধনপতিরও আর কোনো সন্দেহ রইল না। তিনি নিশ্চিত আগন্তুক এ কিশোরই তার পুত্র শ্রীমন্ত। এরপর ধনপতি কুঙ্কুম, চন্দন ও তেল দিয়ে স্নান করেন, স্নান শেষে পিতা-পুত্র পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভোজন করেন। কর্পূর তাম্বুল দিয়ে মুখ শোধন করেন। অতঃপর শ্রীমন্তও নিজ পরিচয় ব্যক্ত করে পিতাকে সান্ত্বনা দেন—

না কান্দ না কান্দ বাপ দূর কর পরিতাপ
আমী তোমার বংশধর॥
... ...
ইছানি নগর পথে বেগে ধায় পারাবতে
খুল্লনার পড়িল অঞ্চলে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২৮৮)

শ্রীমন্ত তার পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন-চণ্ডীকে পূজা না দেওয়া এবং তাকে অবজ্ঞা করার ফলেই এ দুদর্শা। চণ্ডীর পরম ভক্ত শ্রীমন্ত পিতাকে চণ্ডীর ভজনা করতে অনুরোধ করেন কারণ রণে-জনে-বনে-জলে সর্বদা চণ্ডীই তাদের রক্ষা করবেন।

প্রথমে ধনপতি সুশীলার সাথে পুত্র শ্রীমন্তকে বিয়ে দিতে রাজি ছিলেন না কিন্তু নরপতি সালবানের অনুরোধে পুত্রের বিয়ে দিতে রাজি হন। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণের মধ্যদিয়ে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। হিন্দুশাস্ত্র নির্দেশিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি অনুযায়ী সকল আচার-পার্বণ পালনের মধ্য দিয়ে শ্রীমন্ত ও সুশীলার বিয়ে সম্পন্ন হয়। এসব আচার-অনুষ্ঠানে প্রচলিত পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে। তবে উচ্চ শ্রেণির বিয়ের-অনুষ্ঠান হওয়ায় জৌলুস ও আড়ম্বর এখানে বেশি ও স্পষ্ট।

সিংহলরাজ দুহিতার বিয়েতে নানা ধন সম্পদ দিয়ে সাদরে জামাইকে বরণ করেন—

শ্রীমন্তেরে রাজা জদি দিল কন্যাদান।
নানা ধনে জামাতারে সাধিল সম্মান॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২৯০)

সিংহলরাজের নানা ধন সম্পদ দিয়ে জামাতাকে সম্মান করার মধ্যে মধ্যযুগে বিয়েতে বরপণ প্রদানের ইঙ্গিত নিহিত ছিল। রাজা রথ, গজ, ঘোড়া, দোলা ও কণ্ঠমালা দিয়ে জামাতার সম্মান রক্ষা করেন। বিয়ে সমাপনান্তে ভোজনপর্ব, তারপর কন্যা ও জামাতার ফুল শয্যায় রাত্রি যাপন। শ্রীমন্ত তাঁর দুঃখিনী মা খুল্লনাকে ভুলে সুশীলাকে নিয়ে সুখে সংসার যাপন করতে থাকেন। চণ্ডীর ব্রতদাসী খুল্লনার কথা স্মরণ করে চণ্ডী অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং কীভাবে শ্রীমন্ত ও ধনপতিকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা যায় পদ্মার সাথে তার যুক্তি আঁটেন। পদ্মা চণ্ডীকে খুল্লনার রূপ ধরে শ্রীমন্তকে স্বপ্নে দেখা দেওয়ার পরামর্শ দেন।

স্বপ্নে মায়ের দর্শন পেয়ে শ্রীমন্ত অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। পরিশেষে স্ত্রী সুশীলা এবং পিতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশের উদ্দেশে যাত্রা করার প্রস্তুতি নেন। শ্রীমন্তের এই যাত্রার সংকল্প শুনে সুশীলার মন ভারাক্রান্ত। কবিকঙ্কণ *চণ্ডীমঙ্গলে* সুশীলার বারমাস্যার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সুখের বারমাস্যা এখানে দুখের লেশমাত্র নেই। ধনাঢ্য বিলাসবহুল জীবনে সুখ যে আয়ত্ত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সুশীলার বারমাস্যায়। এর মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের বাংলার উচ্চ শ্রেণির গার্হস্থ্যজীবনের এক ভিন্নমাত্রিক প্রান্ত উন্মোচন করেছেন কবিকঙ্কণ। সুশীলা তার স্বামীকে পুরো বছরের বাধাহীন সুখের কাহিনি শুনিয়েছেন—

বৈশাখে দুরন্ত রিতু সুখের সময়।
প্রচণ্ড তপনতাপ তনু নাহী সয়॥
চন্দনাদি তৈল অঙ্গে সুশীতল ধারি।
… … …
ফাল্গুনে ফুটিল নাথ মম উপবনে।
তথি দোলমঞ্চ নাথ করিব নির্মাণে॥
… … …
মধুমাসে মলয়মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীএ মধুকর পীয়ে মকরন্দ॥
মালতি মল্লিকা চাঁপা বিছায়্যা শয়নে।
মধুমাসে গোঙাইব মুদিত রাত্রিদিনে ॥
… … …
সুশীলার বিনয় শুনিঞা সদাগর॥
হেট মুখে শ্রীয়পতি দিলেন উত্তর॥
সর্ব উপভোগ মোর মায়ের চরণ॥

(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২৯২-২৯৪)

শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার প্রাক্কালে কন্যার বাবার বাড়িতে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এত দিনের স্নেহ-লালিত্যে পালিত কন্যাকে জামাতার হাতে সমর্পণ সত্যিই বড় কষ্টের। মেয়েকে সুখী দেখতে জামাতার হাতে উপঢৌকন দিতে কন্যার বাবার কোনো আপত্তি থাকে না। শ্রীমন্তের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সুশীলার পিতা রাজা সালবান এবং সিংহলের যুবক যুবতীরা শ্রীমন্তকে নানা পুরস্কার তথা যৌতুক প্রদান করেন—

কৌতুকে জৌতুক দেই জতেক যুবতী।
কনক রতন হীরা মানিকের ভূষণ
কৌতুকে জৌতুক দেই জত বন্ধুগণ।
পাটনের লোকে দিল হেমময় হার
চরণে নূপুর কেহ দেন সুঝঙ্কার।
নানাধনে জামাতারে কৈল পুরুস্কার
দিলেন দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ ভারে ভার।
চামর চন্দন দিল হিরা মুতি পলা
জামাতারে দিল কনকের কণ্ঠমালা॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২৯৬)

রাজা সালবান ও সিংহলবাসীর এসব উপহার প্রদানের মধ্য দিয়ে উচ্চবিত্ত সমাজের বন্ধুমহলে উপহার আদান-প্রদানের রীতির প্রচলন থাকার প্রমাণ যেমন পাওয়া যায় তেমনি কন্যা-বিদায় বলে কথিত অনুষ্ঠানের বিষাদবহ ছবিও এখানে ফুটে উঠেছে। জামাতার হাতে কন্যা সমর্পণের সময় কন্যার মাতা-পিতা নানা সকরুণ হিতোপদেশ দিয়ে থাকেন। সুশীলার বিদায়ক্ষণেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি-

জামাতার হাতে কৈল কন্যাসমর্পণ।
শিশুমতি সুশীলার করিহ পালন॥
(মুকুন্দরাম : ১৯২১ ; পৃ : ২৯৪)

এ বর্ণনার মধ্যদিয়ে কবি বাঙালি পিতৃহৃদয়ের এক গভীর অন্তর্বেদনার চিত্র তুলে ধরেছেন। সুশীলা পিতা মাতার চরণ বন্দনা করে শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করলেন। কন্যার বিদায় মায়ের হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে—

সুশীলা করিআ কোলে ভাসিআ লোচনজলে
পাটরানি কান্দে উভরায়॥
... ...
রানির ক্রন্দন সুনি জত পুরনিতম্বিনী
ধরণি লোটায়্যা সভে কান্দে॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ২৯৬-২৯৭)

এ এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। মাতা-পিতার অন্তর্বেদনা রাজ্যের সকলকে ব্যথিত করে। তাদের চোখের জল ধরে রাখা দায় হয়ে যায়। শ্রীমন্ত সস্ত্রীক সিংহল হতে উজানি অভিমুখে যাত্রাকালে সুশীলাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানোর দৃশ্য কবি মুকুন্দচক্রবর্তী অত্যন্ত মর্মস্পর্শী করে বর্ণনা করেছেন। সিংহল রাজকন্যাকে পতি গৃহে পাঠাতে গিয়ে কবি বাঙালি পিতার অন্তর্বেদনাকে তুলে ধরেছেন। তিনি নিজে কেঁদেছেন এবং অন্য সকলকেও কাঁদিয়েছেন। এমন মুহূর্তে সুশীলা তার মাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এভাবে—

সুশীলা বলেন মা কাঁদিয়া কেন মর।
মনেতে ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর॥
(মুকুন্দরাম : ১৯২১ ; পৃ : ২৯৫)

যদিও ঐ মুহূর্তে সুশীলার মুখ নিঃসৃত এ বাক্য শুনতে হয়ত তার মায়ের ভালো লাগেনি তবে কবি এ উক্তির মধ্য দিয়ে জীবনের এক কঠিন বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। প্রত্যেক কন্যা তার মাতা-পিতাকে ছেড়ে অন্য এক পরিবেশে গিয়ে স্বামীর মাতা-পিতাকে আপন করে নিজের মতো করে সংসার সাজায় কবি উদ্ধৃতাংশে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। এটাই বাস্তবতা এবং যুগ যুগ ধরে সমাজে এটাই চলে আসছে।

শ্বশুর-শাশুড়ির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীমন্ত পিতা ও স্ত্রীকে নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে আসেন। ধনপতি তাদের আগমন বার্তা কর্ণধারকে দিয়ে অন্দর মহলে প্রেরণ করেন। কর্ণধার তিল মাত্র বিলম্ব না করে এ আনন্দের খবর রানী লহনা ও খুল্লনাকে দেয়। লহনা খুল্লনা স্বামী, পুত্র ও পুত্রবধূকে একসাথে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। শাশুড়ি ও এয়োগণ মিলে ধান দূর্বা দিয়ে পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করে গৃহে নিয়ে এলেন। দেশে ফিরে শ্রীমন্ত স্ত্রী, মাতা-পিতা ও বিমাতাসহ একান্নবর্তী পরিবারে বেশ সুখেই আছেন। কিন্তু এ সুখ দীর্ঘস্থায়ী হলো না, তার জীবনে ঘটল আর এক বিপত্তি। শ্রীমন্তকে শেষ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলো। উজানির রাজা বিক্রমকেশরী আবদার করলেন তাকে সেই দেশের মাটির ওপর কমলে-কামিনীর রূপ দেখাতে হবে। ব্যর্থ হলে গর্দান এবং সফল হলে নিজ কন্যা জয়াবতীকে শ্রীমন্তের হাতে সমর্পণ। চণ্ডীর দয়ায় শ্রীমন্ত রাজাকে কমলে-কামিনী রূপ দেখাতে সমর্থ হলেন। রাজা বিক্রমকেশরী খুশি হয়ে কন্যা জয়াবতীকে হিন্দু শাস্ত্রের সকল আচার-পার্বণ মেনে শুভক্ষণে শ্রীমন্তের হাতে সমর্পণ করেন। শ্রীমন্তের দ্বিতীয় বিবাহে সুশীলার অভিমান—

কান্দে সিলা রাজার নন্দিনী।
... ...
জন্ম হইল সুখস্থলে ছিনু মা-বাপের কোলে
... ...
কোন দোষে দিলে মোরে সতা॥
(মুকুন্দরাম : ২০০৭ ; পৃ : ৩০৪)

সুশীলা ধনীর দুলালি, রাজকন্যা, সোনার চামচ মুখে নিয়ে তার জন্ম। দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা সে কখনো ভোগ করেননি বা করতে হবে এমনটিও ভাবেননি কিন্তু অকস্মাৎ স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের সিদ্ধান্তে দুঃখে, ক্ষোভে ও অভিমানে বিধাতাকে অভিসম্পাত করেছেন। এরপর দুঃখ সংবরণ করতে না পেরে সুশীলা স্বামীর ওপর অভিমান করে পিতৃগৃহে চলে যেতে চেয়েছেন। তখন শ্রীমন্ত সুশীলাকে সান্ত্বনা দেন—

রাজা করে কন্যাদান আমি কি সাধিব মান
সতা নহে জয়া তব দাসী॥
(*চণ্ডীমঙ্গল* ; ২০০৭ : পৃ : ৩০৫)

শ্রীমন্তের দ্বিতীয় বিবাহের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের উচ্চবিত্ত সমাজে বহুবিবাহের আধিক্য ও যৌক্তিকতা প্রদর্শিত হয়েছে। লক্ষণীয় যখনই কোনো উচ্চবংশীয় চরিত্র দ্বিতীয় বিবাহ করতে মনস্থ করেছেন অথবা আপাত ভাবে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বাধ্য হয়েছেন তখনই কবি তাদের মুখে যুক্তি, প্রমাণ ও নানা অজুহাত স্থাপন করেছেন। মধযুগের গার্হস্থ্যজীবনের এই নির্মম বাস্তবতার সমর্থক কবি ছিলেন কিনা এ প্রশ্নের মীমাংসা না করেও বলা যায় যে, কবি এই বাস্তবতার প্রত্যক্ষদর্শী এবং ঐ বাস্তবতার নির্মোহ বর্ণনাদানকারীও।

কলিকালে দীর্ঘদিন মর্ত্যভূমিতে অবস্থান করা বড়ই কষ্টকর তাই চণ্ডী এ সত্য উপলব্ধি করে খুল্লনা, শ্রীমন্ত এবং তাঁর স্বর্গভ্রষ্ট দু'পত্নী এ চারজনকে নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। খুল্লনা স্বামীর অনুমতি নিয়ে দেবীর সহযাত্রী হলেন। স্বর্গে যাওয়ার পূর্বে চণ্ডী ধনপতিকে আশীর্বাদ করে গেলেন লহনার গর্ভে তার বংশধর পুত্র জন্মাবে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি প্রধানত চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচার এবং পৃথিবীতে দেবীর স্বীকৃতি পাবার একটি আখ্যান। কাহিনিটি দুটি ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে কালকেতু উপাখ্যান যেখানে অনার্য সম্প্রদায় তথা ব্যাধ সমাজে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে এবং উক্ত সমাজে আরাধ্যা দেবী হিসেবে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেছেন। কিন্তু এতে দেবী সন্তুষ্ট হতে পারেননি কারণ আর্য সমাজেও তাঁর প্রতিষ্ঠা চাই। এজন্য দেবী আর্য সমাজের প্রতিনিধি দেশের উন্নত শহর উজানিনগরের ধনী বণিক এবং পরম শৈব ধনপতিকে দিয়ে পূজা আদায়ের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করেছেন, শেষে পূজা আদায় এবং দেবীর স্বীকৃতি লাভ করেছেন। দেবখণ্ডে শিব-পার্বতীর সাংসারিক জীবন চিত্র এবং কৈলাসে শিবের চণ্ডী পূজা সম্পন্ন হয়েছে। স্বর্গে ও মর্ত্যে পূজা প্রাপ্তির পরেই একজন দেবী প্রকৃত দেবীর মর্যাদা পান। এ ক্ষেত্রে দেবী চণ্ডী সফল। দেবীর মর্যাদা আদায় করতে গিয়ে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী যে আখ্যানটি বর্ণনা করেছেন সেখানে মধ্যযুগের বাঙালির বাস্তবজীবন চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে। বাঙালি সমাজ, পারিবারিক-জীবন, বিভিন্ন প্রকার আচার-পার্বণ পালিত হওয়ার উল্লেখ মঙ্গলকাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। বিশেষ করে বাঙালির গার্হস্থ্যজীবন চিত্র লক্ষ করার মতো। জীবের ভ্রূণ থেকে শুরু করে একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাই কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। একটি পরিবার, সেই পরিবারে সন্তানের জন্ম, তাকে লালন-পালন, পারিবারিক আচার-পার্বণ, পূজা-পদ্ধতি, শিক্ষা-দীক্ষা আবার সেই সন্তানকে কর্মে প্রতিষ্ঠা এ সব কিছুই এই আখ্যানের অংশ। কখনো মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কাহিনির সমাপ্তি আবার কখনো দেব কন্যা-পুত্র অথবা পুত্রবধূ, অথবা স্বর্গের নর্তক-নর্তকীর স্বর্গরোহণের মধ্য দিয়ে কাহিনির সমাপ্তি ঘটেছে। এর মাঝে তাদের যে কর্মকাল তার মধ্য দিয়ে বাঙালির গার্হস্থ্যজীবন চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। দেখা যায় মঙ্গলকাব্যের দেবতারাও বাস্তব পৃথিবীর মানুষ হয়ে উঠেছেন। একান্ত আপন এবং সাধারণ মানুষের মতোই রক্তমাংসে গড়া, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখের অনভূতিতেও তাঁরা সামিল, কোনো অতিমানবীয় শক্তির অধিকারী নন। মঙ্গলকাব্যগুলোর উৎসে যে মানব-ভাবনা সক্রিয় তাও বাস্তবধর্মী ও সামাজিক যা পারিবারিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। পার্থিব সুখ চাই, স্বাচ্ছন্দ্য চাই, পুত্র পরিজন নিয়ে আনন্দঘন সংসার চাই, রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য থেকে মুক্তি চাই; ইহলোকে সুখভোগ এবং পরলোকে স্বর্গ প্রাপ্তির প্রত্যাশা পার্থিব জীবনে এই চাওয়া মানুষের। মঙ্গলকাব্যের মূল প্রতিপাদ্যই হচ্ছে ইহলোকে সুখ লাভ এবং পরলোকে পরম শান্তির অভীপ্সা।

তথ্য নির্দেশ

অরবিন্দ পোদ্দার (অক্টোবর ২০০৫) *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, ০৯, (চতুর্থ মুদ্রণ)

আশুতোষ ভট্টাচার্য (সেপ্টেম্বর ২০০৯) *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা. লি. ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, দ্বাদশ সংস্করণ

আশুতোষ দাস সম্পাদিত দ্বিজ রামদেবের (১৯৫৭) *অভয়ামঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আহমদ শরীফ (মে ২০০৮) *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (দ্বিতীয় খন্ড), নিই এজ পাবলিকেশন্স, ৬৫ প্যারী দাস রোড, ঢাকা। (পুনর্মুদ্রণ)

ক্ষেত্রগুপ্ত (মাঘ ১৪১৩) *কবি মুকুন্দরাম* , গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১ বি, পটুয়াতোলা লেন, কলকাতা-০৯ ,৪র্থ সংস্করণ

গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯) *বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নীলিমা ইব্রাহীম (নভেম্বর ১৯৯০) *সাহিত্য সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

ভীষ্মদেব চৌধুরী *(১৯৯১) বাংলাদেশের সাহিত্য গবেষণা ও অন্যান্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল জলিল (জানুয়ারি ১৯৯৬) *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

শ্রী অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু প্রকাশিত	(১৯২১) মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তি প্রণীত *কবিকঙ্কণ চণ্ডী* , দ্বিতীয় সংস্করণ, ইণ্ডিয়ান প্রেস লি. এলাহাবাদ
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত	কবি মুকুন্দরাম বিরচিত (১৯৭৪) কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, প্রথম ভাগ, পুনর্মুদ্রিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
শ্রীমন্তকুমার জানা	(জানুয়ারি ২০১১) *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), ওরিয়েন্টাল বুক কো. প্রা.লি., ৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট ,কলকাতা-০৯, পঞ্চম সংস্করণ
সিরাজ সালেকীন	(ফেব্রুয়ারি ২০২০) *কবিতায় নৃগোষ্ঠী : মূলত কেন্দ্র থেকে দেখা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা
সুকুমার সেন	(২০০৭) সম্পা : কবি মুকুন্দরাম বিরচিত *চণ্ডীমঙ্গল* , সাহিত্য অকাডেমি, পঞ্চম মুদ্রণ
সুকুমার সেন	(সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা ০৯, তৃতীয় মুদ্রণ
সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত দ্বিজ মাধবের	(১৯৫২) মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
স্মৃতিকণা চক্রবর্তী	(জুন ২০১১) *মঙ্গলকাব্য পুচ্ছগ্রাহিতা ও মৌলিকতা*, জে এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ

গ. রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের *শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন*

'বাংলাদেশে খ্রিষ্টীয় প্রথম অব্দের দিকে লৌকিক সংস্কৃতির সঙ্গে পৌরাণিক সংস্কৃতির মিলন শুরু হলে শিবোপসনা শুরু হয়'। (শ্রীমন্ত : ২০১১ ; পৃ : ৩৫৯)। গুপ্ত যুগ থেকে শুরু করে পাল ও সেন যুগে বাঙালি রচিত বহু সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থে হর-পার্বতীর কাহিনি পাওয়া যায়। *চণ্ডীমঙ্গল*, *মনসামঙ্গল* ও *রামায়ণের* কাহিনিতে পৌরাণিক শিব ও পার্বতীর ঘর-কন্নার কথা আছে। এককথায় পাল-সেন যুগ থেকেই পৌরাণিক শিবের সাথে লৌকিক শিবের সমন্বয় সাধিত হয়। আর তখন থেকেই শিব এসে গেলেন বাঙালির ঘরোয়া জীবনে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে 'ভারতীয় যে সকল প্রাগ-বৈদিক দেবতা পরবর্তী হিন্দু সমাজেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শিবই সর্বপ্রধান'। (আশুতোষ : ২০০৯ ; পৃ : ১৪২)। সাধারণত শিব মাহাত্ম্য নিয়ে রচিত কাব্যকেই *শিবায়ন* বা *শিবমঙ্গল* কাব্য বলা হয়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে যেখানে দেবদেবীগণ নিজেদের মাহাত্ম্য প্রচার ও পূজা প্রাপ্তির জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন সেখানে *শিবায়নে* শিবের এরূপ কোনো ইচ্ছার প্রতিফলন দেখা যায় না। বরং এ-কাব্যে নিছক পারিবারিকজীবন এবং দাম্পত্যলীলার বর্ণনা আছে। এখানে শিব একেবারে লৌকিক, দরিদ্র, নেশাখোর, নিতান্ত কামাসক্ত ব্যক্তি। এ ছাড়া 'শিবের গৃহস্থালীর চিত্রও বাঙালীর পরিচিত, কিন্তু সে গৃহস্থালী নিতান্তই দরিদ্রের গৃহস্থালী'। (রমেশচন্দ্র : ২০০৩ ; পৃ : ৪১২)

শিবের ব্যাপ্তি সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য : 'শুধু বাংলাদেশেই নহে, সমগ্র ভারতে—উত্তরে কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে কুমারিকা, পশ্চিম-ভারত হইতে পূর্বভারতে আসাম পর্যন্ত বিরাট ভূভাগে শিল্পসাহিত্য, ধর্মকর্ম, শীল-সমাচার-জীবনের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে শিবপ্রমথেশের সর্বব্যাপী প্রভাব লক্ষ করা যাইবে'। (অসিতকুমার : ১৯৯৩ ; পৃ : ২১৩) সর্বোপরি সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে শিবের প্রভাব বর্ণনাতীত। সৃষ্টি ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যু, ধর্ম-কর্ম, পারিবারিক শান্তি ও কল্যাণ, নর-নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক, পূজাপদ্ধতি ও বিভিন্ন প্রকার ব্রতানুষ্ঠানে শিবের প্রভাব অপরিসীম। এককথায় ভারতীয়দের অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে, জগৎ এবং জীবনের আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনায় শিবের অস্তিত্ব একান্ত নিবিড়। শিব সর্বত্র বিরাজিত; শ্মশান-মশান, অরণ্য, গিরিগুহায় তাঁর বিস্তার। তিনি একাধারে সৃষ্টি ও ধ্বংস, মঙ্গল ও অমঙ্গল শক্তির নিয়ন্ত্রক। তিনি একদিকে যেমন বিচিত্র জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধীশ্বর অন্যদিকে তেমনি প্রেম-প্রীতি, মিলন-বিরহ, সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন, নিঃস্ব ও দারিদ্র্যের নিত্য সহচর। একই অঙ্গে তাঁর বহুরূপ। ধ্বংস সাধনে তিনি যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি আবার তিনি কখনো কখনো শান্ত ও পরম করুণাকাতর। তিনি আশুতোষ, সদাহাস্যময় ও আত্মভোলা, আবার তিনিই ক্রোধে হন বিধ্বংসী। তিনি 'কামজর্জর আবার তাঁর যোগানলে কাম হয় ভস্মীভূত'। তিনি নটরাজ তাঁর নৃত্যের তালে তালে বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংস সম্পন্ন হয়। তিনি সন্ন্যাসী, রিক্ত আবার তিনি উমার প্রেমে সংসারী, আবার কখনো কখনো সংসারী হয়েও অনাসক্ত। তাঁর ললাটে 'বহ্নিজ্বালার পাশেই চন্দ্রকলা', তিনি শিশুর মতো সরল, মান অভিমান নিন্দা প্রশংসায় উদাসীন। তিনি মহাকাল। আহমদ শরীফের মতে 'কালান্তরে স্থানান্তরে এবং শাস্ত্রান্তরে মহাদেবতা শিব-শিবানীর গুণগ্রামের নানা বিস্তার, বিকৃতি ও বৈচিত্র্য ঘটেছে। ফলে শিব হয়েছেন যোগী, তান্ত্রিক, ত্রিগুণাতীত ত্রিকালজ্ঞ অসুরত্রাস কৈলাসবাসী এবং পরমা প্রকৃতি উমা, গৌরী রূপিণী আদ্যাশক্তি হয়েছেন তাঁর পত্নী ও সৃষ্টিসহায়। সর্বভারতীয় ও সর্বগোত্রীয় দেবতা বলেই নানা গোত্রের কল্পিত গুণ ও শক্তি প্রতীক শিবে নানা বিরুদ্ধ ও বিপরীত গুণের সমাবেশ ঘটেছে। একাধারে রুদ্রত্ব (উগ্রতা) শিবত্ব (কল্যাণ) ব্রহ্মচর্য ও বামাচার, যোগ ও ভোগ, ক্ষমা ও ক্রোধ, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস, মুক্তি ও বন্ধন, সৃষ্টি ও সংহার, রোগ ও নিদান প্রভৃতি তাঁর গুণ ও শক্তি রূপে পরিকল্পিত'। (আহমদ শরীফ : ২০০৮ ; পৃ : ৪২৬)

বাংলায় শিবের দুইরূপ : লৌকিক ও পৌরাণিক। 'বাংলাদেশে লৌকিক শিব প্রধানত কৃষি-দেবতা, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত গৃহধর্মের ভিক্ষাজীবী অধীশ্বর। চিরায়ত দারিদ্র্যের মতো কোঁচ-রমণীর সঙ্গে ব্যভিচার ও মাদকাসক্তিও তাঁর নিত্যসঙ্গী'। (শ্রীভূদেব : ২০০৯ ; পৃ : ৩৪৫) আমাদের বাঙালি জীবনে শিবের রয়েছে পত্নী শিবানী, কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী, পুত্র কার্তিক ও গণেশ এবং পরিজন পদ্মা, জয়া ও বিজয়া এবং নন্দী

ও ভৃঙ্গীসহ বিশাল এক একান্নবর্তী পরিবার। বিভিন্ন পাঁচালি কাব্যে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে কোথাও কোথাও শিব পরম আরাধ্য। *মনসামঙ্গল* কাব্যে চাঁদের এবং *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের ধনপতি সদাগরের এক ও একমাত্র আরাধ্য দেবতা শিব। আবার ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গলে* শিব দেবতা তো ননই বরং কখনো কখনো মাথাপাগলা বুড়ো, অবিবেচক স্বামী ও পিতা, কখনো অস্থিরচিত্ত ভিখিরি, কখনো বিদূষক, আবার কখনো বা গাঁজারু। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *শিবায়নে*ও শিব গুণহীন এক দরিদ্র গৃহস্থ। সাধারণ ভাবে '*শিবায়ন* কাহিনির সূচনা ঘটে দক্ষযজ্ঞ আয়োজন এবং অভিজাত ও অনভিজাতের মানদণ্ডে শিবকে এই যজ্ঞে আমন্ত্রণের বাইরে রাখার মাধ্যমে। আমন্ত্রণে সবাই সম্মানিত হয়, কিন্তু দক্ষ সচেতন ভাবেই অসম্মান করে শিবকে'। (সিরাজ : ২০২০ ; পৃ : ৩৩)। পিতৃগৃহে কন্যার 'নিমন্ত্রণ কিবা' এ যুক্তি দেখিয়ে দক্ষগৃহে যজ্ঞের কথা শুনে বিনা নিমন্ত্রণেই সতী সেখানে উপস্থিত হলেন। কারণ সতী স্বামীর এহেন অপমান মানতে পারেননি। কেন শিবকে অসম্মান করা হলো এর জবাব সতী তাঁর পিতার কাছে জানতে চান। প্রত্যুত্তরে দক্ষ নিন্দা করতে থাকেন শিবকে—

> সতীরে শুনায়্যা সদাশিবে নিন্দা করে॥
> অমঙ্গল সকল লক্ষণ তার শুন।
> মহাদেব নাম কিন্তু মহাপ্রেত যেন॥
> ভুত-প্রেত-প্রমথ-অসুর লয়্যা সঙ্গ।
> শ্মশানে শবের পারা সদাই উলঙ্গ॥
> ভূজঙ্গভূষণ অঙ্গ চিতাভস্ম গায়।
> দেব মাঝে সে কি সাজে দেখ্যা ডর পায়॥
> ...   .
> বিধির ঘটনে বিষ খায়্যা নাই মৈল।
> সতীর কপালে পতি পাপমতি ছিল॥
> (রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৩২)

দক্ষ সতীর সম্মুখে শিবের নিন্দা করতে লাগলেন, শিব নিন্দা শুনে সতী দেহ ত্যাগ করেন—

> শিব নিন্দা শুন্যা সভে কর্ণে দিল হাত।
> সতীর অন্তরে শেল বাজিল নির্ঘাত॥
> (রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৩২)

নারীর জীবনে পতি পরম আরাধ্য। কোনো নারী পতি-নিন্দা সহ্য করতে পারেন না। পিতার মুখে পতি নিন্দা শুনে সতীর দেহত্যাগের সংবাদে শিব যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হলেন, শিবের অনুচরগণ যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে দিল। সতীকে হারিয়ে শিব সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব শুরু করেন। পত্নীশোকে শিব মূহ্যমান, সারাক্ষণ ধ্যানে মগ্ন। দক্ষকন্যা সতী দেহত্যাগের পর গিরিরাজের গৃহে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন গৌরী রূপে। আশৈশব তিনি শিবকেই পতিরূপে কামনা করেন। গিরিরাজ ভিখিরি শিবের সাথে গৌরীর বিয়ে দিলেন। প্রাসাদ ত্যাগ করে গৌরী শিবের সাথে পর্ণ কুটিরে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু দিন আর কাটে না, ভিক্ষুকের ঘরের আহার সমাপ্তির দিকে, সম্মুখে নিশ্চিত অনাহার। গৌরী এর সমাধান খুঁজতে লাগলেন। অকর্মণ্য শিবকে কীভাবে কর্মে লাগানো যায় ? পরিশেষে গৌরী শিবকে চাষ করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু শিব নিতান্তই অলস প্রকৃতির, পরিশ্রম করতে নারাজ। তিনি যুক্তি দেখালেন চাষের ফল বিলম্বে ঘটে। তিনি ব্যবসা করতে উৎসাহী হলেন কিন্তু পুঁজি না থাকায় চাষ করতেই মনস্থির করলেন। গুণবতী ভার্যার সুপরামর্শে শিব চাষে উৎযোগী হলেন। তিনি ইন্দ্রের নিকট হতে চাষ-ভূমির পাট্টা গ্রহণ করলেন। নিজের ত্রিশূল দিয়ে বিশ্বকর্মার সাহায্যে চাষ উপকরণ তৈরি করেন। অতঃপর তিনি চাষ সজ্জা প্রস্তুত করে কুবেরের নিকট হতে বীজ ধান সংগ্রহ করলেন। মাঘমাসে প্রচুর বৃষ্টি হলো। অনুচর ভীমের সাহায্যে শুভক্ষণে শিব জমিতে হলপ্রবাহ আরম্ভ করলেন। চৈত্র মাসের মধ্যে জমিতে চতুর্দশবার চাষ দিলেন। চাষ ভূমিতে মাটি চূর্ণকরার জন্য মই দিলেন। বৈশাখ মাসে শুভক্ষণে শিব প্রস্তুতকৃত জমিতে বীজ বপন করলেন। শিবের

জমিতে প্রচুর ধান হলো। ধান ভানতে ঢেঁকির প্রয়োজন। শিব নারদের কাছ থেকে ঢেঁকি ধার নিলেন ধান ভানার জন্য। শিবের অনুচরগণ ঢেঁকিতে ধান ভেনে প্রচুর চাল তৈরি করল। এর ফলে গৌরীর সংসারের দৈন্য ঘুচলেও জীবনে শান্তি মিলল না কারণ শিব মর্ত্যলোকে জমি চাষ নিয়ে এতটাই উন্মত্ত ছিলেন যে কৈলাসে ফেরার চিন্তা তাঁর মনে একবারও উঁকি দেয়নি। তিনি গৌরীর কথা একেবারে ভুলেই গেছেন। মর্ত্যলোকে আবার কতগুলি কুচনি সঙ্গিনী জুটিয়েছেন। গৌরী দীর্ঘদিন স্বামী-বিরহ সহ্য করতে না পেরে নারদের পরামর্শে মর্ত্যে উড়ানি মশা প্রেরণ করেন। মশার কামড়ে শিব অস্থির তবুও কৈলাসে যাওয়ার কথা তাঁর স্মরণে নেই। পার্বতী এবার ডাঁশ ও মাছি পাঠালেন, সর্বাঙ্গে ঘি মেখে শিব এদের কামড় থেকে নিস্কৃতি পেলেন। তারপর জোঁকের উপদ্রব আরম্ভ হলো তথাপি শিব পার্বতীর প্রতি উদাসীন। কৃষিকাজ নিয়েই তিনি মত্ত। শিবের কৃষি কাজের ফলে প্রচুর শস্য উৎপাদিত হওয়ায় পার্বতীর সাংসারিক দৈন্য ঘুচল বটে তবে শিব তাঁর সংসার ধর্ম ভুলে চাষ কাজে ব্যাপৃত থাকায় পার্বতীর মানসিক অশান্তি চরমে পৌঁছে।

শিবকে কৈলাসে ফিরাতে অবশেষে পার্বতী বাগদিনির বেশে শিবের কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। ধানক্ষেতে বাগদিনি মাছ ধরতে লাগলেন ফলে ধানের ছড়া হতে ধান ঝরে পড়তে লাগল। তথাপি শিব বাগদিনিকে কিছু না বলে বরং বাগদিনির রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন এবং ক্ষেতের জল সেচে তাকে মাছ ধরতে সাহায্য করবেন এ প্রতিশ্রুতি দিলেন। বাগদিনি শিবের নিকট হতে একটি পিতলের অঙ্গুরি চেয়ে নিলেন। এবার শিব বাগদিনির আলিঙ্গন প্রার্থনা করলেন। বাগদিনিও আলিঙ্গন দেয়ার ছলনা করে কৈলাসের দিকে অগ্রসর হলেন। শিব তাঁর পশ্চাদনুসরণ করতে লাগলেন, বাগদিনি পার্বতী-রূপ ধারণ করে কৈলাসে প্রবেশ করলেন। অভিমানী পার্বতী শিবকে কৈলাসে প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন কারণ তিনি বাগদিনির প্রেমে মত্ত হয়ে তাকে অঙ্গুরি উপহার দিয়েছেন। শিব অপ্রস্তুত হলেন, চারদিক অন্ধকার মনে হলো। এমন সময় নারদ এসে উপস্থিত হলেন। পার্বতী নারদকে স্বামীর ব্যভিচারের কথা জানালেন। ঝগড়া আরও পাকা করবার জন্য নারদ পার্বতীকে স্বামীর কাছে একজোড়া শাঁখা চাইতে বললেন কারণ হিসেবে নারদ বললেন সধবা স্ত্রীর হাতে শাঁখা থাকলে স্বামী আমৃত্যু বশে থাকবে। কিন্তু শিব ভিখিরি, স্ত্রীর এ প্রত্যাশা পূরণ করবেন কীভাবে ? ভেবে তিনি কুলকিনারা পেলেন না। অভিমানী পার্বতী পিতৃগৃহে চলে গেলেন। পিতৃগৃহে তখন দুর্গোৎসব। নারদ শিবকে পরামর্শ দিলেন যদি পার্বতীকে ফিরিয়ে আনতে চাও তবে শাঁখারি সেজে হিমালয় গৃহে যাও। পার্বতীকে শাঁখা পরিয়ে গৃহে নিয়ে আস। শিব অগত্যা তাই করলেন। শাঁখা দেখে পার্বতীর আহ্লাদের সীমা রইল না। শাঁখার মূল্য জিজ্ঞাসা করায় শিব বললেন এর মূল্য আত্মসমর্পণ। পার্বতী শিবকে চিনতে পারলেন এবং দশ হাত বাড়িয়ে দিলেন শাঁখা পরার জন্য। পার্বতীর অভিমান দূর হলো। কৈলাসে ফিরে এসে তারা সুখে জীবন যাপন করতে লাগলেন।

শিবমঙ্গলের উপর্যুক্ত কাহিনির মধ্য দিয়ে আধুনিক সমাজবিজ্ঞনীর দৃষ্টিতে যেটাকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ বলা হয় এরূপ একটি সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে শিব-পার্বতীর (গৌরীর) পারিবারিক সম্পর্কের একটি বাস্তব-চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। পারিবারিক এ চিত্রে একটি শিশুর জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে তাঁর বেড়ে ওঠা, বিবাহ, সন্তান উৎপাদন, তাদের ভরণ-পোষণ, পারিবারিক দায়িত্ব পালন মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রথমেই প্রত্যক্ষ করা যায় দক্ষকন্যা সতী দেহত্যাগের পর গিরিরাজ জায়া মেনকার গর্ভে গৌরী নামে জন্মগ্রহণ করেন। পর্বতের কন্যা বলে গৌরীর আর এক নাম পার্বতী। পৃথিবীতে নতুন মুখের আগমন সব সময় আনন্দের। নবজাতককে দেখে খুশি হয় না এমন লোক বিরল। তারপর যদি হয় জগৎ জননী গৌরী তাহলে তো আর কথাই নেই—

শুভক্ষণে সেই ধন্যা পরম সুন্দরী কন্যা
গিরিরাজ গৃহে অবতার।
সুরনর-নাগলোক ঘুচিল সবার শোক
ত্রিভুবন জয় জয়কার॥
আনন্দ দুন্দুভি বাজে স্বর্গবিদ্যাধর নাচে
পুণ্যগন্ধ বহেন পবন॥

অবতীর্ণ গিরিসুতা   অবনি মঙ্গলদাতা
ইন্দ্র কৈল পুষ্প বরিষণ॥
(রামেশ্বর ; ১৯৫৭ : পৃ : ৪৭)

বাঙালি চিরকাল অনুষ্ঠান-পার্বণ উপভোগ করতে পছন্দ করে এবং বাড়িতে নতুন অতিথি এলে তারা তার মঙ্গলের জন্য নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শুভক্ষণে পৃথিবীতে গৌরী ভূমিষ্ঠ হলেন। তাঁর আগমনে পৃথিবী ধন্য হলো এবং এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। ত্রিভুবন জয় জয়কার করতে লাগল; চারদিকে দুন্দুভি বাজছে, স্বর্গে বিদ্যাধরী নাচছেন, পবন পুণ্যগন্ধ বিতরণ করছেন আর ইন্দ্র করছেন পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ। জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানকে বাঙালি কখনোই ব্যক্তিগত বা ক্ষুদ্রপরিসরে রাখে না। এসব অনুষ্ঠানে তারা সকল সংকীর্ণতা পরিহার করে আপনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। তাদের গৃহদ্বার শুধু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের জন্য উন্মুক্ত থাকে না বরং অনাহূত-রবাহূত সকলের জন্য গৃহদ্বার উন্মুক্ত থাকে। সন্তানের জন্মমঙ্গলের আনন্দে বাঙালি গৃহস্থ তার জন্মদিনে সকলকে আহ্বান জানাত আশীর্বাদ করার জন্য। ফলে উৎসবটি ব্যক্তিগত না হয়ে হতো সার্বজনীন। *শিবায়ন* কাব্যে গৌরীর জন্মগ্রহণের পর হিমালয়কে এমনি একটি উৎসবের আয়োজন করতে দেখা যায়—

দেখিয়া কন্যার মূর্ত্তি   হিমালয় কৃতকীর্ত্তি
আপনে জানিয়া করে দান।
লোচনে প্রেমের ধারা   কহে কেহ মোর পারা
ত্রিভুবনে নাহি ভাগ্যবান॥
লইয়া বান্ধব জনে   বাদ্যগীত কোলাহলে
করিল কৌলিক মহেৎসব॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ : পৃ : ৪৭)

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে শিশুর জন্মোত্তর কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করার রীতি সমাজে প্রচলিত আছে। গৌরীর পাঁচমাস বয়সে কর্ণভেদ করানো হয় এবং সাতমাসে অন্নপ্রাশন করে গিরিরাজ কন্যার নাম রাখেন গৌরী—

দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যেন শশধর।
বসন্তেরে শোভা করে যেন জোৎস্নান্তর॥
পর্ব্বত পুণ্যাহ পাইয়া পাঁচ মাস কালে।
… … …
সাতমাসে শিশুকে ওদন দিল গিরি॥
গৌরী নাম রাখিল গিরীন্দ্র গুণবান॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৪৭)

অলঙ্কারে আসক্তি নারীর চিরকালের। সুপরিপাটি করে নিজেকে সজ্জিত করতে নারী পারদর্শী। গৌরীর পিতামাতা গৌরীকে যে-সমস্ত অলঙ্কারে সজ্জিত করেন তার মধ্যে অন্যতম পায়ে পাটামল, কটিতে কিঙ্কিণী, কাঁচলি, কণ্ঠে রত্নহার, চুড়ি, বাজুবন্দ, অঙ্গুরি, কর্ণে বিচিত্র কুণ্ডল, নাকে নথ। এ-সকল অলঙ্কার হীরা, মণি, মাণিক্য, মুক্তা ও চুণী খচিত ছিল। এছাড়াও গৌরীকে সাজানোর জন্য চন্দন এবং কাজল ব্যবহারের উল্লেখ আছে—

পায় দিল পাটামল পাসুলির পাঁতি।
মহামণি মুকুতা মণ্ডিত কত ভাতি॥
… … …
কটিদেশে কিঙ্কিণী করিছে কলেবর।
… … …
বিচিত্র কাঁচলি বান্ধা বুকের উপর।
… … …
সকল অঙ্গুলিগুলি অঙ্গরী ভূষিত।

মরকত চুণী মণি মাণিক্য ভূষিত॥
… … …
বিচিত্র কুণ্ডল কর্ণে বিশ্ব বিমোহিনী॥
… … …
সুবর্ণের নথ নাকে ভুবনমোহিনী॥
সুন্দর কপালে দিল চন্দনের বিন্দু।
… … …
কজ্জলে উজ্জ্বল কর‍্যা কুরঙ্গ লোচন।
… … …
সুকুঞ্চিত কেশের সুন্দর কর‍্যা বেণী।
দীপ্ত করে উপরে দীপিকা চূড়ামণি॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৪৮)

শিবায়নে গৌরীর বাল্যক্রীড়া প্রসঙ্গে খেলাধূলার উল্লেখ আছে। সাধারণত 'ছোট মেয়েরা খেলতো কড়াকড়ি, আঁটুল-বাটুল এবং বর-কনে দান। *শিবায়ন* কাব্যে গৌরীর ক্রীড়া বর্ণনা প্রসঙ্গে রামেশ্বর এ ধরনের বর্ণনা তুলে ধরেছেন'। (জলিল : ১৯৯৬ ; পৃ : ৬৬) —

খেলে দশ পঁচিশ ছ কড়া লয়্যা কড়ি।
দান ধর্ম্ম ফেলে দান ফেলে বুড়ি বুড়ি॥
সাতঘরী সুন্দরী সুন্দর খেলা করে।
… … …
আঁটুল বাটুল খেলে পশারিয়া পা।
আর কত লীলা খেলা কত কব তা॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৫৪)

মাতা-পিতা সর্বদাই সন্তানের মঙ্গল কামনায় ব্যস্ত থাকেন। বিবাহযোগ্য কন্যাকে নিয়ে মাতা-পিতার উদ্বেগের সীমা থাকে না। পার্বতী বড় হচ্ছেন, ভুবনমোহনী মূর্তি তাঁর। এখানেই মাতা-পিতার দুশ্চিন্তা বেশি। সদ্বংশ ও সৎপাত্রের চিন্তায় গিরিরাজ যখন মশগুল ঠিক সেই সময় নারদ এসে হাজির হলেন। তিনি পর্বত কন্যার জন্য সৎ ও যোগ্য পাত্রের সন্ধান দিলেন—

কুল শীল কন্যা যোগ্য বরপাব কোথা।
ত্রিভুবন ভাবে নগ নির্ব্বাচিতে নারে।
নারদ আসিয়া উপদেশ দিল তারে॥
… … …
জনকের ঘরে যেন রাঘবের সীতা।
তেমনি তোমার ঘরে হরের বনিতা॥
সুমতি হইয়া সূতা শিবে দিবে দান।
মুক্ত হবে মনে কিছু না ভাবিও আন॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৫৫)

নারদের প্রস্তাবে গিরিরাজ খুব খুশি হলেন এবং নারদকে খুব আপ্যায়ন করলেন। এ কথার কোনো অন্যথা হবে না এ অভয় বাণীও গিরিরাজ নারদকে দিলেন। বাঙালি সমাজে জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ সংঘটনকে দৈব্য নির্ধারণ বলে মনে করা হয়। হিন্দুশাস্ত্রে বিবাহকে জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক বলে শাস্ত্রকারগণ মনে করেন। সাধারণ দম্পতির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য না-হলেও হর-গৌরীর ক্ষেত্রে বিবাহ সম্পর্কটি জন্ম-জন্মান্তরের ছিল। দক্ষকন্যা সতী যিনি পূর্ব জন্মে শিবের ঘরনি ছিলেন পিতৃমুখে পতি নিন্দা শুনে ক্ষোভে, অভিমানে দেহত্যাগ করেন এবং পরবর্তী জন্মে তিনি গিরিরাজ জায়া মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে শিবকেই পতি হিসেবে পাওয়ার আরাধনা করেন—

নারদ বলেন শুন ভবিতব্য মূল॥

বিভা জন্ম মৃত্যু ভোগ বশ কার নয়।
যাহা হইতে যখন যেখানে যাহা হয়॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৫৬)

কিন্তু বিবাহ সংঘটনে মধ্যস্থতা করার জন্য একজন ঘটকের প্রয়োজন হয়। শিব-পার্বতীর বিয়েতে এ দায়িত্বটি পালন করেন নারদ। তিনি মেনকাকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

শিবের শাশুড়ী হৈতে পারিবেত বল॥
হিমালয় হরে বিভা দিতে চান ঝি।
তুমি বল আমি তাথে তবে মন দি॥
… … …
শশিমুখী ভাষে সেই শিব নামা কেবা।
হিমালয় কয় নিত্য যার কর সেবা॥
… … …
তবে আর এ কথার জিজ্ঞাসিবা কি॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৫৬)

বিয়ে মানেই কিছু আচার-পার্বণ নিয়ম-নীতি ও বাদ্য-বাজনার সমাহার। এর মধ্যে অন্যতম ছিল যোড়শ মাতৃকা—

যোড়শ মাতৃকা চলে দেবের বিশাল॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৭৫)

শিবকে দিব্যবস্ত্র পরিয়ে কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বর সাজে সজ্জিত করা হলো। বাদ্যকর, নৃত্যকর, কিন্নর, ব্রহ্মা, বিষ্ণুসহ তেত্রিশ কোটি দেবতা শিবের সঙ্গী হলেন—

ত্রিদশ দুন্দুভি বাজে বাজায় বিশাল।
বেণু বিনা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল॥
ঢাক ঢোল দগ ডঙ্কা সড় ধামা ভেরী।
… … …
ব্রহ্মা বরযাত্র চলে বিষ্ণুর সহিত।
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী চলে হয়্যা হরষিত॥
… … …
ত্রিদশ তেত্রিশ কোটি তার সঙ্গে ধায়।
… … …
দিব্য বস্ত্র পরিধান ভালে ভাল ফোঁটা॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৭৪-৭৫)

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে গার্হস্থ্যজীবনে প্রাক-বৈবাহিক কিছু আচার-পার্বণ পালন করার নিয়ম সমাজে প্রচলিত আাছে। এর মধ্যে অন্যতম অধিবাস, ষোড়শ মাতৃক, নান্দীমুখ। গৌরীর বিয়েতেও প্রাক-বৈবাহিক এ আচার-পার্বণগুলি পালন করা হয়। বিবাহ বা কোনো শুভকাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আয়োজিত মাঙ্গলিক সংস্কার অনুষ্ঠানের নাম অধিবাস। হিন্দু সমাজে বিয়ের পূর্বে এ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। গৌরীর বিয়েতেও গিরিরাজ কোনো এক শুভক্ষণে অধিবাসের আয়োজন করেন—

আনন্দ দুন্দুভি কর্য়া লয়্যা বন্ধুগণে।
গৌরী-অধিবাস গিরি করে শুভক্ষণে॥
ছাইয়া ছায়ামণ্ডপ রাখ্যাছে মণিমালে।
… … …
ব্রাহ্মণ সকল বেড়্যা বেদধ্বনি করে॥
(রামেশ্বর ; ১৯৫৭ : পৃ : ৭৬)

যেহেতু পার্বতী রাজকন্যা সেহেতু তাঁর অধিবাস অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে পালিত হবে এটাই স্বাভাবিক। অত্যন্ত আনন্দ-উল্লাসের মধ্যদিয়ে গিরিরাজ তাঁর কন্যার অধিবাস অনুষ্ঠানটি পালন করেন। বিয়ের পাত্রীকে সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার পরানো হয়। পার্বতীকেও সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করা হলো। গন্ধাধিবাসে সাধারণ মহীগন্ধ, শিলা, ধান, দূর্বা, ফুল, ফল, গোরচনা, সোনা, রূপা, তামা ও দর্পণ প্রভৃতি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়—

সুন্দরী সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার পর্য্যা।
… … …
গৌরীর গন্ধাদি বাস করে গিরিবর॥
মহীগন্ধ শিলা ধান্য দূর্ব্বা পুষ্প ফল।
ঘৃত দধি দুগ্ধ দিল সিন্দুর কজ্জল॥
রোচণা সিদ্ধার্থ স্বর্ণ রূপা তাম্র আদি।
চামর দর্পণ দীপ দিল যথাবিধি॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৭৬-৭৭)

এরপর গৌরীর বিয়েতে আরও পালিত হয় ষোড়শ মাতৃকা, ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয় পূজা এবং নান্দীমুখ—

ষোড়শ মাতৃকা পূজা করে তারপরে।
চেদিরাজ পূজ্যা নান্দীমুখ কৈল সারা॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৭৭)

কিন্তু শিবের নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করা হয়নি কারণ তাঁর পিতা, পিতামহ আদি সকলই তিনি নিজেই—

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কি করিবে শূলপাণি।
পিতৃ পিতামহ আদি সকল আপনি॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৭৭)

বিয়ের অনুষ্ঠান শুধু পতি-পত্নীর আনন্দ ও মিলনের অনুষ্ঠান তা কিন্তু নয় বরং এটি সামাজিক ভাবে স্বীকৃত একটি আনন্দঘন মুহূর্ত, যে মুহূর্তটিতে পাড়া-পড়শি, আত্মীয়-স্বজন সবাই একত্র হয়ে অনুষ্ঠানটিকে আরও বেশি উপভোগ্য করে তোলে। স্ত্রী-আচার বিয়ের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হিসেবে পালিত হয়। স্ত্রী আচারে শুধু সধবা নারীগণই (যাদেরকে এয়ো বলা হয়) অংশ গ্রহণ করতে পারেন। কোনো শুভকাজে বিধবা নারীর অংশ গ্রহণ অমঙ্গলের কারণ বলে মনে করা হয়। একশত এয়ো নিয়ে মেনকা গৌরীর বিয়ের জল সহেন। আবার কন্যার পিতা স্বয়ং গিরিরাজ প্রত্যুদগমন করে বিবাহ সভায় বরযাত্রীদের নিয়ে আসেন—

বরযাত্রী শব্দ শুন্যা স্তব্ধ হিমালয়।
আপনি মধ্যস্থ সঙ্গে আগে হয়্যা লয়॥
বাসা দিল বরকে বিচিত্র বাটী মাঝে।
কিন্নর গন্ধর্ব্ব গায় বিদ্যাধরী নাচে॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৭৫-৭৬)

এয়োগণকে সঙ্গে নিয়ে জামাই বরণ করতে গিয়ে মেনকা পড়েন বিপদে। বর দেখে সবাই বিস্মিত হন—

শাশুড়ী বরণ করে সাবধান হইয়া।
… … …
কপালে চন্দন দিয়া গলে দিল হার॥
… … …
দপ্ দপ্ কপালে দহন উঠে জ্বল্যা॥
… … …
বিষধরে বুদ্ধি দিল বিধাতার পো।
শিরে হাত বাড়াইতে সাপে মারে ছোঁ॥

পাছে হৈল পদ্মমুখী পায়্যা প্রাণ ভয়।
সখী মাঝে শব্দ কর্য়া সাপ সাপ কয়॥
... ...
শাশুড়ী সম্মুখে শিব হইল উলঙ্গ॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৮০-৮২)

প্রত্যেক মাতা-পিতা চান তাঁর কন্যাকে সৎ যোগ্য এবং সুদর্শন পাত্রের হাতে সমর্পণ করতে। কিন্তু মেনকা জামাইকে দেখে হতভম্ব। এমন জামাইয়ের হাতে কন্যা সমর্পণের চেয়ে কন্যার গলায় কলসি বেঁধে গঙ্গার জলে ঝাঁপ দেয়া শ্রেয়। এত গুণী এবং অপরূপ সুন্দরী আদরের দুলালিকে তিনি এমন বুড়ো অপদার্থ পাত্রের হাতে তুলে দিতে নারাজ। মেনকার সমস্ত অভিমান, অনুযোগ গিরিরাজের প্রতি। তিনি কীভাবে এমন একজন পাত্রের সাথে নিজ কন্যার বিয়ে স্থির করেছেন ? এজন্য মেনকা স্বামীকে ধিক্কার দিচ্ছেন—

ভাতার চক্ষের মাথা খ্যায়া বর আন্যায়াছে দিবেন ম্যায়া
ছি ছি ছি ছি কি বলিব তারে।
... ...
গায় বেড়া কালসাপ কোথা হতে আইল পাপ
... ...
ভাল ঘর ভাল বর কয়্যা কয়্যা নিরন্তর
নারদ লাগিল মোর হটে।
গৌরীকে বান্ধিয়া গলে ঝাঁপ দিব গঙ্গা জলে
... ...
গুণের বাছা মোর রূপের নাহি ওর
... ...
দেখ্যা আছা বুড়া ধন্দ মদন লাগিল ছন্দ
বদনে দশন পড়্যা গেছে॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৮৩)

মায়ের কাছে তার সন্তান পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর। এমনিতে গৌরী অনিন্দ্য সুন্দরী এবং সর্ব গুণের আধার হিসেবে স্বীকৃত। এজন্যই বোধ হয় মেনকা অনায়াসে বলতে পারেন—'চান্দের গায়ে মলিন আছে বাছার গায়ে নাই'। (*শিবায়ন*) জামাইয়ের এ চেহারা ও পোশাকের ধরন দেখে মেনকা মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে অশ্রু সংবরণ করতে পারেন না। এজন্য তিনি স্বামীকে দোষারোপ এবং নারদকে শাপ-শাপান্তর করতে থাকেন। পূর্বজন্মে গৌরী দক্ষ-দুহিতা সতী ছিলেন। একদা দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। এ যজ্ঞে অভিজাত, অনভিজাত সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাদ দেন শিবকে কিন্তু সতী 'পিতৃ গৃহে নিমন্ত্রণ কিবা' এ অজুহাতে এক প্রকার জোর করেই পিতৃগৃহে আসেন। এবং পিতার কাছে স্বামীকে অপমান করার জবাব চান। দক্ষ জবাব তো দেননি বরং সতীর সামনেই তার পতির নিন্দা করতে থাকেন। অভিমানী সতী স্বামী নিন্দা শুনে পিতার সম্মুখেই দেহত্যাগ করেন এবং পরজন্মেও বিয়ের সভায় শিবকে গৌরীর অযোগ্য বর বলায় তিনি ক্ষোভে, কষ্টে শিবের এ অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি দিতে শ্বেত মাছি হয়ে শিবকে অনুরোধ করেন ভুবনমোহন রূপ ধরার জন্য—

মদনমোহন মূর্ত্তি ধর মোর তরে।
যত ম্যায়া যেন চায়্যা ধন্দ হয়্যা ঝুরে॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৮৬)

পার্বতীর অনুরোধে শিব ভুবনমোহন রূপ ধারণ করেন—

শঙ্করীর এই কথা শুন্যা সেই বপু।
সর্প সর্ব্ব সাজিল সোনার অলঙ্কার।
গলে ছিল ফণী হৈল মণিময় হার॥

বিভূতিভূষণ হৈল জটাভার কেশ।
ভুবন ভুলিআ গেল মহেশের বেশ॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৮৭)

চণ্ডীমঙ্গলের দেবখণ্ডে পুরাণ বর্ণিত শিব-কাহিনিতে হর-পার্বতীর বিবাহ বর্ণনায় শিবের ভুবনমোহন রূপ দেখে উপস্থিত নারীগণ গৌরীর সৌভাগ্য এবং নিজেদের দুর্ভাগ্য স্মরণ করে দুঃখে কাতর হয়ে নিজ নিজ পতিনিন্দায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু *শিবমঙ্গলে* শিবের ভুবন মোহন রূপ দেখে মেনকার সৌভাগ্য এবং নিজেদের দুর্ভাগ্য মনে করে সবাই জামাই নিন্দা করে নিজেদের মেয়ের দুর্ভাগ্যের চিত্র উপস্থাপন করেন। কারো বর অন্ধ, কারো খোঁড়া, কারো কুঁজা, কারো গোদা, কারো বুড়ো জামাইয়ের কথা স্মরণ করে গৌরীর সৌভাগ্য এবং নিজেদের কন্যাদের দুর্ভাগ্যের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন—

মেনকার মন ভাল মনোহর বর।
আহা রে জামাইর রূপে আলো কল্য ঘর॥
নিরন্তর থাকি দেখ্যা নাহি সতন্তরা।
হাড়ির মুখের মত মিল্যা গেল তারা॥ (সরা)
ভাগ্যবানের বেটি আর ভাগ্যবানের পো।
সোনায় সোহাগা যেন মিল্যা গেল গো॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৯১)

এত দিনের স্নেহ-লালিত্যে পালিত কন্যাকে সম্প্রদান করা সত্যই বেদনার তবে প্রথাটি চিরন্তন। এটি মেনেই প্রত্যেক পিতা তাঁর আদরের কন্যাকে জামাতার হাতে সমর্পণ করেন। হিমালয় তাঁর আদরের দুলালি গৌরীকে বেদমন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শিবের হাতে সমর্পণ করেন—

বেদবাক্য বলিয়া করিল সমর্পণ।
দিয়া মাল্য মলয়জ বস্ত্র আভরণ॥
পায় পাদ্য শিরে অর্ঘ্য মুখে আচমন।
মন্ত্র পড়্যা দিল মহীধর বিচক্ষণ॥
কন্যা সম্প্রদান কালে বলে গিরি রায়।
প্রপিতামহ পূর্ব্বক হৈতে চায়॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৯১)

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে কন্যা সম্প্রদান কালে গিরিরাজ প্রপিতামহ হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেন। কারণ প্রত্যেক নারী-পুরুষ চান তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধর রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে। সম্ভবত প্রপিতামহ হওয়ার মধ্যে গৌরবও বেশি। পণ বা যৌতুক প্রদান সমাজে নতুন কোনো ঘটনা নয়। মধ্যযুগে বরপণ ও কন্যাপণ উভয়ই সমাজে প্রচলিত ছিল। স্বয়ং গিরিরাজ জামাতা শিবকেও নানারত্ন, বসন-ভূষণ এমনকি দিব্য সিংহ, দিব্য রথ যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলেন। যদিও শিবের এ সমস্ত যৌতুকের প্রতি কোনোই আকর্ষণ ছিল না। দাস-দাসীও যৌতুক হিসেবে দেওয়ার প্রচলন সেই সময় সমাজে ছিল। এটি অবশ্যই উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। উল্লেখ্য, দাসী প্রেরণ করতেন মাতা-পিতা নিজ কন্যার সুখের জন্য। হিমালয় তাঁর নয়নের মণি গৌরীকে সেবা শুশ্রূষা করার জন্য পদ্মা, জয়া, বিজয়া এ তিনজন দাসী গৌরীর সাথে দিয়েছিলেন—

কৌতুকে যৌতুক দিয়া নত কৈল সভে।
… … …
নানারত্ন পর্ব্বত প্রচুর দিল হরে।
দিব্য সিংহ দিব্য রথ দিল দুহিতারে॥
পদ্মা জয়া বিজয়া দিল তিন দাসী।

... ...

সুভোজন বসন ভূষণ নানা দানে॥

(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৯৩)

রামেশ্বর ভট্টাচার্য *শিব-সংকীর্তন* বা *শিবায়ন* কাব্যে 'গৌরীর বিবাহ খেলা' অংশে বর-কন্যার বিদায় প্রসঙ্গে কন্যা শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার প্রাক্কালে বাঙালি মায়ের অন্তর্বেদনার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা পাঠককে ব্যথিত করে। বালিকা কন্যার পতিগৃহে যাত্রার সময় মাতার করুণ ক্রন্দনে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যায়। শাশুড়ি জামাইয়ের হাত নিজের মাথায় রেখে জামাইকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নেন। জামাই যেন তাঁর কন্যার অশেষ দোষ ক্ষমা করেন এবং কন্যাকে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে রাখেন এতেই কন্যার মা খুশি। এ যেন বাঙালি পরিবারের মায়ের চিরায়ত হৃদয়-আর্তি। মায়ের এ আকাঙ্ক্ষায় বিলাসিতার নাম গন্ধ নেই, নেই কোনো আড়ম্বর ও চাকচিক্য। একেবারে নিরাভরণ, অনাড়ম্বর ও সহজ সরল জীবনের প্রতিচ্ছবি মায়ের আকুতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে—

জামাতার হস্ত তুলিয়া নিল নিজ মাথে।
শাশুড়ীর কথা হইল জামাতার সাথে॥
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কৈর তুমি॥
আঁঠু ঢ্যাকা বস্ত্র দিবা পেট ভর্য়া ভাত।
প্রীতি কৈর যেমন জানকী রঘুনাথ॥

(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৫২)

কন্যা বিদায়ের প্রাক্কালে গৌরী-জননী জামাতার হাত মাথায় রেখে যে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন শিব সে প্রতিশ্রুতি কোনো দিনই রাখার চেষ্টা করেননি। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে প্রাক-বৈবাহিক এবং বিবাহ সংঘটনের মুহূর্তে যত নিয়ম-কানুন পালন করার নির্দেশ আছে সে-সকল নিয়ম যথাযথভাবে এবং নিষ্ঠার সাথে হর-গৌরীর বিয়েতে পালন করা হয়। হিমালয় শাস্ত্র মেনে বেদমন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে স্বীয় কন্যাকে শিবের হাতে সমর্পণ করেন। স্ত্রী আচার মেনে মেনকা কন্যা বিদায়ের প্রাক্কালে জামাইয়ের কাছ থেকে কন্যাকে সুরক্ষিত রাখার প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নেন মাথার দিব্যি দিয়ে। 'অথচ লক্ষণীয়ভাবে আর্যানুসারী পিতৃতান্ত্রিক ধারার ব্যতিক্রম করে শিব শ্বশুরালয়ে বসবাস করতে থাকেন। পুরাণের আদিপর্বে যখন সতীর পতি শিব, তাতে আর্যদের পিতৃতান্ত্রিকতা গভীরভাবে প্রোথিত। কিন্তু হিমালয় ও গৌরীর প্রসঙ্গে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোর প্রচ্ছন্ন প্রভাবেই হয়তো শিবের চরিত্রে পরিবর্তন আসে। হিমালয়ের প্রান্ত দেশগুলোতে মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার এখনো বহাল আছে-মঙ্গোলয়েড নৃগোষ্ঠীগুলোর ভেতর। শিবের এই পূর্বাপর পরিবর্তন যে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতের জন্ম দেয় তার চিহ্নও বহন করে *শিবায়ন গ্রন্থ*'। (সিরাজ ; ২০২০ : পৃ : ৩৭) কিন্তু ছন্নছাড়া শিব শ্বশুর বাড়িতে বেশি দিন টিকতে পারেননি। তবে শুধু যে ছন্নছাড়া বৃত্তির জন্যই তিনি শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে কৈলাসে ফিরে গেলেন তেমনটিও নয় বরং তাঁর কৈলাসে ফিরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রান্তিক মাতৃতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর উন্মেষ ঘটল। এরপর শিবের ভিক্ষাবৃত্তি ও চাষপদ্ধতি প্রবর্তনের মধ্যদিয়ে সমাজে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাটিরও প্রবর্তন হলো—

সকলি আনন্দময়   সবে মাত্র এক ভয়
শ্বশুরান্নে সদাই ভোজন।
ঘর জামাতি আঘাত   ঘোর দুঃখে বিশ্বনাথ
ঘুচাইলা লজ্জার বসন॥
করিয়া শ্যালক সেবা   শ্বশুরান্নে জীয়ে যেবা
তাহার জীবনে থাক ধিক॥
এহি হেতু মহেশ্বর   কৈলাসে করিয়া ঘর
নগরে মাগিয়া খাইল ভিখ॥

(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৯৫)

শিবের জীবনযাত্রা ও সংসারের হালচাল দেখে মনে হয় এ যেন এক নিম্ন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের জোড়াতালি দেওয়া সংসার যেখানে লোকসংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। শিব, তাঁর সর্বংসহা সহধর্মিণী পার্বতী, দুই পুত্র কার্তিক-গণেশ, পরিচর ভীম, ভিঙ্গি, নন্দী এবং তিনজন দাসী পদ্মা, জয়া, বিজয়াকে বিশাল পরিবারের কর্তা। এ বিশাল পরিবারের ভরণ-পোষণ ভিক্ষা লব্ধ দ্রব্যে মেটানো সম্ভব নয়। সকাল থেকে শিব সবার বাড়ি বাড়ি ভিক্ষার দ্রব্য গ্রহণ করেন—

নাচ্যা গায়্যা ঘরে ঘরে ফিরে শূলপাণি॥
হরে বেড়ি হুলাহুলি হইলেক লোকে।
হরষিতে হরিধ্বনি সবাকার মুখে॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৯৮)

শিবের ভিক্ষাবৃত্তিকে আহমদ শরীফ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—'চিরকাল বিজাতি বিভাষী বিজিত শাসিত শোষিত ও পীড়িত বলেই নিঃস্ব নিরন্ন আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদাবোধহীন বাঙালী কৃষক নিঃসংকোচে পারে ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করতে, নির্দ্বিধায় প্রতারণা প্রবঞ্চনা করতে, চুরির হাত পাকাতে আর কৌশল হিসেবে মিথ্যাভাষণকেই আশ্রয় করতে। বাঙালীর এ সব দোষ আবহমান কালের। বাঙালী মনীষার প্রসূন এ শিব কল্পনায় বাঙালীর চরিত্রের ও মানসের মুখ্য বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে'। (আহমদ শরীফ : ২০০৮ ; পৃ ৪২৯) শেষে শিবের ভিক্ষার ঝুলিতে যা আসে চাল, ডাল, শশা, ফুটি, আলু, কচু, শাক, করলা, কুমড়া, কাচকলা, নাড়ু, মুড়ি, মুড়কি, তৈল এগুলো যারা তৈরি করেন সেই চাষা, মোদক, তেলি, বণিক প্রভৃতি বৃত্তিজীবী মানুষের পরিচয়ের মধ্যদিয়ে একটি গ্রামীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। শিবের ভিক্ষাবৃত্তি নগরে নয়, গ্রামের একেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে—

চাষা দিল শশা ফুটি আলু শাক কচু।
করলা কুমড়া কচি কাচকলা কিছু॥
মোদকের মন্দিরে মহেশ তোলে তোলা।
নাড়ু মুড়ি মুড়কি সোনামতি ছোলা॥
থালি পুর্য়া তেলিঘরে তৈল লয়্যা শেষে।
বণিকের বাটী গেল বিজয়ার আশে॥
… … …
হরিদ্রা আবাটা সান্তনুন (সন্তলন) এক ডালা॥
দার-চিনি চন্দনি চন্দন চাঞ্চিচুয়া।
মরিচ আফিং হিঙ্গ হরীতকী গুয়া॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৯৯)

বাঙালির নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বাঙালি কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত শশা, ফুটি, আলু, শাক, কচু, করলা, কুমড়া, নাড়ু, মুড়ি, মুড়কিসহ সিঁদুর, হরিদ্রা ছাড়াও কিছু মসলাপাতি দারচিনি, মরিচ নেশা জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে আফিং-হিঙ্গ, মুখ শুদ্ধির জন্য হরীতকী, গুয়া, প্রসাধনীর মধ্যে চন্দন নিয়ে শিব গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে শিব বিষাণ বাজিয়ে জানান দেন। দুই পুত্র গণেশ ও কার্তিক খাবারের জন্য কন্দল করে। এ সময় পার্বতীর সাবধান বাণী—

শুনে গৌরীগৃহে গৃহ গজানন ছুটে॥
বালকে বারণ করে বিশাললোচনী।
কৈর নাই কোন্দল কোপিবে শূলপাণি॥
… … …
ক্ষুধিত তনয় সে বিনয় নাহি শুনে।
… … …
শূলী দিল ঝুলি দোঁহে লুটী কর্য়া খায়॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ১০০)

অভাবের সংসারে ক্ষুধার তাড়না বেশি সেটা বোঝা যায় কার্তিক-গণেশের খাবার নিয়ে কন্দল করার মধ্য দিয়ে। ঝুলি হতে ভিক্ষা লব্ধ খাবার নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে হুড়াহুড়ি এমনকি হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে যায়। গণেশ চার হাত দিয়ে মুঠো মুঠো গিলতে থাকে। এ দেখে কার্তিক করে বুকে করাঘাত। এ দৃশ্য দেখে মাতা পার্বতী বলেন—

হুড়াহুড়ি হত্যে হত্যে হল্য হাতাতাই॥
… … …
কার্ত্তিক কান্দেন করাঘাত কর‍্যা বুকে॥
দুর্গা দেখ্যা বলে ডাক্যা শুন গজানন।
কার্ত্তিকের করে কিছু দাও বাছাধন॥
… … …
কিছু দিল কার্ত্তিকে কোন্দল হৈল দূর॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ১০১)

দিন আনা দিন খাওয়া দরিদ্রের এ সংসার আর চলে না। শিব ভিক্ষাবৃত্তি করে সামান্য তণ্ডুল সংগ্রহ করে আনেন আর স্বামীপ্রাণা, ধৈর্যশীলা, সর্বংসহা গৌরী অতি যত্নে অন্ন ও নানাবিধ ব্যঞ্জন রান্না করে স্বামী ও পুত্রগণকে পরিতোষসহকারে ভোজন করান। স্বামী পুত্রগণকে খাওয়াতে পার্বতীর কতই না আনন্দ। পার্বতীর সংসারের এ-চিত্র বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি বাংলার এক চিরপরিচিত হতদরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের চিত্র উপস্থাপন করেছেন যেখানে দেবমহিমার উপস্থিতি বিন্দুমাত্র নেই—

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটী সূতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥
… … …
তিন জনে একেবারে বারমুখে খায়।
এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায়॥
সুক্তা খায়্যা ভোক্তা চায় হস্ত দিল শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে॥
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হৈয়্যা খা॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ১০৪)

হতদরিদ্র এ ব্রাহ্মণ পরিবারের অবস্থা বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি গ্রাম-বাংলার কৃষক পরিবারের প্রকৃত পরিচয়টি উৎঘাটন করেছেন। অভাবী সংসারে খাদ্যের চাহিদা বেশি থাকে। থাকে নাই নাই খাই খাই ভাব, এ পরিবারের কত্রী পার্বতী দেবী হয়েও কাব্যে সাধারণ মানবীতে পর্যবসিত হয়েছেন। রামেশ্বর ভট্টাচার্য অত্যন্ত দরদ দিয়ে শাশ্বত বাঙালি মায়ের রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন পার্বতী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। বিশ্বজিৎ ঘোষ পার্বতীকে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে—'পার্বতী বা গৌরীর মাঝে কবি কৃষক-বধূর ছবিটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরেছেন'। (বিশ্বজিৎ ঘোষ : ২০১১ ; পৃ : ৪৭)

উদাসীন শিব ভিক্ষায় যান বটে তবে গা করেন না, খেতে বসেন তবে হাড়িতে ভাত-ব্যঞ্জন আছে কিনা খোঁজ নেন না। এ অবিবেচক স্বামী ও পিতা শুধু পেট পুরে খেতেই জানেন দিতে জানেন না। আরো অন্ন আনো, আরো অন্ন আনো বলে শিব হাঁক দেন। এ কথাও সত্য যে অভাবী ঘরে খাবারের চাহিদাও থাকে বেশি। তবে শিব অবিবেচক হলেও গুণীর কদর কিন্তু তিনি করেন—

প্রেয়সীকে প্রশংসিয়া বলে বিশ্বনাথ।
সত্য সতী তুমি অতি ধন্য দুটী হাত॥
অল্প রান্ধ্যা এত অন্ন কোথা হতে আন।
কেমন হস্তের গুণ কিবা মন্ত্রজান॥
… … …

আচমন মুখ শুদ্ধি সার‍্যা সুতসনে।
সন্তোষে বসিলা শিব শার্দ্দুল-আসনে॥
ওথা অন্ন দেন দেবী দাসদাসীগণে।
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ১০৬-১০৭)

পার্বতী অন্নপূর্ণা; তাঁর ভাণ্ডার কখনো শূন্য হয় না। বরং অল্প খাদ্য রান্না করে তিনি কীভাবে এত মানুষের আপ্যায়ন করেন এ নিয়ে স্বয়ং শিবও রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করেন। পার্বতীর হাতযশের প্রশংসা করতে গিয়ে পার্বতী কোনো তন্ত্র-মন্ত্র জানেন কিনা এ নিয়ে শিব রসিকতা করতেও ছাড়েন না। শিব-পার্বতীর সংসারে অভাব আছে, আছে অনটনও তবে তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্ক অতন্ত মধুর। জন্ম-জন্মান্তরের এ সম্পর্ক। অভাবের সংসারে বাগ্‌বিতণ্ডা অনেক সময় হয়, ঝগড়া-বিবাদও হয় কিন্তু দু'জন দু'জনকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। এখানেই শিব-পার্বতীর দাম্পত্য সম্পর্ক বিশিষ্টতার পরিচয় বহন করে। শিব-পার্বতীর এ সম্পর্কের মধ্যদিয়ে কবি ইহলোকের দরিদ্র কৃষক পরিবারের সংসার যাত্রার চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। পরিবারের অন্য সবার আপ্যায়ন শেষ করে মহামায়া দাস-দাসীদের সাথে নিয়ে ভোজন পর্ব সমাপ্ত করেন। অভাবের সংসারে শিবের আনন্দ উপভোগ চিত্র পাঠক মনে কৌতূহল জাগায় আর শিবের জোগায় মনের খোরাক। কৈলাসের শোভাবর্ণন অংশে আছে নৃত্য গীতের আয়োজন। সেখানে নৃত্যকর নাচছেন, গায়েন গান করছেন সবাই ভক্তিভরে দেবাদিদেব মহাদেবের গুণগান করছেন—

নৃত্য করে বিদ্যাধর অপ্সরা অপ্সরী।
গায়েন গন্ধর্ব্ব সর্ব্ব কিন্নর কিন্নরী॥
... ...
যোড়হাতে সম্মুখে শিবের গুণগান॥
... ...
এইরূপে কৈলাসে নিবাসে বিশ্বনাথ।
সুরপতি ভৃত্য নিত্য ঘরে নাই ভাত॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ১০৯)

ভিক্ষার চাল বাড়ন্ত। কাল কী খাবেন সে ব্যবস্থা নেই। এ নিয়ে শিবের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। পার্বতী কারো কাছ থেকে চাল ধার করবেন সে-পথও বন্ধ। এরই মধ্যে কোনোদিন আবার অলস শিব ভিক্ষা করতে যেতে নারাজ হন, ফলে পার্বতী পড়েন ভীষণ বিপদে। সম্ভ্রান্ত বংশ ও বিত্তশালী রাজকন্যা পার্বতীর পিতা তাঁকে বিয়ে দিয়েছিলেন বড়ঘর ও সুপাত্র দেখে কিন্তু গৌরী সংসারে এসে দেখেন অন্তঃসারশূন্য একটি সংসার। এ নিয়ে হরগৌরীর মনোমালিন্য এবং কথা কাটাকাটিও হয়, যা দরিদ্র বাঙালির গার্হস্থ্যজীবনের প্রাত্যহিক চিত্র :

ধার দিতে আর কেহ নাই অবশেষ॥
বান্ধা দিতে বাকি নাই দিতে নাই দাতা।
... ...
বড় বল্যা বিশ্বনাথে বেটী দিল বাপ।
... ...
রঙ্গিনী রাজার বেটী রুখু করি স্নান।
তৈল বিনে তনু ক্ষীণ খড়ি উড়্যা যান॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ১১১)

স্বামীর নিকট গৌরীর অভিযোগ, শিব যদি অঢেল ধন সম্পদের অধিকারী হন তাহলে ভিক্ষান্নে তাদের কেন দিনাতিপাত করতে হয়? রাজকন্যা হয়েও কেন তাঁকে রুখু অর্থাৎ তেল বিহীন মাথায় স্নান করতে হয় ? সামান্য তেলের জোগাড়ও শিব করতে পারেন না। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে 'ভিক্ষুকের গৃহে নিত্য অভাব এবং এই অভাবকে কেন্দ্র করিয়াই দাম্পত্য জীবনেও নিত্য অশান্তি ঘনাইয়া থাকে। ইহাই হরগৌরীর কোন্দলরূপে কবি প্রকাশ করিয়াছেন'। (আশুতোষ : ২০০৯ ; পৃ : ১৮০)

সতী বলে যদি তুমি ধনী এত ধনে।

ভাল তবে ভোলানাথ ভিখ্ মাগে কেনে॥
বনিতাকে বস্ত্র নাই বেদ বলে বিভু।
… … …
আপনার এত অর্থ আছে যদি জান।
লক্ষ্মীছাড়া লোকের লক্ষণগুলি কেন॥
চন্দন ছাড়িয়া চিতাভস্ম কেন গায়।
ফণি-বিভূষণ কেন মণি নাই ভায়॥
হীন হেন হয়্যা কেন হাড়মালা পর।
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ১১৫)

শিব-পার্বতীর সংসার জীবনের ধরন ও তাঁদের কথোপকথন পর্যবেক্ষণ করে এবং একে অপরকে দোষারোপ করার প্রবণতা হাস্যরসের উদ্রেক করে। তাঁদের দাম্পত্যজীবনে প্রতিফলিত হয়েছে মর্ত্যলোকের হতদরিদ্র সমাজের অশিক্ষা কুশিক্ষায় ভরা এক পরিবারের চিত্র। আশুতোষ ভট্টাচার্য অন্য কবি রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে বর্ণিত পার্বতী চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে—'দারিদ্র্য-পীড়িত সংসারের গৌরবহীন গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিষয়বুদ্ধিহীন স্বামী লইয়া এ দেশের নারীগণ যে কি ভাবে সুখদুঃখের দিন যাপন করিয়া থাকে, রামকৃষ্ণের পার্বতী চরিত্রের ভিতর দিয়া তাহারই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে'। (আশুতোষ : ২০০৯ ; পৃ : ১৬৮) রামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তবতার স্পর্শ নিহিত—

শয়নে তোমার পাশে নিদ্রা নাহি হয় ত্রাসে
জটায় জলের কুলকুলি।
সাপের ফোঁস ফোঁস শুনি সাত পাঁচ মনে গুণি
পালাইতে পরম আকুলি॥
… … …
উদয় করিতে ভানু কার্তিক পাতিয়া জানু
খাইবারে চাহে ছয় মুখে।
… … …
মায়ে পোয়ে ঝুলি ঝাড়ি পাই কড়া দশ কড়ি
সেহ কাণা নাহি চলে হাটে॥
(আশুতোষ : ২০০৯ : পৃ : ১৬৭)

ঘরে কোনো অর্থ নেই, কার্তিক গণেশ ক্ষুধায় কাতর। মা হয়ে সন্তানের এমন দুর্গতি পার্বতীর পক্ষে মেনে নেয়া বড়ই বেদনার। আশাহত দুঃখিনী মায়ের মর্মান্তিক অন্তর্বেদনার এক অপূর্ব ব্যঙ্গচিত্র কবি রামকৃষ্ণ অঙ্কন করেছেন। ভিক্ষালব্ধ ধনে দিন আর চলে না, ভাণ্ডার প্রায় শূন্য গৃহিণী এ কথা গৃহস্থকে জানান। খাদ্য শেষ হওয়ায় গৃহস্থ (শিব) গৃহিণীকে (পার্বতী) অপয়া বলতেও দ্বিধাবোধ করেননি—

শিবে বলে সেই যে সম্পত্তি দিয়াছিলে।
মনে কর মহাপ্রভু কতকাল খ্যালে॥
… … …
গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিণীর গুণে।
… … …
অভাগার ঘরে আসে অলক্ষণা মায়্যা॥
… … …
লঙ্কার বাণিজ্য যদি আন্যা দেই ঘরে।
মায়া হল্যে উড়ুই উড়ায় আঁখি ঠারে॥
(রামেশ্বর ; ১৯৫৭ : পৃ : ২১৫)

প্রবাদ আছে 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। শিব পার্বতীর কাছে বোধ হয় এমনটিই প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু পার্বতী প্রতিবাদ করেছেন, চোখে আঙুল দিয়ে যখনই ত্রুটিগুলো তুলে ধরেছেন তখনই

শিব নিজেকে অভাগার সাথে তুলনা করেছেন। এবং ভাগ্যদোষে গৃহে অলক্ষ্মী বউ এসেছে এমনটি বলতেও সংকোচবোধ করেননি। যদিও কবির উদ্দেশ্য ছিল হর-পার্বতীর দাম্পত্যলীলা বর্ণনার মধ্যদিয়ে মর্ত্যলোকের হতদরিদ্রের জীবন বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটানো। তাই এখানে শিব পার্বতীকে যে সমস্ত বাক্যবাণে আহত করেছেন তার মধ্য দিয়ে গ্রাম্য এক অশিক্ষিত কৃষক স্বামীর চিত্র ফুটে উঠেছে এখানে। দেবত্বের লেশমাত্র নেই। এহেন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সংসারের অভাব অনটন থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যায় এ সব চিন্তা পার্বতীকে নিরন্তর ভাবায়। সংসারে লোকসংখ্যা অনেক, ঘরে খাবার নেই, খাবারের সংস্থান কীভাবে হবে, কী করলে দিন চলবে এ বিষয়ে পার্বতী চিন্তা করতে থাকেন। অবশেষে সমাধান পেয়ে গেলেন তিনি। স্বামীকে চাষকার্যে মনোযোগী হতে পরামর্শ দিলেন পার্বতী—

চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।
নহে দাসদাসী আদি ছাড় পরিজন॥
চরণে ধরিয়া চণ্ডী চন্দ্রচুড়ে সাধে।
নরমে গরমে কয় ভয় নাই বাধে॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ : পৃ : ২১৬)

প্রথমে শিব পার্বতীর প্রস্তাবটি পছন্দ করেননি। নানা যুক্তি দেখিয়েছেন। চাষ করা কষ্টের কাজ, ভিক্ষা করাই ভালো—

ভিক্ষে দুঃখে আছি ভাল অকিঞ্চন পণে।
চাষ চষ্যা বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ২১৬)

তবে পার্বতী ছাড়ার পাত্রী নন কারণ জীবজগতে চাষের গুরুত্ব এবং শিবকে কর্মমুখী করাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। সংসার তথা সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ও জগতের হিতসাধনের কথা শিবকে স্মরণ করিয়ে শেষ পর্যন্ত পার্বতী শিবকে চাষে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হন—

দিন দুটী ছেল্যায় ছড়ায় পাঁচ সের॥
... ...
চাষী বিনা চাষের মহিমা কেবা জানে।
... ...
লক্ষ পোষি চাষী করে সবাকারে তাজা॥
জীবের নিমিত্ত শিব করিবেন চাষ।
... ...
চায়্যা রয় চন্দ্রচূড় চিন্তে জগন্নাথ॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ২১৬)

অবশেষে সাধ্বী স্ত্রীর সুপরামর্শে শিব চাষ করতে মনস্থির করলেন। কিন্তু বিপত্তি ঘটল চাষভূমি, বীজ এবং চাষসজ্জা নিয়ে—'ত্রিলোচন তানে কন তবে চাষ করি।/ হালের সামগ্রী কোথা পাবেক সুন্দরী॥ (রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ২১৭)। খুবই হাস্যকর এবং দুঃখজনক হলেও সত্য সমস্ত উপকরণের ব্যবস্থা পার্বতীকেই করতে হয়। কুবের দেবে বীজ, ইন্দ্রের নিকট থেকে পাওয়া যাবে চাষের জমি। ঘরে তো মহাবৃষ আছেই। বলরামের আছে লাঙ্গল আর ভীমের আছে হাল্যা। মাঘ মাসে প্রচুর বৃষ্টি হলো, ভীমের সাহায্যে জমিতে হলপ্রবাহ করা হলো—

কাত্যায়নী কন কান্ত কিছু নাই কেন।
কুবেরের বাড়ী বীজ বাড়ি কর্য়া আন॥
... ...
ঘরে আছে মহাবৃষ ধরে মহাবল।

যমের মহিষ আন বলাইর লাঙ্গল॥
ভীম আছে হাল্যা আর অনির্ব্বাহ কি।
হর বলে হদ্দ কৈলে হেমন্তের ঝি॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ২১৮)

অতঃপর শিব কৈলাস ছেড়ে এলেন মর্ত্যে, কৈলাসে পার্বতী সন্তান ও পরিজন নিয়ে বাস করছেন। চৈত্রমাসের মধ্যে শিব চতুর্দশবার জমিতে চাষ দিলেন, চাষভূমিতে মাটি চূর্ণ করার জন্য মই দিলেন যাকে বলে আধুনিক চাষ পদ্ধতি। বৈশাখ মাসের শুভক্ষণে শিব বীজ বপন করেন। বলা বাহুল্য 'শিব এখানে যথার্থই দারিদ্র্যপীড়িত জনসমাজের এক প্রতিনিধি, ভাগ্যের হাতে মার-খাওয়া কৃষক সমাজের প্রতীক পুরুষ'। (স্মৃতিকণা : ২০১১ ; পৃ : ৪০০)। এই কৃষক প্রতিনিধি শিবের জমিতে প্রচুর ফসল হলো। শিব নারদের নিকট থেকে ঢেঁকি নিলেন ধান ভানার জন্য। ধান ভেনে চাল তৈরি করা হলো। সেই চাল দিয়ে সাংসারিক দৈন্য ঘুচলেও গৌরীর জীবনে এখনো শান্তি মেলেনি। কারণ মর্ত্যলোকে চাষকার্যে শিব এতটাই ব্যস্ত হয়ে গেলেন কৈলাসে ফেরার কথা এমনকি স্ত্রী পুত্র ও কন্যাদের কথা একেবারে ভুলেই গেলেন। মর্ত্যলোকে শিবের কতগুলি নারী সঙ্গিনীও জুটেছে। এই সঙ্গিনীর মোহে এবং চাষের ফসলের লোভে শিব মত্ত রয়েছেন মর্ত্যে। এ বিপথ থেকে স্বামীকে রক্ষা করতে একজন বুদ্ধিমতী জীবন সঙ্গিনী পার্বতী নানা উপায় খুঁজতে থাকেন। কৈলাসে গৌরী দীর্ঘ দিন স্বামী-বিরহের জীবন যাপন করছেন। সন্তান-পরিজন নিয়ে একা সংসার সামলানো গৌরীর আর সহ্য হচ্ছে না। তাই শিবকে কৈলাসে ফিরিয়ে আনতে পার্বতী নারদের পরামর্শে স্বামীকে বিভিন্ন ভাবে উত্ত্যক্ত করতে মর্ত্যলোকে মশা, মাছি, ডাঁশ, জোঁক প্রেরণ করেন। প্রথমে তিনি মর্ত্যে উঙানি মশা প্রেরণ করলেন। শিব সর্বাঙ্গে তৈল লেপন করে মশার উপদ্রব থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন। অতঃপর গৌরী মাছি ও ডাঁশ প্রেরণ করেন। শিব সকলের দেহে ঘৃত ব্যবহার করে মাছি ও ডাঁশের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। শিবকে কৈলাসে আনার জন্য গৌরী তৃতীয় যে পন্থা গ্রহণ করেন তা হলো মর্ত্যে মশক প্রেরণ। শিব মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য খড় জ্বেলে ধুয়া উৎপাদন করেন। হাস্যকর হলেও সত্যি মশা, মাছি ও জোঁকের উপদ্রব থেকে পরিত্রাণের জন্য শিব যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন একবিংশ শতাব্দীর দারপ্রান্তে এসেও এখনো গ্রামাঞ্চলে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এবার পার্বতী শিবকে উত্ত্যক্ত করার জন্য মর্ত্যে জোঁক প্রেরণ করেন, শিব চূণ ও লবণ প্রয়োগ করে জোঁক নিধন করেন। পার্বতীর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর পার্বতী নিজে বাগদিনির বেশ ধারণ করে মর্ত্যে আগমন করেন। উদ্দেশ্য শিবকে কৈলাসে নিয়ে আসা। মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়ে পার্বতী শিবের ধানক্ষেতে মাছ ধরার ছলে ধানের ক্ষতি করতে থাকেন, পার্বতীর ধারণা ছিল এতে শিব ক্ষুব্ধ হয়ে বাগদিনিকে তিরস্কার করতে গিয়ে স্ত্রী ও সন্তানের কথা মনে পড়বে এবং তিনি কৈলাসে ফিরে যাবেন। কিন্তু শিবের কোনো ভাবান্তর নেই বরং বাগদিনিকে তিরস্কার তো দূরের কথা উপরন্ত মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন—

কি নাম তোমার কহ কোন দেশে ঘর।
... ...
মা বাপের নাম বল বট কার বেটী।
স্বামীর বয়স কত ছাল্যা পুল্যা কটী॥
... ...
তুয়া চান্দোমুখ দেখ্যা বুক যায় ফাট্যা।
কোন সাধে দুই হাতে পরায়্যাছে মাঠ্যা॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ২৬১)

শিবের উক্তির মধ্যদিয়েই তাকে পরনারী লুব্ধ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন একজন অভিভাবক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ তার নিজের সন্তান, স্ত্রীর খোঁজ উনি রাখেন না আবার বাগদিনির জন্য দরদ দেখানো এটা

বড়ই হাস্যকর। শিব পরিবার-পরিজনের প্রতি এতটাই উদাসীন যে, শিবানী এত সহজভাবে তাঁর পরিচয় উপস্থাপন করলেন তবু শিব তাঁকে চিনতে পারেননি—

বঙ্গদেশে বাস শিখরপুরে ঘর।
স্বামী বুড়া দোলুই দরিদ্র দিগম্বর॥
বাপের নাম হেম দোলুই সেব্য যার সৌরি।
মায়ের নাম মেনকা আমার নাম গৌরী॥
অল্পকালে দুটি পুত্র দিয়াছে গোঁসাঞি।
বহিন বিহীন নাম কার্ত্তিক গণাই॥
... ...
পার্ব্বতী প্রকৃত পরিচয় দিলা তবু।
আতুরে অজ্ঞান হৈল জ্ঞানময় প্রভু॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ২৬১-২৬২)

শিব তো শিবানিকে চিনতে পারলেনই না উপরন্তু বাগদিনির কাছে আলিঙ্গন প্রার্থনা করলেন। নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে বাগদিনির সাথে নতুন করে ঘর বাঁধতে চাইলেন; বাগদিনির কাজে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করতে চাইলেন। এমনকি মাছ ধরে শিব নিজেই সেই মাছ হাটে বিক্রি করবেন এবং বাগদিনিকে আরাম-আয়েশে রাখবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিলেন। এ ছাড়াও তিনি নিজেকে সর্বশুচি আখ্যা দিয়েছেন যাকে সুরত দিলে দোষের কিছু নেই—

তুমি যদি সয়্যা বল্যা দয়া কর মোকে।
তোমা লয়্যা ঘর করিব ছাড়্যা দেব তাকে॥
... ...
তেজীয়ান পুরুষ পরশে নাই দোষ।
অনলে সকল পোড়ে তাত তুমি জান॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ২৬৩)

পুরুষের বহুগামিতা মধ্যযুগের সাহিত্যে একটি সাধারণ ঘটনা হিসেবে বহু স্থানে পাওয়া যায়। বিশেষ করে সামন্তসমাজব্যবস্থায় এটি একটি স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন হিসেবে ধরা হয়। পরম পুরষ শিবকেও অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখা যায় *মনসামঙ্গল* এবং *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের দেবখণ্ডে। বাগদিনির সাথে শিবের কথোপকথন দৃষ্টে মনে হয়েছে *শিবমঙ্গলের* শিব গ্রামের অজ্ঞ এক রাখাল বালক যে কাম ছাড়া কিছুই বোঝে না। তাইতো শিব জাত-মান বিসর্জন দিয়ে কোঁচনী বা বাগদিনিকেও প্রেম নিবেদন করতে পারেন। এমনকি বাগদিনির প্রেমে তিনি এতটাই মশগুল যে নিজের সহধর্মিণীকেও পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে পারেন: 'শিব বলে সই তোকে না দেখিলে মরি'। শিব বাগদিনিকে আরও অধিক সন্তুষ্ট করার জন্য ধান ক্ষেতের জল সিঞ্চন করে মাছধরার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন। ছদ্মবেশী বাগদিনিও কম বিচক্ষণ নন, শিব উপহার দিতে চাইলে তিনি অভিজ্ঞান স্বরূপ পিতলের অঙ্গুরিটি চেয়ে নেন যদিও আসলে অঙ্গুরিটি ছিল অনেক মূল্যবান মানিক্য-অঙ্গুরি যেটি দামোদর শিবকে উপহার দিয়েছিলেন—

শিব বলে বল বল তুমি চাও কি।
অষ্টসিদ্ধি অষ্টবসু সব বল দি॥
কিরাতিনী বলে মোর কাজ নাই তাতে।
পিতলের অঙ্গুরীটি দেহ মোর হাতে॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ২৬৯)

এতসবের পর শিবকে আলিঙ্গন দেয়ার সময় হলে ছদ্মবেশী শিবানী শিবের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু করেন। পরে গায়ের কাদা ধোয়ার ছল করে কৈলাসে গমন করেন। বাগদিনির ফিরতে বিলম্ব দেখে শিব বুঝলেন বাগদিনি তাঁকে প্রবঞ্চনা করেছেন। অতঃপর পার্বতীর জন্য শিবের মন চঞ্চল হওয়ায় তিনিও কৈলাসে যাত্রা করলেন। কিন্তু গৃহ দ্বারে উপস্থিত হলে এক নতুন বিপদ উপস্থিত হলো। বাগদিনির প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে

অঙ্গুরি উপহার দেয়ায় পার্বতী শিবকে গৃহে প্রবেশ করতে দেননি। শিব ভীষণ বিপদে পড়লেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন। হর-পার্বতীর দ্বন্দ্বের অবসান যাতে হয় এবং যাতে উভয়ের পুনর্মিলন ঘটে নারদের এটাই ইচ্ছে ছিল কিন্তু হর-পার্বতীর সম্মুখে এসে নারদের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি উপস্থিত হলো। আগুনে ঘি ঢেলে দেয়ার মতো তিনি তাদের কলহের আগুনে ফু দিয়ে আরও উসকিয়ে দিলেন। কলহ হলো আরও বেশি। নারদ পার্বতীকে স্বামীর কাছে একজোড়া শঙ্খ দাবি করতে বলেন। কিন্তু ভিখিরি শিবের গৃহে নিত্য অভাব। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য 'দরিদ্র স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর দীনতম আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ করাও যে কত কষ্টকর, কবি রামেশ্বর পার্বতীর শঙ্খ পরিধানের আকাঙ্ক্ষার লৌকিক কাহিনিটি অবলম্বন করিয়া তাহা অতি সহজ সমবেদনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামীর নিকট সধবা রমণীর দীনতম দাবি একজোড়া শাঁখা। তাহাও দরিদ্র স্বামীর যোগাইবার সামর্থ্য নাই। দুঃখ-দারিদ্র্য-পীড়িত বাংলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের ইহা নিত্য অনুভূতির বিষয়'। (আশুতোষ: ২০০৯; পৃ: ১৮০) সহায় সম্বলহীন দরিদ্র পরিবারের গৃহিণী তার স্বামীর কাছে একজোড়া শঙ্খ চেয়ে না পাওয়ার যে চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন সেই চিত্রের মধ্যদিয়ে আবহমান বাংলার হতদরিদ্র বাঙালি বধূর চাওয়া-পাওয়াকেই নির্দেশ করে-

প্রণমিয়া পার্ব্বতী প্রভূর পদতলে।
রঙ্কিণী সে রঙ্কনাথে শঙ্খ দিতে বলে॥
… … …
পূর্ণ কর পশুপতি পার্ব্বতীর সাধ॥
দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটী বাই।
কৃপাকর কান্ত আর কিছু চাই নাই॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ২৭৯-২৮০)

সাধ্বী নারী স্বামীর কাছে মাত্র একজোড়া শাঁখা চেয়েছেন যা ভারতীয় হিন্দু শাস্ত্রে এয়োতির চিহ্ন হিসেবে স্বামীর মঙ্গল কামনায় সধবা নারীরা পরম শ্রদ্ধায় পরিধান করে থাকে। এটা পার্বতীর জন্য মোটেও বিলাসিতা ছিল না। তারপর পার্বতী তাঁর জীবনের একটি অতিগোপন এবং দুঃখের কাহিনি স্মরণ করেন যা স্বামী ছাড়া আর কাউকে বলা যায় না। এ যে কত বড় লজ্জার কত বেদনার তা ভুক্তভোগী নারী ছাড়া কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়—

লজ্জায় লোকের কাছে দাণ্ডাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাই কই॥
(রামেশ্বর ; ১৯৫৭ : পৃ : ২৮০)

পার্বতী এমন এক হতভাগা নারী যার স্বামী এয়োতির চিহ্ন সামান্য শাঁখা পলাও জোটাতে পারেন না তাঁর হাত দুটি সব সময় শূন্য থাকে। লজ্জায় সেজন্য তিনি জনসম্মুখে হাত নেড়ে কথা বলতে পারেন না। একজন নারীর জীবনে এটা যে কতটা দুঃখের ও বেদনার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বামীর কাছে তার স্ত্রী আবদার করে উপহার চাইবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু এর প্রত্যুত্তরে স্বামী যদি অপমানকর বাক্যবাণে বিদ্ধ করে তবে সেটা বড়ই বেদনার এবং অস্বস্তির। পার্বতীকে এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল—

ভিখারীর ভার্যা হয়্যা ভূষণের সাধ।
কেনে আকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ২৮১)

শুধু এ কথা বলেই শিব ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয়। এর চেয়ে আরও অপমানকর হচ্ছে বড়লোক বাপের দোহাই দেয়া এবং বাবার কাছে গিয়ে আবদার পূরণের দাবি করা—

বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥
যেইখানে শঙ্খ পর্যা সুখ পাবে মনে।
জানিয়া জনক জাগে যাও নাই কেনে॥

একথা ঈশ্বরী শুন্যা ঈশ্বরের মুখে।
শূন্য হৈল সব যেন শেল মাল্য বুকে॥
(রামেশ্বর ; ১৯৫৭ : পৃ : ২৮১)

অকস্মাৎ স্বামীর নিকট এমন অপমান ও অন্যায় গঞ্জনা সর্বংসহা পার্বতী আশা করেননি। স্বামীর কাছে এরূপ নির্দয় বাক্য শ্রবণে পার্বতী বুকে শেলাঘাত অনুভব করেন। তাঁর ধৈর্যের বাধ ভেঙে যায়। কিন্তু এতেও স্বামীর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা তিলমাত্র হ্রাস পায়নি। নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত আশাহত ও বেদনাহত হয়ে পার্বতী তাঁর কোলের শিশু সন্তান দুটিকে নিয়ে বাঙালি তনয়ার শেষ আশ্রয়স্থল বাপের বাড়ি রওনা দিলেন। যাত্রাকালে তিনি স্বামীর চরণে প্রণতি জানালেন—

একথা ঈশ্বরী শুন্যা ঈশ্বরের মুখে।
শূন্য হৈল সব যেন শেল মাল্য বুকে॥
দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটি পায়।
কান্ত সনে ক্রোধ কর্যা কাত্যায়নী যায়॥
কোলে কৈল কার্ত্তিক গমনে গজানন।
চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর গমন॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ২৮১)

শিবানী এভাবে বাপের বাড়ি রওনা দেওয়ায় মহেশ্বর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন। পার্বতীকে ফেরাতে মহেশ্বর অনেক চেষ্টা করেন। সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে শেষে তিনি মাথার দিব্যি, ভাইয়ের দিব্যি পর্যন্ত দিলেন তারপরও তিনি পার্বতীকে ফেরাতে সক্ষম হননি। গৌরী কানে আঙুল দিয়ে বের হয়ে গেলেন। এরপর শিব গৌরীর দুটি হাত ধরে সাধলেন, পরে গৌরীর সামনে আড় হয়ে শুয়ে পড়লেন কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হলো না। গৌরী সকল বাধা অতিক্রম করে ক্ষোভে, রাগে, অভিমানে, অপমানে পিতৃগৃহে রওনা দিলেন। স্বামীর গঞ্জনায় লাঞ্ছিত চিরায়ত বাঙালি নারীর এ এক অবিস্মরণীয় চিত্র। পথিমধ্যে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পার্বতী পিতৃগৃহে পৌঁছালেন। পর্বত কন্যা সকলের বন্দিতা, নয়নের মণি। বনবাস থেকে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় আগমন করলে সমগ্র অযোধ্যাবাসী যেমন রাজ দরবারে আগমন করেন তাদের প্রিয় রাজা রামচন্দ্রকে একনজর দেখার জন্য তদ্রূপ দীর্ঘদিন পর পার্বতীকে দেখে গিরিরাজের গৃহে সেই একই অবস্থার সৃষ্টি হলো—

হৈমবতী আইলা নায়র
বনবাস হৈতে রাম যেমন আইল ধাম
ধায় যেন অযোধ্যার লোক।
দেখি পার্ব্বতীর মুখ পাইল পরমসুখ
পাসরিল যত ছিল শৌক॥
... ...
গৌরীর সংবাদ পায়্যা বাপ মা আইল ধায়্যা
... ...
মেনকা মনের সুখে চুম্ব দিয়া চান্দমুখে
ভবানী ভবনে লয়্যা যায়॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ২৯৮-২৯৯)

দীর্ঘদিন পর মা-মেয়ের সাক্ষাৎ হলো। আবেগে আপ্লুত হয়ে মেনকা মেয়েকে বার বার চুম্বন করলেন। পৃথিবীর সুন্দরতম দৃশ্য মা ও সন্তানের আলিঙ্গন। পার্বতীর বিয়ের পর থেকেই মেনকার মনে কোনো শান্তি ছিল না কারণ ঘর-বর কোনোটিই মেনকার মনঃপুত হয়নি। একজন মা সব সময় চান তার সন্তানেরা সুখে থাক শান্তিতে থাক। চাল চুলোহীন জামাইয়ের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে কোনো মা নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন না। শিবের সাথে গৌরীর বিয়ে দেওয়া মেয়েকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার সামিল। সেটি করেছিলেন গিরিরাজ

নিজ হাতে। যেখানে মেনকার কোনো হাত ছিল না। তৎকালে ভারতীয় নারীদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো অধিকার ছিল না শুধু চোখের জল ফেলা ছাড়া। সব অঘটনই তারা ভাগ্য বলে নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন। তাইতো মায়ের এত অভিমান, অভাবের সংসারে থেকে গৌরীর চাঁদপনা মুখ মলিন হয়ে গেছে। এই প্রথম মেনকা একক সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি তাঁর সোনার পুত্তলী মেয়েকে আর শিবের সংসারে পাঠাবেন না—

আর না পাঠাব আমি ভাল হৈল আল্যে তুমি
মোর ঘরে থাক চিরকাল॥
ননীর পুতলী ছাল্যা জলন্ত অনলে ফেল্যা
বাপ দিল কি করিবে মায়॥
আমি অভাগিনী মরি সকল খণ্ডাত্যে পারি
কপাল খণ্ডান নাহি যায়॥
(রামেশ্বর ; ১৯৫৭ : পৃ : ২৯৯)

এদিকে অনেক দিন গত হলো শিবের কোনো খোঁজ নেই। পার্বতীও তাদের সংসারের কোনো কথা মায়ের কাছে প্রকাশ করেননি। এটাই হচ্ছে বাঙালি মেয়েদের বৈশিষ্ট্য তারা শ্বশুর বাড়ির কথা বাপের বাড়ি এবং বাপের বাড়ির কথা শ্বশুর বাড়ি প্রকাশ করেন না। মূলত কবি পার্বতী চরিত্রের মধ্যদিয়ে নিম্ন-মধ্যবিত্ত অভাবী কৃষক পরিবারের চিত্র তুলে ধরেছেন। শরৎকাল হিমালয় গৃহে শারদীয়া পূজার আয়োজন শুরু হয়েছে। মহা ধুমধামে পূজার আয়োজন চলছে। গ্রামে একটা সাজ সাজ রব। চারদিকে নৃত্য গীত হচ্ছে, দ্বারদেশে গুণবতী নারীরা আল্পনা দিচ্ছেন, ঋষি চণ্ডীপাঠ করছেন। শারদীয়া পূজাকে উপলক্ষ্য করে নারদের পরামর্শে শিব ছলনার আশ্রয় নিলেন। পার্বতীর মান ভাঙাতে তিনি শাঁখারি সেজে গিরিরাজ গৃহে উপস্থিত হলেন এবং সহস্তে তিনি গৌরীকে শঙ্খ পরিয়ে দিলেন। ছদ্মবেশী শঙ্করকে দেখে শিবানী আনন্দে আপ্লুত হলেন। তিনি মনের মতো একজোড়া শঙ্খ নিয়ে এর মূল্য জিজ্ঞাসা করলে শঙ্কর উত্তর দিলেন 'অমূল্য শঙ্খের মূল্য আত্মসমর্পণ'। এরপর শঙ্কর শঙ্খের গুণাগুণ বর্ণনা করলেন—

পরিলে আমার শঙ্খ পতি নাই ছাড়ে।
ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় পরমায়ু বাড়ে॥
... ...
শঙ্খ হাতে থাকিলে সংসারে কারে ভয়।
রোগ শোক-সন্তাপ তিলেক নাহি হয়॥
কান্তের সহিত কতকাল থাকে জীয়া।
এমন শঙ্খের গুণ শুধিবে কি দিয়া॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৩১০-৩১১)

শঙ্খের গুণাগুণ বর্ণনা করে শঙ্কর গৌরীকে অপরূপ সাজে সজ্জিত হতে বললেন। কারণ পার্বতীর চাঁদপনা মুখ দেখে শিব কৃতার্থ হবেন। এ উদ্দেশেই শিব পার্বতীকে দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার পরে শুভক্ষণে শঙ্খ পরিধানের পরামর্শ দিলেন—

শুভক্ষণে শঙ্খ পর্য্য সাজ্যা আস্য সই।
চান্দমুখ দেখ্যা আমি চরিতার্থ হই॥
দিব্য-বস্ত্র-অলঙ্কার যত আছে তোলা।
সর্ব্বাঙ্গে সাজিবে শঙ্খ পরিবার বেলা॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৩১৭)

অতঃপর সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হলো শঙ্কর প্রথমে গঙ্গাজল দিয়ে গৌরীর হাত ধুয়ে নিলেন তারপর জগন্নাথদেবকে স্মরণ করে পার্বতীকে নিজ হাতে শঙ্খ পরিয়ে দিলেন। পরে, সখী পদ্মার সঙ্গে পরামর্শ করে পার্বতী নিজমূর্তি ধারণ করলেন।

অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে মান-অভিমান ভেঙে হর-পার্বতীর মিলন হলো। তাঁরা নিজেই নিজ মূর্তি ধারণ করলেন। পরিচয় উদ্‌ঘাটনের পর শ্বশুরালয়ে ভোজ উৎসবের আয়োজন হলো। শাশুড়ি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করে জামাইকে আপ্যায়ন করেন—

সেদিন শ্বশুরাগারে রহিলা সপরিবারে
শাশুড়ীর রন্ধনে ভোজন॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে অন্ন পাক হৈল পরিপূর্ণ
পায়স পিষ্টক নানাজাতি।
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৩৩১)

খাদ্য পরিবেশনের দায়িত্ব দেয়া হলো পার্বতীকে। পরম যত্নে পার্বতী স্বামী ও সন্তানদের খাবার পরিবেশন করেন। খাদ্য গ্রহণের পর স্বামী ও পুত্রেরা বিশ্রাম নিতে গেলেন। এরপর পার্বতীর মাতা মেনকা নিজে অত্যন্ত যত্ন করে কাছে বসিয়ে পার্বতীকে ভোজন করান—

গৌরীকে গৌরবে কর‍্যা দেয়াইলা আগে॥
যত্ন কর‍্যা জনক-জননী দুইজন ।
পার্ব্বতীকে পূর্ণ করা করাল্য ভোজন॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৩৩৩)

এরপর গৃহস্থ অর্থাৎ গিরিরাজ ভোজন করেন। তারপর দাস-দাসীর ভোজন শেষে অবশিষ্ট যা থাকে তা জোটে গৃহকর্ত্রীর ভাগ্যে। লক্ষণীয় গৃহকর্ত্রীর ভোজনের আগেই দাস-দাসীকে ভোজন করানোর মধ্য দিয়ে মানবিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। রাজমাতা হয়েও এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাননি—

পশ্চাদে পর্ব্বত লয়্যা মৈনাক-নন্দন।
গৃহস্থ গৌরীর বাপ করিল ভোজন॥
দাসদাসী সকলেতে দিয়াছিল পিছু।
চাছ্যা পুছ্যা খাল্য রাণী রাখ্যাছিল কিছু॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৩৩৪)

আহারের পর শিব কিছু সময় বিশ্রাম নিলেন। এরপর শিব-দম্পতিকে আবার নতুন করে বাসর যাপন করতে হবে এ জন্য শিব বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করলেন এমন এক পুরী নির্মাণ করতে যাতে শোভা বিস্তার করে উদয়াস্ত গিরি, সোম সূর্য উভয় দিকে উদিত হয়। মাঝখানে বিরাজ করে তারকা, কালিন্দীর কূলে তরুলতা, আরও থাকে নানা প্রজাতির পুষ্প যেখানে ভ্রমর মধু পান করে। এমন এক মনোরম পুরীতে বাসর যাপনের পূর্বে পার্বতীকে যেসব বসন-ভূষণ ও প্রসাধনী দিয়ে সাজানো হলো তা দ্বারা সপ্তদশ শতাব্দীর উচ্চবিত্ত সমাজের চিত্রকেই প্রতিফলিত করা হয়েছে—

পদ্মাবতী পরাইল পৃষ্ঠে বান্ধ্যা ডুরি।
ঝলমল করে মণি মুকুতার ঝুরি॥
... ...
হাসি হাসি দাসীকে পার্ব্বতী দিলা পান।
রতন-মন্দিরে কৈল রমনের স্থান॥
গঙ্গা জলে গুল্যা ফেলে কুমকুম চন্দন॥
পারিজাত প্রসূন প্রচুর তায় পেলা।
মল্লিকা মালতী জাতী যূথী দিল ঢাল্যা॥
... ...
দুইদিকে বিচিত্র বালিশ দিল তায়।
ধুপাবলি রাখিল সকল ঝরকায়॥
থাকে থাকে রাখে রত্ন দীপ সারি সারি।
পুণ্য গন্ধে আমোদিত কৈল নিজ পুরী॥

করিয়া বিনোদ শয্যা বিনোদ-মন্দিরে।
শিবকে সঙ্কেত কৈল শয়নের তরে॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৩৩৭-৩৩৮)

বিনোদ মন্দিরে হর-পার্বতী সুখ শয্যায় বাসর যাপন করলেন। পরে, সোনা হীরা মানিক্য দ্বারা তৈরি অলঙ্কার পরিত্যাগ করে পার্বতী বাগদিনি বেশ ধারণ করলেন এবং অতি সাধারণ কিছু গহনা যা প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত অর্থাৎ সস্তা দামে ক্রয়কৃত অলঙ্কার দিয়ে পার্বতী নিজেকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করলেন—

বিমলা বন্দিয়া হরে বাগদিনী বেশ ধরে
... ...
দুহাতে দুগাছি মাঠ্যা কাপড় পড়েছে আঁটা
খাট কর‍্যা হাঁটুর উপর।
গলায় রসের কাটি হিঙ্গুলের পলা দুটী
পুঁতি বেড়্যা সাজ্যাছে সুন্দর॥
অঞ্জনে রঞ্জিত আঁখি খঞ্জন-গঞ্জন দেখি
সুললিত নাকে নাকচোনা॥
... ...
ভুবনমোহন খোঁপা সন্ধী শালুকের ঝাঁপা
পেট্যা পাড়্যা পর‍্যাছে সিন্দূর॥
... ...
শুধু অঙ্গ সুধাময় অনঙ্গ তরঙ্গ বয়
মহামেঘে যেমন বিজুরী॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৩৪১)

আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে হর-পার্বতীর বাসর রাত শেষ হলো। এখন তাঁরা কৈলাসে ফিরতে চান। শিব বিজয়া দশমীর দিনকে শুভদিন মনে করে ঐ দিনেই রওনা দিতে চান—

দশমী দিবস ভাল আর দিন নাই।
বিজয়া বিজয় কর জননীর ঠাঞি॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৩৪২)

পার্বতী যখন তাঁর মাকে কৈলাসে ফিরে যাওয়ার বার্তাটি দিলেন তখন মেনকা হঠাৎ বড় রকমের একটি কষ্ট অনুভব করলেন। সন্তান দূরে চলে গেলে প্রত্যেক মায়ের একই অনুভূতি হয়। মাতৃত্বে কোনো পার্থক্য থাকে না। যেমনটি হয়েছিল রাম বনবাসে গেলে মাতা কৌশল্যার। একদিকে সন্তান দূরে চলে যাওয়ার ভাবনা অন্যদিকে ধনীর দুলালি রাজকন্যা ভিখিরিরগৃহে কীভাবে দিনাতিপাত করবে এ দুঃখ মেনকাকে অনুক্ষণ কষ্ট দেয়। তাঁর সোনার প্রতিমা মলিন হয়ে যাবে এ আশঙ্কা তাঁকে ব্যথিত করে—

ঘর যাত্যে হর চায় গৌরী গিয়া কহে মায়
শুনি রাণী শোকে অচেতন।
রাম বনবাস শুনি যেমন কৌশল্যা রাণী
কলস্বরে করেন রোদন॥
... ...
এই দুঃখে আমি মরি পরাণ পুতলী তুমি
... ...
আমি যতকাল জীব আর তোমা না পাঠাব
ফুল ভরে নাহি ভাঙ্গে ডাল॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ : পৃ : ৩৪৩)

বুদ্ধিমতী পার্বতী মায়ের কষ্ট লাঘব করতে মাকে নীতি কথা শোনান। বিবাহিত মেয়ে স্বামীগৃহে থাকবে এটাই জগতের রীতি, বিয়ের পর যে কন্যা মাতা-পিতার গৃহে বসবাস করে তাঁরা বড়ই অভাগা আর যে পরিবারের কন্যা স্বামীগৃহে থাকে সেই মাতা-পিতার জীবন ধন্য—

মুছিয়া বদনখানি　　বলিয়া মধুর বাণী
পার্ব্বতী প্রবোধ করে মায়॥
স্বামী ঘরে কন্যা থাকে　　ধন্য তার বাপ মাকে
অভাগার ঘরে থাকে ঝি॥
বিদায় করহ বল্যা　　পার্ব্বতী প্রণতি হল্যা
না কান্দ মাথার দিব্য দি॥
(রামেশ্বর ; ১৯৫৭ : পৃ :৩৪৩-৩৪৪)

মর্ত্যে নানা লীলা খেলার পর গিরিরাজের শারদীয়া পূজা সমাপ্তির দিনে অর্থাৎ বিজয়া দশমীর দিনে শিব-পার্বতী মর্ত্যলোক ছেড়ে কৈলাসে গমন করেন। শিব দম্পতির কৈলাসে অবস্থানের মধ্য দিয়ে *শিবায়ন* কাব্যের সমাপ্তি ঘটে। শিব-পার্বতী যখন কৈলাসে ফিরেন তখন কৈলাসবাসী আনন্দে আত্মহারা। পদ্মা ও জয়া চামর ঢুলায়ে হর-পার্বতীকে ব্যজন করতে থাকেন। কৈলাসে হর-পার্বতীকে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে সাদর-সম্ভাষণ জানানো হয়—

করি নানা লীলা খেলা　　এরূপে কৈলাসে গেলা
হিমালয় হইয়া বিদায়॥
সুখী হৈল শিব লোক　　ঘুচিল সবার শোক
জয়া পদ্মা চামর ঢুলায়॥
হর-পার্ব্বতীর প্রভা　　কৈলাস করিল শোভা
আনন্দে দুন্দুভি বাদ্য বাজে॥
কিন্নর গন্ধর্ব্বের মিলি　　নৃত্য গীত হুলাহুলি
সুখে হর-পার্ব্বতী বিরাজে॥
(রামেশ্বর : ১৯৫৭ ; পৃ : ৩৪৫)

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *শিব-সঙ্কীর্ত্তন* বা *শিবায়ন* কাব্যটি সাহিত্যগুণ বিচারে হয়ত অতটা উচ্চমার্গের নয় তবে এখানে হতদরিত্র কৃষক পরিবারের একবারে অন্দর মহলের যে চিত্র বর্ণিত হয়েছে তা পাঠককে বেদনার্ত করে। তেমনি ঐ কৃষক পরিবারের গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের স্বরূপ এবং কর্মবিমুখ গৃহকর্তাকে কর্মমুখী করার জন্য গৃহকর্ত্রীর যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা তা আবার সাধারণকে জীবনীশক্তি দান করে। গৃহস্থের এ পরিবারে অভাব আছে, আছে অনটন। এ জন্য পরিবারে দ্বন্দ্ব-কলহ, পারস্পরিক দোষারোপ, খাদ্য-বস্ত্রের অভাব, অভাবী সংসারে ক্ষুধার তাড়নায় সন্তানদের মধ্যে খাবার নিয়ে হাতাহাতির উল্লেখও আছে। আছে পণ প্রথা বা যৌতুক দানের উল্লেখ। স্বামী, সন্তানদের ঠিকমত খাবার দিতে না পারায় গৃহকর্ত্রীর মনোবেদনাও আছে। এত অভাবের মধ্যেও স্ত্রী, সন্তানদের ভুলে গৃহকর্তার পরনারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ইঙ্গিতে গৃহকর্ত্রীর বাবার বাড়ি চলে যাওয়ার যে রেওয়াজ পৃথিবীকে আছে তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। আবার অভিমানের মেঘ কেটে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। তাই বলা যায় কাব্যটিতে গার্হস্থ্যজীবনের যে উপাদান নিহিত আছে তা কাব্যটিতে বিশিষ্টতা দান করেছে। এ-সকল উপাদান সামাজিক ইতিহাস প্রণয়নের অপরিহার্য উপাত্ত ও উপকরণ।

তথ্য নির্দেশ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	(১৯৯৩) *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, তৃতীয় সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি. ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
আশুতোষ ভট্টাচার্য	(সেপ্টেম্বর, ২০০৯) *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, দ্বাদশ সংস্করণ, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কো. প্রা. লি. ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
আহমদ শরীফ	(মে, ২০০৮) *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (দ্বিতীয় খণ্ড), নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা
বিশ্বজিৎ ঘোষ	(২০১১) *বাংলা সাহিত্যে নারী* (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), প্রথম প্রকাশ, ধ্রুবপদ, প্যারীদাস রোড, ঢাকা
মুহম্মদ আবদুল জলিল	(জানুয়ারি,১৯৯৬) *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
রমেশচন্দ্র মজুমদার	(জানুয়ারি, ২০০৩) *বাংলা দেশের ইতিহাস* (মধ্যযুগ), জেনারেল প্রিন্টার অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা-১৩
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	(১৯৯৯) *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*, নব সংস্করণ, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, সি ২৯-৩১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-০৭
শ্রীভূদেব চৌধুরী	(আগস্ট, ২০০৯) *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা* (প্রথম পর্যায়), পুর্নমুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৭৩
শ্রীমন্তকুমার জানা	(জানুয়ারি, ২০১১) *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), পঞ্চম সংস্করণ, ওরিয়েণ্টাল বুক কো. প্রা. কলিকাতা-০৯
শ্রীযোগিলাল হালদার	(১৯৫৭) সম্পা : রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
সিরাজ সালেকীন	(ফেব্রুয়ারি, ২০২০) *কবিতায় নৃগোষ্ঠী*, মূলত কেন্দ্র থেকে দেখা, কথাপ্রকাশ, ঢাকা
স্মৃতিকণা চক্রবর্তী	(জুন ২০১১) *মঙ্গলকাব্য পুচ্ছগ্রাহিতা ও মৌলিকতা*, প্রথম প্রকাশ. জে এন ঘোষ অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা-৭৩

ঘ. মানিকরাম গাঙ্গুলির *ধর্মমঙ্গল* কাব্য

ধর্মমঙ্গল অখণ্ড বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে রচিত সাহিত্য। লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের এই কথকতায় বিধৃত হয়েছে স্থানের, কালের ও মানুষের ধর্মবোধ ও অভিরুচির স্বাক্ষর। মানিকরামের *ধর্মমঙ্গল* কাব্য রচনার কাল নির্ণয় খুব দুঃসাধ্য তবে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ থেকে প্রকাশিত মানিকরামের কাব্যে রচনাকাল জ্ঞাপক দুটি পয়ার-শ্লোক পাওয়া যায়। ঐ দুটি শ্লোকের রচনা-প্রকরণ এতই জটিল যে তার যথার্থ তাৎপর্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। 'তদুপরি কবির বংশধরদের গৃহে রক্ষিত পুথি থেকে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ঐ শ্লোকের মোটামুটি পাঠান্তর আবিষ্কার করেছেন। তার থেকে আশুতোষ ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত করেছেন, ১৪৮৯ শক, তথা ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে মানিকরামের *ধর্মমঙ্গল* কাব্যরচনা সমাপ্ত হয়েছিল। যোগেশচন্দ্র রায় ১৭০৩ শক বা ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ এবং সুখময় মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ বিচার অন্তে সিদ্ধান্ত করেছেন মানিকরামের গ্রন্থ রচনার কাল ১৭৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দ'। (ভূদেব : ২০০৯ ; পৃ : ৩৩৮) আবার ধর্মঠাকুরের পূজা সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত—'বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতেই পশ্চিম বাংলার একটি লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের ওপর এদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়-তাহা ধর্মঠাকুরের পূজা। পশ্চিম বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে, বিশেষত ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটনাগপুরের অরণ্যভূমি পর্যন্ত, এই লৌকিক দেবতার পূজার এখনও ব্যাপক প্রচলন আছে'। (আশুতোষ : ২০০৯ ; পৃ : ৫০১) বলা বাহুল্য ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য এবং তাঁর পূজা প্রচারের কাহিনি নিয়েই *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের আখ্যান রচিত হয়েছে। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের কাহিনির প্রধান আকর্ষণ লাউসেনের বীরত্ব এবং অলৌকিকতা। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যে নারীদেবতার প্রাধান্য বিদ্যমান থাকলেও *ধর্মমঙ্গল* তার ব্যতিক্রম। *ধর্মমঙ্গলে* পুরুষদেবতার মহিমাকীর্তি বর্ণিত হয়েছে। 'পণ্ডিতদের মতে ইনি প্রাক-আর্য কৌমধারার দেবতা। কালক্রমে তিনি শিব, বিষ্ণু, সূর্য, বরুণ, কূর্ম, কল্কি এমনকি ইসলাম ধর্মের সঙ্গে মিশে নবরূপ লাভ করেছেন। বিভিন্ন ভাবধারার বিবিধ তত্ত্ব ও তথ্য, ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতির সমন্বয় সাধিত হওয়ায় ধর্মঠাকুর সর্বাত্মক ধর্মের নির্বিশেষ প্রতিভূ রূপে চিহ্নিত'। (শ্রীমন্ত : ২০১১ ; পৃ : ৩৭৬) ধর্মঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। তাঁর কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই। শিলামূর্তি বেদীর ওপর স্থাপিত। এ মূর্তিগুলোর আকার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। কোনোটি গোলাকার, কোনোটি কচ্ছপের মতো, কোনোটি কাঁকড়াবিছের মতো, কোনোটি চৌকো আবার কোনোটির কোনো আকারই নেই। এরূপ আকৃতির জন্য জনমনে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠতে পারে এবং তার জবাবও বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে দিয়েছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মঠাকুরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা বলেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য এঁকে আদিম জাতি পূজিত সূর্যদেবতা বলে প্রমাণ করতে প্রয়াসী। কালগত বিচারে ধর্মঠাকুরের উৎস সুদূর অতীতের অনার্য ভাবনায়। কালক্রমে তাতে বৈদিক, পৌরাণিক ও বৌদ্ধ ভাবনার সংমিশ্রণ ঘটেছে। 'তবে ধর্মদেবতা আদিতে যে ভাবেই থাকুন না কেন নানা ধর্মের সমন্বয়ে ইনি বর্তমানে মিশ্র দেবতায় পরিণত হয়েছেন'। (শ্রীমন্ত : ২০১১ ; পৃ. : ৩৭৬) তাঁর কোনো বিশেষ অবয়ব নেই। বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন শিলা মূর্তিতে বিভিন্ন নামে ইনি পূজিত হন। ধর্মপূজোর পুরোহিতদের মধ্যে নিম্ন শ্রেণির ডোম, হাড়ি, সদগোপ, নাপিত, ধোপা, ময়রা, বাগদি ও শুঁড়ি প্রধান। ব্রাহ্মণ পূজারি খুবই কম। রাঢ় দেশের নিম্নশ্রেণির ছাপ *ধর্মমঙ্গলে* সুস্পষ্ট। সমকালীন রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক জীবনের প্রতিফলনও *ধর্মমঙ্গলে* বিদ্যমান। ধর্মঠাকুর শস্য উৎপাদন, নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘোচাবার এবং কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের দেবতা। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ধর্মঠাকুর কল্যাণবিধায়ক দেবতা। ভক্তিভরে ধর্মঠাকুরের পূজা করলে মানুষের রোগ-শোক, দুঃখ-দুর্দশা দূর হয়, কামনায় হয় সিদ্ধি লাভ এবং জীবনে কোনো অকল্যাণ প্রবেশ করতে পারে না। সাধারণ জনগণ ধর্মঠাকুরের তুষ্টির জন্য ছাগ, হাঁস, মুরগি, শূকর প্রভৃতি বলি দিয়ে থাকেন। এ পূজায় আদি পুরোহিত রামাই পণ্ডিতের ছড়া এবং ধর্মঠাকুরের পাঁচালি পঠিত হয়ে থাকে। ধর্মঠাকুর অঘটনঘটনপটিয়সী, অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং অত্যন্ত ভক্তবৎসল দেবতা। এই দেবতার ভক্তরা বঁটি ও আগুনের ওপর ঝাঁপ টিয়ে হাত পা বুকে শূল বিদ্ধ করে লোহার কাঁটার ওপর গড়াগড়ি দিয়ে হাজারো দর্শকের সামনে পূজা সম্পন্ন করেন। *ধর্মমঙ্গল* কাব্য সম্পর্কে আহমদ শরীফ বলেন '*ধর্মমঙ্গল* কাহিনি নানা

কারণে বিশিষ্ট ও অনন্য। প্রথমত, এখানে প্রতিষ্ঠিত তথা স্বীকৃত দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণিত। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থি শিথিল বলে এ পাঁচালিতে সমাজের সর্বশ্রেণির ও সর্বস্তরের মানুষের কথা আছে। এখানে রাজসভার ও সরকারের রাজনীতি, কূটনীতি, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও আনুগত্য, খলতা-শঠতা ও সত্যসন্ধিসা, জুলুম ও ন্যায়-পরায়ণতা, ভীরুতা ও বীরত্ব, হিংসা ও প্রীতি, সংগ্রাম ও সাধনা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়, ভক্তি ও ঔদ্ধত্য সব রকমের গুণাগুণবিশিষ্ট প্রতীক চরিত্রও রয়েছে। তৃতীয়ত, এক বিশেষ কালের বিস্তৃত পটে জীবনে, জীবিকার, সমাজের ও সংস্কৃতির একটা সামগ্রিক ও সামষ্টিক চিত্র মেলে *ধর্মমঙ্গলে*'। (আহমদ শরীফ : ২০০৮ ; পৃ : ৩২৮) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *ধর্মমঙ্গল* কাব্যকে রাঢ় দেশের 'ন্যাশনাল এপিক' বা জাতীয় মহাকাব্য নামে অভিহিত করেছেন।

এ কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো নায়ক লাউসেন এবং ইছাই ঘোষ ছাড়া অন্যান্য নর-নারী সকলেই দেবতা সম্পর্কহীন সাধারণ মানুষ। তবে দেব-দেবীর ওপর অন্যান্য নর-নারীর ভক্তি ছিল না তেমনটি নয় কারণ রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের আরাধনা করেই লাউসেনকে পুত্র হিসেবে পেয়েছিলেন, আর কানড়া ভগবতীর আরাধনা করে লাউসেনকে স্বামী হিসেবে পেয়েছিলেন। তারপরও বলতে হয় আত্ম-শক্তির ওপর ভরসা রেখেই তারা জীবন যুদ্ধের প্রতিটি অধ্যায় অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। কালুডোম, লখাই ডোমনী প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণির নর-নারী এবং কলিঙ্গা ও কানড়া সদ্‌বংশজাত অভিজাত পরিবারের সন্তান ও কুলবধূ যারা অদ্ভুত শৌর্যবীর্য ও প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। দেশের সংকট মুহূর্তে অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে বসে না থেকে প্রতিপক্ষকে চরম প্রতি-উত্তর দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর অভিমত- 'দেবভক্তি ও বীরত্বময় আত্মপ্রত্যয় যে পরস্পর বিরোধী, *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণা বহু পরিমাণে অপনোদিত হইয়াছে। রাঢ়রমণীগণের অপূর্ব বীরত্ব-গাথায় বাঙালীর অদৃষ্টনির্ভর ভীরুত্বের অপবাদ অনেকটা খণ্ডিত হইয়াছে'। (শ্রীকুমার : ১৯৯৯ ; পৃ : ৬৬)

ধর্মমঙ্গল কাব্যে দুটি পৃথক কাহিনির সন্নিবেশ ঘটেছে। প্রথমটি পুরাণকেন্দ্রিক রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি এবং দ্বিতীয়টি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত বীর লাউসেনের কাহিনি। প্রথম কাহিনিটি খুবই প্রাচীন। রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী মদনা ছিলেন নিঃসন্তান। এজন্য নিঃসন্তান এ দম্পতিকে বিড়ম্বনা কম সহ্য করতে হয়নি। একদিন এই দম্পতি মনের দুঃখে ঘুরতে ঘুরতে এক নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে ভক্তদের অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ধর্মঠাকুরের পূজা করতে দেখে এবং ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য শুনে পুত্রলাভের আশায় রাজা-রানীও ভক্তিভরে ধর্মঠাকুরের আরাধনা করতে থাকেন। ধর্মঠাকুর রাজা-রানীর ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রলাভের বর দিলেন তবে সাথে একটি শর্ত জুড়ে দিলেন, পুত্র জন্মালে যথাসময়ে তাকে ঠাকুরের কাছে বলি দিতে হবে। পুত্রের মুখ দেখার আনন্দে এবং আঁটকুড়ো অপবাদ ঘুচাতে রাজা-রানী ধর্মঠাকুরের এ প্রস্তাবেই সন্তুষ্ট হলেন। ধর্মঠাকুরের বরে রাজা-রানী পুত্র সন্তানের জনক-জননী হলেন। পুত্রের নাম রাখলেন লুইচন্দ্র। লুইচন্দ্র দিনে দিনে বড় হতে থাকে কিন্তু রাজা-রাণী পুত্রলাভের আনন্দে ও আতিশয্যে প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলেন। একদিন ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাজবাড়িতে উপস্থিত হলেন। সেদিন ছিল একাদশীর পারণ। রাজা ব্রাহ্মণকে ইচ্ছে মতো খাবার দিতে চাইলেন, ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ প্রস্তাবটি সাদরে গ্রহণ করে রাজপুত্র লুইচন্দ্রের মাংসাহারের ইচ্ছা পোষণ করেন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা প্রচণ্ড বেদনা সত্ত্বেও প্রসন্নচিত্তে লুইচন্দ্রকে কেটে মাংস রান্না করে অতিথিকে আপ্যায়ন করেন। রাজার এ আত্মত্যাগে ধর্মঠাকুর অত্যন্ত খুশি হয়ে লুইচন্দ্রকে পুনর্জীবিত করেন। পুত্রকে ফিরে পেয়ে রাজা-রানী মহাসমারোহে ধর্মঠাকুরের পুজোর আয়োজন করেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনি বাংলা সাহিত্যে নানা সম্পদে সমৃদ্ধ এক অপূর্ব আকর। কাব্যের গল্প উপকথা নয়, আকাশকুসুম কল্পনাও নয়, বাস্তবঘটনা এ কাব্যের অংশীভূত। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের ঘটনা ঐতিহাসিক তবে কবির কল্পনায় তা রসে পরিণত হয়েছে। বঙ্গদেশে যখন পালবংশীয় রাজাগণ গৌড়ের অধীশ্বর সেই সময়ে এ কাব্যের সূচনা। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে গৌড়েশ্বর রাজ্য শাসন করছেন, যমদূত সদৃশ নবলক্ষ সেনা বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হয়ে বীরদর্পে হুঙ্কার রবে পৃথিবী কম্পিত করছে এমনি এক সময় অজয়-নদ-তীরবর্তী ঢেকুর

রাজ্যের অধীশ্বর ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ইছাই ঘোষ গৌড়ের ভূপতিকে আর কর দেন না, হুকুম মানেন না ফলে গৌড়েশ্বরের সাথে ইছাই ঘোষের যুদ্ধ বাধে। এ যুদ্ধে গৌড়েশ্বরের পরাজয় এবং ইছাই ঘোষ জয়ী হন। কাব্যের প্রারম্ভ গড়ে উঠেছে এ ভাবেই। এ পরাজয়ে গৌড়েশ্বর যখন অপমানে ভারাক্রান্ত তখন তিনি ভাবতে থাকেন কীভাবে ইছাই ঘোষকে পরাজিত করা যায়। ইছাই ঘোষ মহাশক্তি ভগবতীর সেবক ; প্রচণ্ড উদ্ধত গোঁয়ার। কাব্যে আছে এমনি এক সন্ধিক্ষণে মর্ত্যে অবতীর্ণ হলেন ধর্মের অবতার শান্ত, সৌম্য, প্রাজ্ঞ, রণনিপুণ ও অসম-সাহসী বীর লাউসেন। লাউসেন গৌড়েশ্বরের শালিকা রঞ্জার পুত্র। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো এখানেও ধর্মীয় চেতনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ধর্মঠাকুর মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য উৎসুক। সে সুযোগও এসে গেল। স্বর্গের নর্তকী জাম্ববতী নৃত্যে তাল ভঙ্গ হওয়ার অপরাধে শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে যমতি নগরে বেনুরায়ের কন্যা রঞ্জাবতী নামে জন্ম গ্রহণ করেন। রঞ্জাবতীর বড়দিদি গৌড়েশ্বরের পাটরানী। তাদের বড়ভাই মহামদ গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী। ঢেকুরগড়ের অধিপতি কর্ণসেন ছিলেন গৌড়েশ্বরের অধীন সামন্তরাজা। ইছাই ঘোষ গৌড়েশ্বরের আর এক সামন্ত। ইছাই ঘোষ চণ্ডীর বরপুত্র। অসীম তাঁর শক্তি। ইছাই ঘোষ প্রচণ্ড বিদ্রোহী হয়ে উঠলে গৌড়েশ্বর তাকে দমন করার জন্য কর্ণসেনকে পাঠান। কিন্তু কর্ণসেন এ যুদ্ধে পরাজিত হন। এ যুদ্ধে কর্ণসেনের চারপুত্র নিহত হন এবং পুত্রবধূগণ হন স্বামীর চিতায় অনুমৃতা। কিছুদিন পর পুত্রশোকে রানীও মৃত্যুবরণ করেন। স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূদের হারিয়ে কর্ণসেন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। বৃদ্ধ রাজার এ দুর্দশায় গৌড়েশ্বর ও তাঁর রানী তাঁকে পরম সান্ত্বনায় আগলে রাখেন এবং নিজের শালিকা পরমাসুন্দরী রঞ্জাবতীর সঙ্গে তাঁর পুর্নবিবাহ দেবার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু মহামদ তার পরম স্নেহাস্পদ ভগিনীকে বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে বিয়ে দিতে প্রবল আপত্তি করেন। অবশেষে রাজা ও রানী অত্যন্ত কৌশলে মহামদকে এ সময়ে রাজধানীর বাইরে যেতে বাধ্য করেন এবং এই সুযোগে কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিয়ে দেন। এ বিয়ে দেয়ার ফলে কর্ণসেন গৃহে থিতু হলেন বটে তবে মহামদের রোষের শিকার হলেন। বিয়ের পর কর্ণসেন সস্ত্রীক ময়নাগড়ে উপস্থিত হয়ে নিজ পদে অধিষ্ঠিত হলেন। মহামদের অমতে কৌশলে প্রিয় ভগিনী রঞ্জাকে কর্ণসেনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ায় মহামদ অত্যন্ত ব্যথিত হন তবে গৌড়েশ্বরকে কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু রাগে অভিমানে, ক্রোধে মহামদ কর্ণসেনের সাথে ঘোর শত্রুতা শুরু করেন। বিভিন্ন ভাবে মহামদ কর্ণসেনের মনোবল ভাঙার চেষ্টা করেন। তাঁকে আঁটকুড়ো বলে গালি দেন। পতিনিন্দায় রঞ্জাবতী ক্ষোভে, দুঃখে ও অভিমানে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। একদিন রাজপথ দিয়ে ধর্মঠাকুরের গাজন উৎসবের মিছিল যাচ্ছে। পুরোহিতকে ডেকে রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবহিত হলেন যে, নিষ্ঠার সাথে ধর্মঠাকুরের পূজা দিলে অপুত্রক পুত্র লাভ করেন। শুরু হলো রঞ্জাবতীর কৃচ্ছ্রসাধন। কণ্টকশয্যায় তাঁর শরীর ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত হয়ে গেল। শেষে শালে ভর দিয়ে রঞ্জাবতী প্রাণত্যাগ করতে উদ্যত হলে ধর্মঠাকুর আর্বিভূত হয়ে পুত্রলাভের বর দিলেন। কোন এক শুভক্ষণে রঞ্জাবতীর গর্ভে জন্ম নিলেন স্বর্গের শাপভ্রষ্ট এক দেবতা। নাম কশ্যপকুমার। এ সুসংবাদে গৌড়েশ্বর খুব খুশি হলেও তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন মন্ত্রী মহামদ। শুরু হলো রঞ্জাবতীর পুত্রের অনিষ্ট করার ক্ষণ গণনা। এজন্য মহামদ সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে থাকেন। তার নির্দেশে ইন্দা মেটে নামে এক অনুচর লাউসেনকে অপহরণ করে। পুত্রশোকে রঞ্জাবতী পাগলের মতো বিলাপ করতে থাকেন। রঞ্জাবতীর এ বিলাপ দেখে ধর্মঠাকুর কর্পূরবিন্দু থেকে এক শিশু তৈরি করে রঞ্জাবতীর কোলে দিলেন। শিশুটির নাম রাখা হলো কর্পূরধবল। অচিরেই ধর্মঠাকুরের নির্দেশে হনুমান লাউসেনকে উদ্ধার করে রঞ্জাবতীর কোলে দিলেন। রঞ্জাবতী হলেন দুই পুত্রের জননী। ধর্মঠাকুর সম্পর্কে অরবিন্দ পোদ্দারের অভিমত ‘জীবনে যত কিছু বঞ্চনা আছে এবং আছে না-পাওয়ার বেদনা, তা দূর করে পূর্ণতায় আপ্লুত হতে হ’লে যে শক্তি সামর্থ্য ও গুণের প্রয়োজন, সেকালের মানুষ সেই সমস্ত গুণ ধর্মঠাকুরের মধ্যে আরোপ করে তাঁর আরাধনা করেছে। তাঁর কাছ থেকে পরিপূর্ণভাবে পেতে চেয়েছে, পাওয়ার আনন্দে জীবনকে সুন্দর করতে চেয়েছে। সবকিছুকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া একমাত্র ধর্মঠাকুরের প্রীতি উৎপাদনেই সম্ভব ; কেন না, ভক্তদের দৃষ্টিতে তিনি শুধুমাত্র আদি দেবতা নন, তিনি সব কিছুর মূলে, তাঁরই ইচ্ছায় সমস্ত ঘটনা বা দুর্ঘটনা, কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধিত হয়’। (অরবিন্দ : ২০০৫ ; পৃ : ১০০) মানিকরাম লিখেছেন-

বন্দ নিরঞ্জন সৃজন পালন
দেবতার চুড়ামণি।
তোমার মহিমা অপার অসীমা
কি বলিতে আমি জানি॥
... ...
ইন্দ্র আদি দেব অমর বৈভব
তুমি বিধাতার বিধি॥
(মানিকরাম : ১৯৬০ ; পৃ : ০১)

ধর্মঠাকুরের বরপুত্র লাউসেন দিনে দিনে বড় হতে থাকেন। লেখাপড়ায় এবং অস্ত্রবিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। বিশেষ করে মল্লবিদ্যায় লাউসেনের সঙ্গে পেরে ওঠে এমন কোনো মল্লযোদ্ধা তাঁর কালে বিরল। গৌড়েশ্বরের কাছে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনের উদ্দেশে লাউসেন ভাই কর্পূরধবলকে নিয়ে গৌড়ে যাত্রা করেন। পথে বাঘ, কুমির, হাতি প্রভৃতি বধ করে এবং ভ্রষ্টা রমণীদের প্রলোভন এড়িয়ে নৈতিক শুচিতার পরিচয় দিয়ে গৌড়েশ্বরের কাছে উপস্থিত হলেন। গৌড়ে পৌঁছেই লাউসেন মহামদের চক্ষুশূল হলেন। মহামদের চক্রান্তে লাউসেনকে কারাবরণ করতে হলো। কিন্তু শীঘ্রই বাহুবল দেখিয়ে লাউসেন কারামুক্ত হলেন। সাথে পেলেন প্রচুর পুরস্কার এবং ময়নাগড়ের ইজারা। ময়নাগড়ে ফেরার পথে কালুডোম এবং তার পত্নী লখ্যার সাথে লাউসেনের বন্ধুত্ব হলো। লাউসেন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ময়নাগড়ে ফিরে এলেন এবং কালুডোমকে তাঁর সেনাপতি পদে নিয়োগ দিলেন।

মহামদও চুপ থাকার পাত্র নন। তার চক্রান্তে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে কামরূপরাজকে দমন করার জন্য পাঠালেন। মহামদের ধারণা দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী কামরূপরাজের হাতে লাউসেনের মৃত্যু অনিবার্য। ভ্রাতা-ভগ্নির সম্পর্ক কতটা বৈরি হলে মামা ভাগ্নের অনিষ্ট সাধনে বার বার পদক্ষেপ নিতে পারেন এমন কি তার মৃত্যু কামনা করতে পারেন মহামদ তার জলন্ত প্রমাণ। পারিবারিক এ বৈরিতা যুগে যুগে সমাজে বিদ্যমান তবে মহামদের মতো এতটা মরিয়া হয়ে উঠার দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু বিধিবাম মহামদের সাধনা ব্যর্থ হলো। ফল হলো তার সাধনার উল্টো। লাউসেন কামরূপরাজকে শুধু পরাজিত করেই ক্ষান্ত হননি বরং কামরূপরাজের কন্যা কলিঙ্গাকে বিয়ে করে ময়নাগড়ে ফিরে এলেন। মহামদ জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলেন। এরপর মহামদের চক্রান্তে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে নিয়ে শিমুলরাজ্য আক্রমণ করলেন এবং লোহার গণ্ডার কেটে লাউসেন শিমুলরাজ হরিপালকন্যা কানড়াকে বিয়ে করলেন। এতে মহামদের ক্রোধ আরও দ্বিগুণ হলো। মহামদের চক্রান্তে অজয় নদের তীরে ইছাই ঘোষের সাথে লাউসেনের তুমুল যুদ্ধ হলো। ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন বিজয়ী হলেন এবং ইছাইঘোষ পরাস্ত এবং নিহত হলেন। এরপর মহামদ লাউসেনকে অন্যভাবে পরাস্ত করার জন্য সচেষ্ট হলেন। লাউসেনকে ভীষণ বিপদে ফেলতে মহামদ গৌড়েশ্বরকে দিয়ে আদেশ করালেন লাউসেন যদি এতটাই ক্ষমতাবান বা ধর্মের বরপুত্র হন তাহলে দেখান যে সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হয়। যদি না পারেন তাহলে শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। হাকন্দ নামক স্থানে ধর্মঠাকুরের তপস্যা করে লাউসেন এই অসাধ্য সাধন করেন। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের শিল্পগুণ বিচার করতে গিয়ে সুকুমার সেন এ কাব্যকে Adventure বা কেরামতি কাহিনি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে কাহিনিটিকে ইংরেজি করলে বলা যায়—'এডএভঞ্চারস্ অব্ লাউসেন'। (সুকুমার : ১৯৭৫ ; পৃ : ১২৪) লাউসেন যখন হাকন্দে তপস্যায়রত তখন মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করেন। যুদ্ধে পুত্র-পত্নীসহ কালুরায় মারা যান। লাউসেনের প্রথমা স্ত্রী কলিঙ্গাও এ যুদ্ধে নিহত হন। কিন্তু শেষে বীরাঙ্গনা কানড়ার হাতে মহামদ পরাজিত হয়ে পালাতে বাধ্য হন।

লাউসেন দেশে প্রত্যাবর্তন করে সমস্ত ঘটনা অবগত হন এবং ধর্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা শুরু করেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় সবাই পুনর্জীবন ফিরে পেলেন। প্রচারিত হলো মর্ত্যে ধর্মঠাকুরের পূজা। এদিকে মহাপাপের জন্য মহামদের কুষ্ঠ ব্যাধি হলে দয়াপরবশত লাউসেন ধর্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে মহামদের রোগ মুক্ত করেন। লাউসেন ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করে পরম গৌরবে রাজত্ব করতে থাকেন। তারপর

শুভক্ষণ দেখে পুত্র চিত্রসেনের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে স্বর্গারোহণ করেন। এভাবে কাহিনি বর্ণনার মধ্য দিয়েই এগিয়েছে *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের গার্হস্থ্যজীবনের স্বরূপ।

ধর্মমঙ্গল কাব্য : গার্হস্থ্যজীবনের স্বরূপ

ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যকীর্তন বর্ণিত হলেও এর অন্তরালে সমাজ-সংস্কৃতি ও পারিবারিব জীবন প্রণালীর কিছু চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। যদিও পুরোকাব্য জুড়ে লাউসেনের বীরত্ব গাথা ও অলৌকিকতা বর্ণিত আছে তারপরও লাউসেনের পূর্বপুরুষ বিশেষ করে তাঁর মাতা রঞ্জাবতী এবং পিতা কর্ণসেন এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের জন্ম, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, পারিবারিক আচার-আচরণসহ বিবাহ, মৃত্যু, সতীদাহ প্রথার বর্ণনা আছে। লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতীর জন্ম এবং বিবাহ পদ্ধতির বর্ণনা বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। স্বর্গের নর্তকী জাম্ববতী তাল ভঙ্গের অপরাধে শাপগ্রস্ত হয়ে মর্ত্যে বিশ্বখ্যাত রাজা বেণুরায়ের স্ত্রী বিমলার গর্ভে রঞ্জাবতী নামে ভূমিষ্ঠ হলেন। তৎকালে তথা বর্তমান সমাজব্যবস্থাতেও কন্যা সন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তান মাতা-পিতার কাছে অধিকতর প্রিয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু রঞ্জাবতী জন্ম গ্রহণের পর এর বিপরীত চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায় যা কাব্যটিতে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। রঞ্জাবতী ভূমিষ্ঠ হলে দুহিতার মুখদর্শন করে মাতা-পিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন—

> বিমলা বেণুর জায়া বিশ্বেতে বিখ্যাত।
> দৈবযোগে সেদিন হয়েছে ঋতুস্নাত॥
> ... ...
> পূর্ণ হতে দশমাস প্রসব হইল॥
> ... ...
> কন্যা দেখে দোঁহাকার কৌতুক বাড়িল॥
> (মানিকরাম : ১৯৬০ ; পৃ : ৩২)

রাজা-রানী অত্যন্ত আনন্দের সাথে নতুন অতিথিকে সম্ভাষণ জানান এবং তাঁদের আনন্দিত হওয়ারই কথা কারণ নবজাতকের আগমনে অন্ধকার ঘর যেন ফণির মণির আভায় আলোকিত হলো যার বর্ণনা ঘনরাম দিয়েছেন এ ভাবে—

> অন্ধকার ঘরে যেন জ্বলে ফণি-মণি॥
> আনন্দেতে জাতকর্ম্ম করে একে একে।
> ষষ্ঠ দিনে তুষ্ট করে দেবী ষষ্ঠী মাকে॥
> দিনে দিনে বাড়ে যেন শুক্ল পক্ষের শশী।
> (ঘনরাম : ১৩১৮ ; পৃ : ১২)

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হিন্দু সমাজে যত প্রকার মাঙ্গলিক আচার-পার্বণ পালনের প্রথা প্রচলিত আছে রঞ্জাবতীর জন্মের পর সব আচার-পার্বণগুলি একে একে পালন করার বর্ণনা কবি মানিকরাম গাঙ্গুলি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। ঘনরামের কাব্যে ছয় দিনে দেবী ষষ্ঠী মাকে তুষ্ট করার উল্লেখ আছে কিন্তু মানিকরাম এর কাব্যে জন্মের অষ্টম দিনে ষষ্ঠীপূজা, নবম দিনে নবনত্তা এবং সাতমাসে শুভ দিনক্ষণ, তিথি নক্ষত্র দেখে শুক্লপক্ষে রঞ্জাবতীর অন্নপ্রাশন দেয়ার বর্ণনা আছে। সবশেষে পালিত হয় কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান—

> সমাহিতে অষ্টদিনে করি ষষ্ঠিপূজা।
> নত্তা কৈল নয় দিনে নৃপতি মহাতেজা॥
> সাত মাসে সুদিন করিএ শুক্লপক্ষে।
> দিলেক ওদন রাজা দুহিতার মুখে॥
> ... ...

রঞ্জাবতী আখ্যান থুইল রায় বেণু॥
(মানিকরাম : ১৯৬০ ; পৃ : ৩২-৩৩)

উল্লিখিত আচার-পার্বণের সবগুলিই ব্রাক্ষণ্য সমাজ শাসিত নিয়ম-কানুনের অন্তর্ভুক্ত। রঞ্জাবতী দিনে দিনে বড় হচ্ছেন। ভুবনমোহন তার রূপ। দেখে মনে হয় অপ্সরা উর্বশী অথবা স্বর্গের কোনো এক বিদ্যাধরী মর্ত্যে নেমে এসেছেন। কন্যার রূপ দেখে রাজা-রানী সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা করেন এ কন্যার যোগ্য বর কোথায় পাবেন। রূপে লক্ষ্মী এবং গুণে সরস্বতী হয়েও রঞ্জাবতীর বিধিবাম। অল্প বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। আর তার মাতা হলেন স্বামীর অনুমৃতা—

ভাবীর লিখন ভাই না যায় খণ্ডনা।
দিবস কতেক বই বেণুরায় মল।
ধর্মপত্নী বিমলা সে অনুমৃতা হলো॥
পিতৃমাতৃ বিয়োগে মাহুদ্যা রঞ্জাবতী।
(মানিকরাম : ১৯৬০ ; পৃ : ৩৩)

পিতৃ-মাতৃহীন এ বালিকার ঠাঁই হলো তার জ্যেষ্ঠ ভগিনী গৌড়েশ্বরের পাটরানী ভানুমতীর কাছে। ভানুমতী পরম স্নেহে রঞ্জাকে কোলে তুলে নেন। ভানুমতীর এ দায়িত্ববোধ ও সৌহার্দ্যের বর্ণনা কবি এভাবে প্রকাশ করেছেন—

ভানুমতী রাজরানী রঞ্জাকে কোলে করি।
অন্তঃপুরে গেল শেষে শোক পরিহরি॥
প্রাণের অধিকা রঞ্জা অনুজ ভগিনী।
(মানিকরাম : ১৯৬০ ; পৃ : ৩৫)

সেই মুহূর্তে জ্যেষ্ঠ্য ভগিনী ভানুমতী পিতৃ-মাতৃ শোক পরিহার করে রঞ্জাকে পরম যত্নে নিজের কাছে রাখার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তার মানবতাবোধের চরম বিকাশ ঘটেছে অন্যদিকে পারিবারিক মমত্ববোধ ও দায়িত্বেবোধেরও ঘটেছে বহিঃপ্রকাশ।

ঢেকুরগড়ের অধিপতি কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের একজন বিশ্বস্ত সামন্ত। ইছাই ঘোষ গৌড়েশ্বরের অন্য আর এক সামন্ত। একদা ইছাই ঘোষের সাথে যুদ্ধ করে কর্ণসেন পরাজিত হন। এই যুদ্ধে কর্ণসেনের চারপুত্র নিহত হন এবং চারপুত্রবধূ স্বামীর চিতায় অনুমৃতা হলেন। এর কিছুদিন পর পুত্র শোকে রানীও মৃত্যু বরণ করেন—

চারিপুত্র মোল সেনের চারি বৌ শেষে।
অনুমৃতা হল তারা স্বামীর উদ্দেশে॥
পুত্রবধূ শোকে রানী ব্যথিত অন্তরে।
পরান ত্যজিল তার কত দিন পরে॥
… … …
সংসারের সব সুখ এক কালে ঘুচিল॥
(মানিকরাম : ১৯৬০ ; পৃ : ৪৪)

সতীদাহ প্রথা নামে এক নির্মম প্রথা তৎকালে সমাজে প্রচলিত ছিল। এই নির্মম প্রথাকে মেনে নিয়ে রঞ্জার মা এবং কর্ণসেনের চারপুত্রবধূ স্বামীর চিতায় অনুমৃতা হলেন। সামাজিক অনুশাসন মানতে গিয়ে নির্মম এ প্রথার বলি হতো পরিবারে বেঁচে থাকা শিশু সন্তানেরা। ফলে গৃহগত অনেক বিপর্যয় দেখা দিত। কিছুদিনের মধ্যে পুত্র এবং পুত্রবধূর শোকে কর্ণসেনের পত্নীও মৃত্যুবরণ করেন। পুত্র, পুত্রবধূ এবং স্ত্রী শোকে রাজা কর্ণসেন মূহ্যমান। তিনি গৌড়েশ্বরের নিকট রাজ্য হস্তান্তর করে বৈরাগী হবার বাসনা করেন। কর্ণসেনের এ দুর্গতি দেখে গৌড়েশ্বর তাঁর স্ত্রী ভানুমতীর সাথে আলাপ করে কর্ণসেনের বংশ মর্যাদা ও বীরত্বের কথা মাথায় রেখে মহামদের অনুপস্থিতিতে অনেকটা চুপিসারে শালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পাত্র কর্ণসেনের বয়স বেশি হওয়ায় রঞ্জাবতীর ভাই মহামদ এ বিয়েতে ঘোর বিরোধী ছিলেন

যদিও গৌড়েশ্বরের সামনে এ বিষয়ে কোনো আপত্তি করেননি। খুব আড়ম্বরের সাথে রঞ্জাবতীর বিবাহ সম্পন্ন না হলেও ঐ-কালের উচ্চ শ্রেণির সমাজের বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আচার ও রীতি এ-কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দু বিবাহরীতির কিছু আচার-পার্বণ পালন করার উল্লেখ আছে কাব্যটিতে।

শুভ দিনক্ষণ দেখে অনেকটা গোপনেই গৌড়েশ্বর রঞ্জাবতীর সাথে কর্ণসেনের বিয়ের অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। এ বিয়েতে গৌড়পতি কর্ণসেনকে অনেক অর্থ-সম্পদ দান করেন। বিভিন্ন মঙ্গলাচার ও বেদবিধি সম্মত আনুষ্ঠানিক আচার-পার্বণ বিবাহকার্যে অনুসৃত হয়। জীবনবাদী কবি ঘনরাম চক্রবর্তী কাব্যে রঞ্জাবতীর মাতা-পিতার জীবিত থাকার তথ্য দিয়েছেন। তারা বৃদ্ধ বয়সে খুব হৈ হুল্লোড় করে না হলেও মোটামুড়ি আড়ম্বরের সাথে কর্ণসেন ও রঞ্জার বিয়ের অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। গৃহগত বিবাদ ও মনোমালিন্যের কথা প্রসঙ্গত উঠে এসেছে কাব্যটিতে।

ভ্রাতা মহামদ ভগ্নি রঞ্জার বিবাহবার্তা লোকমুখে শুনে খুব দুঃখিত হন এবং কীভাবে কর্ণসেনের অনিষ্ট করা যায় তার উপায় ভাবতে থাকেন। কর্ণসেনকে মহামদ হেঁরে বেটা আঁটকুড়ো বলে গালি দেন। শুরু হয় কর্ণসেন ও মহামদের বৈরিতা। কর্ণসেন হলেন মহামদের চোখেরবালি। অন্তর্কলহ কীভাবে পারিবারিক পরিমণ্ডলে অশান্তি সৃষ্টি করে তার পরিচয় পাওয়া যায় কাব্যে। মানব জীবন বড়ই বিচিত্র। এখানে দেখা যায় মায়ে-ঝিয়ে দ্বন্দ্ব, ভাইয়ে-ভাইয়ে দ্বন্দ্ব, বোনে বোনে দ্বন্দ্ব আবার কখনো ভাইয়ে বোনে দ্বন্দ্ব। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে পারিবারিক যে দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করা যায় সেখানে মহামদ ভগ্নিপতি কর্ণসেনকে শাস্তি দিতে গিয়ে প্রকারান্তরে অতি আদরের ছোট ভগ্নিকেই ক্ষতি করেছেন। মহামদের এ আক্রোশ স্নেহের ভগ্নি রঞ্জাকে অতিক্রম করে তার শিশু সন্তান লাউসেনের ওপর বর্তিয়েছে। মহামদের ঈর্ষা এততাই প্রবল রূপ ধারণ করেছে যে, যে ভাবেই হোক ভাগ্নের অনিষ্ট সাধন এমন কি তার মৃত্যু কামনা মহামদের এখন একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান। মহামদের প্রতিশোধ গ্রহণের নেশা ক্রোধে ও ঔদ্ধত্যে পরিণত হয়েছে। ফলে রঞ্জার অতি শ্রদ্ধার পাত্র মহামদ এখন রঞ্জার কাছে এক মহা আতঙ্কের নাম। ভাইয়ের প্রতি বোনের অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও আশঙ্কা দিন দিন বাড়তে বাড়তে সম্পর্ক দা-কুমড়ায় পরিণত হয়েছে। বাস্তববাদী কবি মানিকরাম রঞ্জা ও মহামদের গৃহগত এ বৈরি সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সাধারণ জনগণের চলমান জীবনের বাস্তবতাকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন।

মধ্যযুগে একজন নারীর জীবনে স্বামী ছিল পরম আরাধ্য ও পূজনীয়। পতি নিন্দা ছিল বাঙালি নারীর কাছে অসহনীয়। রঞ্জাবতীও তার স্বামী সম্পর্কে ভ্রাতা মহামদের নিন্দা সূচক বাক্য শুনে হন হতবাক। আঁটকুড়ো অপবাদ থেকে স্বামীকে মুক্ত করার জন্য শুরু হয় তার কৃচ্ছ্রসাধন। দাম্পত্য জীবনকে মধুময় ও আনন্দময় করার জন্য সন্তানের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন মনে করে রঞ্জা একনিষ্ঠ সাধনায় মগ্ন হন। মধ্যযুগে মানুষের ধারণা ছিল পুত্র না-থাকলে পরকালে পিতা-মাতার মুক্তি নেই। পুত্রহীন হলে তাদেরকে পুন্নাম নরক ভোগ করতে হবে। এ থেকে নিজেকে এবং স্বামীকে মুক্ত করতে রানী রঞ্জাবতী অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিলেন। এরপর তিনি শালে ভর দিতে মনস্থির করলেন। রানীর বুকে পিঠে শালবিদ্ধ হলো। বুক ফেটে ঝলকে ঝলকে রক্ত বের হতে লাগল। রানীর মুখ দিয়েও রক্ত পড়তে লাগল। এ ঘটনা দেখে স্বর্গের দেবতারাও হতবাক হলেন—

নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ শালে দিয়ে ভর।
… … …
কর্মকারে কয়্যা শাল করাইল নির্মাণ॥
… … …
সুতীক্ষ্ণ কেবল সর্প জিহবার সমান।
মক্ষিকা পড়িলে তায় হয় দুইখান॥
(মানিকরাম : ১৯৬০ ; পৃ : ৮২)

গৃহগত শান্তি বজায় রাখতে রঞ্জাবতীর এ আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা পৃথিবীতে বিরল। তার আত্মত্যাগ দেখে দেবতাদের আসন পর্যন্ত টলে উঠল। পুত্র লাভের আশায় রঞ্জা শালে ভর দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন—

রঞ্জা তেয়াগিয়া প্রাণ দেখে যত যাত্রিগণ
হা হা শব্দে করয়ে রোদন॥
(মানিকরাম : ১৯৬০ ; পৃ : ৮৩)

রঞ্জার একনিষ্ঠতায় তুষ্ট হয়ে বিশ্বপতি তাকে প্রাণ দান করে পুত্র লাভের বর দিলেন। স্বর্গের কশ্যপকুমার রঞ্জার পুত্র রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। একজন নারী গৃহের শান্তি বজায় রাখতে এবং স্বামীর আঁটকুড়ো অপবাদ ঘুচাতে সন্তান লাভের আশায় কতটা আত্মত্যাগ করতে পারেন রঞ্জাবতী তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রঞ্জার এ আত্মত্যাগে ধর্মঠাকুর তুষ্ট হলেন এবং তাঁর কৃপাতেই রানী গর্ভবতী হলেন। ধর্মঠাকুর পুত্রের নামও ঠিক করে দিলেন লাউসেন এবং রানীকে আজীবন লাউ খেতে নিষেধ করেন।

গর্ভকালীন সময়ে গর্ভবতী নারীর অনেক শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। রঞ্জাবতীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। নারীর গর্ভধারণকালীন এই বর্ণনা মধ্যযুগের আখ্যানকাব্যের এক অনিবার্য অংশ। এর মধ্যে অনুবর্তন আছে, ছকবাঁধা কাঠামোর অনুসৃতিও রয়েছে। রঞ্জাবতী যখন তিন মাসের গর্ভবতী তখন প্রায়ই তার ঘুম আসে, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং বমি বমি ভাব হয়, চার মাস গর্ভকালীন সময়ে রঞ্জার খাবারে অরুচি দেখা দেয়, নানা ব্যঞ্জনের মধ্যে অম্লরসযুক্ত খাদ্যে রুচি বাড়ে। দিনে দিনে রানীর অঙ্গে লাবণ্য বেড়ে যায়। সূর্যের তাপ সহ্য হয় না। ভূমিতে রানী শয়ন করে। খাবারে রুচি না থাকায় কুল কাসুন্দি, করঞ্জা খেতে সাধ হয়। পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত খাওয়ার এবং সাত মাসে সাধভক্ষণ আবার কখনো কখনো নয় মাসে সাধের অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। রানীর গর্ভ নয় মাস পূর্ণ হলে ময়নাগড়ের লোকেরা নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে তাদের প্রিয় রানীর সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান পালন করেন। এ সময়ে রানীর বিশেষ কোনো খাবারের প্রতি আকর্ষণ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়। রানী নিম্নলিখিত খাবার খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং রান্নার প্রণালীও বলে দেন—

শুসুনির শাক এনে সম্বরিবে তৈলে।
শেষে দিবে সর্ষপের বাটনা সিদ্ধ হলে॥
… … …
আর এক আছে সাধ আনি পুঁই খাড়া।
… … …
কিছু কিছু দিবে তায় কচু কলা মূল॥
চিংড়ী চাঁদ কুড়া মীন চাঁপা নটে শাকে।
অধিক লবণ দিয়া পাক কর‍্য তাকে॥
তায় দিবে গোটা দশ পনসের বীচ।
প্রচুর করিয়া দিবে পিঠালি মরিচ॥
ঝোলে দিয়া কৈ মাছ করে চড়চড়ি।
তৈলেতে ভাজিয়া তায় দিও ফুলবড়ি॥
… … …
শফরীর পেট চিরি বারি করে পোঁটা।
পোড়াবে যতনে যেন থাকে গোটা গোটা।
… … …
ব্রাহ্মণী রঞ্জার বাণী শুনে সেইমত।
শাকাদি ব্যঞ্জন রেঁধ্যা করিল প্রস্তুত॥
অনাদি ভাবিয়া রঞ্জা বসিল ভোজনে॥
(মানিকরাম : ১৯৬০ ; পৃ : ১০০-১০২)

রঞ্জা উপরিল্লিখিত খাবার খেতে চেয়েছেন শুধু তাই নয় খাবারগুলি রান্নার প্রণালীও তিনি ব্রাহ্মণীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রন্ধন শিল্পে রঞ্জার এ পারদর্শিতা সত্যিই প্রশংসনীয় এবং তাঁকে একজন অভিজ্ঞ বাঙালি রন্ধন শিল্পী বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙালি নারী সুস্বাদু খাবার রান্না করে তার প্রিয় মানুষদের ভোজন করানোকে প্রধান দায়িত্ব বলে মনে করেন এবং এ কাজটি করে তারা আনন্দও পান। মধ্যযুগের কবিরা যে ভোজনরসিক ছিলেন, নানা ব্যঞ্জনের রন্ধন প্রণালীর বর্ণনায় তাঁদের সেই আগ্রহ ও অভিজ্ঞতার চিহ্ন বর্তমান। সাধ খেয়ে রঞ্জার গর্ভ নিরাতঙ্কে নয় মাস পূর্ণ হওয়ার পর দশ মাসে প্রবেশ করতেই রানীর প্রসববেদনা শুরু হয়। মলিন হলো রানীর চাঁদ মুখ। ধাই ছুটে এসে রানীর অঙ্গে চন্দন লেপন করলেন। দাসীরা তাকে ব্যজন করতে লাগলো। প্রসূতি নারীর পরিচর্যায় কবি এখানে অভিজাত পরিবারের পরিচয় দিয়েছেন। প্রসববেদনায় রানী ছটফট করতে লাগলেন। মাটিতে শুয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়তে লাগলেন সেই যন্ত্রণাকাতর সময়েও প্রসূতি ঠাকুর-দেবতাকে স্মরণ করেন একটি সুস্থ বাচ্চার প্রত্যাশায়। প্রসূতির শারীরিক কষ্টের বর্ণনায় মানিকরাম আন্তরিক সমবেদনা ও জীবনাভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছেন। অসহায় নারীর আকুতি ধ্বনিত হয়েছে রঞ্জার নিচের ভাষ্যে—

রঞ্জা কয় দায় দিদি দুঃখ পাই বড়।
বাঁচাও জীবন মোর বলি তোরে দড়॥
যদি ঘোচাতে পার প্রসববেদনা।
প্রভাতে পরাব কানে পুরটের সোনা॥
(মানিকরাম : ১৯৬০ ; পৃ : ১০২)

দৈবানুকূল্যে রঞ্জার গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হলো; শুভক্ষণে শুভযোগে জন্ম নিল লাউসেন। দাই দিদি সূতিকা গৃহে প্রদীপ জ্বেলে প্রসব-উত্তর যাবতীয় কাজ সমাপ্ত করলেন। রানীর পুত্র প্রসবের সংবাদে ময়নাগড়বাসী আনন্দে উল্লসিত। রাজপুত্রকে দেখতে নারীরা রাজপ্রাসাদে আসতে শুরু করেন। পুত্রের চাঁদপনা মুখের দিকে তাকাতেই রাজা-রানীর আনন্দের আর সীমা রইল না। কর্ণসেন বেদবিধি মতো সকল কুলকর্ম এবং জাতকর্ম সম্পাদন করেন। শিশুর নাড়ী কাটার জন্য ধাত্রী পেল পাটের শাড়ী ও অনেক মূল্যবান দ্রব্য। পুত্রের মঙ্গল কামনা করে রাজা দীন-দুঃখীদের মাঝে বহু সোনা দান করেন। তিনি ভাটকে ঘোড়া, নাপিত ও রজককে জোড়া শাল উপহার দিলেন। এর মধ্য দিয়ে উচ্চবিত্ত সমাজে শিশুর জন্মোত্তর কুলাচারের পরিচয় গ্রথিত করলেন কবি।

একজন মা সন্তান লাভের জন্য কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন তা রঞ্জার কৃচ্ছ্রসাধন থেকে বোঝা যায়। রঞ্জার পুত্র লাভের সংবাদে গৌড়ের সকলেই যখন আনন্দে উল্লসিত তখন রানীর একমাত্র ভাই মহামদ ভাগ্নের অনিষ্ট সাধনে তৎপর হয়ে ওঠেন। ফলে পুত্র সন্তান জন্মদানের আনন্দ রঞ্জাবতীর জীবনে নিমেষেই ফিকে হয়ে যায়। মহামদ ইন্দা মেটেকে পাঠায় তার ভাগ্নেকে বধ করতে। এতে পারিবারিক ঈর্ষা ও হঠকারিতার প্রকাশ ঘটেছে। বাচ্চাকে চুরি করে ইন্দা মেটে দারিকেশ্বরে এসে নদীতে স্নান করতে যাওয়ার পূর্বে একটা ঝোপের মধ্যে শুইয়ে রাখে। স্নান শেষে ভোজনের পর মদ খেয়ে যখন তারা মাতাল হয়ে পড়ে তখন মা বসুধা ক্ষুধার্ত শিশুকে কোলে তুলে নেন। এ দিকে অনেক সাধনার ধন পুত্র চুরি যাওয়ায় রাজপ্রাসাদে শোকের ছায়া নেমে আসে। এত সাধনার ধনকে হারিয়ে রানী রঞ্জাবতী পাগল প্রায়। সদ্যপ্রসূতি নারীর দুরবস্থা ও মানসিক বিপর্যয়ের অসামান্য ছবি এঁকেছেন মানিকরাম—

শালে ভর দিয়ে প্রাণ তেয়াগিয়ে তোমা ধন
… … …
গর্ভে ধরে পেলাম ক্লেশে সার্থক না হল্য শেষে
হায় মোর কি ছিল অনীকে॥
ভাবিতে অনল উঠে ক্ষীরভরে স্তন ফাটে
তোমা বিনে দিব কার মুখে॥
(মানিকরাম : ১৯৬০ ; পৃ : ১০৭)

পুত্র শোকে রানী যখন হাহাকার করতে থাকেন তখন ধর্মঠাকুর হনুমানকে মর্ত্যে পাঠান। হনুমান দৈবজ্ঞের বেশে রাজ বাড়িতে প্রবেশ করে প্রথমে কর্পূরধবলকে রানীর কোলে দিলেন এবং বললেন ধর্মঠাকুরের দান হিসেবে এ পুত্রকে পালন করলেই মঙ্গল হবে। রানী কর্পূরকে পেয়ে খুশি হলেন কিন্তু দৈবজ্ঞের কাছে মিনতি করলেন তার গর্ভজাত পুত্রকে এনে দিতে। দৈবজ্ঞের এতে মায়া হলো তিনি লাউসেনকে এনে রানীর কোলে দিয়ে বললেন এই হলো তোমার পুত্র লাউসেন, যাকে তুমি উদরে ধারণ করেছিলে। অন্য পুত্রটিও ধর্মঠাকুর তোমাকে দান করেছেন। রঞ্জাবতী এখন দুই পুত্রের জননী। অরবিন্দ পোদ্দার মন্তব্য করেছেন যে, 'যিনি দুঃখ দিতে পারেন, দুঃখ হরণের অধিকার তাঁরই ; যিনি অকল্যাণ সাধন করতে পারেন, কল্যাণ সাধনের উপায়ও তাঁরই জানা থাকে ; যিনি বঞ্চিত করতে পারেন, তিনি পরিপূর্ণভাবে দিতে পারেন, আর যিনি দিতে পারেন, তাঁর ধ্যানও মঙ্গল, মঙ্গলগাথা শ্রবণও কল্যাণপ্রসূ'। (অরবিন্দ : ২০০৫ ; পৃ : ১০১) রঞ্জাবতীর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনায় ধর্মঠাকুরের অবদান অনুধাবন করা যায় কবির অনুসরণে।

সন্তান জন্ম গ্রহণের পর হিন্দু শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী কিছু আচার-পার্বণ পালনের নিয়ম প্রচলিত আছে। রঞ্জাও তাঁর সন্তানের মঙ্গল কামনায় কিছু আচার-পার্বণ পালনের জন্য পুরো রাজপুরীকে আমন্ত্রণ জানান এবং নত্তা, ষষ্ঠীপূজা, অরণ্যষষ্ঠী অনুষ্ঠানগুলি অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে পালন করেন। এক, দুই, তিন এভাবে পাঁচ মাস গত হয়ে ছয় মাসে পরতেই ঘটা করে রাজা-রানী শুভদিন দেখে পুত্রের অন্নপ্রাশন এবং নামকরণ অনুষ্ঠান পালন করেন। মধ্যযুগে কন্যা সন্তানের মতো পুত্র সন্তানকেও নানা আভরণে ভূষিত করা হতো। রঞ্জাও তাঁর পুত্রকে বিভিন্ন আভরণে ভূষিত করেন।

লাউসেন এবং কর্পূরধবল দিনে দিনে বড় হতে থাকেন। তাদের দৈহিক নানা পরিবর্তন এবং অঙ্গভঙ্গি দেখে রাজা-রানী সুখের সাগরে ভাসতে থাকেন। এভাবে লাউসেন ও কর্পূরধবলের বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হলো। সাধারণত সন্তানের বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হলে হাতেখড়ি দিয়ে গুরু গৃহে পাঠানো অথবা নিজ গৃহে গুরুকে এনে সন্তানকে পাঠদানের নিয়ম তৎকালে উচ্চবিত্ত সমাজে প্রচলিত ছিল। লাউসেন এবং কর্পূরধবলের বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হলে হাতেখড়ি অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

মাত্র দশ দিনে সেন-নন্দন বর্ণপরিচয় শেষ করেন। এরপর একে একে ব্যাকরণ, পাণিনি, অভিধান তারপর শুরু করেন সাহিত্যের বিভিন্ন রস আহরণ। মুরারি, ভারবি, ভট্টি, কালিদাস, অলঙ্কারশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ও ছন্দশাস্ত্র মাত্র দশ বছর বয়সে সমাপ্ত করেন—

ব্যাকরণ প্রথমে পড়িল নানামত।
পাণিনি কলাপ ভাষ্য কোষ কতশত॥
… … …
মুরারি ভারবি ভট্টি নৈষধ পিঙ্গল॥
অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্কশাস্ত্র।
ছন্দশাস্ত্র পুরাণ পড়িল তারপরে।
উত্তম হইল বিদ্যা নয় দশ বৎসরে॥
(মানিকরাম : ১৯৬০ ; পৃ : ১১৫)

বিদ্যাগ্রহণের পাঠ্যসূচিতে সেকালের শিক্ষাজগতের রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। উচ্চবিত্ত সমাজের বিদ্যার্থীরা কী কী বিষয় অধ্যয়ন করত এবং তাদের মানসিক স্তর কোন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, তার পরিচয় বিধৃত রয়েছে ওপরের কাব্যাংশে।

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে লাউসেন ও কর্পূরধবলের শারীরিক ও মানসিক শক্তিও বাড়তে থাকে। পুত্রদের নিজেদের সুরক্ষা এবং দেশকে সুরক্ষিত রাখার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলার প্রয়াসে কর্ণসেন পুত্রদের মল্লবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। তাছাড়া লাউসেন নিজের বেদ, পাণিনি, ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতি শিক্ষা

সমাপ্ত করে ধর্ম ও মল্লবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী হলেন। জ্ঞান ও ধর্ম একই সঙ্গে লাউসেনের প্রিয় ছিল। পাণ্ডব পুত্র ভীম ও অর্জুনকে স্মরণ করে নিজ পুত্রদের যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী করার জন্য কর্ণসেন বিভিন্ন দেশ থেকে মল্লবিদদের আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজগৃহে নিয়ে আসেন। শুরু হলো লাউসেন ও কর্পূরধবলের মল্লবিদ্যা শিক্ষা। পুত্রদের শারীরিক সুরক্ষার জন্য মল্লবিদ্যা শিক্ষা অনেকটা বাধ্যতামূলক ছিল উচ্চশ্রেণিভুক্ত সমাজে। তারই পরিচয় পাওয়া যায় লাউসেনের বিদ্যার্জনের আড়ম্বরে। তবে লাউসেনকে দেখেই মল্লবিদেরা চিন্তিত হলেন। ভয়ে তাদের উরু কাঁপতে থাকে। চেহারায় ও আচরণে লাউসেনকে দেবতার মতো দেখে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে মল্লবিদদের মস্তক অবনত হয়। এ দেখে রাজা রানী খুব বিব্রত বোধ করেন। ভক্তবৎসল ধর্মঠাকুর এ কথা জানতে পেরে লাউসেনকে মল্লশিক্ষা দেওয়ার জন্য বীর হনুমানকে মর্ত্যলোকে পাঠালেন। বীর হনুমানের নিকট হতে মল্লবিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করে লাউসেন একেবারে প্রকৃত মল্লবিদ হয়ে যান। এরপর বর্হিবিশ্ব সম্পর্কে স্বচক্ষে জ্ঞান আরোহণের জন্য তিনি মাতা-পিতার কাছে ভ্রমণের অনুমতি প্রার্থর্না করেন। কিন্তু মাতা রঞ্জাবতী কিছুতেই অনুমতি দিবেন না। লাউসেন যখন গৌড়ে যাত্রার জন্য মাতার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন তখন স্নেহময়ী মা সন্তানকে অত্যন্ত সুকৌশলে গৃহে আটকে রাখার ও মাতৃস্নেহের যে নজির সৃষ্টি করলেন তা যেমন হাস্যকর তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক—

গৌড় হইতে আন মল্ল সারেঙধরে॥
হাত পা ভাঙ্গিয়ে রাখ বলে কয়ে তাকে।
… … …
অবিরত বেটার দেখিবে চাঁদমুখ॥
(মানিকরাম : ১৯৬০ ; পৃ : ১৫৭)

এখানে রাজমাতা ও পিতার যে আদর্শ দেখতে পাওয়া যায় তাতে তাঁদের ব্যক্তিত্বে এবং আভিজাত্যে প্রখরতা তো প্রকাশিত হয়নি বরং অতিরিক্ত স্নেহ-বাৎসল্য তাদেরকে অতি সাধারণ মানবে পরিণত করেছে। পরিশেষে লাউসেন নানা যুক্তি প্রদর্শন করে ও নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে মাতা-পিতার অনুমতি আদায়ে সক্ষম হন। গৌড় যাত্রার পথ ছিল নানা বিপদে ভরপুর। প্রথমে কামদল বধ পালায় হিংস্র কামদল বাঘ বধ করেন। এরপর জামতি পালা ও গোলাহাট পালায় পড়েন ভ্রষ্টা নারীর খপ্পরে। কাব্যের জামতি পালায় নয়ানী নামে এক অসতী নারীর পরিচয় পাওয়া যায় যে লাউসেনের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রেম লাভের জন্য আকুল হয়ে ওঠে। এক উদগ্র বাসনা ও কামচঞ্চলতায় ঘরে গিয়েও স্থির থাকতে না পেরে সে মনস্থির করল মোহিনী বেশে লাউসেনকে সরাসরি প্রেম নিবেদন করবে। এ জন্য নয়ানী দেহগাত্র চন্দনে চর্চিত করল, পরিপাটি করে কেশবিন্যাস করে উত্তম বসন পরিধানসহ যত প্রকার অলঙ্কর ছিল তা একে একে অঙ্গে পরে দেহকে ভূষিত করল। কুলবতী হলেও কুলের নিয়ম না মেনে সুন্দর পরপুরুষের প্রেমাভিলাসে তার চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। চিত্ত তার সততই বর্হিমুখী। ধারণা করা হয় বিবাহিত জীবনে অসুখী নয়ানী সাংঘাতিক ভাবে ভোগবাদী। লাউসেনের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রেমনিবেদন করে অলজ্জিতভাবে। নিজের বাড়িতে লাউসেনকে রাত্রি যাপনের আহ্বান জানায়। পরিশেষে লাউসেনকে তার প্রেম প্রস্তাবে রাজি করাতে না পেরে নিজ সন্তানকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দেয় এবং সম্পূর্ণ দোষ লাউসেনের ওপর দিয়ে লোক জড়ো করে। লাউসেন লোকোপবাদ থেকে রেহাই পেতে ধর্মঠাকুরকে স্মরণ করেন এবং কূয়া থেকে মৃত বাচ্চাকে তুলে তার জীবন দান করেন। বাচ্চাটি সকলের সামনে স্বীকারোক্তি করে তার মাই তাকে কূয়ায় নিক্ষেপ করেছে। উপস্থিত সকলে নয়ানীকে ধিক্কার এবং লাউসেনের নামে বিজয় ধ্বনি দিতে থাকেন। পরপুরুষকে বধ করার জন্য নারীর এ-রকম ফাঁদ-পাতার কাহিনি মধ্যযুগের কাব্য সুলভ। নয়ানীর আচরণে মধ্যযুগের একাংশ নারীর মনোজগতের ও আচরণের পরিচয় এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। গোলাহাট পালায়ও এমন আর এক ভ্রষ্টা রমণীর পরিচয় পাওয়া যায়, যে বাজারের বারবণিতাকেও হার মানায়। এই রমণীর নাম সুরিক্ষা যে গোলা হাটের সর্দারনী। অনেক দাস-দাসী পরিবেষ্টিত সুরিক্ষা পান, সুপারি পড়া খাইয়ে পরপুরুষদের বশ করত। মানিকরাম গাঙ্গুলির *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে সুরিক্ষা হয়ে ওঠে আরও বেশি উদ্ধত ও বীভৎস—

উলঙ্গ হইয়ে নাচে নাই লাজ ভয়।
ব্রহ্মচারী ঠাকুর বচনে বশ হয়॥
ঔষধ অশেষ বিদ্যা বিলক্ষণ জানে।
রূপের তুলনা নাই এ তিন ভুবনে॥
বিদগ্ধ বিদেশী পুরুষ যদি পায়।
কুচের কাঁচুলি খুলে মোহনি লাগায়॥
গাড়র করিয়া রাখে ঔষধের গুণে।
সুন্দর পণ্ডিতা বিটি সর্বশাস্ত্র জানে॥
(মানিকরাম : ১৯৬০ ; পৃ : ২৪৪-২৪৫)

এভাবে লাস্যময়ী হয়ে লাজ-ভয় ত্যাগ করে বিভিন্ন ছলনার আশ্রয় নিয়ে পুরুষকে ফাঁদে ফেলত সুরিক্ষা।

পরিশেষে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, ভ্রষ্টা রমণীদের ফাঁদ অতিক্রম করে লাউসেন ও কর্পূরধবল গৌড়রাজ্যে পৌঁছলেন। গৌড়েশ্বরের পাটরানী ভানুমতী পরম স্নেহে ভগ্নিতনয়দের বুকে টেনে নেন এবং মণ্ডা, মিঠাই, চিনি ও মুড়কি দিয়ে আপ্যায়ন করেন। সম্ভবত মধ্যযুগে রাজবাড়িতে চিনি, মণ্ডা, মিঠাই ও মুড়কি দিয়ে অতিথি আপ্যায়নের রেওয়াজ ছিল যা আজও আমাদের বাঙালি সমাজে নিত্যদিনের জলখাবার হিসেবে সাধারণ গৃহস্থ পরিবার ব্যবহার করে থাকেন। গৌড়রাজ্যে কিছু দিন অবস্থানের পর লাউসেন ও কর্পূরধবল যখন স্বদেশে ফেরার জন্য মাসির কাছে বিদায় নিতে গেলেন তখন মাসি অত্যন্ত বেদনার্ত চিত্তে নানা বসনে-ভূষণে সজ্জিত করে তাদেরকে বিদায় দিলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে লাউসেন ও কর্পূরধবল গৌড়রাজ ও রানীকে ভক্তিভরে প্রণাম করেন। এর মধ্য দিয়ে পারিবারিক বন্ধন, হৃদ্যতা এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ভালোবাসা প্রকাশসহ পারিবারিক সুশিক্ষার বিভিন্ন দিক প্রকাশ পাই। তৎকালে সমাজে ছেলেরাও মেয়েদের মতো নানা বসনে ভূষণে ভূষিত হতেন। এজন্য গৌড়রাজ্য থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে রাজা ও রানী লাউসেন ও কর্পূরধবলকে নানা বসনে ও ভূষণে ভূষিত করেন।

মানুষ সামাজিক জীব। সৃষ্টির পর থেকেই মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। আর এভাবেই পরিবার নামক সংগঠনটির সৃষ্টি। পরিবার সংগঠনে বিবাহ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত নর-নারী বৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে সন্তান সন্ততিসহ একত্র বসবাস করার আশ্রয় হচ্ছে পরিবার। লাউসেনের বিবাহ পালায় ঘটক নির্বাচনের মাধ্যমে বর ও কন্যাপক্ষের সর্ব সম্মতিক্রমে বিয়ে সংঘটিত হয়নি। কলিঙ্গরাজ লাউসেনের দায়িত্বে, বীরত্বে, আচরণে, ভক্তিতে এবং সততায় সন্তুষ্ট হয়ে নিজ কন্যা কলিঙ্গাকুমারীকে তাঁর হাতে সমর্পণ করতে মনস্থির করেন। কলিঙ্গরাজ তাঁর চাঁদমুখ স্বরূপা কন্যাকে লাউসেনের হাতে সঁপে পিতৃদায়িত্ব পালন করতে চান—

কলিঙ্গা আমার কন্যা ধন্যা রূপে গুণে।
সম্প্রদান তোমাকে করিব সাধ মনে॥
(মানিকরাম : ১৯৬০ ; পৃ : ৩৪৪)

কলিঙ্গরাজের এ প্রস্তাবে লাউসেন রাজার পিতৃত্বকে সম্মান জানিয়ে খুশি হয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। লাউসেনের সম্মতি পাওয়ার পর হিন্দু বিবাহরীতির সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে তাঁদের বিয়ের আয়োজন করা হয়। এ বিয়েকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ধর্মদেব স্বয়ং বীর হনুকে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে পাঠান কলিঙ্গরাজের বনভূমিতে সুধা বা অমৃতবর্ষণ করার জন্য। দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় কলিঙ্গরাজ্যে অমৃতধারা বর্ষিত হলো। ফলে লাউসেনের প্রতি রাজা-রানীসহ সকল প্রজার বিশ্বাস বেড়ে গেল এবং পৃথিবীতে ধর্মের জয় হলো। অমৃতবর্ষণ দেখে রাজা-রানী সকলেই আনন্দে বিহ্বল। সকলের ধারণা অমৃত সুধা বর্ষণের মধ্যদিয়ে দেবতাদের আশীর্বাদ বর্ষিত হলো। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ অলৌকিকতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

রাজকন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে চারদিকে মঙ্গলশঙ্খ এবং নানা বাদ্য-বাজনা বাজতে লাগল। বিবাহকার্য সম্পন্ন করার জন্য যে কুঞ্জটি সজ্জিত হলো সেটি উন্নতমানের বস্ত্র এবং মণি-মুক্তা দ্বারা সাজানো হলো সাথে

আরও সংযুক্ত হলো বিভিন্ন রঙের পতাকা। বিয়ের এ সাজ-সজ্জার মধ্য দিয়ে উচ্চবিত্ত সমাজের রুচির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এরপর কলিঙ্গার মাতা অমলা দেবী এয়োগণ সাথে করে জল সইতে গেলেন। হিন্দু শাস্ত্রের আচরণ মতে বর-কন্যার গাত্রহরিদ্রা ও অধিবাসপর্ব সম্পন্ন হলো।

প্রাক বিবাহের সমস্ত বিধিবিধান সমাপ্ত করার পর লাউসেনকে শিবির হতে চতুর্দোলায় করে রাজপ্রাসাদে আনা হলো। সুদর্শন লাউসেনকে দেখে সবাই আনন্দিত হলেন। আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই ছাঁদনাতলায় আসন গ্রহণ করেন। বিশাল চন্দ্রাতপের তলায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসহ কন্যা সম্প্রদান করতে রাজা প্রস্তুত ছিলেন। এমন সময় কুলপুরোহিত রাজার কাছে অনুযোগ করেন যুদ্ধে অনেক লোক মারা গেছেন এ অবস্থায় রাজার এখন অশৌচ চলছে। এক বছরের জন্য অশৌচের কারণে বিবাহকার্য অনুচিত। অকস্মাৎ এ প্রস্তাবে উপস্থিত সকলেই বিব্রত হলেন। এ সময় রাজকন্যা কলিঙ্গাকুমারী তাঁর মাতা-পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যিনি ধর্মের সেবক সতত ন্যায়পরায়ণ তিনি এর একটা ব্যবস্থা করবেন। হবু স্বামীর প্রতি বাঙালি মেয়েদের আত্ম বিশ্বাস যে কতটা প্রবল তার ইঙ্গিত আছে কলিঙ্গার উক্তির মধ্যে। সব কিছু জানার পর লাউসেন ধর্মঠাকুরের কৃপায় সকল সৈন্যকে পুনর্জীবিত করেন। এভাবেই মধ্যযুগের কাব্যে বাস্তবতার ফাঁকে ফাঁকে অলৌকিকতার আমদানি করেছেন কবিরা। এ অসাধ্য সাধন করায় লাউসেনকে সকলে নররূপী দেবতা মনে করতে লাগলেন। মৃত সৈনিকেরা যখন প্রাণ ফিরে পেলেন তখন কলিঙ্গরাজ্যে আনন্দ অশ্রু বর্ষিত হতে লাগলো। আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলো সমস্ত নগরবাসী। কলিঙ্গাকুমারীও আনন্দে উৎফুল্ল হলেন তাঁর সমস্ত শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হলো। রাজা-রানী জামাতার গর্বে গর্বিত হলেন। পরম প্রীত হয়ে রাজা সমস্ত বিধিবিধান মেনে কন্যা সম্প্রদানের মধ্য দিয়ে বিবাহকার্যের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। অন্তঃপুরের নারীগণ বর-কন্যাকে জলধারা দিয়ে বাসর ঘরে নিয়ে গেলেন। বিয়ের আট দিন পর অষ্টমঙ্গলার আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত হলো। লাউসেন এবার শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে দেশে ফেরার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাজা-রানী তাঁদের এত দিনের স্নেহে লালিত কন্যাকে হর্ষ ও বিষাদের মধ্য দিয়ে বিদায় জানালেন। আবার অলৌকিকতার সঙ্গে বাস্তবতার মেলবন্ধন ঘটল। আর এভাবেই মিশ্র বাস্তবতার পরিচর্যায় গার্হস্থ্যজীবনের রূপ অঙ্কিত হলো।

লাউসেনের এ বিয়েতে সরাসরি যৌতুক প্রদানের প্রসঙ্গ না থাকলেও কলিঙ্গরাজ জামাতাকে বহু ধনরত্ন এবং মূল্যবান বসন-ভূষণ উপহার দেন। সেই সাথে কন্যার শ্বশুর-শাশুড়ির জন্য নমস্কারী স্বরূপ বসন-ভূষণ প্রদান করেন। রাজা কালু ডোম ও তার অনুচরবর্গকে জরিপট্টি শাল দিয়ে সম্মানিত করেন। এর সবটাই কবি কর্তৃক প্রথার অনুবর্তন মাত্র। এই লৌকিকতার পরিচয় আমরা অন্যান্য কাব্যেও লক্ষ করেছি। যৌতুক হিসেবে মূল্যবান নানা রত্নরাজি কন্যাকে দান করার পরও তাঁকে দেখাশোনা করার জন্য কলিঙ্গরাজ দক্ষিণা ও দ্রৌপদী নাম্নী দুইজন দাসীকে কলিঙ্গাকুমারীর সাথে পাঠান। কন্যার সঙ্গে যৌতুক স্বরূপ দাসী সম্প্রদান বা প্রেরণ সেকালের উচ্চবিত্ত পরিবারের কুলাচার রূপেই গণ্য ছিল। সমস্ত কুলাচার শেষে বিদায়ের প্রাক্কালে নবদম্পতি রাজা-রানী, ব্রাহ্মণ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। এ সময় বর-বধূকে অনেকে স্বর্ণ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি উপহার হিসেবে প্রদান করেন।

নবদম্পতিকে বিদায় দিয়ে কলিঙ্গরাজ্যের সকলেই দুঃখে ভারাক্রান্ত। কন্যাকে বিদায় দিয়ে রাজরানী অত্যন্ত বেদনার্ত। অনির্বার অশ্রু জলে রানীর দুচোখ ঝাপসা হয়ে উঠলো। রাজকন্যার অনুপস্থিতি সমস্ত নগরকে একেবারে নিরানন্দ এবং শ্রীহীন করে দিল। কলিঙ্গার সখীরাও দুঃখে কাতর। প্রাণপুত্তলী গৌরীকে বিয়ের পর বিদায় দিয়ে মাতা মেনকার যে অবস্থা হয়েছিল রানীরও সেই একই অবস্থা হলো। রাজ্যের প্রবীণারা রানীকে নানা প্রবোধ দিতে থাকেন। আর কন্যাকে বিদায় দিয়ে কলিঙ্গরাজের অবস্থা হলো মহারাজ জনকের মতো। মিথিলার রাজা জনক প্রিয় পুত্রী জানকীকে বিয়ে দিয়ে যেমন উচ্চস্বরে বিলাপ করতে থাকেন কলিঙ্গরাজের অবস্থাও তদ্রূপ হলো—

জানকীকে পাঠাইয়া জনক যেমন।
উচ্চেঃস্বরে অবোধিয়া করেন রোদন॥
তেমতি কর্পূরধল কলিঙ্গার মোহে।

অঙ্গ হল্য আপ্লাবিত নয়নের লোহে॥
(মানিকরাম : ১৯৬০ ; পৃ : ৩৫০)

লাউসেন স্ত্রীকে নিয়ে গৌড়পতির সাথে দেখা করে ময়নাগড়ে পৌঁছাবেন মনস্থির করেন। সঙ্গে কলিঙ্গরাজও গৌড়পতির সাথে দেখা করার জন্য যান। সকলে গৌড়রাজ্যে উপস্থিত হলেন। শত্রুতার কথা বিবেচনায় রেখে গৌড়পতি কলিঙ্গরাজার সাথে দেখা করতে প্রথমে রাজি ছিলেন না। পরে লাউসেনের কাছে সকল কাহিনি শুনে তিনি কলিঙ্গরাজকে বন্ধু হিসেবে মেনে নেন। লাউসেন অন্তঃপুরে গিয়ে মাসিকে প্রণাম করেন। গৌড়ের পাটরানী বধূ কলিঙ্গাকুমারীকে অন্তঃপুরে এনে অনেক আশীর্বাদ করলেন এবং উপহার হিসেবে ধনরত্ন দান করলেন। বধূর চাঁদমুখ দেখে রানী প্রীত হলেন। বধূর নমস্কারী বস্ত্র ও ধনরত্ন রানীকে প্রদান করেন। লাউসেন ও কলিঙ্গাকুমারী রাজা-রানী, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনদের প্রণাম করে তাদের আশীর্বাদ নিয়ে চতুর্দোলায় বসলেন। তাঁদের সাথে চলল বহু দাসদাসী ও অনুচরবর্গ। পদ্মা পার হয়ে মঙ্গলকোটের দিকে অগ্রসর হতেই মঙ্গলকোটের রাজা লাউসেনের আগমনবার্তা শুনেই তাঁর কন্যা অমলাবতীকে ধর্মপুত্র লাউসেনের হাতে সমর্পণ করতে মনস্থির করেন। রাজার ধারণা রূপে, গুণে, শৌর্যে, বীর্যে ও বীরত্বে লাউসেনের তুল্য জামাই মেলা ভার। প্রত্যেক পিতা সৎ, যোগ্য, বিশ্বস্ত ও বীর পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে চান এজন্য দোজবর পাত্র জেনেও রাজা কন্যা সমর্পণে আপত্তি করেননি। লাউসেন মঙ্গলকোটে পৌঁছুতেই রাজা গজপতি বিয়ের সব আয়োজন করে লাউসেনের কাছে কুলপুরোহিত ও ভাটকে পাঠান। পুরোহিত ও ভাট রাজা গজপতির বার্তা লাউসেনকে প্রেরণ করেন এবং তাঁর কন্যা সম্পর্কে বলেন রাজকন্যা অমলা অপ্সরা শ্রেষ্ঠা। উর্বশীর মত রূপসী। রূপে ও গুণে অতুলনীয়া। এ প্রস্তাব শুনে লাউসেন নববধূ কলিঙ্গাকুমারীর দিকে তাকান। কলিঙ্গাকুমারী স্বামীর মুখপানে আনন্দের সাথে তাকিয়ে সর্ব সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এর ফলে উচ্চ সমাজে বহুবিবাহ যে প্রচলিত তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তবে বর্তমান স্ত্রীর সম্মতির বিষয়টি সম্ভবত উচ্চবিত্ত সমাজের সংস্কৃতির অভিরুচিরই পরিচায়ক। স্ত্রীর সম্মতি পাওয়ার পর লাউসেন এ বিয়েতে রাজী হয়ে রাজধানী মঙ্গলকোটে প্রবেশ করেন। বেদবিধি অনুসারে রাজা কন্যাকে লাউসেনের হাতে সমর্পণ করেন। রাজা যৌতুক হিসেবে অনেক ধন-রত্ন লাউসেনকে উপহার দেন। ব্রাহ্মণদেরকে দিলেন উপযুক্ত দক্ষিণা। বিয়ের পর অষ্টমদিনে অষ্টমঙ্গলা সমাপ্ত করে লাউসেন রাজার কাছে বিদায় চাইলেন।

দুই স্ত্রীসহ চতুর্দোলায় করে লাউসেন স্বদেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বর্ধমানরাজ্যে পৌঁছুলে বর্ধমানরাজ কালিদাস তাঁর কন্যা বিমলাকে গ্রহণ করার জন্য লাউসেনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। লাউসেন সম্মত হলে রাজা অবিলম্বে বিবাহকার্য সমাপ্ত করেন। বেদবিধি মতে বিবাহকার্য সমাপ্ত হলে বর-কন্যাকে বাসরঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত্রি প্রভাত হতেই লাউসেন নববধূকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করেন। বর্ধমানের রাজমহিষী কন্যা বিমলাকে তার দুই সপত্নী কলিঙ্গা ও অমলার হাতে বিনয়ের সাথে তুলে দিয়ে বিনীত ভাবে তাঁদের কন্যার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করলেন। কলিঙ্গা ও অমলাও তাঁকে বিশেষ ভাবে আশ্বাস দিলেন। সপত্নী সৌহার্দ্যের এ দৃষ্টান্ত ব্যতিক্রমী এবং কৌতূহলোদ্দীপক।

এবার লাউসেন তিন বধূকে নিয়ে চতুর্দোলায় উঠলেন। ময়নাগড়ে পৌঁছানোর আগেই লাউসেন নগরে সমাচার পাঠিয়ে দেন। অনেক দিন পর প্রভূত বিজয়গৌরব ও যশ নিয়ে লাউসেন ময়নাগড়ে ফিরে আসেন। পুত্রের আগমন বার্তা পেয়ে কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী আনন্দের সাগরে ভাসতে থাকেন। মহাআনন্দে পুরো ময়নাগড় উল্লসিত।

রঞ্জাবতী পুত্র এবং পুত্রবধূদের বরণ করার জন্য অন্তঃপুরে এয়োদের সঙ্গে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। বধূরা রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলে রঞ্জাবতী এয়োগণকে সঙ্গে নিয়ে বধূদের বরণ করেন। কর্ণসেনও ধানদূর্বা ও ধনরত্ন দিয়ে বধূদের আশীর্বাদ করেন। চারদিকে নানা বাদ্য বাজতে থাকে। ব্রাহ্মণরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। নারীগণ মঙ্গলাচার করে হুলুধ্বনি দিতে থাকেন। বধূদের মাথায় রত্নমুকুট ও গলায় রত্নহার পরিয়ে দিলেন রাজমাতা রঞ্জাবতী। হীরা, মরকত, মণিসহ বিচিত্র মূল্যবান অলঙ্কার পুত্রবধূদের উপহার

দিলেন কর্ণসেন। শ্বশুর-শাশুড়ি কর্তৃক পুত্রবধূকে সাদরে গ্রহণ করা এবং উপহার প্রদানের মধ্য দিয়ে আন্তরিকতা, হৃদ্যতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি বৃদ্ধি পায় যা গৃহগত শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়ক হয়।

বধূদের পিতা-মাতা যৌতুক এবং নমস্কারী স্বরূপ যেসব বসন ভূষণ ও ধনরত্ন দিয়েছিলেন বধূদের সহচরী দাসীগণ রঞ্জাবতীর হাতে তা তুলে দিলেন। ব্রাহ্মণগণও লাউসেন ও বধূদের মাথায় ধান ও দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। ভ্রাতা কর্পূরধবলকে লাউসেন বুকে জড়িয়ে ধরেন। পারিবারিক এ সৌহার্দ্য দেখে আগত অতিথিগণ আবেগাপ্লুত হলেন। সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত করে লাউসেন পিতা-মাতা ও বধূদের নিয়ে একান্নবর্তী পরিবারে পরম সুখে বাস করতে থাকেন। পিতা বৃদ্ধ হওয়ায় লাউসেন রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনও করতে থাকেন।

উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে লাউসেন পারিবারিক বন্ধনে সুদৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হওয়ায় স্বর্গলোক থেকে ধর্মঠাকুর বীরহনুকে ডেকে বললেন, মর্ত্যলোকে ধর্মের পূজা প্রচার ও প্রকাশের জন্য কশ্যপনন্দন পৃথিবীতে নররূপে লাউসেন নাম নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু লাউসেন সেই আদর্শ ভুলে গিয়ে মায়া ও মোহপাশে আবদ্ধ হয়ে ধন, জন ও রমণী নিয়ে মত্ত হয়ে উঠেছেন। ফলে কলিযুগে ধর্মপূজার প্রচলন ও প্রসার ঠিকমত হচ্ছে না। ধর্মঠাকুর লাউসেনকে এ অবস্থা থেকে নিবৃত্ত করে ধর্ম প্রচারের কাজে একনিষ্ঠ ভাবে আত্মনিয়োগ করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। এর মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে কানড়ার বিবাহ সংঘটনে একটি কঠিন শর্তারোপ করা। হরিপাল কন্যা রূপবতী কানড়াকুমারী লাউসেনকে পতি হিসেবে পাওয়ার জন্য নিত্য দেবী ভগবতীর আরাধনা করেন। ধর্মরাজ বীর হনুকে বললেন এ ব্যাপারে একটা সমস্যার সৃষ্টি করে বীর লাউসেনকে দিয়েই সেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। তখনই ধর্মঠাকুর স্বর্গের নর্তকী বিদ্যাধরীকে ডেকে বললেন তুমি মর্ত্যে গিয়ে নানা ছলাকলাসহ নৃত্য পরিবেশন করে গৌড়ের বৃদ্ধ রাজাকে কামমোহিত কর। এ আদেশ পেয়ে বিদ্যাধরী এক অপূর্ব বেশ-ভূষায় সজ্জিত হয়ে মর্ত্যলোকে এলেন। খঞ্জনা পাখির মতো চঞ্চলা হয়ে উঠল তার লোচনযুগল, ভ্রু হলো রামধনুর মতো, তার কটিদেশ মৃগরাজের কটিদেশকে হার মানায়। অপ্সরী রম্ভার মতো সুগোল তার উরুদেশ। মণিমনোমোহিনী মনোরমা সেই সুন্দরীর তনু ছিল তিলোত্তমার মতো। যে কেউ সে রূপ দর্শনে দংশিত হবে। এই তিলোত্তমা মর্ত্যে গৌড়রাজ্যে গিয়ে গৌড়েশ্বরকে কামে বিমোহিত করে তুললেন। রাজা পাত্রকে আদেশ দিলেন তুমি এমন এক কন্যা জোগাড় কর যার গায়ের রং কাঁচা সোনার মতো। তৎক্ষণাৎ পাত্র রাজাকে আশ্বস্ত করে বলেন আমি সে রকমই এক কন্যার সন্ধান পেয়েছি। শিমুল নিবাসী হরিপালের কন্যা অপ্সরা উর্বশীর মতো রূপসী। কানড়ার রূপের বর্ণনা শুনে রাজা বিয়েতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। পাত্র গঙ্গাধর ভাটকে কানড়ার পিতা হরিপালের কাছে তার কন্যার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পাঠান। সঙ্গে কন্যার পিতাকে খুশি করার জন্য নানাবিধ মিষ্টান্ন ও রত্নাদিসহ ভেট পাঠানো হয়। কন্যার জন্য পাঠানো হয় মণি-মুক্তা খচিত স্বর্ণালঙ্কার। এর সাথে ভাট রাজা হরিপালকে পাত্র প্রেরিত একখানি পত্র প্রদান করেন——

কানড়া তোমার কন্যা কিশোর বয়েসী।
বিবাহ করিতে রাজা বড় অভিলাষী॥
নভ নয় দিনে হল্য লগ্ন নিরূপণ।
প্রভুত্ব বুঝিবে রায় পাঠাই লিখন॥
ভেট লয়্যা ভাট যায় ভাব্য নাঞি আন।
দুস্খ পাবে না দিলে দুহিতা নৃপে দান॥
(মানিকরাম ; ১৯৬০ : পৃ : ৩৬৬)

কানড়ার পিতা হরিপাল এ প্রস্তাব শুনে পাত্রের বয়স, চেহারা না দেখে প্রস্তাবটি কীভাবে বিবেচনায় নিবেন তা ভাবতে থাকেন। রাজা অন্দরমহলে গিয়ে এ ব্যাপারে রানীর মতামত জানতে চাইলে তিনি রাজাকে অনুরোধ করেন কানড়ার সাথে কথা না বলে বিয়ের ব্যাপারে কাউকে কথা না দিতে। রানীর কথা মতো কানড়ার পিতা কানড়ার কাছে বিয়ে সম্পর্কে মতামত জানতে চান। তিনি কানড়াকে বলেন তোমাকে বিয়ে করার জন্য গৌড়ের রাজা তাঁর ভাট ও কুলপুরোহিতকে পাঠিয়েছেন। তোমার জন্য নানা অলঙ্কার এবং নানা

ধনরত্ন পাঠিয়েছেন। গৌড়পতি প্রতাপান্বিত রাজা উৎকল, অঙ্গদ, কোশল, মগধ, বঙ্গ ও বার ভূঁইঞা তাঁর অধিকারভূক্ত রাজ্য। তাঁর ঐশ্বর্যের সীমা নেই। তিনি তোমাকে বিয়ে করতে চান। এখন ভেবে দেখ এ বিয়েতে তোমার মত আছে কি না। মধ্যযুগে বিয়ের পূর্বে কন্যার মত যাচাইয়ের কোনো অবকাশ ছিল না এই প্রথম কানড়ার মাতা-পিতা সিদ্ধান্ত নেন বিয়ের আগে কন্যার মতামত জানার। কানড়ার মাতা-পিতার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁদের ব্যতিক্রমী রুচিবোধ ও মার্জিত সংস্কারের পরিচয় মেলে। পিতার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কানড়া বলেন পিতা আমি দেবী ভগবতীর প্রতি সমর্পিত প্রাণা। আমি তাঁর প্রতি সতত ভক্তিযুক্তা। আমার সমস্ত রীতিনীতি তাঁরই দ্বারা পরিচালিত। তিনি নিজেই আমাকে বলেছেন আমি তোর বিয়ের ব্যবস্থা করব। বিয়ে সম্পর্কে আমার নিজস্ব কোনো মতামত নেই। সরাসরি পিতার প্রস্তাব নাকচ না করে বুদ্ধিমতী কানড়া যেভাবে উল্লিখিত উদ্ধৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন তারমধ্য দিয়ে একদিকে তার পারিবারিক শিক্ষা অন্যদিকে তার বিচক্ষণতার পরিচয় মেলে। পারিবারিক সংকট মোকাবেলায় এ এক অভিনব পদ্ধতি।

কানড়া বীর লাউসেনকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার জন্য ভদ্রকালীর ভজনা করেন। কানড়ার পিতা যখন কিছুতেই গৌড়েশ্বরের সাথে কানড়াকে বিয়েতে রাজি করাতে পারছেন না। তখন তিনি নিজের সর্বনাশের কথা কন্যাকে অবগত করান এবং গৌড়েশ্বরের ভয়ে সবাইকে নিয়ে রাজ্য থেকে পালিয়ে যেতে মনস্থির করেন। কিন্তু কানড়া কিছুতেই গৌড়েশ্বরের ভয়ে পালিয়ে যেতে রাজি নন। ভক্ত কানড়ার ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে অত্যন্ত তুষ্ট হলেন দেবী পার্বতী। তিনি তাঁর দাসী পদ্মার সঙ্গে যুক্তি করে কৈলাসপুরে বিশ্বকর্মা নির্মিত যে লোহার গণ্ডার ছিল তা নিয়ে তৎক্ষণাৎ আকাশ মার্গে শিমুলে হরিপাল রাজকন্যা কানড়ার ঘরে আবির্ভূত হলেন। ভূমিতে লুণ্ঠিতা কানড়াকে স্নেহভরে উঠিয়ে তার গায়ের ধুলো ঝেড়ে, বেঁধে দিলেন তার আলুলায়িত কেশপাশ। মুছিয়ে দিলেন তার চোখ-মুখ। তারপর আশ্বস্ত করে বললেন তুমি কাঁদছ কেন ? জগতে যমও আমার কাছে পরাজিত হয়। আমি একান্তভাবে তোমারই। তুমি আমার কন্যা। কানড়া বলেন আমি চিরদিন তোমার ভজনা করে এসেছি তবু কেন তুমি আমার কপালে বৃদ্ধ পতি জোটালে। দেবী রসিকতা করে বললেন তোমার জন্য যুবক স্বামী কোথায় পাব ? আমি নিজেই তো বুড়ো স্বামী নিয়ে ঘর করি। যাই হোক ধরণী মণ্ডলে ধন্য, ধর্মের সেবক, রূপে, গুণে অনুপম, রসিক যুবক লাউসেনই হবে তোমার পতি যাকে তুমি আরাধনা করে আসছ। এরপর দেবী লোহার গণ্ডারের গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, গৌড়ের রাজার কাছে তুই হবি বজ্রকায় এবং বীর লাউসেনের অসি বা খড়্গের কাছে তুই হবি বধ্য। এরপর দেবীর দাসী দুর্মুখা লোহার গণ্ডারটিকে গাড়ির ওপর চাপিয়ে হরিপাল রাজার অনেক লোকলস্কর সঙ্গে নিয়ে গৌড়পতির শিবিরে গেলেন। দাসী দুর্মুখা অত্যন্ত দাপটের সাথে ঘোষণা করলেন দেবী তার ভক্ত কানড়ার জন্য কৈলাশ থেকে এই গণ্ডারটিকে মর্ত্যলোকে পাঠিয়েছেন। যিনি এই লৌহ নির্মিত গণ্ডারটিকে এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করতে পারবেন সেই পুরুষ হবেন কানড়ার স্বামী। এ শর্ত শুনে এবং লোহার গণ্ডার দেখে বৃদ্ধ রাজা গৌড়পতি চমকে গেলেন। তিনি খড়্গ হাতে তোলার সাহস পাচ্ছিলেন না। সকলের অনুরোধে যখন তিনি খড়্গ ধরলেন তখন তাঁর হাত-পা কাঁপতে থাকে। তবুও তিনি মরিয়া হয়ে বার্ধক্য জর্জরিত দেহে যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল তার সবটুকু প্রয়োগ করে খড়্গ দ্বারা আঘাত করলেন লোহ নির্মিত গণ্ডারের গলায়। কিন্তু সে-আঘাতে গণ্ডারের গলায় একটু দাগও পড়েনি। বরং রাজার হাত থেকে খড়্গটি খসে পড়ল এবং রাজা মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। জনগণের যত্নে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ হন। বিচক্ষণ রাজা খুব সহজেই বুঝে ফেলেন, কানড়ার সাথে অবশ্যই কোনো দৈবশক্তি আছে। পাত্র এ কথা শোনার পর বলেন, একমাত্র লাউসেনই আমাদের মধ্যে দৈববলে বলীয়ান। লাউসেনের কাছে পরোয়ানা পাঠাও। রাজার আদেশ মোতাবেক পাত্র জরুরি এক পত্র লিখে ভাটকে দিয়ে ময়নাগড়ে পাঠিয়ে দিলেন। পত্রপাঠে অবগত লাউসেন কালু ডোম ও তার অনুচরবর্গকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সৈন্ধব অশ্বের পিঠে চড়ে সিমুলিয়ার উদ্দেশে রওনা হন। প্রথমে তিনি শিমুলিয়ার সন্নিকটে গৌড়পতির শিবিরে উপস্থিত হলেন। লাউসেনকে দেখার পর হর্ষধ্বনিতে উত্তাল হলো গৌড়রাজের শিবির। রাজা সেনকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। লাউসেনও ভক্তি ভরে রাজার পায়ের ধুলো নিলেন। সেনের ভক্তিতে সকলেই খুশি হলেন। গৌড়পতি লাউসেনকে গণ্ডার কাটার

অনুরোধ করে বলেন যদি তুমি গণ্ডারটি দ্বিখণ্ডিত করতে পার তাহলেই আমি হরিপাল কন্যাকে বিয়ে করতে পারি। পাত্র জোর করে আমার হাতে সূতা পরিয়ে দিয়েছেন সূতা হাতে নিয়ে বিয়ে না করে কী করে রাজ্যে ফিরে যায়। সব শুনে লাউসেন রাজাকে আশ্বস্ত করে বললেন আমি উপলক্ষ্য মাত্র, পাণ্ডব সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এ কাজ করবেন। সদাশয় লাউসেনের প্রকৃতি সৎগুণে ভরা। রাজার আদেশে লাউসেন তাঁর অভয়া প্রদত্ত দৈব অসি দিয়ে লোহার গণ্ডার কাটার জন্য প্রস্তুত হলেন। কানড়ার দাসী ধুমসী দেবী ভবানীর ধ্যান করতে থাকেন। দাসীর তপস্যায় মা ভবানী সন্তুষ্ট হয়ে লাউসেনের অসিতে ভর করেন। একাগ্র চিত্তে ধর্মের পদ স্মরণ করে লাউসেন খড়্গ দিয়ে একচোটে গণ্ডারকে দুখণ্ড করে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কানড়ার দাসী তার প্রতিনিধি হিসেবে সোনার থালায় রাখা বরমাল্য লাউসেনের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন আজ থেকে তুমি কানড়ার পতি হলে। এ প্রসঙ্গে কিছু পৌরাণিক প্রসঙ্গও উত্থাপিত হলো—

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর শুন্যাচ ভারত।
... ...
অর্জুন বিন্ধিল লক্ষ্য অচ্যুতের বোলে।
দ্রৌপদীর বিবাহ বিভাগ যথাকালে॥
তেমনি লোহার গণ্ডার নিয়ম আমার।
আমি দিব লাউসেনে বিবাহ তোমার॥
(মানিকরাম : ১৯৬০ ; পৃ : ৩৮১)

সিদ্ধ হলো কানড়ার তপস্যা। তারপর দাসী রসিকতা করে বললেন তোমার কপাল ভালো বলেই কানড়ার মতো মেয়ের পতি হতে পারলে। গুণবতী কানড়ার রূপের সীমা নেই যেন সাক্ষাৎ কনকপ্রতিমা। তোমরা খুব সুখে থাকবে। আমি বাসর ঘরে তোমাদের সেবা করবো।

এসব শোনার পর পাত্র মহামদ লাউসেনকে নানাভাবে অপমান করতে থাকেন কিন্তু সৎ গুণাবলম্বী লাউসেন নীরবে সব অপমান সহ্য করলেন। তবে লাউসেনের পরম ভক্ত কালু ডোম প্রভুর এই অপমান সহ্য করতে না পেরে রাগে গরগর করতে লাগলেন। কালু ডোম যখন পাত্রকে লক্ষ্য করে ধনুকে তীর যোজনা করে তখন লাউসেন ইশারায় কালুকে নিরস্ত করেন। গৌড়পতি পাত্রকে এ সব ঝামেলা হতে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরার জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু কুচক্রী পাত্র রাজাকে বললেন ওদের দর্প চুর্ণ না করে বিনা যুদ্ধে দেশে ফিরে যাব না। আমাদের নয় লক্ষ সেনা নিয়ে আমরা শিমুলা আক্রমণ করবো। কানড়ার দর্পচূর্ণ করে তাকে আপনার পায়ের কাছে ফেলবো। গৌড়পতি এ কথায় কোনো সায় দিলেন না। পাত্র লাউসেনকে বাসরিয়ার গড়ে পাঠান হরিপালকে আক্রমণের জন্য। সাথে গেল কালু ডোম।

কানড়ার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে কানড়া চিন্তায় পড়লেন। তিনি দেবী ভবানীর আরাধনা করতে থাকেন। দেবী ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে মর্ত্যে এসে কানড়াকে অভয় দিলেন। শুরু হলো দেবতা ও মানুষের যুদ্ধ। গৌড়পতির লক্ষ লক্ষ সেনা এ যুদ্ধে নিহত হলো। অবশেষে গৌড়পতি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন।

যুদ্ধ শেষে কানড়ার জীবনে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। কুমারী বয়স থেকে কানড়া যাকে পতি হিসেবে তপস্যা করে এসেছেন সেই লাউসেনের সাথে কানড়ার প্রথম সাক্ষাৎ। কানড়া ও লাউসেন পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়েই পরস্পরের রূপে মুগ্ধ হলেন। শুভক্ষণে শুভদৃষ্টি হলো দু'জনের। কানড়া খুব খোলা মেলা ভাবেই তার মনের কথা লাউসেনের কাছে ব্যক্ত করেন। উমা যেমন মহেশ্বরকে স্বামী রূপে পাবার জন্য কুমারী বয়সে তপস্যা করতেন, আমিও তেমনি তোমাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করে তপস্যা করে এসেছি। আমি তোমার বণিতা তুমি আমার প্রাণনাথ। এ কথা শোনার পর লাউসেন কানে আঙুল দিয়ে বলেন এ কথা শোনাও পাপ। গৌড়রাজ অধিবাস করে হাতে সূতা পরেছিলেন। অধিবাস মানে অর্ধেক বিয়ে সম্পন্ন হওয়া। সূতরাং তাকেই তোমার বিয়ে করা উচিত। তুমি মনে মনে আমাকে পতি হিসেবে কামনা করলেও আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না। কারণ এতে অধর্ম তো হবেই সেই সাথে সারা দেশে আমার অপযশ

হবে। কানড়া কিছুটা ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন আমি কেন গৌড়রাজকে বিয়ে করতে যাব ? আমি তো তাকে কোনো প্রতিশ্রুতি বা বাগদান করিনি। কোনো ব্যক্তি যদি আমার মতামতকে অগ্রাহ্য করে অসংযত এবং অসংগত কামনায় বশীভূত হয়ে অধিবাস করে হাতে সূতা বেঁধে নিজ ইচ্ছায় আমাকে বিয়ে করতে আসে তাহলে কি আমি দায়ী ? নারীরা মনে মনে যে ব্যক্তিকে পতি হিসেবে কামনা করে সেই তার প্রকৃত পতি। সে নারী যদি অন্য কোনো ব্যক্তিকে পতি রূপে ভজনা করে তাহলে সে অবশ্যই দ্বিচারিণী। সেটাই হবে চরম অধর্ম। এর মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের সমাজপটে এক স্পষ্টভাষিণী অধিকার সচেতন নারীর পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া কানড়া আরও বলেন আমার বিয়েতে আমি একটি শর্তারোপ করেছিলাম, যে ব্যক্তি দেবী ভবানী কর্তৃক প্রেরিত লোহার গণ্ডারকে এক চোটে দ্বিখণ্ডিত করতে পারবে তার গলায় আমি বরমাল্য পরাব। কিন্তু গৌড়রাজ চেষ্টা করেও সেটা পারেননি। তুমি সেই গণ্ডারকে দ্বিখণ্ডিত করেছ, আর আমার দাসী আমার প্রেরিত বরমাল্য তোমার গলায় পরিয়ে দিয়েছে। প্রত্যুত্তরে লাউসেন বলেন এ সব কথা আমি শুনতে চাই না। আমি গৌড়রাজের আজ্ঞাবহ তাঁর আদেশ মতো আমি তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে তাঁর সাথে তোমার বিয়ে দেব। লাউসেনের এ বাক্য শেষ হতে না হতেই কানড়া তার ঘোড়ার পিঠে উঠে এক রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করলেন। তার কটিদেশে ছিল খাপে ঢাকা তরবারি এবং হাতে ছিল ধনুক। কানড়া ধনুকে তীর যোজনা করে বললেন দেখি কে আমায় জোর করে ধরে নিয়ে যায়? কানড়ার এই রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখে মা ভবানী মর্ত্যে নেমে এসে কানড়ার হাত ও ঘোড়ার লাগাম ধরলেন এবং বললেন যার জন্য তুমি সেই বাল্যকাল থেকে তপস্যা করে আসছ তার সাথে এ রকম ব্যবহার করতে আছে ? মা ভবানী লাউসেনকে বললেন তুমি কানড়ার এবং কানড়া তোমার। আমি আজই তোমার হাতে আমার কন্যাকে সম্প্রদান করবো। যেই কথা সেই কাজ ঐ দিনই দেবী ভবানী লাউসেনের সাথে কানড়াকে বিয়ে দিলেন। বিয়েতে ভবানীপতি শঙ্করও উপস্থিত ছিলেন আর নারদ ছিলেন পুরোহিত হিসেবে। বিয়ে সমাপ্ত হওয়ার পর দেবী লাউসেনকে বললেন কানড়া আমার কিঙ্করী শুধু নয় বড় সাধের কন্যাও বটে। তুমি ওকে যত্নে রাখবে এবং ভুল ত্রুটি ক্ষমা করবে।

দেবী পার্বতী লাউসেনকে যৌতুক এবং নারদকে পৌরহিত্যের জন্য দক্ষিণা দিলেন। দেবীরাও যে জামাইকে যৌতুক প্রদান করেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে। দেবী প্রদত্ত দক্ষিণা নারদ লাউসেনকে যৌতুক হিসেবে দান করলেন। সমস্ত কাজ শেষে দেবী যখন শঙ্করসহ কৈলাসে গমনের জন্য উদ্যত হলেন তখন কানড়া দেবীর চরণ ধরে কাতর কণ্ঠে বললেন হে দেবী এই আনন্দক্ষণেও কেন আমার মনে আনন্দ নেই। আমার মাতা-পিতা, ভাই কোথায় আছে আমি জানি না। আনন্দঘন এই সুখের দিনে বিষাদে মগ্ন হয়ে আছে আমার মন। বাংলার মেয়েরা শুধু স্বামীকে নিয়ে সুখে জীবন যাপন করতে পারেন না পরিবারের অন্যান্যজনকেও (পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলকে) পাশে চাই। কানড়ার এ বিষাদের মধ্যে তারই আভাস পাওয়া যায়। কানড়ার এই বিষাদের কথা শুনে দেবী ভবানী তৎক্ষণাৎ কানড়ার মাতা-পিতা ও ভাইকে শিমুলা নিয়ে এলেন। এরপর দেবী কৈলাসে গমন করেন।

স্বয়ং দেবী ভবানী ও দেবাদিদেব শঙ্করের উপস্থিতিতে কানড়ার বিবাহকার্য সমাপ্ত হয়েছে দেখে রাজা হরিপাল আনন্দে বাকশূন্য। লাউসেনের মতো জামাই প্রাপ্তি সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। লাউসেনকে জামাই হিসেবে পেয়ে রাজা আনন্দ সাগরে ভাসতে থাকেন। এই আনন্দের মাঝে রাজা-রানীর হৃদয় বিষাদে ভরপূর কেননা এতদিনের স্নেহে লালিত কন্যাকে বিদায় জানানো সত্যই বড় কষ্টের এবং হৃদয়বিদারক। লাউসেন যখন ময়নাগড়ে প্রত্যাবর্তনের জন্য রাজার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন তখন শিমুলারাজ্যে বিষাদের ছাপ পড়ে। অন্তঃপুরে কান্নার রোল পড়ে। কানড়ার মাসি, পিসি, মামী, জেঠি, খুড়ি সবাই কাঁদতে থাকেন। কানড়া নিজেই তাদের প্রবোধ দিতে থাকেন—

মহীপাল হরিপালে মাগেন বিদায়॥
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন কলরোল।
… … …

কানড়ার মাসি পিসি মামী খুড়ি জেঠি।
কেমনে পাঠাব বলে মায়ামোহ কাটি॥
কানড়া প্রবোধ করে কেঁদ নাই আর।
এইরূপ যোগমায়া জগৎ সংসার॥
বিদায় করিল রাজা রাজব্যবহারে।
চপলে চাপিলা সেন অম্বির পাখরে॥
(মানিকরাম ; ১৯৬০ : পৃ. : ৪০৬)

উদ্ধৃতাংশে কানড়ার বাস্তববোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কন্যা সন্তানকে পিতৃগৃহে ধরে রাখা দায়, তাদের জন্মই হয় অন্যের গৃহ আলো করার জন্য। প্রত্যেক মেয়েকে একটি নির্দিষ্ট বয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শ্বশুর গৃহে চলে যেতে হয় এবং পরকে আপন করে সেখানে শান্তির নীড় তৈরি করতে হয় এটিই জগত সংসারের নিয়ম। প্রকারন্তরে কবি কানড়ার উক্তির মধ্য দিয়ে এ তথ্যটিই প্রকাশ করেছেন। সংগত কারণেই লাউসেন নববধূকে নিয়ে ময়নাগড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। গৃহে প্রবেশ করতেই বধূর রূপ দেখে প্রীত হলেন রাজা কর্ণসেন ও রানী রঞ্জাবতী। দীর্ঘদিন লাউসেনের অদর্শনে ময়নাগড়ের প্রজাদের মধ্যে যে শোক বিরাজ করেছিল সেই শোক তারা তাদের প্রিয় রাজা লাউসেনকে দেখে ভুলে গেলেন। চারদিকে মঙ্গলধ্বনি বাজতে লাগল।

এরই মধ্যে লাউসেন ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহে অমৃত বৃষ্টির দ্বারা গৌড়ে নিহত সকল রাজসৈন্যকে জীবিত করে গৌড়রাজের হাতে সমর্পণ করেন। গৌড়রাজের সাথে সাক্ষাৎ শেষে লাউসেন নিজের রাজধানী ময়নাগড়ে ফিরে যান এবং মাতা-পিতা, ভ্রাতা ও চারবধূকে নিয়ে একান্নবর্তী পরিবারে সুখে সংসার করতে থাকেন। তাঁর চারজন স্ত্রীর মধ্যে কোনো মনান্তর নেই। সম্পর্কে সতিন হলেও তারা চার বোনের মতোই আনন্দের সাথে একত্র জীবন-যাপন করেন। সপত্নীদয়ের এ সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক জগতে বিরল। লাউসেন স্ত্রী ও মাতা-পিতাকে নিয়ে একান্নবর্তী পরিবারে সুখে গার্হস্থ্যধর্ম পালনের সাথে সাথে ন্যায় ধর্মানুসারে রাজকার্যও যথারীতি পালন করতে থাকেন। কিন্তু পাত্র মহামদের কুচক্রে লাউসেনের সুখ স্থায়ী হলো না। পাত্রের প্ররোচনায় গৌড়রাজ ঢেকুরগড়ের রাজা ইছাই ঘোষকে পরাজিত করে ঢেকুরগড়কে গৌড়রাজের অধীনে আনার আদেশ দিয়ে লাউসেনকে পরোয়ানা প্রেরণ করেন। লাউসেনকে দিয়ে গৌড়পতি ঢেকুরগড় জয় করতে চান শুনে রাজা কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী দুশ্চিন্তায় পড়েন কারণ ইছাই ঘোষের সাথে যুদ্ধ করেই কর্ণসেন তাঁর জীবনের সব কিছু হারিয়েছিলেন। অতীতের সেই দুঃখ সন্তাপ রাজা আজও ভুলতে পারেননি। তার সংসারটা ভেঙে চুরমার হয়েছিল। জীবন হয়েছিল দুর্বিষহ সেখান থেকে গৌড়েশ্বরের সহায়তায় কর্ণসেন আজকের এ পর্যায়ে পৌঁছেছেন। ইছাই ঘোষ কর্ণসেনের কাছে এক মহাআতঙ্ক তাই পুত্রকে ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে রাজা-রাণীর মন সাড়া দিচ্ছে না। না জানি পুত্রের প্রাণ সংশয় হয়। কিন্তু লাউসেন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মাতা-পিতার কাছে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। মাকে লাউসেন দেবী সম্বোধন করে বলেন-হে দেবী, তুমি প্রসন্ন হয়ে আমাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দাও। মাকে অভয় দিয়ে আরও বলেন তুমি যার জননী এবং রায় কর্ণসেন যার জনক তার আবার ভয় কিসের ? ধর্ম যার সহায় তার জয় অবশ্যম্ভাবী।

রাজমাতা রঞ্জাবতী পুত্রকে কাছে বসিয়ে খাওয়ানোর জন্য নিজেই রান্না করার প্রস্তুতি নিলেন। তিনি প্রথমেই স্নান করে শুচিশুদ্ধ হয়ে প্রধানা বধূ কলিঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে একে একে নানা ব্যঞ্জন রান্না করলেন। তারপর যত কিছু সুখাদ্য ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন যা লাউসেন খেতে ভালবাসেন রঞ্জাবতী তা সবই প্রস্তুত করে পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখলেন। উত্তম আপ্যায়নের জন্য ছিল পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ও নানা রকমের পিঠা পায়েস। রানী একসঙ্গে তিনজনকে খাবার দিলেন। দুই পাশে দুই পুত্র এবং মাঝখানে রাজা কর্ণসেন। রানী পরম তৃপ্তির সাথে দুই পুত্র ও স্বামীকে ভোজন করান। এরপর পুত্রবধূদের ডেকে পাঠান। তোমরা নিশ্চয় অবগত আছ যে, পূর্বে ইছাই ঘোষের সাথে যুদ্ধে তোমার চার ভাসুর অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন। এবং তাদের স্ত্রীগণ স্বামীর চিতায় অনুমৃতা হয়েছেন। তোমরা অত্যন্ত রূপসী এবং অল্পবয়স্কা তোমরা তোমাদের

রূপসৌন্দর্য ও ছলাকলার দ্বারা স্বামীকে বশীভূত করো। ভুবনমোহিনী মদনমঞ্জরী রূপে মৃদুহাস্যে ও মদির কটাক্ষে তার মন চুরি করো। শাশুড়ি মার এ কথা শুনে যুব রানী কলিঙ্গা ছাড়া সকলেই লজ্জায় মাথা হেঁট করে কৌতুকের হাসি হাসতে লাগলেন। তাদের হাসি দেখে প্রধানা বধূ কলিঙ্গাকুমারী সতিনদের উদ্দেশে বলেন, বিপদকালে এত হাসি-ঠাট্টা করতে নেই। গুরুজনদের কথা শুনতে হয়। স্বামী সঙ্গে এখন আমরা সময় কাটাব আনন্দ করব কিন্তু বিধাতা আমাদের সেই সুখ থেকে বঞ্চিত করলেন। এখন যে ভাবেই হোক স্বামীকে আমাদের ধরে রাখতেই হবে। জেনে রাখবে পতি বিনে নারীর জীবন এঁটোপাতের মতই বৃথা।

কলিঙ্গার সাজ-সজ্জার মধ্য দিয়ে তৎকালে উচ্চবিত্ত সমাজে ব্যবহৃত নারীর বসন-ভূষণ বর্ণনার পাশাপাশি মাতৃভ্রুণ জাগরণের বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। সাধারণত ঋতুস্নাতের চতুর্থ দিবসে নারীরা সন্তান-সম্ভবা হতে পারে সে তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে। চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে নারীর গর্ভসঞ্চার, গর্ভকালীন সময়ে নারীর পরিচর্যা আচার-পার্বণ পালনের ইঙ্গিত প্রদত্ত হয়েছে। ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার সৃজন ও গার্হস্থ্যজীবনের সুখ-শান্তি ও আনন্দ উপভোগের জন্য সন্তান উৎপাদন অত্যাবশ্যক। সন্তান পারিবারিক হৃদ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। লাউসেন পুত্র সন্তানের জনক হলে পুরো ময়নাগড়বাসী আনন্দোৎসব করতে থাকেন। গরু, বস্ত্র ও অলঙ্কারসহ মূল্যবান দ্রব্য দান করা হয়। কিন্তু দুভাগ্যবশত লাউসেন ঐ সময় ময়নাগড়ে অনুপস্থিত ছিলেন। মহামদ পাত্রের প্ররোচনায় লাউসেন পশ্চিমে সূর্যোদয়ের জন্য হাকন্দ নামক স্থানে ধর্মঠাকুরের তপস্যায়রত ছিলেন। লাউসেন যখন হাকন্দে তপস্যায় ব্যস্ত ছিলেন তখন মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করেন। মহামদের সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে লাউসেনের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কালু ডোম পুত্র-পত্নীসহ নিহত হন। লাউসেনের প্রথমা স্ত্রী কলিঙ্গাও এ যুদ্ধে প্রাণ হারান। সবশেষে বীরাঙ্গনা কানড়ার হাতে মহামদ পরাজিত হয়ে পালাতে বাধ্য হন। বাঙালি নারীরা দেশকে, সংসারকে সর্বোপরি নিজের স্বামীকে সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে নিতে পারে লখ্যা, কলিঙ্গা ও কানড়া তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

তপস্যা শেষে লাউসেন দেশে ফিরে সব কিছু অবগত হলেন। সব শুনে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ধর্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলেন। ভক্তের ডাকে ধর্মঠাকুর সবাইকে জীবিত করলেন। রাজ্যে আবার পূর্বের ন্যায় শান্তি ফিরে এল। মর্ত্যে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারিত হলো। মহামদ তার মহাপাপের শাস্তি স্বরূপ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়। দয়াপরবশত লাউসেন ধর্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করায় মহামদ এ কঠিন ব্যাধি থেকে মুক্তি পান। পৃথিবীতে লাউসেন ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করে পরম গৌরবে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। এরপর পুত্র চিত্রসেন রাজ্য পরিচালনার উপযুক্ত হলে তাঁর হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে স্বর্গারোহণ করেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে মূলত লাউসেনের বীরত্বগাথা ও তার কেরামতি কাহিনি বর্ণিত হলেও পারিবারিক রসাবেদনের চিত্র নেহাত কম নয়। মানব জীবনের নানা সংগতি-অসংগতি, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব- কলহের চিত্রও অত্যন্ত স্পষ্ট। মহামদের স্নেহের ভগ্নি রঞ্জাকে বয়স্ক অপাত্রে সমর্পণ করায় মহামদের দুঃখ-কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক কিন্তু তাই বলে প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া এবং ভাগ্নের অনিষ্ট সাধনে মত্ত হওয়া মহামদের উচিত হয়নি। মামা ও ভাগ্নের যে বিরল সম্পর্ক কাব্যটিতে প্রতিফলিত হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যেও বিরল। তবে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া পারিবারিক সংকট অন্যান্য কাব্যের তুলনায় *ধর্মমঙ্গলে* কম। বরং লাউসেনের চার স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহমত মিশ্রিত যে সুন্দর সম্পর্ক বিদ্যমান তা বাংলা সাহিত্যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ *ধর্মমঙ্গলে* বিদ্যমান। এ কাব্যের মূল বিষয় ক্ষমার মধ্য দিয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

তথ্যনির্দেশ

অরবিন্দ পোদ্দার (অক্টোবর, ২০০৫) *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-০৯

আশুতোষ ভট্টাচার্য	(সেপ্টেম্বর ২০০৯) *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, দ্বাদশ সংস্করণ, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কো. প্রা. লি. কলিকাতা-৭৩
আহমদ শরীফ	(নভেম্বর, ২০০৮) *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (১ম খণ্ড), পুনর্মুদ্রণ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা
পীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত	ঘনরাম চক্রবর্তীর (১৯৬২) *ধর্মমঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	(১৯৯৯) *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*, নব সংস্করণ, ওরিয়েন্ট বুক কো. লি. সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-০৭
শ্রীবিজিতকুমার দত্ত ও	মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত (১৯৬০) *ধর্মমঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
শ্রীসুনন্দা দত্ত সম্পাদিত	(আগস্ট, ২০০৯) *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ,
শ্রীভূদেব চৌধুরী	কলিকাতা-৭৩
শ্রীমন্তকুমার জানা	(জানুয়ারি, ২০১১) *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, ওরিয়েন্টাল বুক কো. প্রা. লি. ৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-০৯
সুকুমার সেন	(১৯৭৫) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী), আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা-০৯
স্মৃতিকণা চক্রবর্তী	(জুন, ২০১১) *মঙ্গলকাব্য পুচ্ছগ্রাহিতা ও মৌলিকতা*, জে. এন. ঘোষ অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা-৭৩

৬. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের : *অন্নদামঙ্গল*

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা-দেশের যুগমানস ও কালের পরিসীমা ছিল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ; তবে সমাজের অন্তর্জীবনে যেমন ছিল নানা পরিবর্তনের ছোঁয়া তেমনি ছিল ভাঙা গড়ার ইতিহাস ও অন্নাভাবের হাহাকার। মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবরবি ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অস্তমিত হয়। সেই সাথে সুবে বাংলার ভাগ্যে একদিকে ঘটতে থাকে রাষ্ট্রশক্তির নানা উত্থান-পতনের ঘটনা, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার নানা বিশৃঙ্খলা, বণিক সভ্যতার অভ্যুদয় ও বর্হিশক্তির প্রাদুর্ভাব বাংলার শান্তি, সমৃদ্ধি ও সহাবস্থানের ভিতকে দুর্বল করে দেয়। বিশেষ করে বর্গীর আক্রমণ বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিভূমিকে যেমন ধূলিসাৎ করে অন্যদিকে তেমনি ইংরেজদের আগমনের পথকেও করেছিল প্রশস্ত। আওরঙ্গজেবের মৃত্যু এবং এরপর ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশির আম্রকাননে সিরাজউদৌল্লার পতন এই অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে বাংলার সার্বিক জীবনপ্রবাহ এক অন্তঃসারশূন্য জীবনচর্যায় পর্যবসিত হয়। সুবেদার, রাজ-কর্মচারী ও বিদেশি বণিকের অন্তহীন শোষণ, বর্গীর অবাধ লুণ্ঠন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ বাংলার অর্থনীতিকে যেমন ভেঙে চুরমার করেছিল অন্যদিকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে করেছিল বিধ্বস্ত। একদিকে ধনতান্ত্রিক আভিজাত্যের অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বর এবং অন্যদিকে নিরন্ন জনসাধারণের হা অন্ন হা অন্ন রব অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয়ী জীবনধারারই পরিচায়ক। এ অবক্ষয়ী জীবনচর্যার ফলস্বরূপ দেখা দেয় নৈতিক অবক্ষয় ও উচ্ছৃঙ্খলতা, চারিত্রিক দীনতা ও অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বরের প্রাবল্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলটি ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলী খাঁর সুবেদার নিযুক্তির মধ্যদিয়ে শুরু এবং ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশি-প্রান্তরে সিরাজউদৌল্লার পতনের মধ্যদিয়ে শেষ হয়। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-১৭৬০) নবাবি আমলের কবি। মুর্শিদাবাদের এ নবাবি আমল যেমন নানাবিধ উত্থান-পতনের স্মৃতি-বিজড়িত, কবির জীবনও তেমনি নানা উত্থান-পতন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর এ ক্রান্তিকালকে আহমদ শরীফ বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে—'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, ক্ষমতার লড়াই, শাসন শৈথিল্য, বিদেশীবেনের অবাধ বাণিজ্য, দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তির অবক্ষয় প্রভৃতির ফলে বাঙলাদেশে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য প্রায় চরম অবস্থায় পৌঁছেছিল। ফলে জনজীবনে ও জীবিকায় ছিল অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তার অভাব। প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও আর্থিক অনিশ্চয়তা ব্যক্তির সামাজিক জীবন করে বিপন্ন ও বিশৃঙ্খল, এবং সাংস্কৃতিক জীবন করে বন্ধ্যা ও বিকৃত। ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব বাঙলার এমনি দুর্দিনে-দুর্যোগকালে'। (আহমদ শরীফ; ২০০৮: পৃ.৪১৪)

কবি ভারতচন্দ্র ধনীর সন্তান ছিলেন। কবির জন্মের পর তাঁর পিতা বর্ধমানের রাজমাতার কোপদৃষ্টিতে পড়ে সর্বস্ব হারান। কবির আশ্রয় হয় মাতুলালয়ে। সেখান থেকে তিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গুরুজনদের চাপে তিনি ফারসি ভাষাও আয়ত্ত করেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপাদৃষ্টি লাভের পূর্ব পর্যন্ত কবির জীবন নানা উত্থান-পতনে জর্জরিত ছিল এবং তিনি বাউণ্ডেলে জীবন যাপন করতেন। অল্প বয়সে গুরুজনদের অমতে ভারতচন্দ্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এক সময় কবি নিজেও বর্ধমান মহারাজের রোষদৃষ্টিতে পতিত হয়ে কারাবরণ করেন। পরে নিজ বুদ্ধির কৌশলে কারাগার থেকে পলায়ন করে সন্ন্যাসী হয়ে পুরী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে কাটিয়ে নিজ দেশে ফিরে পুনরায় গার্হস্থ্যজীবনে থিতু হন। জীবিকার তাগিদে চন্দননগরের সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের শরণাপন্ন হন এবং এই ইন্দ্রনারায়ণের সহায়তায়ই তিনি কৃষ্ণনগরের রাজসভায় স্থান পেয়েছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দয়াপরবশত ভারতচন্দ্রকে মূলাজোড় গ্রামটি দান করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবি এ মূলাজোড় গ্রামেই অতিবাহিত করেন। আবাল্য দুঃখের আগুনে পোড়খাওয়া ভারতচন্দ্র দেশ-কাল-সমাজ, রাজ্য ও রাজার হাব-ভাব, হাল-হকিকত ভালো জানতেন ও বুঝতেন। কারণ জানার ও বোঝার দুর্বার শক্তি ছিল তাঁর। শাসকের মন-মেজাজ ও শাসন-নীতি-পদ্ধতির ওপর জনগণের জান-মাল, সুখ-শান্তি-স্বস্তি ও সম্পদ নির্ভর করে তাও কবির জানা ছিল। মুর্শিদাবাদের সমকালীন রাজনীতির ও শাসকের পরিচয় দিয়েই তিনি তাঁর কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন—

কটকে মুরসীদকুলি খাঁ নবাব ছিল।
তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল॥
কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥
নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে।
মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফাটকে॥
... ...
স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি॥
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১২-১৪)

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের সমকালের বাংলা দেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে সাহিত্যের সমালোচকগণ এক দুর্দশাপীড়িত ভঙ্গুর অর্থনীতির চিত্র-সম্বলিত একটি দেশকে উপস্থাপন করেন। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন মধ্যযুগের সামন্ত সমাজে সাধারণ মানুষের জীবনের চরম দুর্দশা ও লাঞ্ছনা কোনো এক বিশেষ সময়ের নয় বরং সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী তা বিস্তৃত ছিল। এর সাথে ছিল বর্গীর আক্রমণ। এ ছাড়া ব্রিটিশদের হাতে দেশ পরাধীন হলে অত্যাচার আরও ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়। বাংলা দেশের যে অঞ্চলে ভারতচন্দ্র জীবন অতিবাহিত করতেন সেই অঞ্চল বার বার বর্গীদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল। কবি ব্যক্তিজীবনেও বহুবার বর্ধমান মহারাজার কোপদৃষ্টিতে পড়ে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছিলেন। একদিকে কবির ব্যক্তিজীবনের লাঞ্ছনা অন্যদিকে বর্গীদের আক্রমণে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বাঙালির জীবনকে যেভাবে জর্জরিত করেছিল তার প্রভাব কিছুটা হলেও তাঁর রচিত *অন্নদামঙ্গলে* প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজে শিষ্টের ও দুষ্টের ভারসাম্য যদি অতিমাত্রায় নষ্ট হয়, তাহলেই দুষ্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ঘটে বিপত্তি। প্রশাসনিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেখা বিপর্যয় ও বিকৃতি। ভারতচন্দ্রের কালে যে সেটাই ঘটেছিল তা কবি নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। অর্থাভাব ও অন্নাভাবে চারদিক জর্জরিত তাই কবির ইষ্টদেবতা গৌরী, কালী, দুর্গা বা চণ্ডী নন—অন্নদায়িনী অন্নদা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে সামন্তসমাজের অবক্ষয় ছিল বেশ স্পষ্ট। নবাব, আমীর-উমরাহ ও বড় বড় রাজা-মহারাজাদের বাহ্যিক আড়ম্বর ও জাঁকজমকের অন্তরালে স্থূলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা প্রবল হয়েছিল। বিদেশের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে সামন্ত প্রভুদের আর্থনীতিক আধিপত্য ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছিল। এছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য স্থাপিত হওয়ায় দেশে প্রচুর রৌপ্য আমদানি হতে থাকে। ফলে দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা ও শিল্প উৎপাদন-ভিত্তিক একটি অর্থনীতি গড়ে ওঠে। এর ফলে ধনিক শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে যারা আধুনিক প্রাক-ধনতান্ত্রিক শ্রেণির আদিপুরুষ। এই ধনিক শ্রেণির সাথে মধ্যযুগীয় সামন্তশ্রেণির দ্বন্দ্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতেই লক্ষ করা যায়। সামন্ত জমিদার ও রাজা-মহারাজারা অনেক ক্ষেত্রেই এই উঠতি ধনিক শ্রেণির ওপর অর্থনৈতিকভাবে অনেকাংশেই নির্ভরশীল ছিলেন। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের নবাব পর্যন্ত সেকালের ধনিক শ্রেণির মধ্যমণি শেঠ পরিবারের ওপর অর্থের জন্য নির্ভরশীল

ছিলেন। অর্থাৎ ক্ষমতার উৎস বাহুবল থেকে অর্থবলে স্থানান্তরিত হয়। এ পথে ধনতান্ত্রিক সমাজের পত্তন হয়ত সম্ভব হতো, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে দেশ পরাধীন হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে একটি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের শোষণে পরিণত হয়। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের জীবনাবসান হওয়ায় কবিকে এ নৈরাশ্যবোধ প্রত্যক্ষ করতে হয়নি। মধ্যযুগ গবেষক আহমদ শরীফ বাংলার এ সংকট কালকে উপস্থাপন করেছেন এভাবে—'নওয়াবের ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বৈতশাসনে ও শোষণে এবং শাসন শৈথিল্যে ও কোম্পানী-চাকুরের নির্লক্ষ্য নির্বিচার লুঠতরাজের ফলেই বাঙালীর আর্থিক সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন আরো নীতিভ্রষ্ট, পীড়নদুষ্ট, দুর্নীতিবহুল ও পাপ-পঙ্কিল হয়ে উঠেছিল, গ্রামীণ পণ্য-বিনিময়ভিত্তিক আর্থিক জীবন মুদ্রাবিনিময় বহুল হয়ে ওঠায় এবং জীবন যাত্রায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পণ্য প্রভাবে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ায় নতুন-পুরাতনের অসঙ্গত অসমঞ্জস টানা-পোড়েনে বাঙালীর গার্হস্থ্য ও আর্থিকজীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল'। (আহমদ শরীফ ; ২০০৮ : পৃ ৪১৫)

বস্তুতপক্ষে ভারতচন্দ্রই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে মানবধর্মের বিজয়কেতন উত্তোলন করেন। ধর্মচেতনার গণ্ডি থেকে বাংলা সাহিত্যকে তিনি মর্ত্যচেতনার ধূলি-ধূসর রাজপথে নামিয়ে আনেন। তাঁর কাব্যের প্রত্যক্ষ রস মানব রস। তিনিই প্রথম সন্ধান করেছেন ধর্মের খোলসের অন্তরালে রক্ত-মাংসে গড়া প্রাণের স্পন্দন। বিশিষ্ট সমালোচক মদনমোহন গোস্বামীর মন্তব্য—'কাব্যের মধ্যে, জীবনের মধ্যে মানুষের প্রতিষ্ঠা আধুনিক যুগের অন্যতম লক্ষণ। অষ্টাদশ শতকের প্রতিনিধি ভারতচন্দ্রের রচনায় অবাস্তব স্বপ্নালুতার পরিবর্তে দুঃখ-সুখে ভরা বাস্তবজীবনই ধরা পড়িয়াছিল। স্বর্গের দেবদেবীও তাই কবির হাতে মানুষের ব্যবহার পাইয়াছে'। (সনাতন ; ২০১০ : পৃ : ৮৫)। স্বর্গের দেবদেবীগণ স্বর্গলোক ও স্বর্গের মহিমা, বিলাস পরিত্যাগ করে ভারতবর্ষের নর-নারীতে পরিণত হয়েছেন। শিব, অন্নপূর্ণা ও ব্যাসদেব এঁদের চরিত্রে পৌরাণিক ঐতিহ্য রক্ষিত হয়নি। শিব ও অন্নপূর্ণা ঐ যুগের মানবিক রূপ ধারণ করেছেন। বৃদ্ধ বর শিবকে দেখে মেনকার বিলাপ ও তাঁর চরিত্র নিয়ে গৌরীর ঠাট্টা প্রমাণ করে দেবদেবীর চরিত্রে স্বর্গের অলৌকিক মহিমা নেই। হরগৌরীর বিবাহে শাশুড়ি ও এয়োগণের বিড়ম্বনায় কৌতুকরসের স্বতঃস্ফূর্ত স্ফুরণ ঘটেছে। ভারতচন্দ্র স্বর্গের তথা কৈলাসের দেবদেবীর সংসার বর্ণনায় স্বামী, স্ত্রী ও পুত্রদের যে জীবন চিত্র অঙ্কন করেছেন তা একেবারে বাঙালির মাটির ঘরের দরিদ্র ও অতি সাধারণ মানুষ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে।

অন্নদামঙ্গল (রচনাকাল ১৭৫২-১৭৫৩) কাব্যটি ভারতচন্দ্র তিনটি খণ্ডে রচনা করেন। প্রথম খণ্ডে অন্নদা মাহাত্ম্য, দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যাসুন্দর কাহিনি এবং তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান। বিদ্যাসুন্দর কাহিনিটি ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে মূল কাহিনির সাথে সংযোজন করেন। দেবী অন্নদা তথা অন্নপূর্ণা মর্ত্যলোকে নিজের পূজা প্রচারের সংকল্প করে সখী জয়া-বিজয়াকে এর উপায় জিজ্ঞাসা করেন। তখন জয়া-বিজয়া বললেন, কুবের তোমার পূজা করতে চাইলে কুবেরের অনুচর বসুন্ধরের ওপর ফুল তোলার ভার দেবে। পুষ্পবনে রমণীসম্ভোগহেতু বসুন্ধরকে অভিশাপ দিয়ে মনুষ্য জন্ম লাভ করার জন্য মর্ত্যলোকে পাঠাবে। মর্ত্যলোকে বসুন্ধর হরিহোড় নামে জন্ম গ্রহণ করবে। তুমি হরিহোড়কে প্রচুর ধন প্রাপ্তির বর দেবে, তাহলেই হরিহোড় মর্ত্যে তোমার পূজা প্রচার করবে। এরপর তুমি কুবের পুত্র নলকুবেরকে অভিশাপ দিয়ে ভবানন্দ মজুমদার নামে মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করাবে। হরিহোড় গৃহে অহরাত্র চার সতিনের কন্দল থাকায় অভিমান করে তুমি হরিহোড়ের গৃহ ত্যাগ করে ভবানন্দের গৃহে যাবে। ভবানন্দের দ্বারাই মর্ত্যে তোমামর পূজা প্রচারিত হবে।

ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে প্রথমেই সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা, দিকবন্দনা, পঞ্চদেবতা ও লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং দেবীঅন্নপূর্ণার বন্দনা, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবির আত্মপরিচয় দান এবং মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তির বিবরণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ, অতঃপর গমন, পিতৃগৃহে স্বামী নিন্দা শুনে সতীর দেহত্যাগ, দেহত্যাগের সংবাদ শ্রবণে শিবের রণমূর্তি ধারণ এবং দক্ষালয়ে গমন, দক্ষযজ্ঞনাশ, প্রসূতির স্তবে দক্ষের পুনর্জীবন প্রাপ্তি, একান্ন পীঠের বর্ণনা, শিব বিবাহের মন্ত্রণা, নারদ কর্তৃক শিবের বিবাহ সম্বন্ধ, শিবের ধ্যানভঙ্গ ও মদনভস্ম,

রতি-বিলাপ, রতির প্রতি দৈববাণী, শিবের হিমালয় যাত্রা, শিবের বিবাহ, শিবনিন্দা, শিবের মোহনমূর্তি ধারণ, সিদ্ধি-ভক্ষণ, হর-গৌরীর কথোপকথন, হর-গৌরীররূপ, কৈলাস বর্ণন, হর-গৌরীর বিবাদ সূচনা, হর-গৌরীর কন্দল, শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ, সখী জয়ার উপদেশ, দেবীর অন্নপূর্ণা মূর্তিধারণ, শিবের ভিক্ষায় যাত্রা, ভিক্ষুক শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ, শিবকে অন্নদান, পুরী নির্মাণ, দেবগণের নিমন্ত্রণ, শিবের পঞ্চতপ, ব্রহ্মাদি দেবগণের তপ, অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান, শিবের অন্নদাপূজা, অন্নদার বরদান, ব্যাসের পরিচয়, বেদব্যাস কর্তৃক শিবপূজা নিষেধ, শিব-স্তোত্র, ঋষিগণের কাশীযাত্রা, হরি-সংকীর্তন, ব্যাসের ভিক্ষাবারণ, কাশীবাসী লোকের প্রতি বেদব্যাসের শাপ, অন্নদার মোহিনী রূপ, শিব ও ব্যাসের কথোপকথন, ব্যাসের দ্বিতীয় কাশী নির্মাণের উদ্যোগ, গঙ্গা কর্তৃক ব্যাসের অভ্যর্থনা, ব্যাস কৃত গঙ্গার তিরস্কার, গঙ্গা কৃত ব্যাসের তিরস্কার, বিশ্বকর্মার উদ্দেশে ব্যাসের অভ্যর্থনা, ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন, ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য, অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসকে ছলনা, ব্যাসের প্রতি দৈববাণী, কুবেরের অনুচর বসুন্ধরের প্রতি অন্নদার শাপ, বসুন্ধরের বিনয়, অন্নদার শাপে বসুন্ধরের মর্ত্যলোকে জন্ম, হরিহোড় বৃত্তান্ত, হরিহোড়ের প্রতি অন্নদার দয়া, হরিহোড়ের বরদান, কুবেরের অন্যতম পুত্র নলকুবেরের প্রতি অন্নদার শাপ, মর্ত্যলোকে নলকুবেরের ভবানন্দ মজুমদার রূপে জন্ম, অন্নদার ভবানন্দ মজুমদারের ভবনে যাত্রা প্রভৃতি বিষয় *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের প্রথম খণ্ডে অন্নদামাহাত্ম্য অংশে বর্ণিত হয়েছে। 'ভারতচন্দ্র ছিলেন সমাজ ও যুগসচেতন কবি। যুগধর্মের জন্যই কবি ভারতচন্দ্রের সময়ে দেশের জনসাধারণ দেব-দেবীর মাহাত্ম্য ও কৃপার প্রতি ততটা আস্থাভাজন ছিলেন না। ভারতচন্দ্র পুরাতনকে নামমাত্র গ্রহণ করে নতুনত্বের উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। *অন্নদামঙ্গলে* পুরাতন ও নতুনযুগ পরস্পর মুখ দেখাদেখি করেছে। সর্বোপরি তিনি পুরাতন পাত্রে নতুন রস পরিবেশন করেছেন'। (শ্রীমন্ত ; ২০১১ : পৃ : ৪৮৬)। যুগসচেতন কবি ভারতচন্দ্র *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে যুগের বৈশিষ্ট্যকে কাব্যের অঙ্গে ভূষণ করে তুলেছেন। তিনি নিজেও ছিলেন সমাজ ও ইতিহাস টানাপোড়েনের অন্যতম সাক্ষী। ব্যক্তিগত জীবনে কবিকে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে বলেই কবি অত্যন্ত সচেতনভাবে তাঁর কাব্যে সমকালীন ইতিহাস ও সমাজ প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। সমকালীন সমাজ ও ইতিহাস চেতনা তাঁর কাব্যে এনেছে ভিন্ন মাত্রা। অষ্টাদশ শতাব্দীর এক যুগসন্ধিক্ষণে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব।

অন্নদামাহাত্ম্য

'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'—রবীন্দ্রনাথের এ কাব্য-বাণী স্মরণে রেখে বলা যায় ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* দেবতা ও মানুষকে একত্র করেছে। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের চরিত্রগুলি সাধারণ মানুষ এবং কাব্যের দেব-দেবীগণও নামে দেবতা স্বভাবে মানুষ। দেবতাদের জীবন চিত্রেও মৃত্তিকাসংলগ্ন সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার রস সিঞ্চিত হয়েছে। আধুনিক যুগে যে নবজাগরণ সূচিত হয়েছিল তার মূল সুর হচ্ছে মানবিকতা কিন্তু মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে মানবিকতার কিছুটা অভাব পরিলক্ষিত হয়। কারণ মধ্যযুগের সমাজে ও সাহিত্যে দেবতার প্রাধান্য ছিল ভক্তি রসের। কিন্তু ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে দেবতাকে মানবত্বে উত্তীর্ণ করেছেন, তাই মানুষ ও দেবতা একাকার হয়ে মৃত্তিকাসংলগ্ন হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্য দেবমাহাত্ম্যসূচক হলেও ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের দেবদেবীরা প্রকৃতরূপেই মানবিক। মানুষ রূপেই মানুষ, মানুষের আড়ালে অন্য কোনো সত্তা নয়। অন্নদামাহাত্ম্যে অন্নদার রূপ বর্ণনা এবং বিদ্যাসুন্দর কাহিনিতে বিদ্যার রূপ বর্ণনায় তেমন কোনো প্রভেদ নেই। ভারতচন্দ্রের শিব ও অন্নপূর্ণা ঐ যুগের মানুষের বেশ ধারণ করেছেন। দেবতার প্রতি ভক্তি নিবেদন, জনগণের মঙ্গলের উদ্দেশে পবিত্র মঙ্গলসংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে দণ্ড ধরে ভারতচন্দ্র রাজা ও রাজানুচরবর্গের বিভিন্ন প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। ফলে তিনি যে-সব দেবচরিত্র অঙ্কন করেছেন, তাতে মনুষ্য চরিত্রের প্রতিভাস সুস্পষ্ট। বৃদ্ধ বর দেখে মেনকার বিলাপ কিংবা ঘটক নারদকে গালাগালি করায় মেনকার চরিত্রে দেবত্বের মহিমা আদৌও পরিলক্ষিত হয়নি। শিবের চরিত্র নিয়ে গৌরীর ঠাট্টা, বরবেশী বুড়ো শিবের উলঙ্গ মূর্তি দেখে

নারীগণের আলোড়ন, অন্নদার জরতীবেশ প্রভৃতি চিত্রে অলৌকিক স্বর্গধামের কোনো মহিমা নেই। আসলে ভারতচন্দ্রের কাব্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেবলীলার পটভূমিকায় নরজগতের কাহিনি উপস্থাপন। তিনি নিজ অন্তরের ভক্তির তাগিদে কাব্য রচনা করেননি বরং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে কাব্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। এজন্য *অন্নদামঙ্গলে* দেবতা অপেক্ষা মানুষের কথাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। শিব-অন্নপূর্ণা-নারদ-ব্যাসদেব-গঙ্গা সকলকেই তিনি মানবিক গুণে ভূষিত করেছেন। শিবের হিমালয় যাত্রা, শিববিবাহ, হরগৌরীর কন্দল, শিবনিন্দা, হরগৌরীর কথোপকথন, হরগৌরীর বিবাদ সূচনা, শিবের ভিক্ষা যাত্রা, ব্যাসের শিবনিন্দা, ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি, ব্যাসকৃত গঙ্গার তিরস্কার-এ-সব অংশে দেবতাদের আচরণ পুরোপুরি মানবিক। কারণ তাদের আচার-আচরণে মানবিক দোষ ত্রুটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের আরাধ্যা দেবী অন্নদা ; তিনি আলোচ্য আখ্যানের প্রধানা চরিত্রও বটে। অন্নদা মাহাত্ম্যে অন্নদার দুটি ভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়— সতী ও পার্বতী। এছাড়া গঙ্গা মূর্তির চকিত রূপও প্রত্যক্ষ করা যায়। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের অন্নদা মাহাত্ম্য অংশে প্রজাপতি দক্ষ এবং শিবের মধ্যে এক ঠাণ্ডা লড়াই বিদ্যমান। রূপে গুণে অনন্যা সকলের আদরের স্নেহধন্যা কন্যা সতীকে দক্ষ চাল-চুলোহীন, ছন্নছাড়া শিবের হাতে সমর্পণ করতে চাননি। অবশেষে ঘটক নারদ মুনির মধ্যস্থতায় একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সতীকে দক্ষ শিবের হাতে সমর্পণ করেন। কারণে অকারণে তিনি শিবকে অপমান করতে ছাড়েন না। এমনকি নিজ গৃহে যজ্ঞানুষ্ঠানে সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করলেও বাদ দেন দেবাদিদেব মহাদেবকে। 'পিতৃগৃহে নিমন্ত্রণ কিবা' বাঙালি পরিবারতন্ত্রে বিশ্বাসী সতী এ নীতিকে বিশ্বাস করে পিতৃগৃহে যাবার আশা ব্যক্ত করেন—

আরম্ভিয়া দেবযাগ নিমন্ত্রিল দেবভাগ
নিমন্ত্রণ না কৈল-শঙ্করে।
যাইতে দক্ষের বাস সতীর হৈল আশ
ভারত কহিছে জোড় করে॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ২১)

নারী চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তারা পিতৃগৃহে স্বামী এবং স্বামীগৃহে পিতৃনিন্দা সহ্য করতে পারেন না বরং একজনের কাছে অন্যজনের প্রশংসা শুনে হন আনন্দিত এবং গর্বিত। দেবী অন্নদার আচরণেও এ চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। বিনা নিমন্ত্রণে শিব সতীকে পিতৃগৃহে আয়োজিত যজ্ঞানুষ্ঠানে যেতে নিষেধ করায় সতীর স্বগতোক্তি — 'বাপঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা'। শিব যতই সতীকে পিতৃগৃহে যেতে বারণ করেন, ততই সতী রেগে যান, শেষ পর্যন্ত 'ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ'। এই সতীই আবার পিতৃগৃহে পতিনিন্দা শুনে ক্ষোভে অপমানে দেহত্যাগ করেন—

যে মুখে পামর নিন্দিলে শঙ্কর
সে মুখ হবে ছাগল।
এতেক কহিয়া শরীর ছাড়িয়া
উত্তরিলা হিমাচল॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩০)

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বাংলার সংস্কৃতিতেও অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়। জনমানসের চিন্তাধারায় সুস্থতা ও স্বচ্ছতার অভাব, রুচিবিকৃতির মলিনতা, চারিত্রিক অধোগতি জীবনের সর্বস্তরে সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। পুরাতন সংস্কৃতি বিলোপ হতে চলেছে কিন্তু নতুন সংস্কৃতির কোনো স্থিরক্ষেত্র তখনও অনুপস্থিত। এমনই এক সন্ধিক্ষণে ভারতচন্দ্রের অবস্থান। কবি নিজেও ছিলেন সমকালীন সমাজ ও ইতিহাসের দোলাচলের অন্যতম সাক্ষী। ব্যক্তিগত জীবনে কবিকে অনেক দুঃখ, কষ্ট ও দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। সংগত কারণেই তিনি তাঁর কাব্যে সচেতনভাবেই সমাজ ও ইতিহাস প্রসঙ্গকে উপস্থাপন করেছেন।

মঙ্গলকাব্যের ভোক্তা যেহেতু সাধারণ মানুষ সেহেতু কাব্যে সমকালীন সমাজজীবনের নিখুঁত চিত্র রূপায়ণে কবিগণ কুণ্ঠাবোধ করেননি। ভারতচন্দ্রও এ নীতির ব্যতিক্রম নন। তিনি তৎকালীন সমাজব্যবস্থার নানা অসংগতি তুলে ধরার জন্য ব্যঙ্গ রসের যে চাবুক হাতে নিয়েছিলেন তা সত্যই যেমন যুগোপযোগী তেমনি প্রশংসনীয়। শিব-পার্বতীর সংসার জীবনের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে কবি সমগ্র ভারতবর্ষের দরিদ্র বাঙালির নিত্য অভাব অনটনের চিত্র তুলে ধরেছেন। রাজদুহিতা হয়েও পার্বতী স্বামীর সংসারে দারিদ্র্যের চাপে নিয়ত নিষ্পেষিতা। অভাবের চাপ ছাড়াও স্বামীর নিত্যগঞ্জনা সহ্য করতে হয় রাজদুহিতা পার্বতীকে। এ গঞ্জনার জন্য পার্বতী নিজের ভাগ্য ও পিতা-মাতাকে দোষারোপ করেন—

মা বাপ পাষাণ-হিয়া ভিক্ষুকেরে দিল বিয়া
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৭৩)

পার্বতীর এ উক্তি নিতান্তভাবেই একজন সাধারণ গ্রাম্য গৃহবধূর। অভাব অনটনে জর্জরিত, রোগ-শোকে ক্ষীণ এক গৃহবধূর ক্ষোভ ও হতাশা কবি পার্বতী চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

বিবাহকার্য সম্পাদনের জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে একজন ঘটকের উপস্থিতি প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে শিব-পার্বতীর বিবাহ সংঘটনে নারদের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। নারদ উমাকে দেখে হিমালয়কে জিজ্ঞাসা করেন কন্যাকে কার সঙ্গে বিয়ে দেবেন এ সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন কিনা ? সঙ্গে সঙ্গে নারদ সতীর বিয়ের পাত্রও স্থির করে ফেলেন—

নারদ কহেন শুন শুন হিমালয়।
… … …
বিবাহ কাহারে দিবা ভাবিয়াছ কিবা।
শিব পতি ইহার ইহার নাম শিবা॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৪৩)

নারদের মুখে পার্বতীর বিয়ের যোগ্য পাত্রের পরিচয় পেয়ে হিমালয় অত্যন্ত খুশি এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। পার্বতীর মতো কন্যাকে গর্ভে ধারণ করায় মেনকাও ধন্য। হিমালয় ও মেনকা পার্বতীর জনক-জননী হিসেবে গর্বিত। ঘটকের মাধ্যমে বিবাহ সংঘটনের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের আদর্শ নিহিত। বৈদিক নিয়ম মেনে বিবাহ সংঘটনে তিথি নক্ষত্র ও শুভ দিন-ক্ষণ দেখার প্রচলন সমাজে সব সময় বিদ্যমান। নারদ মুনি শিব-পার্বতীর বিবাহ অনুষ্ঠানের শুভ দিন-ক্ষণ দেখে লগ্নপত্র প্রস্তুত করেন। নারদ কৈলাসে ফিরে দেখেন শিব ধ্যানমগ্ন, তিনি শিবের ধ্যান ভঙ্গের জন্য প্রেমের দেবতা মদনকে স্মরণ করেন—

মন্ত্রনা করিয়া মদনে ডাকিয়া
সুরপতি দিলা পান।
সম্মোহন বাণ করিয়া সন্ধান
শিবের ভাঙ্গহ ধ্যান॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৪৪)

ইন্দ্রের আজ্ঞায় রতিপতি মদন হাতে পুষ্পশর নিয়ে দেবাদিদেব শিবের ধ্যান ভাঙার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন—

ভূমে হাঁটু পাড়ি দিল বাণ ছাড়ি
অনলে পতঙ্গ হয়ে॥
… … …
কামশরে ত্রস্ত নারী লাগি ব্যস্ত
নেহালেন চারি পাশে।
… … …
দেখি পুষ্পশরে ক্রোধ হৈল হরে
অটল অচল টলে॥

(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৪৫)

ক্রুদ্ধ শিব তাঁর তৃতীয় নেত্রের অগ্নিতে মদনকে ভস্মীভূত করেন। মদন ভস্মের পর শিব কামবাণে মোহিত। শিবের এ অবস্থাকে দেবেশকুমার আচার্য্য ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে–'দেবাদিদেব মহাদেবের মহিমা ভারতচন্দ্রের হাতে ধুলিধূসরিত হয়েছে। দেবাদিদেবের তপস্বী মূর্তিটিকে তিনি কামোন্মত্ত বৃদ্ধে রূপান্তরিত করেছেন'। (দেবেশ ; ২০১০: পৃ : ৬৭)। এর মধ্য দিয়ে শিবের চরিত্রে দেবত্বের লেশ মাত্র পরিলক্ষিত হয়নি। কামমত্ত শিবের ভয়ে পলায়নপরা অপ্সরা কিন্নরীদের পশ্চাদ্ধাবন বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক করে কবি উপস্থাপন করেছেন—

কামে মত্ত হর দেখিয়া অপ্সর
কিন্নরী দেবী সকল॥
যায় পলাইয়া পশ্চাত তাড়িয়া
ফিরেন শিব চঞ্চল॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৪৬)

কামশরে দগ্ধ শিবের এহেন দুর্গতি প্রত্যক্ষ করে নারদ মুচকি মুচকি হেসে শিবের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপন করেন। নারদ শিবকে অবগত করেন দক্ষ দুহিতা সতী দক্ষগৃহ ছেড়ে হিমালয়ের গৃহে পার্বতী নামে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন। সতীর পুনর্জন্ম প্রাপ্তির সংবাদে শিব অত্যন্ত প্রীত হন এবং নারদকে আজই বিয়ের আয়োজন করার জন্য অনুরোধ করেন—

শুনি শিব কন ওরে বাছাধন
ঘটক হও তাহার॥
... ...
কহেন শঙ্কর বিলম্ব না কর
আজি চল মোর বাবা॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৪৬)

অন্নদামঙ্গলে শিবের বিয়েকে কেন্দ্র করে সমকালীন রীতি-নীতি ও সামাজিক বিন্যাসের ছবি বেশ স্পষ্ট। বিবাহ আসরে শিবের অবস্থান এবং তাঁর উলঙ্গ অবস্থা দেখে শাশুড়ি মেনকার আচরণ, এয়োগণের পারস্পারিক প্রতিক্রিয়া, নারদের প্রতি মেনকার আক্ষেপে জীবনবাস্তবতা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া গার্হস্থ্যজীবনের একটি অন্যতম প্রধান শর্ত এবং পবিত্রতম দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃত এ বন্ধন থেকে দেবগণও বাদ পড়েননি। জগতের সংহারকর্তারূপে স্বীকৃত শিবের বিয়েতে আনন্দ-উল্লাসের কমতি ছিল না। দেবাদিদেব মহাদেবের বিয়ে। স্বর্গের দেবগণ মিলে পরম উৎসাহে বিয়ের আয়োজন করতে থাকেন। ইন্দ্র সকলকে নিয়ে বরযাত্রী হলেন, অপ্সরা ও কিন্নরদের নৃত্যগীত দেখে মহেশ্বর পুলকিত হন। মহাদেবের বিয়েতে পৌরহিত্য করেন স্বয়ং ব্রহ্মা, বরকর্তা সাজেন নারায়ণ। বর সাজানোর দায়িত্ব পড়ে নারদের। নারদ মহাদেবকে বর সাজে সজ্জিত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে মহাদেব নানা যুক্তি উত্থাপন করে সজ্জার জন্য মুকুট মুক্তা কস্তুরীচন্দন বাদ দিয়ে তাঁর নির্ধারিত বেশ-ভূষা হাড়ের মালা, মুণ্ডমালা, বাঘছাল, সাপ, ছাই মেখে এবং সিদ্ধি-ধুতরা ভক্ষণ করে ভূত-প্রেত সঙ্গে নিয়ে বুড়ো বলদের পিঠে চড়ে শ্বশুর গৃহে উপস্থিত হন—

জটাজুটে চূড়া সাপে বান্ধ খুড়া
মুকুটে কি দিবে শোভা।
... ...
কস্তুরী কেশরে চন্দনে কি করে
ঘন করে মাখ ছাই॥
... ...
ফুলমালা যত শোভা দিবে কত

যে শোভা মুণ্ডের মালে॥
কাপড়ে কি শোভা   জগমনোলোভা
যে শোভা বাঘের ছালে॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৫১)

শিবের এহেন বেশ-ভূষা দেখে বিয়ের মণ্ডপে উপস্থিত জনগণ হতবাক, মুখের ভাষা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন তারা—

যত কন্যাযাত্র   দেখিয়া সুপাত্র
বলে এ কেমন বর।
বরযাত্রগণে   দেখি ভয় মনে
না সরে কারো উত্তর॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৫৩)

বরকে ছাঁদনাতলায় বসানো হলো। সভামাঝে হিমালয় পূর্বদিকে মুখ করে বামপাশে দান সামগ্রী নিয়ে উত্তর দিকে বরের আসন দিয়ে বরকে বরণ করার জন্য নানা শাস্ত্রাচার পাঠ করে জামাইকে বরণ করে নেন। জামাই-এর সাজ-সজ্জা দেখে হিমালয় হতভম্ব। এরপর কন্যার মা এয়োগণকে সঙ্গে নিয়ে ছাঁদনাতলায় স্ত্রী আচার পালন করতে আসেন—

স্ত্রী আচার করিবারে মেনকা আইলা।
…   …   …
এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া।
লইয়া নিছনিডালা হুলাহুলি দিয়া॥
বরের সম্মুখে মাত্র মেনকা আইলা।
…   …   …
এয়োগণ বলে ও মা এ কেমন বর॥
মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৫৪-৫৫)

জামাই-এর এ সাজ দেখে মেনকা দিগ্বিদিক হয়ে নারদকে আঁটকুড়ো বলে গালি দিতে থাকেন। স্বামী গিরিরাজকেও ক্ষোভে ও অভিমানে পাগল ও বুড়ো বলে গালি দেন। পাড়া-পড়শি এয়োগণ বিলাপ করতে থাকেন—'এই গৌরীর বর লো / বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে/ হৈল দিগম্বর লো' আর গৌরীর মা জামাই দর্শনে দুঃখে, কষ্টে 'কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।' মেনকা কন্যার রূপ গুণের সাথে বুড়ো জামাইকে তুলনা করেন। মেয়ে তার সোনার প্রতিমা, দাঁত তার মুক্তো দানার মতো, মুখ চাঁদের মত, উমার শরীরে সুগন্ধি চন্দনের সুবাস, বিচিত্র বসন তার অঙ্গে, গলায় মালতীর মালা, এই সোনার প্রতিমা কন্যার জন্য যে বর নির্বাচন করা হয়েছে তার মাথায় বিকট জটা, বয়সের ভারে দাঁত নড়ে, পাকা দাড়ি-গোঁফে মুখের আকৃতি বিকট আকার ধারণ করেছে। বুড়ো জামাই সারা অঙ্গে মেখেছে ছাই, গলায় হাড়ের মালা এবং পরনে আছে বাঘের ছাল। জামাই সম্বন্ধে মেনকার এ-বিরূপ আচরণ দেখে গৌরী ভয় পান তার শঙ্কা দক্ষগৃহে পতি নিন্দা শুনে তাকে আত্মবির্সজন দিতে হয়েছিল ফলে শিব যে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করেছিলেন এবারও তার পুনরাবৃত্তি না হয়। পার্বতী মনে প্রাণে শিবের গৃহিণী হয়ে গার্হস্থ্যধর্ম পালন করতে চান—

হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই।
তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই॥
কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ।
কৃপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৬০)

দেবীর কৃপাতেই মেনকা দিব্য দৃষ্টির দ্বারা শিবের মাহাত্ম্য অনুভব করলেন এবং শিবের দিকে দৃষ্টি দিতেই তাঁর মোহন মূর্তি প্রত্যক্ষ করেন—

জটাজুট মুকুট দেখিলা ফণিমণি।
বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য পৈতা ফণী॥
ছাই দিব্য চন্দন বদন কোটি চাঁদ।
মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৬০)

শিবের মোহন মূর্তি দেখে মেনকা, উপস্থিত অভ্যাগত এবং এয়োগণ অত্যন্ত আনন্দিত হন। ঋষিগণ বেদমন্ত্র পাঠ করলেন, কিন্নর গাইলেন এবং অপ্সরা নাচলেন। বিদ্যাধরীগণ কৌতুক করতে লাগলেন। বিয়ে সম্পন্ন হলো। মেনকা আনন্দে জামাইকে নিয়ে ঘরে গেলেন। সমস্ত মঙ্গলাচার সেরে উমাপতি উমাকে নিয়ে গেলেন কৈলাসে। বিধি বিষ্ণু আদি সবাই নিজ ধামে ফিরে গেলেন। দীর্ঘদিন মহেশ্বর পার্বতী বিহীন জীবন অতিবাহিত করছেন। ভগবতী আজ কৈলাসে। মহামহোৎসবে সকলে ভগবতীকে বরণ করে নেন। শঙ্খঘণ্টার ধ্বনিতে ত্রিভুবনে জয়জয়াকার— 'নাচিছে নাটক/ গাইছে গায়ক/ রাগ তাল মান লয়॥' (ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৬১) উমাকে পেয়ে মহেশ্বর আনন্দিত। হরগৌরীর কথোপকথন অংশে নিগূঢ় হাস্যরসের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা আনন্দসঞ্চারী এবং মানব রসে সিঞ্চিত—

সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর॥
… … …
অর্দ্ধ অঙ্গ তোমার আমার অর্দ্ধ অঙ্গে।
প্রত্যুত্তরে পার্বতীও রসিকতা করেন–
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়।
… … …
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাদ করে।
তার সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে।
পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৬৬)

নব দম্পতি শিব-পার্বতীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বাঙালি কবি সাধারণ বাঙালি নব দম্পতির জীবন বৈচিত্র্যকে স্মরণ করিয়ে দেন। সমগ্র *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের দেবখণ্ডে হর-পার্বতীর সংসার জীবনের যে চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন তা একান্তভাবেই মানবিক এবং বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। হর-পার্বতীর জীবনচিত্রে হতদরিদ্র বাঙালির নিত্য অভাব অনটনের পরিচয় নিহিত। রাজদুহিতা হওয়া সত্ত্বেও পার্বতী স্বামীর সংসারে দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিয়ত নিষ্পেষিতা। অভাবের সংসারে স্বামীর নিত্যগঞ্জনাও তার ভাগ্যে জোটে। এজন্য পার্বতী নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার ও পিতা-মাতাকে দোষারোপ করেন—'মা বাপ পাষাণ-হিয়া/ ভিক্ষুকেরে দিল বিয়া' (*ভারতচন্দ্র ;* ১৪০৪ : পৃ : ৭৩) পার্বতীর সংসারে অভাব এতটাই প্রকট যে তিনি তাঁর দুটি সন্তানকেও পেট পুরে দুবেলা দুমুঠো ভাত দিতে পারেন না— 'দাবাল ছাবাল দুটি/ অন্ন চাহে ভূমে লুটি/ কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে' (*ভারতচন্দ্র ;* ১৪০৪ : পৃ : ৭৩)। স্বামী দেবাদিদেব মহাদেবের অঙ্গ ক্ষুধায় কাঁপে—'শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি/ ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি' (*ভারতচন্দ্র ;* ১৪০৪ : পৃ : ৭২)। এমতাবস্থায় স্বামী ভিক্ষা করে যা আনেন তার কিছু অংশ কার্তিকের ময়ূর এবং কিছু অংশ গণেশের ইদুরের ভোগে লাগে, বাকি অংশ বাপ-বেটা তিনজন মিলে চেটেপুটে খায়, পার্বতীর জন্য এককণাও পড়ে থাকে না। পার্বতীর এহেন দুর্গতি দেখে কবির স্বগতোক্তি—'হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী/ চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী' (*ভারতচন্দ্র ;* ১৪০৪ : পৃ : ৭৩) কবি কৌতুক-দৃষ্টিতে শিব-পার্বতীর এ

দাম্পত্য কলহ নিরীক্ষণ করলেও এর মধ্যে বাস্তবজীবন রস সিঞ্চিত পারিবারিক-সামাজিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের নিখুঁত চিত্রটি শনাক্ত করা যায়—

আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উহাঁর কপালে সবে হয়েছে নন্দন॥
... ...
অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালি ধন কই॥
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে ।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে।
তখনো যে ধন ছিল এখনো সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ॥
... ...
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৭৪-৭৫)

উল্লিখিত বর্ণনার মধ্যে একদিকে গৃহস্থের দারিদ্র্য অন্যদিকে সুগৃহিণীর লক্ষণও নির্দেশিত হয়েছে। শিব-পার্বতীর সংসার জীবনের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন তা স্বর্গধামের কোনো দেব-দেবীর সংসারের চিত্র নয় এ বর্ণনা একান্তই মানবিক এবং অতি সাধারণ বাঙালি এক দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারের চিত্র। স্বামী, সন্তান এবং সংসারের নিত্য অভাব যন্ত্রণা নিয়ে পার্বতীর যে অনুযোগ তার মধ্যেও এক অতি সাধারণ বাঙালি দরিদ্র গৃহবধূকেই খুঁজে পাওয়া যায়। সামান্য তেল, সিঁদুর ও শাঁখা যা এয়োতির চিহ্ন তাও দেয়ার ক্ষমতা শিবের নেই। অথচ ভাঙ, গাজা খেতে শিব খুব পারদর্শী। সিদ্ধি বাটতে বাটতে পার্বতীর হাতে কড়া পড়েছে। এত কষ্টের পরও পার্বতীর কোনো অভিযোগ নেই, অভিযোগ শুধু অযৌক্তিক বাক্যবাণের। অলক্ষ্মী বলায় পার্বতী মর্মাহত। তবে পার্বতীও ছাড়ার পাত্রী নন, তিনিও এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন উল্লিখিত ছত্রটিতে। সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি সুসম্পর্ক না থাকে, মনের মিল না ঘটে তাহলে সে সংসার বিষময় হয়ে যায়, এ চিরন্তন সত্যও ভারতচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে—

গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রসকথা কহিতে বিরস হয়ে যায়॥
... ...
আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা॥
... ...
স্ত্রী ভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৭২-৭৩)

অভাবের সংসারে শিব-পার্বতীর নিত্য কলহ চলতে থাকে। ‘যেমন দেবা, তেমনি দেবী। শিবের বক্তব্য— স্ত্রীভাগ্যে ধন, অথচ উমাকে বিবাহ করে তাঁর দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে ; পার্বতীর বক্তব্য- পাষাণ মা-বাপ তাঁকে এই ভিক্ষুকের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে কষ্টে ফেলেছেন’। (সনাতন ; ২০১০ : পৃ : ৫৯) পরস্পর দোষারোপের এ চিত্রও মানবিক জীবন রসে সিক্ত। এখানে দেবাদিদেব মহাদেবও সাধারণ মানুষের মতো নিজের দুঃখের কথা জানাতে ভোলেননি এবং সংসারে অভাব অনটনের জন্য পার্বতীকেই দোষারোপ করেছেন। স্ত্রীভাগ্যে ধনপ্রাপ্তি এবং পুরুষ ভাগ্যে পুত্রপ্রাপ্তি এরূপ কুসংস্কারমূলক অযৌক্তিক বাক্যবাণে

গৌরীকে ব্যথিত করতেও শিব কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁর (শিবের) ভাগ্যের জন্যই পার্বতী পুত্র সন্তানের জননী হয়েছেন এমন অযৌক্তিক দাবিও উত্থাপন করেছেন, যা বিজ্ঞান সমর্থিত নয়। হরগৌরীর সংসারের চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে ভারতচন্দ্র একেবারে বাঙালি পরিবারের অভাব অনটনে ভরা ঘরোয়া মানবিক রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যিনি চির শক্তির আধার তাকেই ভিক্ষায় বেরুতে হয়, এমনকি খেদের সঙ্গে বলতে হয় 'নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগায়।/ সাধ করে এক দিন পেট ভরে খায়॥'(*ভারতচন্দ্র ;* ১৪০৪ : পৃ : ৭২) শিবের বয়স হয়েছে, এ বয়সে ক্ষুধা সহ্য করা কঠিন। অনেক বেলা হয়েছে কিন্তু পেটে দানা পানি কিছুই পড়েনি। পিত্তে তাঁর গলা তেতো হয়ে গেছে। এ অবস্থায় শিবের খেদোক্তি—

বেলা হৈল অতিরিক্ত পিত্তে হৈল গলা তিক্ত
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৭৫)

'মৃত্যুঞ্জয় শিব, যিনি কৈলাসপতি, তাঁর সংসারে অভাব নিত্য সঙ্গী। অভাবের তাড়নায় ভিক্ষায় বেরোতে হয় শিবকে'। (দেবেশ ; ২০১০ : পৃ : ৪৬)। এমতাবস্থায় শিব নন্দীকে বৃষ আনার আদেশ দেন। শ্মশানে থাকাকালীন শিব যে বেশে থাকেন সেই বেশ ধারণ করে ভিক্ষায় গমন করতে উদ্যত হন। অভাবের সংসারে হর-গৌরীর যে দ্বন্দ্ব তা তৎকালীন বাঙালি সমাজের পরিচয় বহন করে। নিষ্কর্মা উদাসীন প্রকৃতির স্বামীর ঘরে স্ত্রী অভাবে জর্জরিতা হবে এটাই স্বাভাবিক। তার ওপর বাউণ্ডুলে প্রকৃতির সন্তানাদি। এ সংসার নিয়ে গৌরীই বা কী করবেন। সংসারের সমস্ত ঝক্কি-ঝামেলাতো গৌরীকেই সামলাতে হয়। ফলে শিব গৌরীর বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে লজ্জায়, ক্ষোভে, অভিমানে গৌরীকে স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীন মনে করে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য কৈলাস ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন—

ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস॥
নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহারে উচিত বনবাস॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৭৫-৭৬)

শিব পার্বতীর ওপর রেগে গিয়ে যখন গৃহত্যাগী হতে চাইলেন তখন পার্বতীও বলেন, 'যে ঘরে গৃহস্থ হেন/ সে ঘরে গৃহিণী কেন/ নাহি ঘরে সদা খাই খাই' (*ভারতচন্দ্র ;* ১৪০৪ : পৃ : ৭৬)। যে-গৃহের কর্তা এমন আচরণ করেন সে ঘরে গৃহিণী কীভাবে দিনাতিপাত করবেন ? এমনটি মনে করে গৌরীও এ গৃহে আর থাকবেন না মনস্থির করলেন। তিনি কার্তিক ও গণেশকে নিয়ে পিত্রালয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় সখী জয়া পার্বতীকে যে উপদেশ দিলেন সেখানেও বাঙালির গার্হস্থ্যজীবনের বিড়ম্বনার রূপটিই ফুটে উঠেছে—

জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া॥
যা বলি তা কর নিজ মূর্ত্তি ধর
বস অন্নপূর্ণা হয়ে॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৭৭)

একটি প্রবাদ আছে 'তেল মাথায় ঢালো তেল আর শুকনো মাথায় ভাঙ বেল'। যার আছে তাকে মানুষ আরও দিতে চায় কিন্তু যার নেই তাকে তো দিতে চায় না বরং তাকে দেখলে ভয় পায় না জানি কী দাবি করেন এবং উঠতে বসতে মানসিক আঘাত করতে থাকেন। অতি আপনজনও তাকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করতে থাকেন। মা-বাবা-ভাই-বোনসহ রক্তের সম্পর্কের আপনজনদের কাছ থেকেও ভাগ্যে জোটে অবহেলা, অনাদর, কটূক্তি এবং নিন্দা। প্রথম প্রথম হয়ত করুণার চোখে দেখেন পরক্ষণেই

আগন্তুকের ভাগ্যে জোটে অবহেলা আর লাঞ্ছনা। প্রাপ্তির প্রত্যাশা না থাকায় গৃহের ভৃত্যগণও করুণার দৃষ্টিতে দেখে। তাই ছেলে-মেয়ে নিয়ে বেশি দিন বাবার বাড়িতে থাকলে প্রথম দিকে আদর-যত্ন করলেও পরবর্তীতে তা গরলে পরিণত হয়। সখী জয়ার পরামর্শে এ সত্য উপলব্ধি করে পার্বতী পিতৃগৃহে যাওয়া বিরত রেখে অন্নপূর্ণা মূর্তি ধারণ করে কৈলাসে অবস্থান করতে লাগলেন। এদিকে মহাদেব ভিক্ষা যাত্রায় বের হন কিন্তু যেখানে যেখানে হর অন্নের সন্ধানে যান সেখানেই হা অন্ন হা অন্ন রব শুনতে পান—

ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া॥
যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৮১)

মনে করা হয় কবি ভারতচন্দ্র এ উক্তির মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন বিশেষ করে বর্গীর আক্রমণে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে খাদ্য-বস্ত্র ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব মানুষকে যে কতটা অসহায় করেছিল তার প্রতীক রূপে উপস্থাপন করেছেন। এরপর মহাদেব কোথাও অন্ন না পেয়ে ধন-সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর শরণাপন্ন হলেন, সেখানেও তিনি অন্ন না পেয়ে নিম্নোক্ত প্রবাদপ্রতিম অবিস্মরণীয় উক্তি করেন—

হাভাতে যদ্যপি চায়   সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৮২)

অভাবের কারণে শিব-পার্বতীর সংসারে নিত্য কলহ। শিব ভিক্ষাবৃত্তি করে দিন গুজরান করেন। শিবের পরিবারকে কখনো অনাহারে আবার কখনো অর্ধাহারে থাকতে হয়। শিব-পার্বতীর সংসারের যে দৈন্য-দশা কবি অঙ্কন করেছেন সেই চিত্রের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা দেশের অতি সাধারণ জনগণের জীবন-যাত্রার পরিচয় তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন কবি। অভাব অনটনের এ সংসারে হর-গৌরীর নিত্য কলহ। একদিন কলহ চরমে পর্যায়ে পৌঁছে ফলে শিব ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু ঐদিন শিব কোথাও ভিক্ষা পাননি কারণ অন্নদা সখী জয়ার পরামর্শে সব অন্ন হরণ করে নিজের কাছে রেখেছেন শিবকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। সর্বত্র ব্যর্থ হয়ে শিব ধন-সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর শরণাপন্ন হলেন কিন্তু সেখানেও অন্ন না পেয়ে শিব অত্যন্ত হতাশ হলেন। এ পরিস্থিতিতে শিবের চেতনা জাগানোর জন্য লক্ষ্মী ঈষৎ শ্লেষের আশ্রয় নিয়ে নিম্নোক্ত উক্তি করেন—

অন্নপূর্ণা যার ঘরে   সে কান্দে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৮৩)

পরিশেষে শিব অন্নপূর্ণার দ্বারে সমুপস্থিত হলেন এবং অন্নপূর্ণার হাতের অন্নে তৃপ্ত হলেন—

অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন।
... ...
রত্ন-পানপাত্র দিলা ঈশ্বরী॥
সঘৃত পলান্নে পুরিয়া হাতা।
... ...
রত্ন পানপাত্রে দিলা্ ঈশ্বরী ॥
সযত্নে পলান্নে পুরিয়া হাতা।
... ...
পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টকপর্ব্বত কচমচিয়া॥

চুকু চুকু চুকু চূষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া॥
লিহ লিহ লিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৮৪)

অন্নদার হাতে অন্ন খেয়ে শিবের এত আনন্দ হলো যে তিনি আনন্দে নাচতে লাগলেন। অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচারে শিব নিজেই অন্নদার পূজা করতে মনস্থির করেন। অন্নদা যে শিবেরও পূজ্য শিবের অন্নদা পূজার মধ্য দিয়ে সেই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পেল। শিব স্বর্গের দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে মহা ধুমধামের মধ্য দিয়ে অন্নদা পূজার আয়োজন করেন—

আনন্দে ত্রিনয়ন সহিত দেবগণ
পূজেন নানা আয়োজনে॥
... ...
কিন্নরগণ গায় অপ্সর নাচে তায়
গন্ধর্ব্ব করে নানা রস॥
নারদ আদি যত দেবর্ষি শত শত
চৌদিকে করে বেদ গান॥
... ...
আনন্দে শূলপাণি করিয়া জোড়পাণি
পূজেন চরণকমল॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১০৫)

অতঃপর স্বর্গে পূজা প্রাপ্তির এবার পর মর্ত্যে পূজা প্রচারের মানসে দেবী অন্নপূর্ণা কুবেরের অনুচর বসুন্ধরকে সামান্য দোষে অভিশাপ দিয়ে নরলোকে অতি দরিদ্র বাহাত্তরে কায়স্থ বিষ্ণুহোড়ের পুত্র হরিহোড় রূপে জন্মগ্রহণের ব্যবস্থা করলেন। উদ্দেশ্য 'বড় সুখী করিব পশ্চাতে দিয়া বর'। বিষ্ণুহোড়-পদ্মিনীর সংসারে দারিদ্র্যের সীমা নেই। বিষ্ণুহোড় স্ত্রীকে সামান্য অন্ন-বস্ত্র এমনকি মাথার তেল পর্যন্ত দিতে ব্যর্থ। বিষ্ণুহোড়-পত্নী পদ্মিনী সেই হতভাগ্য নারী যে সমাজের দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম অংশের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে চিত্রিত। হা-অন্ন হাহাকারে বিদীর্ণ সমাজের নিরন্ন মানুষ বিষ্ণুহোড় দম্পতি। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে অন্নহীন মানুষের হাহাকার অনেকবারই ধ্বনিত হয়েছে তবে বিষ্ণুহোড়ের পরিবারের হাহাকার সবকিছুকেই হার মানিয়েছে ; বিশেষ করে পদ্মিনীর জীবনাচার অনেক মানুষকে কাঁদিয়েছে আবার অনেকে উপহাসও করেছে, যার বর্ণনা ভারতচন্দ্র উপস্থাপন করেছেন এভাবে—

হেনকালে এক রামা স্নান করি যায়।
তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়॥
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন ।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন॥
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্ম্ম সার।
গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী তার নাম॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৬১)

বিষ্ণুহোড়ের দৈন্যদশা স্মৃতিকণা চক্রবর্তী ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—'সামাজিক মাৎস্যন্যায়ের এক সূক্ষ্ম চিত্র ভারতচন্দ্রের কালির আচরে এখানে জীবন্ত। সমাজ এই নারীর গায়ে একখানা বস্ত্র জোগাতে পারে না, কিন্তু পদ্মপাতা দিয়ে সেই নারী যখন নিজের লজ্জা উপশমের আয়োজন করে তখন তাকে লোকে পদ্মিনী নামে উপহাস করে'। (স্মৃতিকণা ; ২০১১ : পৃ : ৪১৫)। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে বিষ্ণুহোড় হচ্ছেন সেই অসহায়

হতভাগ্য স্বামী যে স্ত্রীকে সামান্য অন্ন-বস্ত্র দিতে ব্যর্থ। ঘুঁটে বিক্রি করে যে অর্থ পান তা দিয়ে কোনো রকমে সংসার চলে। সম্পন্ন কায়স্থ স্বজাতিরাও এ পরিবারটিকে এড়িয়ে চলে। মূলত অভিমানবশতই সমাজ সংসারের এককোণে এ দরিদ্র পরিবারটি লোকচক্ষুর আড়ালে অতিকষ্টে কোনো রকমে দিনাতিপাত করেন। এই পরিবারে দেবী অন্নপূর্ণা কুবেরের অনুচর বসুন্ধরকে শাপ দিয়ে বিষ্ণুহোড়ের স্ত্রী পদ্মিনীর গর্ভে প্রেরণ করে পদ্মিনীকে পুত্রবতী হওয়ার আশীর্বাদ প্রদান করে বলেন, এ পুত্র হতেই তার সমস্ত দুঃখের অবসান হবে এবং সংসার ধনধান্যে পূর্ণ হবে। দেবী পদ্মিনীর হাতে একটি মায়াময় শ্রীফলের ফুল দিয়ে কানে কানে বললেন—

মায়াময় শ্রীফলের ফুল দিলা হাতে।
বীজরূপে বসুন্ধরে রাখিলা তাহাতে॥
কানে কানে কহিলেন যতনে রাখিবে।
ঋতুস্নান দিনে ইহা বাটিয়া খাইবে॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৬২)

চিকিৎসা শাস্ত্রে টোটকা পদ্ধতি সেই প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান অবধি সমাজে প্রচলিত। বিশেষ করে সন্তান লাভের আশায় বন্ধ্যা নারীরা এ পদ্ধতি গ্রহণ করতেন। ঝাড় ফুক, জলপড়া, গাছের ছাল, পাতা, ফুল-ফল বেটে খাওয়া সাধারণ ঘটনা হিসেবে সমাজে প্রচলিত ছিল, বর্তমানেও আছে। স্বয়ং দেবী অন্নদাও বিষ্ণুহোড়ের স্ত্রী পদ্মনীকে শ্রীফলের ফুল বেটে খাওয়ার জন্য দিয়েছিলেন। ঋতুস্নান দিনে সেই ফুল বেটে খেয়ে পদ্মিনী গর্ভবতী হয়েছিলেন—

দেবীর দয়ায় ঋতু সেই দিনে হয়।
স্নানদিনে সেই ফুল বাটিয়া খাইল॥
পতিসঙ্গে রতিরঙ্গে গর্ভিণী হইল।
এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস॥
গর্ভবেদনায় হৈল পদ্মিনী কাতরা।
দ্রুত হয়ে বসুন্ধর ধরে বসুন্ধরা॥
পুত্র দেখি সুখ রাখিবারে নাহি ঠাঁই।
ধরি তোলে তাপ দেয় হেন জন নাই॥
আপনি দিলেন হুলু নাড়ীচ্ছেদ করি।
দুঃখেতে স্মরিয়া হরি নাম দিলা হরি॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৬৩)

পদ্মিনীর বেদনা পাঠককে অশ্রুসিক্ত করে। তাদের চার কুলে এমন কেউ নেই যে এ দুর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়াবে এবং সমব্যথী হবে। অগত্যা আতুর ঘরের সমস্ত কাজ বিষ্ণুহোড়কেই করতে হয়। তিনি নিজেই হুলুধ্বনি করলেন, সন্তানের নাড়িচ্ছেদ করলেন, মনের দুঃখে হরিকে স্মরণ করে পুত্রের নামও রাখলেন হরি। শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়। অন্নদার দাস হয়ে হরিহোড় নাম নিয়ে বসুন্ধর পৃথিবীতে জন্ম নিলেন। পুত্রের মুখ দেখে বিষ্ণুহোড়ের সুখ এবং পদ্মিনীর আনন্দ আর ধরে না। বিষ্ণুহোড় দম্পতি তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শুভ দিনক্ষণ দেখে সন্তানের ষষ্ঠী পূজা এবং অন্নপ্রাশনও করালেন। হয়ত তাদের এ আয়োজনে কোনো আড়ম্বর ছিল না, ছিল না কোনো লোক সমাগমও তবু আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি মেনে বিষ্ণুহোড় পুত্রের জন্ম পরবর্তী অনুষ্ঠান পালন করেন—

ষষ্ঠীপূজা হৈল সায়   ছয়মাসে অন্ন খায়।
যুবা হৈল নানা দুঃখ পায়ে॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৬৩)

অভাবী সংসারে বিষ্ণুহোড় বনে-বাদাড়ে কাঠকেটে, ঘুঁটে কুড়িয়ে তা বাজারে বিক্রি করে তার সংসার চালান। নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে পুত্র হরিহোড় বড় হলো। হরিহোড়ও পিতার বৃত্তিকে পেশা হিসেবে

নিয়েছেন। একদিন দেবী অন্নদা ছদ্মবেশী বুড়ি হয়ে বাগানে প্রবেশ করে সমস্ত ঘুঁটে কুড়িয়ে সাজিয়ে রাখেন। ঐ দিন হরিহোড় কোনো ঘুঁটে না পেয়ে বুড়ির ঘুঁটে কেড়ে নিবেন এটাকেও তিনি পাপ মনে করেন। নিরুপায় হরিহোড় পিতা-মাতার জন্য অন্ন জোগাড়ের চিন্তায় ব্যাকুল। হত-দরিদ্রের সংসারে বড় হন হরিহোড়। তবে তার পারিবারিক শিক্ষা ও দায়িত্ববোধ তাকে অত্যন্ত মানবিক ও মহান করেছে। বুড়ির ঘুঁটে কেড়ে নেওয়াকে পাপ মনে করার মধ্য দিয়ে হরিহোড়ের চরম সততার প্রকাশ ঘটেছে অপর দিকে মাতা-পিতার জন্য অন্ন সংস্থান করতে না পারার দুঃখ তাকে করেছে বিষণ্ন ও ব্যথিত—

বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে আকুল অন্নের তরে
ঘুঁটে বেচা আমার সম্বল॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৬৪)

হরিপ্রিয়া ছল করে হরিহোড়কে দিয়ে সমস্ত ঘুঁটে বহন করে হরিহোড়ের বাড়িতে অতিথি হিসেবে অবস্থান করেন। হিন্দু শাস্ত্রে অতিথি সেবা গার্হস্থ্যজীবনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃত কারণ অতিথি নারায়ণতুল্য কিন্তু ঘরে যদি অন্ন না থাকে তাহলে অতিথিকে অবাঞ্ছিত মনে হয়—

অতিথি আপনি হবে উপোসী কেমনে রবে
অন্নের সংযোগ মোর নাই॥
... ...
এই দেখ বৃদ্ধ বাপ অন্ন বিনা পান তাপ
বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে॥
গেল চারিপর দিন অন্ন বিনা আমি ক্ষীণ
যমযোগ্য অতিথি এ ঘরে॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৬৫)

ছদ্মবেশী বুড়ি হরিহোড়কে মা ভবানীর নাম স্মরণ করতে বলেন। তিনি আরও বলেন প্রভাতে যে অন্নপূর্ণাকে স্মরণ করেন ইহলোকে তার অন্নের কোনো অভাব হয় না এবং পরলোকে সে মোক্ষ লাভ করেন—

প্রভাতে যে জন অন্নপূর্ণা নাম লয়।
ইহলোকে অন্নে পূর্ণ শেষে মোক্ষ হয়॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৬৬)

এরপর ছদ্মবেশী বুড়ি পদ্মিনীকে মা ভবানীর নাম স্মরণ করে হাঁড়ি পাড়তে বলেন। পদ্মিনী মা ভবানীর নাম স্মরণ করে হাঁড়ি পাড়েন এবং দেখেন হাঁড়ি অন্ন ও ব্যঞ্জনে পরিপূর্ণ তখন পদ্মিনী মায়ের ছলনা বুঝতে পেরে দণ্ডবৎ হয়ে মায়ের চরণে প্রণাম করেন এবং পরিচয় জানতে চান—

হাসিয়া কহেন দেবী শুনরে বাছনি।
না জানে গৃহিণীপনা তোমার জননী॥
... ...
প্রভাতে যে জন অন্নপূর্ণা নাম লয়।
ইহলোকে অন্নে পূর্ণ শেষে মোক্ষ হয়
... ...
অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পাড় গিয়া॥
হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে।
... ...
অন্নপূর্ণা নাম লয়ে প্রণাম করিল।
হাঁড়ী পাড়ি দেখে অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি।
দণ্ডবত প্রণাম বুড়ীরে করে আসি॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৬৬)

দেবীর কৃপা যার ওপর তার আর ভাবনা কী ! তাই হরিহোড়ের হাতে গোময় নির্মিত ঘুঁটেও সোনার ঘুঁটেতে রূপান্তরিত হয়। বুদ্ধিমান হরিহোড় দেবীর এ লীলা বুঝতে পেরে মর্ত্যে দেবীর পূজা প্রচারের পরিবর্তে নিজগৃহে দেবীকে অচলা হয়ে থাকার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন। দেবীও তথাস্তু বলে যতদিন না হরিহোড় স্বয়ং তাকে যেতে বলবেন ততদিন তিনি হরিহোড়ের গৃহে অচলা থাকবেন এ প্রতিশ্রুতি দিলেন।

অন্নদার কৃপায় হরিহোড়ের মাতা পদ্মিনী প্রকৃত পক্ষে পদ্মিনী হলেন, পিতা বিষ্ণুহোড় দিব্য বস্ত্র, অলঙ্কার পরে অভিজাত পরিবারের প্রতিনিধি হয়ে গেলেন। তাদের পর্ণকুটির হলো সুরম্য প্রাসাদ। আর হরিহোড় হলেন কুলীন কায়স্থ। অতঃপর হরিহোড় ঘোষ, বসু এবং মিত্র অর্থাৎ তিন মুখ্য কুলীন বংশের তিন কন্যাকে বিয়ে করে রাজৈশ্বর্যে একান্নবর্তী পরিবারে মাতা-পিতা ও তিন সহধর্মিণীকে নিয়ে তিনি আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন—

ঘোষ বসু মিত্র মুখ্যকুলীনের কন্যা।
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা॥
পিতা মাতা সুত ভ্রাতা কন্যা বধুগণ।
জামাই বেহাই লয়ে ভুঞ্জে নানা ধন॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৭০)

বহুবিবাহ প্রথার অস্তিত্ব সমাজে ছিল এ তারই উদাহরণ। তিনজন স্ত্রীকে নিয়ে হরিহোড় রাজৈশ্বর্যে দিন কাটাতে লাগলেন এবং নিত্য গৃহে অন্নদার পূজা করে দেবীকে গৃহে অচলা করে রাখলেন। এ অবস্থায় দেবী অন্নদা হরিহোড়ের গৃহ কীভাবে ত্যাগ করবেন তার উপায় খুঁজছিলেন। আর ঠিক তখনই পতিশোকে শোকাতুরা বসুন্ধরা দেবী অন্নদার কাছে অনুযোগ করেন—

কান্দিয়া কহিছে মজি পতিশোককূপে।
আমার স্বামীরে লয়ে মানুষ করিয়া।
আনন্দে রাখিলা তারে তিন নারী দিয়া॥
স্বামিহীনা আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া।
এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া॥
… … …
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়॥
শিব যদি যান কভু কুচনীর বাড়ী।
ভাবহ আপনি কত কর তাড়াতাড়ি॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৭০-১৭১)

দেবী অন্নদা এ সুযোগটি কাজে লাগান। তিনি বসুন্ধরাকে নিয়ে বসুন্ধরায় ফিরে এলেন। ঝড়ুদত্তের স্ত্রী ধুমীর গর্ভে জন্ম নিল বসুন্ধরা, সোহাগ করে নাম রাখা হল সোহাগী। ধুমী ছিলেন খুব মুখরা নারী, মেয়ে সোহাগীও তার ব্যতিক্রম নয়। এক বোলে সে দশ বোল বলতে ছাড়ে না। বৃদ্ধকালে হরিহোড় এই সোহাগীকে বিয়ে করলেন—

বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈল তারে॥
শুভ ক্ষণে সোহাগী প্রবেশ কৈল আসি।
লকলকী নামে তার সঙ্গে আইল দাসী॥
বৃদ্ধকালে হরিহোড় যুবতী পাইয়া।
আজ্ঞাবহ সোহাগীর সোহাগ করিয়া॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৭১)

বৃদ্ধকালে হরিহোড়ের এ সিদ্ধান্ত তার জীবনের কাল হলো। বহুবিবাহজনিত অশান্তি তার জীবনকে বিষময় করে তুলেছিল। হরিহোড়ের চতুর্থ পক্ষের ভার্যা তরুণী সোহাগী ছিলেন বড়ই কলহপরায়ণা। এ নারীর আগমনে হরিহোড়ের সংসারের সমস্ত শান্তি কর্পূরের মতো উবে গেল—

চারি সতিনীর সদা বড়ই কন্দল।
ঝড়ু করে ঠকামি সোহাগী দ্বন্দ্ব করে॥
নানা মতে ধন যায় রাজা ছল ধরে॥
কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার।
ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৭২)

এহেন অশান্তির সংসারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবী হরিহোড়ের কন্যার ছদ্মবেশে বিদায় চাইলে পারিবারিক অশান্তির কারণে হরিহোড় ক্রোধভরে কন্যারূপী ছদ্মবেশিনী দেবীকে চলে যেতে বললেন। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেনদেবী। তিনি তড়িৎবেগে সুযোগটি গ্রহণ করে হরিহোড়ের গৃহ ত্যাগ করেন। বস্তুত কবি দেবী অন্নদার হরিহোড়ের গৃহ ত্যাগ করে ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে যাত্রার বিবরণ যুক্ত করে সেকালে অকারণে যখন-তখন ভাগ্য-দেবতা বিমুখ হওয়ার যে ইঙ্গিত দিয়েছেন ইতিহাসেও তার সমর্থন মেলে। দেবী অন্নদা মর্ত্যলোকে পূজা পাওয়ার আশায় সামান্য অপরাধে কুবের পুত্র নলকুবেরকে শাপ দিয়ে মর্ত্যলোকে এক ব্রাহ্মণ বংশের গৃহিণী সীতা ঠাকুরাণীর গর্ভে প্রেরণ করেন—

ঋতুস্নান সে দিন করিয়াছিলা তিনি॥
রতিরসে সেই সতী পতিরে তুষিলা।
নলকুবরেরে দেবী সেই গর্ভে দিলা॥
শুভ ক্ষণে নলকুবরের গর্ভবাস।
এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস॥
ভূমিষ্ঠ হইল নলকুবর স্বচ্ছন্দে।
ভবানন্দ নাম হৈল ভবের আনন্দে॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৭৮)

শুভক্ষণে শুভদিনে নলকুবের ভবানন্দ মজুমদার নাম নিয়ে ভূমিষ্ঠ হলেন। নলকুবেরের দুই স্ত্রী চন্দ্রিণী ও পদ্মিনী মর্ত্যলোকে দুই ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিলেন। মর্ত্যলোকে তাদের নাম হল চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী। পূর্ব-নির্ধারিত ভাগ্যের লিখন অনুযায়ী ভবানন্দ মজুমদার এই দুই কন্যাকে বিয়ে করলেন।

সময়ান্তরে চন্দ্রমুখী গোপাল, গোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণ নামে তিন পুত্র সন্তানের জননী হলেন। কিন্তু পদ্মমুখী চির যুবতী রয়ে গেলেন। 'সুয়াভাবে মজুমদার তাহে অনুগত'। ভবানন্দ মজুমদারের দুই স্ত্রী গ্রহণের মধ্য দিয়ে বহুবিবাহ যে সেই সময় সমাজে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অভিজাত সমাজে সেকালে নব-বিবাহিত কন্যার সাথে পিতা-মাতা দাসী প্রেরণ করতেন। চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখীর পিতা তাদের সাথে সাধী ও মাধী নামে দুজন দাসী প্রেরণ করেন। মাতা-পিতা, দুই স্ত্রী, তিনপুত্র ও দাস-দাসী নিয়ে একান্নবর্তী পরিবারে ভবানন্দ মজুমদারের বাস। বাঙালির একান্নবর্তী গার্হস্থ্যজীবনের পরিচয় ভবানন্দের পারিবারিক জীবন-সূত্রে বিধৃত হয়েছে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে। এ ছাড়া ভবানন্দের পরিবারে দুই সতিনের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, মনোমালিন্য ও ঈর্ষা প্রকাশের মধ্য দিয়ে বহুবিবাহ পীড়িত পরিবারের চিত্রটিও প্রকাশ পেয়েছে।

অন্নপূর্ণা হরিহোড়ের গৃহত্যাগ করে ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে গাঙ্গিনীর তীরে পাটুনিকে নদী পার করে দেওয়ার কথা বললে ঈশ্বরী পাটুনি দেবীর পরিচয় জানতে চাইলেন—

একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৮০)

অপরূপ সুন্দরী কুলবধূকে একা দেখে তাঁকে ওপাড়ে নিয়ে যেতে ঈশ্বরী পাটুনি ভয় পাচ্ছেন। কারণ রক্ষণশীল গৃহের কোনো বধূর সেকালে একা পথে বের হওয়া রীতি ছিল না। তাছাড়া অপরূপ এই সুন্দরী

বধূটি হয়ত সংসারে কোন গোলমাল হওয়ায় রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছেন। তাঁকে সাহায্য করলে তাঁর শ্বশুর বাড়ির লোকের রোষের কারণ হতে হবে। নিরীহ ছা-পোষা পাটুনি এসব উৎপাতে জড়াতে নারাজ। তাছাড়া তিনি নাছোড়বান্দাও কারণ পরিচয় ছাড়া সালঙ্কারাকে তিনি পার করবেন না। অবশেষে সুন্দরী রমণী বলেন—'জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী' অর্থাৎ তিনি জানিয়ে দেন যে, বাঙালি হিন্দু নারীরা স্বামী কিংবা অন্যান্য গুরুজনদের নাম মুখে আনেন না। ফলত, দেবী অন্নদা সুকৌশলে ব্যাজস্তুতির মাধ্যমে স্বামীর পরিচয় প্রদান করেন—

অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তাঁর তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৮০-১৮১)

ঈশ্বরী পাটুনি অতি সহজ সরল সাধারণ মানুষ। অন্নদার আত্মপরিচয়ের গূঢ়ার্থ অনুধাবনের সাধ্য তার নেই। সরল বুদ্ধি দিয়ে যতটুকু বুঝেছেন তা এমন—'যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল'। কুলীন পরিবারের গৃহগত জীবনের বিড়ম্বনা একটি শব্দের ঝলকে অসাধারণ ভাবে বাঙ্ময় করে তুলেছেন কবি। সমবেদনায় কাতর ঈশ্বরী পাটুনি শেষ পর্যন্ত দেবীকে পার করতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন-গুজরান করা মানুষটি তার পারের কড়ি চাইতে ভুল করেননি—

শীঘ্র আসি নায়ে চড় কিবা দিবা বল।
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৮১)

আবার অভিজ্ঞ প্রবীণ অভিভাবকের মতো দেবীকে সাবধান করেছেন—

পাটুনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৮১)

সেঁউতির ওপরে পা রাখার ফলে কাঠের সেঁউতি সোনায় পরিণত হলো। তখন পাটুনি বুঝলেন 'এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়' ফলে অভাবিত ঘটনার সম্মুখীন হয়ে সাধারণ মানুষটি ভীত হয়ে পড়লেন এবং ঐকান্তিক বিশ্বাসের বশে দেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন—

তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৮২)

অন্নদা আত্মপরিচয় দান করে পাটুনিকে বর চাওয়ার আজ্ঞা দিলেন। ঈশ্বরী পাটুনি বাঙালির সেই চিরন্তন চাওয়া তার সন্তান যেন কোনো রকম খেয়ে পরে সুস্থ সবল থাকে এ বর প্রার্থনা করলেন— 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। ঈশ্বরী পাটুনি এ বর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বাঙালির চিরন্তন চাওয়া-পাওয়াকে বলা যায়, চিরায়ত বাণীমূর্তি দান করলেন।' ধনজন, সুরম্য অট্টালিকা, ঐশ্বর্য, আভিজাত্য ও উচ্চক্ষমতা কোনো কিছুতেই তার প্রয়োজন নেই, সাধারণ বাঙালির চিরন্তন কামনা অতি সাধারণ মানুষ ঈশ্বরী পাটুনির হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে প্রবল আর্তির যে সুর ধ্বনিত হয়েছে সেই আর্তি খেটে-খাওয়া মানুষের সেদিনও ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পটভূমিকায় বিশৃঙ্খল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে বৈষম্যের যাঁতাকলে পিষ্ট নিরন্ন, বুভুক্ষু হাজার হাজার কণ্ঠের হাহাকারের সুর যেন এতে অনুরণিত হয়েছে। ঈশ্বরী পাটুনি শুধু বাঙালির নয়, সব দেশের, সব কালের ক্ষুধার্ত মানুষের চিরায়ত প্রতীক'। (সূত্র :সনাতন : ২০১০ ; পৃ : ১৭৬)

ঈশ্বরী পাটুনি পরে ভবানন্দের গৃহে এসে দেবী অন্নপূর্ণার আগমন সংবাদ পৌঁছে দেন। ভবানন্দ মজুমদার দ্রুত বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন মেঝেতে এক মনোহর ঝাঁপি রাখা, আর তখনই দৈববাণী হলো—

পুলকে পুরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা।
হইল আকাশবাণী অন্নদা আইলা॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৮৩)

এভাবেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের গৃহে অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি হয়। এ খণ্ডেও আমরা প্রত্যক্ষ করি বাঙালির গার্হস্থ্যজীবনের অনুপুঙ্খ বিবরণ। এর মধ্য দিয়ে যেমন অলিখিত সামাজিক পারিবারিক ইতিহাস বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তেমনি বিধৃত হয়েছে সমাজ বাস্তবতা ও সমাজচৈতন্য।

বিদ্যাসুন্দর কাহিনি

'কথিত আছে-বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানি রচনা করিয়া ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট তাহা উপস্থিত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র তখন কার্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন, পুথিখানি কবির হাত হইতে লইয়া তাহা না দেখিয়াই পার্শ্বস্থ উপাধানের ওপর হেলান দিয়া রাখিয়া তিনি নিজের কাজ করিতেছিলেন। ভারতচন্দ্র কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ পুথিখানি এইভাবে রাখিবেন না, ইহার রস গড়াইয়া পড়িবে'। শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পুথিখানি খুলিয়া দুই-একটি পাতা পড়িলেন, পড়িয়া হাস্যমুখে কবিকে বলিলেন,' বাস্তবিকই যে রস তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা গড়াইয়া পড়িবারই মত'। (আশুতোষ ; ২০০৯ : পৃ : ৬৬১) মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্যের এ বর্ণনার মধ্যেই রয়েছে বিদ্যাসুন্দর কাহিনির প্রকৃত নিহিতার্থ। সুকুমার সেনের মতে, 'পুরুষ খোঁজে বিদ্যা নারী চায় সুন্দর পতি— এই রূপকের ওপর বিদ্যাসুন্দর কাহিনির ভিত্তি'। (সুকুমার ; ১৯৭৫ : পৃ : ৪২০) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের প্রথম খণ্ডের সমাপ্তিকালে কাহিনির পরবর্তী অংশের বর্ণিতব্য বিষয় উল্লেখ করেছেন এভাবে—

ইতঃপর কহে শুন রায় গুণাকর।
প্রতাপআদিত্য মানসিংহের সমর॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৮৩)

বিদ্রোহী রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমনের জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে মুঘল সেনাপতি রাজা মানসিংহ সসৈন্য বঙ্গদেশে আসেন। মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদারের কাছে বিদ্যাসুন্দর কাহিনি শুনতে চাইলে 'বিবরিয়া মজুমদার বিশেষ কহেন তার'—

বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার॥
… … …
শেষে শুনি সবিশেষ কাঞ্চী নামে আছে দেশ
তাহে রাজা গুণসিন্ধু রায়।
সুন্দর তাহার সুত বড় রূপগুণযুত
বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায়॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ১৮৬)

ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের বিদ্যাসুন্দর কাহিনির বিদ্যা কবির দৃষ্টিতে যিনি রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী সেই বিদ্যা 'শিক্ষা করেছিলেন ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, নাটক, অলঙ্কার, পুরাণ, সংহিতা, স্মৃতি এবং আরো অনেক কিছু। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যে-পুরুষ তাঁর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে জয়ী হবে, তিনি তাঁকে পতিত্বে বরণ করবেন। বলা বাহুল্য, নায়ক সুন্দর ছাড়া আর কেউই তাঁকে পরাজিত করতে পারেননি'।(আনিসুজ্জামান ; ২০০০ : পৃ : ১৫)। এ কথা শুনে কাঞ্চি রাজপুত্র সুন্দর বিদ্যাকে ধ্যান-জ্ঞান ও জপমালা করে বিদ্যা অন্বেষণে বর্ধমানের উদ্দেশে যাত্রা করেন। বর্ধমানরাজ বীরসিংহের পরমা সুন্দরী ও বিদুষী কন্যা বিদ্যা এবং কাঞ্চিরাজ গুণসিন্ধুর পুত্র সুন্দরের গোপন মিলনই এ খণ্ডের মূল উপজীব্য। কাঞ্চিরাজপুত্র সুন্দর বর্ধমানে উপস্থিত হয়ে বর্ধমান রাজগৃহে ফুল সরবরাহকারী মালিনী হীরার সাহায্যে বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গোপনে মিলিত হওয়ার কাহিনি এ খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। মালিনীর মুখে বিদ্যার রূপের কথা শুনে সুন্দর এবং সুন্দরের কথা শুনে বিদ্যা উভয়ে প্রেমাসক্ত হন। রাজপ্রাসাদের নিকট বালাখানার সামনে রথের কাছে প্রথম বিদ্যা ও সুন্দরের চার চোখের মিলন ঘটে। সুন্দরকে দেখে বিদ্যার অবস্থা—

অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ।
... ...
শুভ ক্ষণে দরশন হইল দুজনে॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ২২০)

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বিদ্যাসুন্দর কাহিনিতে রোমান্সের যে আবহ সৃষ্টি করেছেন তাতে তাঁর যুগচেতনা ও আধুনিকতার পরিচয় মেলে—

দুহার নয়নফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে।
দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনের মনে॥
মনে মনে মনমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ২২১)

ভারতচন্দ্রের বিদ্যা বৈরাগিণী নন, সাহিত্যের যুগ সন্ধিক্ষণে জন্ম নেওয়া রক্তে-মাংসে গড়া সাধারণ মানুষ তাই বিয়ের প্রয়োজন তার কাছে যেমন সামাজিক ততটাই মানসিক এবং তার চেয়েও অধিক শারীরিক। আধুনিক মন ও মননের অধিকারী বিদ্যা ও সুন্দর প্রথম সাক্ষাতেই দু-জন দু-জনের অন্তরে এমন ভাবে গৃহীত হলেন যে তাদের পক্ষে ঘরে ফেরা দায়। কিন্তু এ অবস্থায় থাকাও বিপদজনক। ভারতচন্দ্র বিরক্ত হয়ে লিখেছেন—

আঁখি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হৈল কাল।
ভারত জানয়ে প্রেম এমনি জঞ্জাল॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ২২১)

সাহিত্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখা যায়। কবি ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রেও হয়ত তাই ঘটেছে। মাতা-পিতার অমতে কবিও অতি অল্পবয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিদ্যা এবং সুন্দরের পরিপক্ব এ প্রেম দেখে হীরার সৎ পরামর্শ মা-বাবাকে জানিয়ে যথাশীঘ্র শুভকাজটি সম্পর্ণ করার। কিন্তু বিদ্যা এ ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। কারণ মাতা-পিতা যদি রাজি না হন। তার আরও আশঙ্কা সুন্দর যদি রাজপুত্র না হন। প্রেমেমত্ত বিদ্যা এখন শুধু সুন্দরকে চান, কোনো রাজপুত্রকে নয়। কারণ বিদ্যা স্বাধীনা, রুচিশীলা এবং তার চেয়েও বেশি অসম সাহসী এবং একগুয়ে। সুন্দরকে রূপে ও বৈদগ্ধ্যে শ্রেষ্ঠ জেনে মনে মনে তাকে পতিরূপে বরণ করে ফেলেছেন তিনি। এ কথা শুনে হীরা ভয়ে-শঙ্কায় আতকে ওঠেন। গোপন প্রণয়ের কথা কখনও চাপা থাকে না। বাঘিনীর মতো রানী, প্রলয়ঙ্কর রাজা, অনর্থকর কোটাল আর বিদ্যার সঙ্গিনীরাতো আছেই যাদের মুখে এক অন্তরে আর এক। হীরা এও জানেন সত্য প্রকাশ পাবেই। তখন হীরাকে নিয়েও টানা-টানি হবে।

কিন্তু বিদ্যা নাছোড়বান্দা তিনি একাজ করতে রাজিতো ননই বরং দেহ মনে জ্বলতে জ্বলতে পৌরাণিক সমাধান পেয়ে হীরাকে দিয়ে এ বার্তা পাঠাতে সমর্থ হলেন কৃষ্ণ যেভাবে রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন আমাকেও সুন্দর সেভাবে হরণ করে নিন। সেই সময় একজন রাজকন্যার পক্ষে এত কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রত্যয় সত্যিই দুঃসাহসের পরিচয় বহন করে। বোঝা যায় বিদ্যা ও সুন্দরের এ কাহিনিতে, বিশেষত বিদ্যার অতি প্রাগ্রসর ভাবনায় সমকালীন নারী-পুরুষের মানসিকতায় নৈতিকতার ধস নেমেছিল। ইন্দ্রিয়জ কামনা চরিতার্থ করতে গিয়ে তাদের আচরণে যুগের অবক্ষয় গার্হস্থ্যজীবনে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তারও পরিচয় মেলে।

বিদ্যা কর্তৃক এ-রকম আহ্বানে সুন্দর অভিভূত কিন্তু উপায় কী ? সুন্দর চিন্তিত কিন্তু দ্রুতই উপায় পেয়ে গেলেন; কালী যিনি কালের কামিনী হয়ে সুন্দরের চিত্তে আশা সঞ্চার করে রেখেছেন তিনি তাঁকে স্মরণ করলেন। সুন্দর স্তব শুরু করতেই দেবী অবিলম্বে তুষ্ট হয়ে সুড়ঙ্গ কাটবার সিঁদকাটি ফেলে দিলেন, তাম্রপত্রে লেখা সন্ধি মন্ত্রসহ। সুপরিসর মণিদীপ্ত সুড়ঙ্গ দিয়ে সুন্দরের যাত্রা শুরু হয়। সুন্দর চলছেন—'উরু গুরু গুরু হিয়া দুরু দুরু /কাঁপয়ে আবেশ রসে। ক্ষণে আগে যায় ক্ষণে পাছে চায় / অবশ অঙ্গ অলসে॥ ক্ষণেক চমকে ক্ষণেক থমকে / না জানি কি হবে গেলে'। (*ভারতচন্দ্র ;* ১৪০৪ : পৃ : ২২৬) সুন্দরের অপেক্ষায় বিদ্যা অস্থির, মিলনের আগেই বিরহজ্বালায় দগ্ধ অর্থাৎ কামজ্বরে ঝলসিত যুবতীকন্যা। বৈষ্ণব কবির চিত্তে বিরহিণীর যে রূপ অঙ্কিত তার অনুকরণে কবির বর্ণনা—

'চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল/ চন্দন আগুনকণা। কর্পূর তাম্বুল লাগে যেন শূল / গীত নাট ঝনঝনা॥ ফুলের মালায় সূচের জ্বালায় / তনু হৈল জর জর॥ (*ভারতচন্দ্র ;* ১৪০৪ : পৃ : ২২৭)

বৈষ্ণব কবিতায় কৃষ্ণের দর্শন পাওয়ার জন্য রাধার যে আত্মত্যাগ ও মিলিত হওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টা সেই বোধ দেখি বিদ্যার অন্তরে-'এ নীল কাপড় হানিছে কামড় / যেমন কালসাপিনী। শয্যা হৈল শাল সজ্জা হৈল কাল / কেমনে জীবে পাপিনী॥ (*ভারতচন্দ্র ;* ১৪০৪ : পৃ : ২২৭)। প্রেম-বাণে বিদ্ধ বিদ্যাার অন্তর-মন জুড়ে সুন্দরের অবস্থান। বিদ্যার ধ্যান-জ্ঞান সুন্দরকে ঘিরে। বিদ্যার সখীগণ বিদ্যার এ অবস্থা দেখে ব্যথিত, মর্মাহত কিন্তু হঠাৎ ভূমিতল থেকে সুন্দরের আবির্ভাব সকলকে করে উচ্ছ্বসিত ও আশ্চর্যান্বিত—

এ কি দেখি অপরূপ দেখ লো সই।
ভুবনমোহন রূপ॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ২২৮)

অভিসারের এ অভিনব কৌশল পাঠককেও বিভ্রান্ত করে। আকস্মিক এবং অনেকটা অতিভৌতিকভাবে সুড়ঙ্গ দিয়ে হঠাৎ একজন সুদর্শন যুবকের আবির্ভাব বিদ্যা এবং উপস্থিত সকল সখীকে করে হতবাক। বিদ্যার আজ্ঞায় সখী সুলোচন আগন্তুকের পরিচয় জানতে চান। সুন্দরের পরিচয় পাওয়ার পর বিদ্যা ও সুন্দর দু-জন দু-জনের আত্মাকে এক অভিন্ন আত্মায় পরিণত করে গান্ধর্ব শাস্ত্র মতে হরগৌরীকে সাক্ষী মেনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন—

রায় বলে এক আত্মা তবে তুমি আমি।
বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী॥
শুভক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা।
হরগৌরী সাক্ষী করি দিলা বরমালা॥
... ...
বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল মনে আখি ঠার॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ২৩৩-২৩৪)

আধুনিক যুগের উন্মেষ লগ্নে একজন রাজকন্যার এহেন দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত সত্যিই পাঠককে আশ্চর্যান্বিত করে। যদিও তারা গান্ধর্বশাস্ত্র মতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তবে নিয়ম কানুন পালনে কোনো ব্যত্যয়

ঘটেনি। এ বিয়েতে বরকর্তা হয়েছিলেন বর এবং কন্যাকর্তা কন্যা নিজে, পৌরোহিত্য করেছিলেন স্বয়ং পঞ্চশর। নৃত্য, বাদ্য ও সংগীতের ব্যবস্থাও ছিল। এয়োর কাজ সম্পাদন করেছিলেন প্রেমের দেবতা মদন পত্নী দেবী রতি। বিদ্যা তাঁর মাতা-পিতাকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে সখীগণকে সাথে নিয়ে অতি গোপনে গান্ধর্বশাস্ত্র মতে বিয়ের কাজটি সেরে ফেলেন নিজের প্রাসাদে। বিদ্যা শিক্ষিত, মার্জিত, প্রাগ্রসর দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিশ্বাসী। স্বেচ্ছা নির্বাচন করতেই পারেন তবে তাই বলে মাতা-পিতাকে বিষয়টি সম্পূর্ণ আড়াল করবেন এটি অবশ্যই অনৈতিক এবং অন্যায়ও বটে। ছেলে-মেয়ের এ সিদ্ধান্তে গৃহগত অশান্তি সৃষ্টি হয় সেই সাথে মাতা-পিতা সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হন। ফলে গার্হস্থ্যজীবনে সৃষ্টি হয় চরম অশান্তি। গান্ধর্বশাস্ত্র মতে বিদ্যার বিয়ের বর্ণনা—

কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর॥
কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন।
বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ॥
নৃত্য করে বেশরে নূপুরে গীত গায়।
আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈলা তায়॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ২৩৪)

এরপর কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বিদ্যার সখীগণ কর্তৃক উৎসর্গকৃত ভোজন উৎসবের এক অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন। বাঙালিরা চিরকালই ভোজন রসিক। দয়িতারা তাদের দয়িতের মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন পদের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেন। এ কাজ করে তারা শুধু তৃপ্তি বোধ করেন তা নয় বরং প্রিয়কে সামনে বসিয়ে খাবার পরিবেশন করাকে পবিত্রতম দায়িত্ব মনে করেন। যদিও বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সুন্দরকে খাবার পরিবেশন করেছিলেন বিদ্যার সখীরা—

গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তুরী।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটি পুরি॥
ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানাজাতি।
নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি॥
শীতল গঙ্গার জল কর্পূরবাসিত।
মিঠা পান মিঠা গুয়া চুন পাথরিয়া॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ২৩৫)

এর পরের আয়োজন 'সুগন্ধিসম্ভার, পুষ্পসজ্জা, প্রকৃতির প্ররোচনা, সখীদের শৃঙ্গারগীতি; প্রথমে বিদ্যার পরে সুন্দরের, তারপর যুগল কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন এ সবের মধ্য দিয়ে দেহসাগরের তটে পাঠকের উত্তেজিত অনুভূতিকে কবি টেনে নিয়ে গিয়েছেন' (শঙ্কর ; ২০০০ : পৃ : ২২৫) প্রেমরসের আলিঙ্গনে—

পালঙ্কে বসিলা সুখে যুবক-যুবতী।
শোভা দেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি॥
... ...
বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ।
আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন॥
মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ।
... ...
বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান।
সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা।
মিশায়ে বীণার স্বরে গাইতে লাগিলা॥
দুজনের গানেতে মোহিত দুই জন।

আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ২৩৫-২৩৬)

বিদ্যা ও সুন্দর দুজনেই তাদের গোপন মিলনের কথা হীরার কাছে চেপে গিয়েছিলেন—

বুঝহ চতুর সব কি এ চতুরালি।
কুটনীরে ফাঁকি দিয়া করে নাগরালি॥
... ...
মত্ত দেখি দু জনে পলায় সখীগণ॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ২৪৩)

রোমান্টিক যুগলের প্রেমে কুটনি চরিত্রটি অনেক সময় অনিবার্য এবং একই সাথে আবর্জনা স্বরূপ; মিলনে কখনও কখনও সহায়িকা আবার নিজ অপরাধবোধে কুটিল এবং সাবধানী। 'কুটনিকে ফাঁকি দিয়ে মিলনের চাতুরালিতে কবি আলঙ্কারিক উল্লাসবোধ করেছেন'। (শঙ্করী : ২০০০ ; পৃ : ২২৬) কবি হীরা মালিনীকে আড়াল করে বিদ্যার সখীদের উন্মুক্ত করেছেন। সুন্দর ও বিদ্যার গোপন অভিসারের সাক্ষী বিদ্যার সখীরা। 'সেবার কারণ মাত্র জানে সহচরী' (*ভারতচন্দ্র ;* ১৪০৪ : পৃ : ২৪৩) বিদ্যার 'সখীরা সকলেই সুন্দরী যুবতী, সঙ্গ দেয়, গীতবাদ্যে উদ্দীপক-পরিবেশ রচনা করে, যা দেহগত প্রাকৃতিকতার স্থূলতাকে আবৃত করে রাখে। তদুপরি নায়িকা মিলনের পূর্বে ও পরে সমপ্রাণা সখীদের কাছে দেহমন খুলে কৌতুক, কৌতূহল ও প্রীতিকূজনের পরিচর্যালাভের সুখবোধও করে'। (শঙ্করী : ২০০০; পৃ : ২২৬-২২৭) বিদ্যার সঙ্গে রাত্রি যাপন করে দিবসে যখন সুন্দর বেকার তখন তার মাথায় এক কুবুদ্ধি আসে, সন্ন্যাসীর বেশে রাজার রাজসভায় হাজির হন তিনি। জামাই হয়েও প্রণাম আদায় করেন শ্বশুরের এবং রাজার কাছে বার বার তার কন্যার সাথে শাস্ত্রচর্চার দাবি জানান। রাজা আতঙ্কে বলেন—' গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়'। (*ভারতচন্দ্র ;* ১৪০৪ : পৃ : ২৪৯) সুন্দর তার দুষ্টুমির কথা বিদ্যার কাছে গোপন করেন। কোনো এক সময় বিদ্যা ও সুন্দর যখন একান্তে সময় কাটাচ্ছেন তখন সুন্দর ইচ্ছা করেই বিদ্যাকে বিব্রত করেন সন্ন্যাসীর কথা উত্থাপন করে। সন্ন্যাসী পণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ তিনি সুন্দরকে হারিয়ে দিয়েছেন, বিদ্যাকে হারিয়ে দেওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে-বাক্যটি শুনে অজান্তেই বিদ্যার দীর্ঘশ্বাস! এখন উপায় ? সুন্দর রসিকতা করে বলেন উপায় আর কী? তুমি পুরাতন ফেলে নতুনকে পাবে। এ রসিকতায় বিদ্যা কিন্তু মোটেও আতঙ্কিত হননি।

'রোমাণ্টিক প্রেমে সন্তানের উপস্থিতি কাঙ্ক্ষিত নয় সেখানে শুধু মিলন-বিরহ অথবা বিরহ-মিলনই মুখ্য। এ প্রেম দৈহিক নয় আত্মিক। কিন্তু গার্হস্থ্যজীবনের আদর্শ যেখানে একান্তই বাঞ্ছিত সেখানে সন্তানের সুকুমার উপস্থিতি দাম্পত্য জীবনকে করে তোলে সুখময় ... তবে নিষিদ্ধ প্রেমের যন্ত্রণাদহন ঘটাতে অবাঞ্ছিত সন্তান টেনে আনা কাম্য হয়ে ওঠে। নববিবাহিতের উন্মত্ত ভালবাসার কাছেও সন্তান কখনো কখনো বিরক্তিবোধের কারণ হয়ে যায় বিশেষত পুরুষের কাছে যখন সেই সন্তান মাতৃস্নেহের ভাগীদার হিসেবে উপস্থিত হয়। বিদ্যাসুন্দর কাহিনিতে বিদ্যার গর্ভবর্ণন অধ্যায়ে এ সকল সমস্যার ছায়াপাত কবির মনে পড়েনি। সমাজকলঙ্কের বিভীষিকাময় শাস্তি পর্যন্ত তিনি ভ্রুক্ষেপ করেননি। কারণ কবি জানতেন বিদ্যার এ কলঙ্ক কালীগত। এখানে ভারতচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। ভোগই ভোগফলের জন্ম দেয়। বিদ্যা ও সুন্দরের মুক্ত বিহারের ওপর ভারতচন্দ্র একটি ভ্রূণ নিক্ষেপ করে তাঁর কৌতুকবোধকে চরিতার্থ করেছেন। সুস্থ যৌবনধন্য নরনারীর মিলনের আনন্দ যেমন সত্য, তেমনি সত্য ঐ মিলনের ফল স্বরূপ সন্তান। ভারতচন্দ্র জীববিজ্ঞানীর নিরাসক্ত মনোভাবের ভঙ্গিতে এ তথ্য ঘোষণা করেছেন'-(সূত্র: শঙ্করী: ২০০০ ; পৃ : ২২৬-২২৭)

গর্ভবতী নারীর খাবারে আকাঙ্ক্ষা ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় মঙ্গলকাব্য ভারাক্রান্ত। এ ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র স্বতন্ত্র: 'ভারতচন্দ্র অপূর্ব বাণীতে সেই অতি-বিস্তারিত বর্ণনার জঞ্জাল পরিষ্কার করে একটি সংক্ষিপ্ত সুন্দর ছবি এঁকেছেন'। (শঙ্করী ; ২০০০ : পৃ. ২২৯) যেখানে সংযোজিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে রসিকতার অপূর্ব সমন্বয়। কবি অত্যন্ত সংবেদনশীল হৃদয় দিয়ে গর্ভবতী নারীর শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। এ অবস্থায় গর্ভবতীর বিবমিষা, বিভিন্ন টক জাতীয় এবং অখাদ্য

দ্রব্যের প্রতি বেশি আকর্ষণ বোধ করা, শারীরিক দুর্বলতা এবং মানসিক অশান্তির চিত্র অত্যন্ত চমৎকার ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে—

সর্ব্বদা ওয়াক ছর্দ্দি মুখে উঠে জল।
কত সাধ খেতে স্বাদ সুস্বাদু অম্বল॥
… … …
পোড়া মাটি খেতে রুচি সারিতে সে লাজ॥
… … …
শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস॥
গর্ভ দেখি সখীগণ করে কানাকানি।
কি হইবে না জানি শুনিলে রাজা রাণী॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ২৬২)

সমাজ-অননুমোদিত সম্পর্কের ফল প্রসঙ্গে সমাজদৃষ্টি বিরূপ ও আক্রমণাত্মক হবে এটাই স্বাভাবিক। সখীদের মুখে বিদ্যার অনাকাঙ্ক্ষিত গোপন সংবাদটি শুনে রানী হঠাৎ বজ্রাহত হয়ে দ্রুত বিদ্যার গৃহে উপস্থিত হলেন। ঘটনা সত্য এটি প্রত্যক্ষ করে রানী ভয়ে, শঙ্কায়, লজ্জায়, অপমানে কিছুক্ষণের জন্য বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তারপর রাগে ক্ষোভে নিজের বুকের যন্ত্রণা লাঘব করেন একমাত্র সন্তানকে গালি দিয়ে—

গর্ভের লক্ষণ করি নিরীক্ষণ
কহে ভালে কর হানি॥
ও লো নিশঙ্কিনী কুলকলঙ্কিনী
সাপিনী পাপকারিনী॥
… … …
না মিলিল দড়ি না মিলিল কড়ি
কলসী কিনিতে তোরে॥
… … …
রাজা মহারাজ তাঁরে দিলি লাজ
কলঙ্ক দেশে বিদেশে॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ২৬২-২৬৩)

রানীর অন্তর্বেদনার ক্ষোভ বিদ্যাকে ভর্ৎসনার মধ্য দিয়ে যে বাণীরূপ লাভ করেছে তা অত্যন্ত বাস্তব। এ অন্তর্জ্বালা সকল মায়ের কাছেই অভিন্ন। বিয়ের পূর্বে গর্ভে সন্তান ধারণ এখনো সমাজ অনুমোদন করে না। এটি এখনো সমাজে অত্যন্ত জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত এবং ঘৃণিত। সন্তানের এ-রকম অনৈতিক ক্রিয়া-কর্মে গৃহগত জীবনে চরম অশান্তির সৃষ্টি হয়। মাতা-পিতার আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। সন্তানকে ঘিরে মায়ের কত স্বপ্ন থাকে বিদ্যার মায়েরও অনেক স্বপ্ন ছিল—

রাজার ঘরণী রাজার জননী
রাজার শাশুড়ী হব।
যত কৈনু সাধ সব হৈল বাদ
অপবাদ কত সব॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ২৬৪-২৬৫)

রানীর সকল স্বপ্ন যখন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো তখন তিনি ক্ষোভে, যন্ত্রণায় ও মর্মপীড়ায় ক্ষত-বিক্ষত হলেন। বিদ্যার আত্মসমর্থনের চেষ্টায় তিনি রাগে ঝাঁঝে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজার কাছে বুকের জ্বালা প্রকাশ করলেন এই বর্ণনা যেমন নির্মম তেমনি মর্মস্পর্শীও বটে। এমনকি বিদ্যার সখীগণকে ভৎর্সনা করার মধ্যেও রানীর ক্ষোভ, দুঃখ ও যন্ত্রণা ছিল। সেই রানীই আবার উদাসীন কর্তব্যপরাঙ্মুখ রাজার কাছে গিয়ে অস্থির যৌবনের পক্ষ সমর্থন করে তীব্র ব্যঙ্গ তাচ্ছিল্যের সাথে যা উচ্চারণ করেছেন তা এ-রকম—

ঘরে আইবড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে
বিবাহের না ভাব উপায়॥
অনায়াসে পাবে সুখ দেখিবে নাতির মুখ
এড়াইলে ঝির বিয়াদায়॥
... ...
উচ্চ মাথা হৈল হেঁট বিদ্যার হয়েছে পেট
কালামুখ দেখাইবে কারে॥
বিদ্যার কি দিব দোষ তারে বৃথা করি রোষ
বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে॥
যৌবনে কামের জ্বালা কদিন সহিবে বালা
কথায় রাখিব কত টেলে॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ :২৬৭-২৬৮)

সদ্যনিদ্রিত রাজা অকাল জাগরণে কিছুটা বিরক্ত হয়ে পরে রানীর কাছে সকল বৃত্তান্ত শুনে ক্রোধান্বিত হলেন বটে তবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্রথমে চোর ধরার ব্যবস্থা করতে কোটালকে কড়া নির্দেশ দিলেন। রাজার হুকুম মতো কোটাল চোর ধরার সব রকম আয়োজন করেন। কোটালের দূরদর্শিতায় শীঘ্রই চোর ধরা পড়ল। চোরকে (সুন্দরকে) রাজসভায় হাজির করা হলো। সভাস্থলে সুন্দর উপস্থিত হলে রাজা লজ্জায়, অপমানে ভারাক্রান্ত কিন্তু তিনি কেন কুমারী কন্যার কলঙ্কের ব্যাপারটিকে প্রকাশ্য সভায় টেনে আনলেন তা অবশ্যই ভেবে দেখার বিষয়। সুন্দরকে দেখে রাজা ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া উচিত বিবেচনা করলেন। কিন্তু রাজা একটা অন্যায়ের শাস্তি প্রদান করতে গিয়ে অন্য একটি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারেন না—

কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব।
কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ২৯৪)

পরে রাজা বীরসিংহ সুন্দরের পরিচয় পেয়ে পরম যত্নে নতুন বসন-ভূষণ পরিয়ে তাঁকে সিংহাসনে বসালেন। অতঃপর বিদ্যাকে রাজসভায় ডেকে পাঠালেন। বিদ্যা রাজসভায় উপস্থিত হলে কন্যাকে জামাতা সুন্দরের হাতে সমর্পণ করলেন।

মঙ্গলকাব্যে নারীগণের পতিনিন্দার বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের কুলবধূরা দাম্পত্য জীবনে অসুখী ছিলেন যা তাদের পতিনিন্দার ধরন দেখে অনুমান করা যায়। বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজ-দর্পণে এ চিত্রটি একেবারে জীবন্ত করে চিত্রিত করেছেন মঙ্গলকাব্যের কবিগণ। প্রসঙ্গত আশুতোষ ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণ অনুধাবনীয়— 'ভারতচন্দ্র তাঁহার সমস্ত ঘৃণাবোধ লইয়া এই জীবনটিকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, কোথাও কোনো সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই। তবে এই ব্যঙ্গের মধ্য দিয়াই সহানুভূতির ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও হয়ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অসম বিবাহ দাম্পত্য-জীবনে যে কি সুগভীর দুঃখের কারণ হয়, তাহা সমাজ সেদিন অনুভব করে নাই ; কারণ নারীমনের দুঃখবেদনার অনুভূতি সেদিন অব্যক্ত ছিল। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্য রচনার একটি প্রথা অনুসরণ করিবার সুযোগে নারীমনের এই অব্যক্ত বেদনার অবরুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন। অসম বিবাহই সেই যুগে সমাজের নারীজীবনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল'। (আশুতোষ ; ২০০৯ : পৃ : ৬৮৫)। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনিতে পতিনিন্দার যে দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে নারীমনের অব্যক্ত বেদনা হয়ত তাদের নিজের অজান্তেই লোকচক্ষুর সামনে বেরিয়ে এসেছে। বিদ্যার কক্ষ থেকে সুন্দরকে রাজদরবারে আনা হলে আবালবৃদ্ধবনিতা ধেয়ে আসে সুন্দরকে এক নজর দেখার জন্য এ সময় সুন্দরের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখে কুলনারীগণ নিজ নিজ পতিনিন্দায় ব্যাকুল হয়—

এক রামা বলে সই শুন মোর দুখ।

আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ॥
সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত ।
কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত॥
... ...
আর রামা বলে সই এ ত বরং সুখ।
মোর দুখ শুনিলে পালাবে তোর দুখ ॥
মন্দভাগা অন্ধ পতি দ্বন্দ্বে মাত্র ভাল।
... ...
আর রামা বলে সই এ মাথার চূড়া।
আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া॥
... ...
অধর দংশিতে চায় ভেঙ্গে যায় দাঁত॥
... ...
আর রামা বলে কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই॥
... ...
সকলের রমণী সকলে নিন্দে কত॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ২৮৬-২৯১)

নিঃসন্দেহে এ বর্ণনা নিছক বর্ণনার জন্য বর্ণনা নয়। অপ্রাপ্তিজনিত হতাশা থেকেই নারীগণ তাদের পতি নিন্দায় ব্যাকুল হয়েছেন। এ বর্ণনায় কৌতূহল উদ্রেক করে বটে, কিন্তু অচরিতার্থ জীবনের বেদনায় যে হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে তা হৃদয়কে স্পর্শ করে। এতে সমাজের অন্তর্নিহিত ক্ষত অত্যন্ত দরদের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।

অবশেষে অনেক ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে বিদ্যা ও সুন্দরের পরিণয় স্বীকৃতি পায়। পরিণতির পর তাদের দাম্পত্য জীবন বেশ সুখেই অতিবাহিত হয়। সময়ের বহমানতায় বিদ্যার জীবনে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। বিদ্যার গর্ভ দশ মাস পূর্ণ হলো; শুভক্ষণে বিদ্যা পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। শুভ দিনক্ষণ দেখে ছয় দিনে ষষ্ঠী পূজা এবং ছয় মাস বয়সে পুত্রের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান করা হলো। বিদ্যার পুত্র যেহেতু রাজার পুত্র ও রাজার নাতি, অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে জন্ম পরবর্তী অনুষ্ঠান পালিত হয়। রকমারি রান্ন-বান্না, খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। আগত অতিথিরা নবজাতককে উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করেন। পুত্রের বয়স এক বৎসর পূর্ণ হলো, সুন্দর অনুভব করলেন তাঁর নিজ রাজ্যে ফিরে যাওয়া উচিত। একজন বিজ্ঞ এবং দায়িত্ববান স্বামী হিসেবে স্ত্রীর সাথে এ বিষয়ে সুপরামর্শ করেন সুন্দর। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুন্দর ও বিদ্যার এ পরামর্শের মধ্য দিয়ে তাদের দাম্পত্য জীবনের সুসম্পর্ক প্রকাশ পায়—

সুন্দর বলেন রামা যাব নিকেতন।
তুষ্ট হয়ে কহ মোরে যেবা লয় মন॥
তোমার বাপেরে কয়ে বিদায় করহ।
যদি মোরে ভালবাস সংহতি চলহ॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩১৩)

শাস্ত্রে বলে জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও প্রিয়। জননী ও জন্মভূমি ছেড়ে কেউ যেতে চায় না কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। মেয়েদেরকে মা-বাবা ভাইবোনকে ছেড়ে অন্য একটি পরিবেশে গিয়ে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। বিদ্যাও পিতা-মাতার অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে সুন্দরের সাথে শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেন। শ্বশুরালয়ে বিদ্যা সাদরে গৃহীত হলেন—

রাজা রাণী তুষ্ট হয়ে   পুত্রবধূ পৌত্র লয়ে
মহোৎসবে মগন হইলা॥
রাজা গুণসিন্ধু রায়   পুলকে পূর্ণিত কায়
সুন্দরেরে রাজ্যভার দিলা॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩২০)

দেবী দিব্যজ্ঞানে বিদ্যা ও সুন্দরের পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করালেন। বিদ্যা ও সুন্দর পিতা-মাতাকে বুঝিয়ে নিজ পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে দেবী কালীর সাথে স্বর্গারোহণ করলেন। তাঁদের স্বর্গারোহণের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসুন্দর কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে এবং পৃথিবীতে কালীর পূজা প্রচারিত হয়।

বিদ্যাসুন্দর কাহিনির সূত্রে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার অবক্ষয়িত সমাজের স্বরূপ অঙ্কন করেছেন, অমিতাচারী যৌবনের নৈতিকতা ও সামাজিক আইন বহির্ভূত আচরণের ও বিশ্বাসের যে রূপায়ণ কাব্যখণ্ডটিতে ঘটেছে, তাতে কবির শিল্পকুশলতার পরিচয় ঘটেছে বটে, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে গার্হস্থ্যজীবনের আনুশাসনিক রীতি ও নীতির লঙ্ঘনে যে বিপর্যয় সূচিত হয় তারও আভাস দিয়েছেন। যদিও স্বর্গভ্রষ্ট নর-নারীর আচরণের একটি দৈবী ব্যাখ্যা হয়ত সবসময় প্রস্তুত থাকে। দেবদেবীর আচরণের একটি ক্ষমাযোগ্য্য মীমাংসা হয়ত গ্রহণ করে নিতে হয়। তবু এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিদ্যাসুন্দর কাহিনিতে দেবলীলার ছলে অমিতাচারী যৌবনের যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রই পরিস্ফুট হয়েছে। তাই কালের বিশ্বস্ত দর্পণ হিসেবেই এ কাব্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যানটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস নয়, একটি কাব্য। ভারতচন্দ্রের এ কাব্য রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেবী অন্নদা কীভাবে ভবানন্দ মজুমদারকে কৃপা করলেন এবং ভবানন্দই বা কীভাবে সম্রাট জাহাঙ্গীরকে দিয়ে দেবী অন্নপূর্ণার পূজা করিয়ে নিজে রাজত্ব ও রাজা উপাধি অর্জন করলেন সেই কাহিনি বর্ণনা করা। মানসিংহ যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে এসে যখন দুর্যোগে বিপন্ন হয়েছিলেন তখন দয়ালু ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের কানুনগো হয়ে দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায় মুঘল ও রাজপুতবাহিনীকে অন্ন দান করে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এ ঘটনা ইতিহাস স্বীকৃত নয়। এ কাহিনি কিছুটা জনশ্রুতি, কিছু ইতিহাস এবং কিছু কবি কল্পনা। সংক্ষেপে এ খণ্ডের মূল বিষয় হলো মানসিংহ প্রতাপাদিত্য দমনে বাংলায় এলে ভবানন্দ তাঁর কানুনগো নিযুক্ত হন, প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে অতিব্যাকুল মুঘল-রাজপুত বাহিনীকে দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায় অন্ন দান করে তাদের প্রাণ রক্ষা করলেন। দিল্লি যাওয়ার সময় মানসিংহ ভবানন্দকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন যাতে তার কিছু ঐহিক সুবিধা হয়। বস্তুত কবি দেবী অন্নদার হরিহোড়ের গৃহ ত্যাগ করে ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সেকালে অকারণে যখন-তখন ভাগ্য-দেবতা বিমুখ হওয়ার যে ইঙ্গিত দিয়েছেন ইতিহাসেও তার সমর্থন মেলে। একদিকে সামন্ত রাজার অবক্ষয় অন্যদিকে বর্গীর উপদ্রবে বিব্রত রাঢ়-বাংলার সাধারণ মানুষের মনের কামনা ফুটে উঠেছে ঈশ্বরী পাটুনির চাওয়া-পাওয়ার মধ্য দিয়ে। কোনো মতে সন্তান-সন্ততি নিয়ে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারলেই হলো। তবে এ আর্তি সবার জন্য প্রযোজ্য ছিল না এটা একান্তই সাধারণ মানুষের হৃদয়ের কথা। কানুনগো ভবানন্দ দিল্লি যাচ্ছেন বাদশাহি ফরমান পেয়ে নতুন রাজা হবার প্রত্যাশায়। একদিকে হরিহোড়েরা নিঃশেষিত হচ্ছেন অন্যদিকে মাথা তুলে আছেন ভবানন্দ প্রমুখেরা। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে জড়িত ছিল হরিহোড়ের জীবন, পক্ষান্তরে ভবানন্দ ছিলেন কানুনগো অর্থাৎ চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত। রৌপ্যমুদ্রাভিত্তিক যে নতুন অর্থনীতি সমাজে চালু

হতে যাচ্ছে সেই নতুন ব্যবস্থায় সৌভাগ্য-শিখরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ এসেছে ভবানন্দ প্রমুখদের সামনে। এই ভাবেই মানসিংহ-ভবানন্দ কাহিনিটি যুগ সত্যের ধারক হয়ে উঠেছে।

মানসিংহ ভবানন্দের উপদেশে দেবী অন্নপূর্ণার পূজা করে সকল বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেলেন। পথে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের মরদেহ ঘিয়ে ভেজে সম্রাট জাহাঙ্গীরকে ভেট হিসেবে প্রদান করেন। বাদশাহ তুষ্ট হয়ে বাংলা জয়ের বিস্তারিত জানতে চাইলে মানসিংহ ভবানন্দকে দেখিয়ে বললেন অন্নপূর্ণার মহাভক্ত ভবানন্দ মজুমদার দেবীর কৃপায় তাদেরকে ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং তাকে রাজা উপাধি এবং জমিদারি দান করা উচিত। ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্রাট জাহাঙ্গীর দেবীর এ অলৌকিক ক্ষমতাকে অস্বীকার করেন এবং এ সমস্ত কার্যকলাপকে ভূতুড়ে কাণ্ড বলে ভবানন্দ মজুমদারকে কয়েদখানায় বন্দি রাখেন। কারাবাস কালে মজুমদার দেবী অন্নপূর্ণার স্তুতি করলে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে দৈববাণীতে তাকে সান্ত্বনা দেন। দেবী অন্নপূর্ণা তাঁর দৈবশক্তির বলে দিল্লিতে অলৌকিক ভূতপ্রেতের উৎপাত কাহিনি উল্লেখ করে ভারতচন্দ্র ইতিহাস বিপর্যয় ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠতে পারে। তবে ঐতিহাসিক কাহিনিকাব্যে লেখকের কল্পনার স্বাধীনতা কতখানি সে সম্পর্কে আজকের ধারণার সাথে সেকালের ধারণার তুলনা করা অনুচিত। দীর্ঘকাল মুঘল শাসক দিল্লির সিংহাসনে বসে সমগ্র বাঙালি জাতিকে শাসন করে আসছেন এরূপ প্রতিক্রিয়া থেকেই বাঙালি কবি বাঙালি দেবী-কর্তৃক দিল্লি সম্রাটের রাজ্যে ভূত-প্রেত দ্বারা উৎপাতের চিত্র অঙ্কন করে থাকতে পারেন। তবে সম্রাট জাহাঙ্গীর ও ভবানন্দের কথোপকথনে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ করেছেন বলে আপাতত মনে হলেও প্রবল ব্যঙ্গবাণের অন্তরালে কবিমানসের যে পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে ব্যঙ্গ নয় বরং সমন্বয়ী এক ভাবাদর্শ খুঁজে পাওয়া যায়—

হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৪২)

কবির এ সরল ভাবাদর্শের সাথে বাঙালিসুলভ জীবনাসক্তিই ভারতচন্দ্রের কাব্যের মূল সূর। স্ত্রী ও সন্তানাদি নিয়ে সুখে-দুঃখে কোনো রকম একটু সচ্ছলভাবে জীবন কাটাতে পারা ভারত-মানসের ঈপ্সিত প্রত্যাশা এজন্য তাঁর চাওয়া-পাওয়া অতি ক্ষীণ যা ঈশ্বরী পাটুনির উক্তির মধ্য দিয়ে (আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে) কবি প্রকাশ করেছেন। রাজসিক আয়োজন কবির কাম্য নয়। তাহলে এ কামনা কি একান্তই ঈশ্বরী পাটুনির ? কবি স্বীয় সন্তানদের জন্য দেবীর কাছে কৃপা কামনা করেছেন। পরীক্ষিত রায়. রামতনু রায় ও ভগবান রায় এই তিন পুত্রের জন্য কবি অন্নপূর্ণার কাছে কোনো রাজৈশ্বর্য প্রার্থনা করেননি বরং দেবীর কৃপা প্রার্থনা করেছেন মাত্র। ধনী ভূস্বামী নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর তাঁর পুত্রের জন্য দেবীর কাছে ধনসম্পদ বা রাজৈশ্বর্য প্রার্থনা না করে বস্তুত ঈশ্বরী পাটুনির মানসিকতার সাথে নিজের একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। আবার অন্যদিকে লক্ষ করলে দেখা যায় ব্যক্তি জীবনে ঘর-সংসার বিতাড়িত কবি যেন ধরা দিয়েছেন দাসুর উক্তিতে—

দিবসে মজুরি করে   রজনীতে গিয়া ঘরে
নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৪৫)

একদিকে দিল্লীশ্বরের কাছে লাঞ্ছিত হচ্ছেন ভবানন্দ, আর অন্যদিকে ভবানন্দের সফরসঙ্গী ভৃত্য দাসু গ্রাম বাংলার এক গৃহকোণে ফিরে গিয়ে সস্ত্রীক স্বস্তিপূর্ণ গার্হস্থ্যজীবন যাপনের স্বপ্ন দেখছে। দাসু যেন এখানে ঘর-সংসার বিচ্যুত কবি চিত্তেরই মূর্ত প্রতীক। এইভাবে সারা কাব্যে শান্তির নীড় প্রত্যাশী একজন কবি চিত্তকে খুঁজে পাওয়া যায়। যে-কবি শৈশব থেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন তৎকালীন সামন্ত রাজা ও বর্গীর ধ্বংসাত্মক অত্যাচার ও পীড়ন। আরও প্রত্যক্ষ করেছেন রাজসভার ও রাজার উন্নাসিকতা এবং অন্তঃসারশূন্য সামন্তসমাজের চাকচিক্য।

মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যানটিতে কবি ভারতচন্দ্র অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গার্হস্থ্যজীবনের আনন্দ-বেদনার কিছু খণ্ডচিত্র উপস্থাপন করেছেন। মাতা-পিতা, দুই স্ত্রী, তিনপুত্র ও দাস-দাসী নিয়ে ভবানন্দ মজুদারের একান্নবর্তী পরিবার। ভবানন্দ মজুমদার যখন দিল্লি যাত্রা করেন তখন তিনি নানা আচার-পার্বণ সমাপ্ত করেন, তারপর দু-স্ত্রীকে সম্ভাষণ এবং পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে বিদেশ যাত্রা করেন—

বিল্বপত্র ঘ্রাণ লয়ে বন্ধুগণে প্রিয় করে
গোবিন্দদেবেরে প্রণমিয়া ॥
বাপ মায় প্রণমিয়া দুই নারী সম্ভাষিয়া
আরোহিলা পালকী উপর॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৩২)

যাতায়াতের বাহন হিসেবে পালকি মর্যাদা সম্পন্ন মানুষেরা ব্যবহার করতেন। বিদেশ-বিভূইয়ে দাসু-বাসুর খেদোক্তির মধ্য দিয়ে কবি একদিকে তৎকালীন সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনচিত্র অন্যদিকে দাম্পত্য-সুখ বঞ্চিত দুই অসহায় যুবকের করুণ আর্তনাদ প্রকাশ করেছেন—

দিবসে মজুরি করে রজনীতে গিয়া ঘরে
নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী॥
নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে
তারে বড় কেবা আছে দুখী॥
... ...
কুড়ি টাকা পণ দিয়া নূতন করিনু বিয়া
এক দিনো শুতে না পাইনু॥
কাদাখেঁড়ু হইয়াছে পুনর্ব্বিয়া বাকী আছে
মাটি খেয়ে বিদেশে আইনু॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৪৫)

এ ছাড়াও উল্লিখিত বর্ণনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজে বাল্যবিবাহ এবং কন্যাপণ প্রচলনের একটি স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি রূপায়িত হয়েছে। সেকালে প্রাপ্ত বয়সের আগেই বালিকাদের বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হতো। বিয়ের পর যখন তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হতো তখন সমাজে কাদাখেঁড়ু উৎসব পালনের রেওয়াজ ছিল। সমাজে শুধু বরপণ প্রচলিত ছিল তা নয় কন্যাপণও প্রচলিত ছিল। দাস-বাসু তাদের বিয়েতে বিশ (কুড়ি) টাকা কন্যাপণ দিয়েছিল।

বহুবিবাহের প্রচলন মঙ্গলকাব্যে পরিলক্ষিত হয়। ভারতচন্দ্র প্রথমেই এই বলে সকরুণ রসিকতা করেছেন—'দুই নারী বিনা নাই পতির আদর'—দুই নারীর প্রতিযোগিতাপূর্ণ স্বামী সমাদর প্রায়ই প্রাণান্তকর হয়, এ ক্ষেত্রে হতেও পারত-যদি না ভবানন্দ যথেষ্ট চতুর হতেন। রাজনীতি ও কামনীতি-উভয় নীতিতে নৈপুণ্য দেখিয়ে ভবানন্দ কীভাবে উভয়েরই সারাস্বাদ ও সুরাস্বাদ করেছেন, কবি তার লোভজনক বিবরণ দিয়েছেন। (শঙ্করী ; ২০০০ : পৃ:২৬৫)

দীর্ঘদিন প্রবাস জীবন শেষে রাজা উপাধি নিয়ে ভবানন্দ মজুমদার ঘরে ফিরছেন। গৃহস্বামীর এ অর্জন স্বাভাবিক ভাবেই পরিবারে আনন্দ বাড়িয়ে দেয়। এই আগমন বার্তা চাকর বাসু পৌঁছে দিল দুই রানীর দাসী সাধী ও মাধীকে। 'দুই ঠাকুরাণীকে সংবাদ দেহ গিয়া, রাজা হয়ে ঠাকুর আইলা ডঙ্কা দিয়া'। (শঙ্করী ; ২০০০ : পৃ : ২৬৫) শোনামাত্র তারা পড়িমরি করে ছুটল কে আগে গিয়ে তাদের প্রিয় রানীমাকে সংবাদটি প্রেরণ করতে পারে। দাসীর কাছে স্বামীর সুস্থ প্রত্যাবর্তনের খবর শুনে দুই রানী ভীষণ খুশি। অবসান হলো তাদের এতদিনের অপেক্ষা ও উৎকণ্ঠার। শুরু হলো স্বামীকে তুষ্ট করার প্রতিযোগিতা। এ দিকে ভবানন্দ মজুমদার প্রথমে গৃহে প্রবেশ করে তাঁর গৃহে প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবতা গোবিন্দদেবকে প্রণাম করলেন, অতঃপর চরণ বন্দনা করলেন জনক-জননীর। ভবানন্দের মাতা এয়োগণকে সঙ্গে নিয়ে পুত্রকে মহাসমারোহে বরণ করলেন—

প্রথমে গোবিন্দদেবে প্রণাম করিলা।
জনকের জননীর চরণ বন্দিলা॥
সীতা ঠাকুরাণী যত এয়োগণ লয়ে।
পুত্রের নিছনি কৈলা মহাহৃষ্ট হয়ে॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বাজে বিবিধ বাজন।
হুলু হুলু ধ্বনি করে যত রামাগণ॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৭০)

রাজা উপাধি নিয়ে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর ভবানন্দ মজুমদারকে পারিবারিবকভাবে যে সমস্ত আচার-পার্বণের মাধ্যমে বরণ করা হয় তা গৃহগত আনন্দ-উল্লাসের এক অনিবার্য অংশ। সমস্ত আচার-পার্বণ সমাপ্ত হওয়ার পর শুরু হয় ভবানন্দের অন্তর্দ্বন্দ্ব। তাঁর তো দুই রানী। অন্তর্জগতের এ সমস্যা ভবানন্দকে ভাবিত করে, করে দ্বিধান্বিত—

দুই নারী দুই ঘরে কোথা যাব আগে।
মনে এই আন্দোল কন্দল পাছে লাগে॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৭১)

এ দ্বিধা থেকে পরিত্রাণের জন্য ভবানন্দ কাল ক্ষেপণ করতে থাকেন। উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নেন মাতৃমন্দিরকে। মায়ের কাছে খাওয়া-দাওয়া সেরে, মায়ের সাথে বিদেশ-বিভূইয়ে যাপিত জীবনের গল্প করতে থাকেন তিনি। ঠিক তখনি বড় রানীর খাস দাসী সাধী ছুটে যায় বড় রানীর ঘরে। দুই দাসী প্রতিযোগিতা করতে থাকে কে কত সুন্দর ও পরিপাটি করে তাদের রানীকে রাজার কাছে উপস্থাপন করবে। রাজাকে রানীর প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য টোটকার আশ্রয় নিতে দাসীরা রানীকে অনুপ্রাণিত করে। জলপড়া, পানপড়া দিয়ে রাজাকে বশীকরণ করতেও তাদের বিবেক দংশিত হয় না। বড় রানীর দাসী সাধীকে বলতে শুনি—

বড় ঠাকুরাণী গো।
ঠাকুর হইলা রাজা তুমি রাণী গো॥
... ...
মাধী পাছে পড়ি দেয় পান পানি গো।
কত মন্ত্র তন্ত্র জানে সে নাপানী গো॥
ছোট যুবা প্রভু তাহে যুবজানি গো
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৭১)

সাধী বড় রানীকে বলছে ওগো মা তোমারই তো অধিকার। কিন্তু যে পরিস্থিতি দেখছি তাতে মনে হয় ছোট রানীর ঘরেই আসর বসবে, ছোট রানীর ঘরই হবে রাজগৃহ। ছোট রানীকে সবাই বলবে মহারানী আর তোমাকে বলবে বুড়ো ঠাকুরানী। তোমাকে হাত তোলা খেতে হবে। দেখে এলাম মাধী ছোট রানীকে নিয়ে টানাটানি করছে। মাধী ছোটকে টেনে নিয়ে যাবে রাজার কাছে। এখন তো তারই দিন, কাঁচা বয়স, মহারাজও যুবজানি হতে ইচ্ছুক—

যুবা সুয়া বুড়া দুয়া সবে জানি গো।
সুয়া যদি হবে শুন মোর বাণী গো॥
... ...
টেনে টুনে বাঁধ ছাঁদ খোঁপাখানি গো।
শাড়ী পর চিকণ শ্রীরামখানি গো॥
দেহুড়ীর কাছে থাক হয়ে দানী গো।
ঘরে আন ধরে করে টানাটানি গো॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৭১-৩৭২)

দুই সতিনের ঘরে দাসীদের উস্কানিমূলক সংলাপের মধ্য দিয়ে কবি সমাজের একেবারে বাস্তব ঘটনাকে রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। মানুষ সৌন্দর্যের পূজারি তবে নারীদের সৌন্দর্য চেতনা একটু বেশি। বিশেষ করে দয়িতের নিকট যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেক নারীই নিজেকে সজ্জিত ও পরিপাটি করে উপস্থাপন করেন। দৈহিক সৌন্দর্য দিয়েই প্রভুর মন জয় করতে হবে এ লক্ষ্যে সাধীর পরামর্শে বড়রানী স্খলিত যৌবন মেরামত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। টান টান করে খোঁপা বাঁধলেন, সজোরে টিপে চোখে কাজল দিলেন, তেল দিয়ে মুখ মাজলেন, মাথায় দিলেন ফুল, মন্ত্রপূত সিঁদুর দিলেন সিঁথিতে এবং কপালে। গায়ে সুগন্ধি লেপন করলেন, বড়রানী চন্দ্রমুখী স্বামীকে আকৃষ্ট করার জন্য নিজের সাজগোজ নিয়ে যখন ব্যস্ত, বিষণ্ন এবং বিপন্ন ঠিক তখনই তার কোলের সন্তান চিৎকার করে কেঁদে ওঠে—

ছেলে কেন্দে উঠে কোলে　　তোষেন মধুর বোলে
…　　…　　…
সাধীরে বালক দিয়া　　দেহুড়ীর কাছে গিয়া
রহিলা প্রহরী যেন রেতে॥
প্রভু আসিবেন যেই　　ধরে লয়ে যাব তেই
না দিব সতার ঘরে যেতে॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৭৩)

অপরদিকে ছোটরানীর প্রস্তুতিও যথোপযুক্ত, কারণ ছোটরানীর দাসী মাধীর মুন্সিআনা কম নয়। সে ছোটরানীকে উপদেশ দেয় তোমার সতিনের কোলে তিন বেটা। শ্বশুর-শাশুড়িকেও সে হাত করেছে। ঘর-দ্বার সবই তার, তোমার আপন বলতে একমাত্র আমি। মহারাজ সদ্য দেশে ফিরেছেন। তুমি যদি আগে তাকে তোমার কক্ষে নিতে না পার আর যদি মহারাজ বড় রানীর কক্ষে রাত কাটান তবে সেই হবে মহারানী আর তুমি হবে দাসী। সুতরাং ওঠো দুয়ারে দাঁড়াও, আঁখি ঠারে তাঁকে ডাকো। আমি তাকে খবর দিই। তুমি যদি একবার তাকে তোমার কক্ষে আনতে পার তবে তুমিই হবে রাজরানী। দাসীর পরামর্শ মতো ছোটরানী নিজেকে সজ্জিত করে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। মাধী প্রভুপত্নীর দিকে তাকিয়ে পদ্মমুখীর শরীরের বিজয়পতাকার আন্দোলনে আশ্বস্ত হয়ে চলল মহারাজের কাছে। তার সেই আশ্বস্ত গমনকে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক নৈপুণ্যে—

এত বলি তাড়াতাড়ি　　চলিল বাহির বাড়ী
মাধী যেন মাতাল মহিষী॥
চূড়া ছাঁদে বাঁধা চুল　　তাহাতে চাঁপার ফুল
আঁচল লুটায় মাটি মিশি॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৭৪)

মাধী মুখে ছোটরানীর সাদর আহ্বান পেয়ে ভবানন্দ অত্যন্ত পুলকিত, আপ্লুত। যে ভবানন্দ এতক্ষণ মাতৃসঙ্গে আনন্দে সময় পার করছিলেন তাঁর এখন মাতৃসঙ্গে অরুচির লক্ষণ। গার্হস্থ্যজীবনে প্রিয় মিলনে উচাটন ব্যক্তির নানা রকমের মানস-অবস্থা ও অভিব্যক্তিকে চমৎকার নৈপুণ্যে শব্দবন্ধে ধারণ করেছেন ভারতচন্দ্র। পুত্রের মনের অবস্থা বুদ্ধিমতী মা বুঝতে পেরে ছেলেকে নিজ কক্ষে যাওয়ার অনুমতি দিলেন—

রাখিতে কে পারে আর মাধী দিল টান।
ঘাড় ফিরে আড়ে আড়ে মার দিকে চান॥
মায়ের পোয়ের ভাব নহে নাকি ছাপা।
সীতা কন ঘরে গিয়ে পান খাও বাপা॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৭৪)

রাজার আগমন বার্তায় মাধী উল্লসিত, নিজেকে জয়ী মনে করে হাসি-হাসি-ভাব নিয়ে আগে যাচ্ছে মাধী দাসী, পেছনে মজুমদার। এমন সময় ঘটল সেই অঘটন। সামনে বড়রানী চন্দ্রমুখী পথ আটকিয়ে রাজাকে তার ঘরে যাওয়ার জন্য অনুনয় করেন। অন্তত তার পুত্রের মুখ চেয়ে তার কক্ষে গিয়ে পান-জল খাবেন।

মজুমদার এখন উভয় সংকটে-কার ঘরে আগে যাবেন। ‘কার ঘরে আগে যাব ভাবিতে লাগিলা॥ / যাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ। ভবানন্দের ইচ্ছে ছোটরানীর ঘরে আগে যাওয়ার কিন্তু ‘বড় কৈলা বাদহাটা আগুলিয়া পথ॥ (ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৭৪-৩৭৫) পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে উঠল। দুই দাসী সাধী-মাধীতে বেধে গেল চরম কন্দল। সাধী মাধীকে বলে তুই রামায়ণে দশরথের সংসার তছনছ করা কৈকেয়ীর দাসী কুঁজি মন্থরা। অন্যজন উত্তর দিল ‘আমি জানি অমন বিস্তর এঁড়ে ডাক’। মাধী ছুটে গেল ছোটরানীর কাছে। সাধী তোমার কাছ থেকে ঠাকুরকে সরিয়ে নিতে চায়, আমাকে কথা শোনাচ্ছিল, আমিও শুনিয়ে দিয়েছি। এখন তুমি চল। মাধীর বচনে পদ্মমুখী হন্তদন্ত হয়ে চলে এলেন স্বামীর নিকট। গলায় আঁচল দিয়ে স্বামীকে নমস্কার করে নয়নে নয়ন দিয়ে দুজনের কথা হলো। পতিদেবের ইশারা পেয়ে পদ্মমুখী খুশি হলেন। খুব সুকৌশলে পদ্মমুখী পরিস্থিতি সামলে নিলেন। খুব সহজে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বিনয়ের সাথে বললেন—

হাসিয়া কহেন প্রভু কেন দাঁড়াইয়া॥
বড়দিদি দাঁড়াইয়া কেন দুঃখ পান।
উচিত যে উহাঁরি মন্দিরে আগে যান॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৭৭)

ভবানন্দ মজুমদার শান্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। ভবানন্দ দাসীদের নিজ নিজ কক্ষে চলে যেতে বললেন, দরকার হলে তিনি তাদের ডেকে নিবেন- ‘কামের করাতে ভাগ করি কলেবরে। / সমভাবে রব গিয়া দু জনার ঘরে॥ (*ভারতচন্দ্র* ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৭১) না হয় যে ধরে নিয়ে যাবে তার ঘরে আগে যাব। দাসী দুজন সরে গেল। দু সতিন মুখোমুখি দাঁড়ালেন কলহ করতে। তাদের মধ্যে চলতে থাকল ব্যঙ্গোক্তি এবং হাসির ছুরিকাঘাত। এ খেলায় বেশ পটু ছোটরানী পদ্মমুখী আর তার হাসির ফলাটুকু গিয়ে বিঁধল বড়রানীর বুকের ঠিক মাঝখানটিতে।

বড় এবং ছোটরানীর মধ্যে ব্যঙ্গচ্ছলে কিছু রসিকতা হলো। পরিশেষে জয় হলো ছোট রানীর। স্বামী শিকারের অব্যর্থ শর ছোট রানীর নবীন দেহেই বিদ্ধ করল। কেননা ভবানন্দ রসিক রাজসিক পুরুষ। বড়রানী তা ভালো করেই জানেন। তাই তিনি ছোটর দিকে ফিরে বললেন বোন বড়ই ব্যঙ্গ করলে। একদিন আমি দর ছিলুম, কিন্তু তিন ছেলে কোলে নিয়ে এখন আর কত দর হব বল ?—

চন্দ্রমুখী কন বুনি ব্যঙ্গ কৈলা বড়।
দড় ছিনু যখন তখনি ছিল দড়॥
তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে
আটে পিঠে দড় যেই সেই দড় হবে॥
দড় বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাট করি।
ধরিতে না হৈত প্রভু আনিতেন ধরি॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৭৮)

কলহের কটু কথা ছাপিয়ে বিগত যৌবনা নারীর মর্মান্তিক যন্ত্রণা খেদোক্তি হয়ে প্রকাশ পেয়েছে এখানে—

তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া।
হরায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া॥
সুয়া যদি নিম দেয় সেই হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেন, নিম হন তিনি
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৭৮)

ক্ষোভে রোষে অনেক বেশি বলে হয়ত বড়রানী মুখের ঝগড়ায় জিতেছিলেন কিন্তু এ জয়ের চেয়ে পরাজয় বোধ হয় আর নেই ! ছোটরানী বড়রানীকে অগ্নিবলয়ে দগ্ধ করে স্বামীর ইঙ্গিতে তুষ্ট হয়ে গরবিনীর মতো নিজের কক্ষে প্রবেশ করার মধ্যে ভারতচন্দ্র এক শিল্পসফল গার্হস্থ্যজীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। নারী-পুরুষের কলহের কথা, নারীর পতি-নিন্দার কথা আমরা পূর্বে পেয়েছি, কিন্তু বলা যায়, এই প্রথম

আমরা এক পুরুষকে উপলক্ষ্য করে দুই নারীর প্রতিযোগিতার কলহবিঘ্নিত রূপ অঙ্কিত হতে দেখলাম। এর মধ্য দিয়ে আমরা বাঙালির গার্হস্থ্যজীবনের ভিতর মহলের এক অনুপেক্ষণীয় দ্বন্দ্বমুখর ছবি প্রকাশিত হতে দেখলাম। বহুবিবাহের কুফলজাত এই পরিণয় বাঙালির সমকালীন জীবনের এক নিগূঢ় বাস্তবতাকেই লোকচক্ষুর সামনে নিয়ে এসেছে। দেখা যায়, ছোটরানী উদারতার বানে এবং বিনয়ে নত হয়ে বড়রানীকে উদ্দেশ্য করে বলেন—‘ আহা, বড়দিদি দাঁড়াইয়া কেন দুঃখ পান। উচিত যে ঠাকুরের আপনার মন্দিরে আগে যান’। ভবানন্দ বাঁচলেন এবং নানা বিষয় বিবেচনায় নিয়ে অতি বিচক্ষণ মজুমদার প্রথমে বড়রানীর কক্ষেই প্রবেশ করেন। অতঃপর রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে যান ছোটরানীর কক্ষে। দুই রানীকে নিয়ে ভবানন্দ মজুমদার অত্যন্ত সুখে জীবন যাপন করতে থাকেন। এরপর ভবানন্দ মজুমদার রাজগৃহে অন্নপূর্ণার পূজার আয়োজন করেন।

সংসার-যাপনায় বড়রানী চন্দ্রমুখী এয়োজাতের দায়িত্ব এবং ছোটরানী পদ্মমুখী রান্নার দায়িত্ব পেলেন। পদ্মমুখী স্নান করে দেবী অন্নপূর্ণার ধ্যান করে ভোগ রান্না শুরু করেন। প্রথমে নিরামিষ রান্না করেন।

শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক।
ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে।
মুগ মাষ বরবটি বাটুলা মটরে।
বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা।
দুধথোড় ডালনা শুক্তানী ঘণ্ট তাজা॥
কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনিরসে রসে বুড়ে॥
তিল পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমুড়া॥
নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৮৫-৩৮৬)

তেইশ পদের নিরামিষ রান্নার পর শুরু হয় আমিষ রান্নার আয়োজন। খাদ্য তালিকায় আমিষের গুরুত্ব অপরিসীম। আমিষের অভাব বাঙালি সাধারণত মাছ দ্বারাই বেশি পূরণ করে থাকেন। তাছাড়া প্রবাদও আছে মাছে ভাতে বাঙালি। বাংলায় মাছের সমাহারও প্রচুর। নদী, বাওড়, খাল-বিলের দেশ হওয়ায় খুব সহজে মাছ সংগ্রহ করা যায় এবং সেই মাছ বাঙালির আমিষের অভাব পূরণ করে যাচ্ছে নিরন্তর। খাবারে আমিষের বর্ণনায় বিভিন্ন প্রকার মাছ ও কিছু মাংসের উল্লেখ আছে—

কাতলা ভেটুক কই ঝাল ভাজা কোল।
সীকপোড়া ঝুরী কাঁটালের বীজে ঝোল॥
… … …
চিঙড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার॥
কণ্ঠা রান্ধি রান্ধে রুই কাতলার মুড়া।
তিত দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুঁড়া॥
অম্ল দিয়া শৌলমাছ ঝোল চড়চড়ী।
আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী॥
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক।
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক॥
বাচার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা।
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা॥
… … …
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
… … …
কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা॥
অন্ন মাংস সীকভাজা কাবাব করিয়া।

রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পুরিয়া॥
মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা।
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৮৬)

পদ্মমুখী তেইশ পদের নিরামিষ রান্নার পর বিভিন্ন প্রকার মাছ ও মাংসের ব্যঞ্জন রান্না করেন। মাছগুলো কোন সবজির সাথে এবং কীভাবে রান্না করলে স্বাদ বৃদ্ধি পায় তার একটি পরিপূর্ণ বিবরণ পদ্মমুখী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খাবারে প্রদত্ত হয়েছে। আমিষের পর্ব শেষ করে পদ্মমুখী অম্বল বা চাটনি রান্না করেন। যা খাদ্য হজমে সহায়তা করে পরিপাক ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে—

আম আমসত্ব আর আমসী আচার।
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মন্দার॥
অম্বল রান্ধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা।
… … …
চুষী রুটি রামরোট মুগের সামুলী॥
কলাবড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজাপুলী।

সবশেষে ছোটরানী পরমান্ন ও মিষ্টান্ন দ্রব্য রান্না করেন—

পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা।
… … …
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।
বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার॥
অতুলিত অগণিত রান্ধিয়া ব্যঞ্জন।
অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন॥
মোটা সরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে।
আসু বোরো আমন রান্ধিলা ক্রমে ক্রমে॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৮৭)

পদ্মমুখীর রান্নার বিবরণ, পদ্ধতি এবং উপাদান উপকরণের সমাহার ও উৎপাদন দৃষ্টে রাজা ভবানন্দ মজুমদারের পারিবারিক অবস্থা জানার সাথে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা তথা কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। বিভিন্ন সবজি, শাক এবং ধানের বিবরণ এমন কি আউশ, আমন ও বোরো ধানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে বেশি জানা যায় গৃহস্থ পরিবারের রান্না ঘরের খবর। এর মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় সম্পন্ন গৃহস্থ-পরিবারের রান্নার উপকরণ, প্রক্রিয়া ও খাবার-তালিকার বিবরণ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। বাস্তবজ্ঞান-সম্পন্ন কবি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমকালীন জীবনের এক ভিন্নমাত্রিক ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন। এতে সামাজিক ইতিহাস উপাত্তসহ কাব্যটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

শেষে ভবানন্দ মজুমদার নানা উপচার, উপকরণ দিয়ে সঠিক নিয়ম নিষ্ঠা মেনে দেবী অন্নদার পূজা সমাপ্ত করেন।

অশেষ উপচার আনিয়া মজুমদার
পুজেন অন্নদাচরণ।
পদ্ধতি সুবিদিত পণ্ডিত পুরোহিত
পুজয়ে বিধান যেমন॥
… … …
মহিষ মেষ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ
বসন ভূষণ সন্দেশ॥
বাজয়ে বাদ্য যত নাচয়ে নট যত
গায়ক নটী রামজনী॥

যতেক রামাগণ পরমহৃষ্টমন
করয়ে হুলু হুলু ধ্বনি॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৮৮)

পূজায় ছাগ, মেষ বলি দেওয়া হয়। এরপর পূজায় আগত অভ্যাগতদের ভোগের অন্ন দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। অন্নদার বরে চন্দ্রমুখী, পদ্মমুখী ও ভবানন্দ মজুমদার তাদের পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে অবগত হলেন।

দেবী অন্নদা অষ্টমঙ্গলার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে ভবানন্দ মজুমদার ও তাঁর দুই স্ত্রীকে নিয়ে স্বর্গে গমনের ইচ্ছা জানান। সবশেষে মহামায়ার অলৌকিক মায়াজালে সকল মোহ কেটে গেল এবং তাঁরা তিনজনই জাতিস্মর হয়ে পূর্ব জন্মের সকল স্মৃতি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। এখন তাদের স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কিন্তু পার্থিব মায়ার বাঁধন তাঁদেরকে ব্যথিত করছে। শ্বশুর-শাশুড়ি এবং পুত্রগণকে রেখে পৃথিবী ছাড়তে তাঁদের মনোকষ্ট হয়—

মোহ গেল জাতিস্মর হৈলা তিন জন।
দেখিতে পাইলা সর্ব্ব পূর্ব্ব বিবরণ॥
মজুমদার কন আর এথা নাহি কাজ।
অব্যাজে দেখিব গিয়া বাপ যক্ষরাজ॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী কান্দে নানা ছন্দে।
শ্বশুর শাশুড়ী দেখিবারে প্রাণ কান্দে॥
দেবীর চরণে ধরি কান্দে তিন জন।
লয়ে চল এথা আর নাহি প্রয়োজন॥
(ভারতচন্দ্র ; ১৪০৪ : পৃ : ৩৯৩-৩৯৪)

ভবানন্দ মজুমদারের দেহত্যাগের পর রাজ্যভার কার ওপর দিবেন সে বিধানও অন্নদা দিয়ে দিলেন। বংশ পরম্পরায় পাঁচ পুরুষের রাজ্যভারের বিধান দেবী অন্নদা দিয়েছিলেন ভবানন্দ মজুমদারও দেবীর আদেশকে শিরোধার্য মনে করে স্বর্গযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং দেহত্যাগ করলেন। পুত্রের দেহত্যাগে ভবানন্দ মজুমদারের পিতা-মাতা শোকে মূহ্যমান। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে চন্দ্রমুখী এবং পদ্মমুখী হলেন সহমৃতা। একজন প্রজাবান্ধব রাজার মৃত্যুতে প্রজাগণও শোকে বিহ্বল। অন্যদিকে স্বর্গরাজ্যে আনন্দের উৎসব শুরু হলো।

কাব্যের শেষাংশে পৌঁছে ভবানন্দের স্বর্গরোহণের পূর্ব-পর্যন্ত যে বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে তাতে পারিবারিক জীবনের মায়া মমতা-পরিপূর্ণ ছবি অঙ্কিত হয়েছে। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর পারিবারিক জীবনের বন্ধনের সূত্র, পারিবারিক সম্পর্কের মাহাত্ম্য তথা সৌন্দর্য বাস্তবিক ঘটনা সংস্থানের মাধ্যমে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যে ভারতচন্দ্র যে অনন্য প্রতিভাধর কবিপুরুষ-তার পরিচয় এতে সমুপস্থিত।

তথ্যনির্দেশ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৩) *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (তৃতীয় খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি. কলিকাতা

আনিসুজ্জামান (ফেব্রুয়ারি ২০০০) *বাঙালি নারী সাহিত্যে ও সমাজে*, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

আশুতোষ ভট্টাচার্য (সেপ্টেম্বর ২০০৯) *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা. লি. ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, দ্বাদশ সংস্করণ, কলিকাতা -৭৩

আহমদ শরীফ	(মে ২০০৮) *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, নিজ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা
দেবেশকুমার আচার্য্য সম্পাদিত	(২০১০) *ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কবি ও কাব্য*, চতুর্থ প্রকাশ, সাহিত্যসঙ্গী, ডি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-০৯
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত	(১৪০৪ বঙ্গাব্দ) *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা
শঙ্করীপ্রসাদ বসু	(জানুয়ারি ২০০০) *কবি ভারতচন্দ্র*, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা-৭৩
শ্রীমন্তকুমার জানা	(জানুয়ারি ২০১১) *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, ওরিয়েণ্টাল বুক কো. প্রা. লি. ৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ০৯
সনাতন গোস্বামী সম্পাদিত	(এপ্রিল ২০১০) *ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল*, প্রথম খণ্ড, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা- ০৯
সুকুমার সেন	(১৯৭৫) *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংসকরণ, আনন্দ পাবলিশার্স লি. কলিকাতা ০৯
স্মৃতিকণা চক্রবর্তী	(জুন ২০১১) *মঙ্গলকাব্য পুচ্ছগ্রাহিতা ও মৌলিকতা*, জে. এন. ঘোষ অ্যাণ্ড সন্স, কলকাতা-৭৩

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলার মধ্যযুগের কাহিনিকাব্যে রূপায়িত গার্হস্থ্যজীবনের মূল্যায়ন

ছয়শতাধিক বছর পরিব্যাপ্ত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত বিভিন্ন ধারার কাহিনিকাব্যে বাঙালির গার্হস্থ্যজীবনের যে পরিচয় পরিস্ফুটিত হয়েছে তাতে পরিবর্তমান সামাজিক ইতিহাসের চিত্র পাওয়া যায়। সামাজিক জীব হিসেবে একজন মানুষের পরিচয় নির্ণয়ের জন্য যেমন তার বংশলতিকা জানার প্রয়োজন হয় তদ্রূপ একটি দেশের সাহিত্যভাণ্ডার আলোচনার ক্ষেত্রে কালের পরিসীমা, সমাজ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যুগের পরিক্রমানুসারে বাংলা সাহিত্যের কালকে ঐতিহাসিকেরা প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা করেছেন : প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ। বক্ষ্যমাণ গবেষণার শিরোনাম 'মধ্যযুগের বাংলা কাহিনিকাব্যে গার্হস্থ্যজীবন'। এতে মূলগ্রন্থ হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে—বড়ুচণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, সেখ ফয়জুল্লার *গোরক্ষ-বিজয়*, বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল*, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল*, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের *শিব-সঙ্কীর্ত্তন* বা *শিবায়ন*, মানিকরাম গাঙ্গলির *ধর্মমঙ্গল* এবং ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের *অন্নদামঙ্গল*। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ ধারা রোমান্সমূলক প্রণয়কাব্যেও গার্হস্থ্যজীবনের রূপায়ণ ঘটেছে যা সামাজিক ইতিহাসেরই অংশ। বিশেষ করে মুসলিম পরিবারের গার্হস্থ্যজীবনের পরিচয় সেখানে বিধৃত। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় এ ধারাকে আমরা অনুবাদ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত বলে অন্তর্ভুক্ত করিনি। অনূদিত *রামায়ণ-মহাভারতের* আলোচনাও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আমাদের আলোচনার পরিধিভুক্ত কাহিনিকাব্যে গার্হস্থ্যজীবনাচরণ আলোচনায় একদিকে যেমন স্থান পেয়েছে রাজনৈতিক উত্থান-পতন, অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক অনুশাসন অন্যদিকে তেমনি আলোচিত হয়েছে বাঙালির যাপিত-জীবনের প্রাসঙ্গিক ও প্রাত্যহিক কার্যাবলি বিশেষ করে পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ, সপত্নী বিদ্বেষ, সন্দেহ-শঙ্কা, উৎকণ্ঠা। এ ছাড়াও সন্তান লালন-পালন, খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা, অলঙ্কার, সাজ-সজ্জা, বাসস্থান, গৃহস্থালি দ্রব্যাদি, অবসর ও বিনোদন এবং সামাজিক উৎসব-পার্বণ তথা জন্মপূর্ব এবং জন্ম পরবর্তী অনুষ্ঠানসমূহ। বিবাহ পরবর্তী অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বহুবিবাহ, পণপ্রথা, বৈধব্য এবং মৃত্যু ও সতীদাহ প্রথা জন্ম-পরবর্তী অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও পালিত হয় বিভিন্ন পার্বণিক ও অপ্রধান ব্রতমূলক অনুষ্ঠান।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ মানুষের আয়ুষ্কালকে শতবর্ষ ধরে যে চারটি বর্ণাশ্রমের (ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস) প্রভাব আলোচনা করছেন সেখানেও গার্হস্থ্যধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ অর্থে গৃহগত ক্রিয়াদি সম্পাদন করাই হচ্ছে গার্হস্থ্যধর্মের মূল উদ্দেশ্য। তবে এর সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট।

এ কথা স্বীকৃত যে, মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য ছিল অনেকটাই তত্ত্বাশ্রয়ী ও প্রধানত দেবনির্ভর। দেব-বন্দনা বা দেবস্তুতি ছিল মূল বিষয়। মানুষ কখনো স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে দেব-বন্দনা করেছে আবার কখনো রোষের শিকার হয়ে বাধ্য হয়ে দেব-দেবীর আরাধনা করেছে। মধ্যযুগের কাহিনিকাব্য বিশ্লেষণে দেখা যায় বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে দেব-দেবীগণ তাদের আধিপত্য বিস্তার তথা মর্ত্যলোকে দেবতার স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য স্বর্গের কোনো দেবশিশু আবার কখনো কোনো নর্তক-নর্তকীকে সামান্য অপরাধে অভিশপ্ত করে মর্ত্যে পাঠিয়েছেন নিজেদের স্বার্থে। অভিশাপ প্রাপ্ত দেবশিশু ও নতর্ক-নর্তকীরা মর্ত্যে তাদের যাপিত জীবনে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে দেবতার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারপর অভিশাপ কাল শেষ করে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এর মাঝখানে যে ঘটনা প্রবাহ সেই ঘটনা প্রবাহই কবিগণ সমাজপটে স্থাপন করেছেন নানা বৈশিষ্ট্যে, নানা বৈচিত্র্যে ও নানা অলৌকিকতায়। কাহিনিকাব্যে সাধারণত মর্ত্যলোকের দরিদ্র অনার্য-অন্ত্যজ ও সচ্ছল মানুষের গার্হস্থ্যজীবন-চিত্র পৃথক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। দেবখণ্ডে কবিরা সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্যের আলোকে অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে দেবতাদের সংসার-চিত্রও আলোচনা করেছেন। সুতরাং মধ্যযুগের কাহিনিকাব্যে গার্হস্থ্যজীবনের চারটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। ক. দেবতাদের গার্হস্থ্যজীবন খ.

দরিদ্রের গার্হস্থ্যজীবন গ. মধ্য-স্তরের সচ্ছল গার্হস্থ্যজীবন এবং ঘ. উচ্চবিত্তের গার্হস্থ্যজীবন (বণিক সম্প্রদায় ও রাজ-রাজাদের)।

প্রাচীন ভারতে ও মধ্যযুগে এমন বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, গার্হস্থ্যজীবনের পূর্ণতা আসে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সন্তান উৎপাদন তথা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করা এবং তাদের যোগ্য করে গড়ে তোলার মাধ্যমে। পরিবার হচ্ছে আত্মা ও আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ যৌথবদ্ধ একটি সংগঠন। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার গার্হস্থ্যজীবনের মূলসংগঠন হিসেবে বিবেচ্য। মানবজীবনে পরিবারের অবস্থান পবিত্র ধর্মস্থানের চেয়েও ওপরে। গবেষণাকর্মে নির্বাচিত কাহিনিকাব্যে যে পরিবার ব্যবস্থা বিধৃত হয়েছে সেখানে যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার প্রথাই বেশি লক্ষণীয়। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, *মনসামঙ্গল*, *চণ্ডীমঙ্গল*, *শিবমঙ্গল*, *ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলে* যে পরিবার ব্যবস্থা দেখা যায় সেখানে পরিবারের সদস্যররা মা-বাবা, স্ত্রী, সন্তানাদিসহ একত্র বসবাস করে। মধ্যযুগে সামন্তসমাজব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় রাজা-বাদশাগণ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন বিধায় তাঁদের একাধিক পত্নী থাকা অস্বাভাবিক ছিল না। যদিও সামন্তরাজাদের পত্নীরা শ্বশুর-শাশুড়ি, দাস-দাসীকে নিয়ে একত্র বসবাস করতেন। *চণ্ডীমঙ্গলে* ধনপতি, শ্রীমন্ত, *অন্নদামঙ্গলে* হরিহোড় এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে লাউসেন একাধিক পত্নী নিয়ে যৌথ পরিবারে বসবাস করতেন। পৌরাণিক অংশে শিব-পার্বতীর সংসারও ছিল একান্নবর্তী ; সেখানে তাঁদের সন্তান ছাড়াও অবস্থান করতেন জয়া, বিজয়া, পদ্মা, নন্দী এবং ভৃঙ্গী। আলোচ্য কাহিনিকাব্যে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। সমাজের একদিকে যেমন অন্ত্যজ দরিদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে আছে কালকেতু-ফুল্লরা, বিষ্ণুহোড়-পদ্মিনী এবং অন্যদিকে আছে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি চাঁদ সদাগর-সোনকা, সাহেবেনে-সুমিত্রা, ধনপতি-লহনা-খুল্লনা, রঞ্জাবতী-কর্ণসেন। আর পৌরাণিক অংশে শিব-পার্বতীর সংসার। শিবকে উপস্থাপন করা হয়েছে ভিখেরি হিসেবে ; পরবর্তীতে সুগৃহিণী পার্বতীর পরামর্শে চাষকাজে সম্পৃক্ত হয়েছেন তিনি। সকল সম্প্রদায়ের মানুষ নিজ নিজ পেশা বা বৃত্তি অবলম্বন করে অর্থনীতিতে অবদান রাখে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ পাই গোয়ালা সম্প্রদায়ের পরিচয় যারা দধি-দুধ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। মধ্যযুগের এ সুদীর্ঘ কালপরিসরে এ সকল পরিবারে প্রভাব ফেলেছে রাজনৈতিক উত্থান-পতন, অর্থনৈতিক সংকট ও নানা সামাজিক অনুশাসনের আধিপত্য। তবে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে জীবন। পারিবারিব দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, কলহ , সপত্নী বিদ্বেষ, মায়ে-ঝিয়ের সম্পর্ক, শাশুড়ি-ননদ-পুত্রবধূর সম্পর্ক কখনো হয়েছে মধুর আবার কখনো পরিণত হয়েছে তিক্ততায়। এ সম্পর্ক কালের সাক্ষী হিসেবে গ্রথিত আছে মধ্যযুগের কাহিনিকাব্যের পাতায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের বিনাশ রোধ এবং অধার্মিকদের পতনের মহান ব্রত নিয়ে অবতার রূপে দৈবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কংসবধের পূর্বে মথুরা গমনের আগ পর্যন্ত কৃষ্ণের যে আচরণ সেখানে দেবত্বের লেশ মাত্র পাওয়া যায়নি। জন্ম থেকে বিরহখণ্ড পর্যন্ত কৃষ্ণ একজন লম্পট গ্রাম্য বালক ছাড়া কিছুই ছিলেন না ; ছিলেন শুধুই রাধার প্রেম প্রত্যাশী, রাধাকে বিভিন্ন ভাবে উত্ত্যক্ত করাই ছিল কৃষ্ণের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। কুলবধূ রাধা প্রথমে কুলগর্বে গর্বিত হলেও সময়ের ধারাবাহিকতায় এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনীয়তায় পরবর্তীতে জাত-কুল-মান ত্যাগ করে কীভাবে কৃষ্ণতে লীন হলেন তা চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন কবি বড়ু চণ্ডীদাস। এ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ঐ সময়ের সমাজ-সংসারের নানা প্রসঙ্গ। একদিকে গোপ-পল্লিবাসীর গৃহগত জীবন এবং অন্যদিকে বৃন্দাবনের প্রকৃতি ও মাহাত্ম্য। গোপপল্লির বাসিন্দাগণের মধ্যে পুরুষগণ গো-পালন করেন, স্বয়ং কৃষ্ণও রাখালরাজ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। গোপবধূগণ গৃহগত কাজের পাশাপাশি দধি, ঘি, মাখন তৈরি করে মথুরার হাটে যেতেন বিক্রি করতে। রাধাও গোপবধূ হিসেবে উক্ত কাজই করতেন। এই যাতায়াতের মধ্য দিয়েই রাধা ও কৃষ্ণের চরিত্রে ঘটে স্খলন। পরিবার-পরিজন ও সমাজ উপেক্ষা করে রাধা ও কৃষ্ণের এই অনৈতিক মেলামেশা সমাজ তথা রাধার শ্বশুরকুল মেনে নেননি। এতে ঘটেছে পারিবারিক বিপর্যয় ; পাহারা

বসানো হয়েছে রাধার গতি-বিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য। ফলে সৃষ্টি হয়েছে পারিবারিক মনোমালিন্য। শাশুড়ি-ননদ এবং পুত্রবধূর সম্পর্কে ধরেছে চির, সৃষ্টি হয়েছে অবিশ্বাস। ননদ রাধাকে পাহারা দিয়েও যখন আটকাতে পারেননি, তখন শাশুড়ি বাধ্য হয়েছেন পুত্রবধূকে গৃহে আটকে রাখতে। বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* শাশুড়ি-ননদ ও পুত্রবধূর সম্পর্ক কতটা তিক্ত ছিল সেটা ফুটে উঠেছে তাদের গতি বিধির মধ্য দিয়ে। রাধা নিজেই স্বীকার করেছেন শাশুড়ি-ননদ তার বড়ই 'দুরুবার'। এমনকি রাধা স্বামী আইহনের চোখ ফাঁকি দিয়ে কীভাবে পর-পুরুষের প্রেমে মত্ত হন এবং এর ফলে তার সংসার তথা সমাজে কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটা বংশীধ্বনি শুনে রাধার উৎকণ্ঠা এবং রান্নার বিপর্যয় থেকে বোঝা যায়। কৃষ্ণের জন্য রাধার উৎকণ্ঠা ও আবেগ পারিবারিক জীবনে ব্যত্যয় ঘটিয়েছে। কুলবধূ রাধা স্বামীকে আড়াল করে কৃষ্ণের প্রেমে মজেছেন। স্বামীর সাথে রাধার এ চরম প্রতারণা তার পরিবার ঘৃণার চোখে দেখেছে। ফলে কাব্যটিতে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অপেক্ষা লৌকিক প্রণয় বিলাসই বেশি উপস্থাপিত হয়েছে। আর পারিবারিক এ স্খলনের মধ্য দিয়ে কবি সমাজ সংসারে গোপ সম্প্রদায়ের অন্দরমহলের চিত্র তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন যা সামাজিক ইতিহাস রচনার তথ্য ও উপকরণের অতি প্রয়োজনীয় অংশ।

মানুষ অভিযোজনের তাগিদে কীভাবে পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ায় আবার চৈতন্যোদয় হলে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে *গোরক্ষ-বিজয়ে* মীননাথ তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নৈতিক চরিত্র স্খলনের ফলে অভিশাপ প্রাপ্ত মীননাথ যোগতত্ত্ব ভুলে কদলি নগরে গিয়ে ষোলশ কদলি নারী নিয়ে ভোগ বিলাসে মত্ত ছিলেন এবং শিষ্য কর্তৃক কীভাবে সেই অপরাধ জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে যোগতত্ত্বে ফিরে এলেন সেই কাহিনিই ফুটে উঠেছে *গোরক্ষ-বিজয়* কাব্যে। প্রকৃতিগত ভাবেই কদলি নগর ছিল পুরুষ শূন্য এবং অর্থ বিত্তে সম্পদশালী। ফলে এ শহরের নারীরা ছিলেন কিছুটা উদ্ধত এবং স্বাধীনচেতা। তবে কোনো পুরুষ পেলে তারা মনে করতেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছেন এবং তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে স্ত্রীর স্বীকৃতি পেতে চাইতেন। একটা যুগল সম্পর্ক তাদের জন্য খুব প্রয়োজন ছিল। মীননাথ এ সুযোগটি কাজে লাগিয়েছিলেন। এখানে অদ্ভুত এক সংসার জীবনের চিত্র আছে। একমাত্র পুরুষ মীননাথ আর তার ষোলশ নারী বা স্ত্রী। তাদের অনুভূতি ছিল, ষোলশ নারীর সাথে মীননাথের দাম্পত্য সম্পর্কও ছিল, বিন্দুনাথ নামে এক পুত্র সন্তানের জনকও হয়েছেন তিনি, ছিল খাওয়া-দাওয়ার বাহার। রাজপ্রাসাদে তারা শয়ন করতেন, অলৌকিক ঘটনারও অনেক উল্লেখ আছে। মীননাথ নিজের অজান্তেই এ সকল ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন কিন্তু শিষ্য কর্তৃক চৈতন্য ফিরে পেয়ে আবার যোগী জীবনে থিতু হলেন। এক ধরনের অদ্ভুত সংসারাশ্রমের চিত্র এখানে উপস্থাপিত হয়েছে বটে তবে সন্ন্যাসধর্ম ও গার্হস্থ্যধর্ম যে এক সাথে চলতে পারে না মীননাথের যোগী জীবনে ফিরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সেটি প্রমাণিত হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা কাহিনিকাব্যে গার্হস্থ্যজীবনের চিত্র অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে মঙ্গলকাব্যে। প্রবাদ আছে 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। গার্হস্থ্যজীবনের স্বরূপ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একটি পরিবারে নারী ছাড়া গার্হস্থ্যজীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। নারীই তার পরিবারটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে জীবন-যাপনের উপযোগী করে তোলেন ; অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ পারিবারিক সকল কাজে সম্পৃক্ত থেকে নিরলস পরিশ্রম করে পারিবারকে আগলে রাখেন। জীবনের পরম সুখ প্রাপ্তির জন্য পরিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। সংসার চলমান স্রোতের মতো ; এখানে চলতে গিয়ে জীবনে আসে নানা ঝড়-ঝাপটা, কখনো কখনো হাবুডুবু খেতে হয়, তবু জীবন থেমে থাকার নয়। মানবজীবনে তাই নানা সময়ে নানা সমস্যা দেখা দেয়—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক এসব সমস্যা অতিক্রম করার নামই হচ্ছে জীবন। চলমান এ জীবনে একই সাথে আসে সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন, হাসি-কান্না, দ্বন্দ্ব-বিরোধ, আনন্দ-বেদনা, সপত্নী বিদ্বেষ, দাম্পত্যকলহ, সপুত্রী বিদ্বেষ, মায়ে-ঝিয়ে দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অলৌকিকতা, পারিবারিক আচার-পার্বণ প্রভৃতি। মঙ্গলকাব্যে গার্হস্থ্যজীবন বর্ণনায় দুটি ধারা লক্ষ করা যায়—ক. পৌরাণিক বা দেবতাদের গার্হস্থ্যজীবন এবং খ . মর্ত্যলোকের সাধারণ মানুষের গার্হস্থ্যজীবন।

মর্ত্যলোকের মানুষের গার্হস্থ্যজীবন বর্ণনায় সাধারণত উচ্চশ্রেণির গার্হস্থ্যজীবন বিশেষ করে বণিক সম্প্রদায় ও রাজ-রাজড়াদের গার্হস্থ্যজীবন এবং নিম্নবিত্তের গার্হস্থ্যজীবন বিধৃত হয়েছে।

ঘন ঘন রাষ্ট্রশক্তির উত্থান-পতনের সাথে সাথে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে চলে যায় কখনো কখনো। মধ্যযুগের সামন্তসমাজে সাধারণ মানুষের জীবনের চরম দুঃখ-দুর্দশা ও লাঞ্ছনা কোনো বিশেষ এক সময়ের নয় বরং সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপী তা বিস্তৃত ছিল। রাষ্ট্রিক বিপর্যয় ও অর্থনৈকিত সংকট, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব এ সকল বিপর্যয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হয় নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা। সমাজে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান সর্বকালের, সর্বসময়ের। একদিকে মানুষ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খাচ্ছে অন্যদিকে দরিদ্র সম্প্রদায় ক্ষুধার অন্ন জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে। শিবের ভিক্ষায় বেরোনো এবং হা অন্ন হা অন্ন রব শোনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের চিত্রই ফুটে ওঠে। আবার বণিক সম্প্রদায়ের আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে বিলাসিতার ছাপ ফুটে উঠেছে। এ সকল কারণে সমাজে শ্রেণি বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। গঠনগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে মঙ্গলকাব্যে গার্হস্থ্যজীবনকে প্রধানত দুটি অংশে ভাগ করা যায়। যথা পৌরাণিক অংশ এবং লৌকিক অংশ।

মঙ্গলকাব্যের পৌরাণিক অংশে বা দেবখণ্ডে যে গার্হস্থ্যজীবন বর্ণিত হয়েছে সেখানে হর-পার্বতীর সংসার চিত্রের বর্ণনা আছে। প্রত্যেক কবি হর-পার্বতীর সংসার চিত্রকে অত্যন্ত রিক্ত, নিঃস্ব ও অসহায় করে বর্ণনা করেছেন। *মনসামঙ্গল* কাব্যে একদিকে দারিদ্র্যের কষাঘাত অন্যদিকে সপত্নী বিদ্বেষ ও অযোনিসম্ভবা কন্যা মনসার অন্তর্জ্বালা পার্বতীর জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল। তাছাড়া মহাদেবের পরনারী লুব্ধতাতো আছেই। এমন এক সংকটময় অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে দেবখণ্ডের গার্হস্থ্যজীবন। শিব-পার্বতীর অভাবের সংসারে দাম্পত্য কলহের মূল কারণই ছিল সপত্নী গঙ্গা এবং কন্যা মনসা। *মনসামঙ্গল* কাব্যের শুরুতেই দেখা যায় চণ্ডী ও মনসার দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বের মূল কারণ শিবের চরিত্র নিয়ে চণ্ডীর সন্দেহ। সন্দেহ দাম্পত্যজীবনে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে, সেখানে কোনো শ্রদ্ধা থাকে না। পার্বতীর বিশ্বাসের ভিতটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাই মনসা বার বার নিজের পরিচয় দিয়েও চণ্ডীকে শান্ত করতে পারেননি। বরং চণ্ডী আরও বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে মনসাকে আঘাত করেছেন। এক পর্যায়ে চণ্ডীর নখের আঘাতে মনসার একটি চোখ অন্ধ হয়ে যায়। অবিশ্বাসের এ দ্বন্দ্ব সংসারে অশান্তি বয়ে আনে। অবশেষে গঙ্গা এসে তাঁদের কন্দল রোধ করেন। এরপর শুরু হয় সপত্নী কলহ। চণ্ডী কখনো মনসাকে শারীরিক আঘাত করে আবার কখনো বিষবাক্য নিক্ষেপ করে বিব্রত করেছেন। বার বার অত্যাচারিত হওয়ার পর ধৈর্যচ্যুত হয়ে মনসা চণ্ডীর দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিজেকে রক্ষা করেন। স্ত্রৈণ শিবের অনুরোধে মনসা চণ্ডীকে বিষমুক্ত করেন। বিষমুক্ত হয়ে চণ্ডী অভিমান করে তাঁর দুই পুত্রকে নিয়ে বাবার বাড়ি যেতে উদ্যত হলে শিব সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনতে মনসাকে বনবাসে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন। একদিকে স্ত্রীর মন রক্ষা অন্যদিকে কন্যার সুরক্ষা—পারিবারিক জীবনের এই উভয় সংকটে পড়ে শিব স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক রাখতে গিয়ে কন্যার প্রতি অবিচার করে বনবাসে পাঠালেন। ফলে স্ত্রৈণ শিব তাঁর কন্যাকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হলেন। শিব ও চণ্ডীর গার্হস্থ্যজীবনের অন্তরায় ছিলেন গঙ্গা এবং মনসা। সেই একই পরিবারে আবার দেখা যায় যে চণ্ডী ঈর্ষা পরবশত মনসাকে নানা ভাবে ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেছেন, আবার সেই চণ্ডীই মনসার বিয়ের প্রাক্কালে সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। নারীদের একই অঙ্গে ভিন্ন রূপ। এখানেই চণ্ডীর মাতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তবে যে বিষদৃষ্টি একবার অন্তরে গ্রথিত হয় তা মুছে ফেলা খুব কঠিন, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে পরবর্তী সময়ে। মনসা সেই দুঃখী নারী ও হতভাগ্য মা যিনি ঘর-বাড়ি, ভিটেমাটি ছাড়া হয়েও জীবনের শেষ রক্ষা করতে পারেননি বরং নিষ্ঠুর সমাজের এমন বিষনজরে পড়েছিলেন যে মায়াবলে তার সন্তানের জন্য প্রাকৃতিক নিয়মে সঞ্চয়কৃত দুধ পর্যন্ত শুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ কাজটি আর কেউ নন করেছিলেন তার সৎ মা দেবী চণ্ডী। দেবী চণ্ডী নারী বিদ্বেষের চরম পরিচয় দিয়ে মাতৃত্বের অপমান করেছেন এ জঘন্য কাজের মধ্য দিয়ে। এমন ঈর্ষা, ক্রোধ ও দ্বন্দ্ব মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। এভাবে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে কখনো সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটছে আবার কখনো বা অবনতি। আর এভাবেই এগিয়েছে মঙ্গলকাব্যের পৌরাণিক

অংশের গার্হস্থ্যজীবন। পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষের এ সব উপকরণ সামাজিক ইতিহাসের অনন্য উপকরণ। আবার এই চণ্ডীর মধ্যেই চারিত্রিক রূপান্তরের বহুমাত্রিকতা লক্ষ করেছেন কবিগণ। যে চণ্ডী স্বামীর প্রতি সন্দেহবশত মনসার সাথে এমন ক্রূর আচরণ করতেন সেই চণ্ডীই আবার সতী রূপে দক্ষ-গৃহে পতি নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করে শিবকেই আবার স্বামী হিসেবে পাওয়ার জন্য গিরিরাজ জায়া মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন পার্বতী রূপে। পার্বতী কঠোর তপস্যা করে আবার শিবকেই স্বামী হিসেবে পান। সমস্ত আচার-পার্বণ ও বেদমন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শিব-পার্বতীর বিয়ে সমাপ্ত হয়। এ-ভাবেই নারী-পুরুষ সম্পর্কের এক বিচিত্র রূপ মধ্যযুগে রচিত কাহিনিকাব্যের অভ্যন্তরে চিত্রিত হয়ে যায়।

দুঃখ-দারিদ্র্য পার্বতীর ললাট লিখন। *চণ্ডীমঙ্গলের* দেবখণ্ডে দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ, শিব-পার্বতীর বিয়ে প্রভৃতি পুরাণ-আশ্রিত ঘটনা নিয়ে কবি মুকুন্দরাম বাঙালি পারিবারিক জীবনের এমন একটি নিখুঁত ও বাস্তব জীবন চিত্র অঙ্কন করেছেন। যেখানে দরিদ্র শিব-পার্বতীর দাম্পত্য জীবন, গণেশ ও কার্তিকের জন্ম, শ্বশুরালয়ে আশ্রিত থাকাকালীন মায়ে-ঝিয়ের দ্বন্দ্ব ও লাঞ্ছনাসহ পারিবারিক কলহের এক রসোজ্জ্বল চিত্র বর্ণনার মধ্য দিয়ে গ্রাম বাংলার এক সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের স্বরূপ উপস্থাপিত হয়েছে। বিয়ের পর মেয়েদের স্থান শ্বশুর বাড়িতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি এর ব্যত্যয় ঘটে তাহলেই সৃষ্টি হয় বিপত্তি যেটি পার্বতীর জীবনে ঘটেছিল। পার্বতী-জননী মেনকা মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনি এবং পার্বতীর তিন সখীকে ভাত জোগাতে জোগাতে অতিষ্ঠ হয়ে পার্বতীকে কটুকথা বলতে বাধ্য হন। ফলে মায়ে-ঝিয়ে সৃষ্টি হয় তুমুল ঝগড়া। অভিমান করে পার্বতী মায়ের দুয়ারে কাটা দিয়ে অর্থাৎ আর কখনো পিতৃগৃহে আসবেন না এমন প্রতিজ্ঞা করে স্বামী, সন্তান ও সখীদের নিয়ে কৈলাসে চলে যান। গার্হস্থ্যজীবনের এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। শিব-পার্বতীর দাম্পত্যজীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বার বার তাঁদের দুঃখ-দারিদ্র্যের উল্লেখ করেছেন কিন্তু কোথাও এ দুঃখ-দারিদ্র্য বড় হয়ে ওঠেনি বরং শিবের ভোজন রসিকতা, স্বামী-স্ত্রীর কলহ বর্ণনায় কবি হাস্য-রস সঞ্চার করে পাঠকের দুঃখ ভুলিয়েছেন। যদিও তাঁদের সংসারে অভাব নিত্য সঙ্গী এবং এজন্য শিবকে ভিক্ষা বৃত্তি বেছে নিতে হয় তবু তাদের দাম্পত্যে এতটুকু চির ধরেনি, কেননা শিব-পার্বতীর সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের। বার বার পার্বতী শিবকেই স্বামী হিসেবে ভজনা করেছেন। পার্বতীর মধ্য দিয়ে কবি বাঙালির নারী সত্তাকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। আবার *চণ্ডীমঙ্গলের* ধারার মধ্যেই *অন্নদামঙ্গলের* অবস্থান কারণ *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে দেবী অন্নদা চণ্ডী বা সতীরই পরিবর্তিত রূপ। এখানেও পার্বতী রাজদুহিতা হয়েও দারিদ্র্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিতা। পার্বতীর জীবনে অভাব-অনটন, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নিত্য সঙ্গী। সাধারণ বাঙালি নারীর ন্যায় নিজের কর্মের জন্য পার্বতী মাতা-পিতাকেই দোষারোপ করেন। অভাব-অনটনের এ সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পার্বতী অনেক সময় অভিমান করে স্বামীকে অভিসম্পাতও করেছেন। আবার সেই পার্বতীই স্বামী সন্তানকে ঠিকমত খাবার দিতে না পারার দুঃখে নিরন্তর কেঁদেছেন। অভাবের কারণে শিব-পার্বতীর সংসারে নিত্য কলহ। ভিক্ষাবৃত্তি করে শিব দিন গুজরান করেন। কিন্তু অলস শিব পরের দিন আর ভিক্ষায় যেতে চাইলেন না। শিবের পরিবারকে কখনো অনাহারে, কখনো অর্ধাহারে কাটাতে হয়। অভাবের কারণেও শিব-পার্বতীর সংসারে কলহের সৃষ্টি হতো। *অন্নদামঙ্গলে* শিব-পার্বতীর সংসারের যে দৈন্য-দশা কবি অঙ্কন করেছেন সেই চিত্রের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলাদেশের অতি সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার চিত্র প্রতিভাসিত হয়েছে। অভাব-অনটনের এ সংসারে শিব-পার্বতীর কলহ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে শিব ভিক্ষার পাত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েন দ্বারে দ্বারে কিন্তু কোথাও ভিক্ষা না পেয়ে লক্ষ্মীর শরণাপন্ন হলে লক্ষ্মী ঈষৎ শ্লেষের আশ্রয় নিয়ে অন্নদার কাছেই শিবকে পাঠালেন। অন্নদার হাতে অন্ন খেয়ে শিব অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হলেন এবং অত্যন্ত ঘটা করে অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য নিজেই অন্নদার পূজা দিলেন স্বর্গের দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে। একজন নারীর জীবনে যে কতটা রূপান্তর ঘটে এবং তাকে কতটা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয় পার্বতী তার জ্বলন্ত উদাহরণ। পার্বতীর মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের কবিরা সকল নারীর বিবর্তনকে তুলে ধরেছেন। যা সামাজিক ইতিহাসের অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য-উপকরণ। এই পার্বতীকেই আবার আমরা *শিবমঙ্গলে* দেখি কর্মবিমুখ শিবকে কর্মমুখী করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করতে এবং পরিশেষে পার্বতী জয়ী হন। শিব চাষ কাজে

নিযুক্ত হলেন। এর মাঝে ঘটেছে নানা ঘাত-প্রতিঘাত। মান-অভিমান, সন্দেহ, কলহ এ সব কিছু অতিক্রম করে হর-গৌরীর কৈলাসে সংসার যাপন। *মনসামঙ্গল* থেকে *অন্নদামঙ্গল* পর্যন্ত হর-গৌরীর সংসার জীবনের যে বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব. সংঘাত, মান-অভিমান, সন্দেহ, সপত্নী বিদ্বেষ, মায়ে-ঝিয়ের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি উপকরণ সামাজিক ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল হিসেবে বিবেচ্য। পার্বতীর বিবর্তনের মধ্য দিয়েই ঘটেছে পৌরাণিক অংশের গার্হস্থ্যজীবনের বিবর্তন কারণ সংসারের প্রতিটি পর্বে নারীর অংশ গ্রহণ অপরিহার্য। নারী ছাড়া গার্হস্থ্যজীবন অকল্পনীয়।

এছাড়া মঙ্গলকাব্যের পৌরাণিক অংশে পারিবারিক আচার-পার্বণের যে পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলো গতানুগতিক পদ্ধতিতে পালিত হওয়ার উল্লেখ আছে। বিশেষ করে বিবাহ, জন্মপূর্ববর্তী ও জন্মপরবর্তী আচার-অনুষ্ঠান এবং রান্নার পদ্ধতিতে গতানুগতিক নিয়ম-কানুন উপস্থাপিত হয়েছে। তবে খাবার প্রস্তুতকরণে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্নার উল্লেখ থাকলেও আমিষের কোনো উল্লেখ পৌরাণিক অংশে আলোচিত হয়নি। উৎসব-পার্বণে তেমন কোনো বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়নি।

মঙ্গলকাব্যের নরখণ্ডে গার্হস্থ্যজীবনের যে রূপ ও রূপান্তর প্রত্যক্ষ করা যায় সেখানে দুটি সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত। একদিকে দরিদ্র সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে উচ্চবিত্ত বা অভিজাত সম্প্রদায়। দরিদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা হলো নিদয়া, ধর্মকেতু, সঞ্জয়কেতু ও হীরাবতী, কালকেতু, ফুল্লরা, বিষ্ণুহোড়, পদ্মিনী, ঈশ্বরী পাটুনি, দাসু বাসু কালু ডোম, লখ্যা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আগত দর্শক, দাস-দাসীসহ পতিতা নারী নয়ানী এবং সুরিক্ষা। দরিদ্র সম্প্রদায়ের গার্হস্থ্যজীবন আলোচনায় কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে ধরা হয় *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে ধর্মকেতু-নিদয়া দম্পতি, সঞ্জয়কেতু-হীরাবতী দম্পতি এবং তাদের উত্তরাধিকারী কালকেতু-ফুল্লরা দম্পতিকে এবং *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে বিষ্ণুহোড়-পদ্মিনী দম্পতিকে। প্রথমাবস্থায় এদের যাপিত জীবন এবং দেবীর অনুগ্রহ লাভের পর তাদের জীবনের উত্থান কীভাবে গার্হস্থ্যজীবনে প্রভাব ফেলেছে সেটা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করেছেন কবিরা। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে ধর্মকেতু দম্পতির জীবনে অভাব ছিল, ছিল অনটনও কিন্তু ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের কোনো কমতি ছিল না। কন্যা ও পুত্র সন্তানকে সংসারী করে একটি সময়ে তাদের মনে হয়েছে গার্হস্থ্যজীবনে আবদ্ধ না থেকে মোক্ষ লাভের জন্য ব্রাহ্মণ্য আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে বারাণসী গমন করা উচিত। তখনই তারা পুত্র ও পুত্রবধূ ফুল্লরার ওপর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে বারাণসী গমন করেছেন। সঞ্জয়কেতু ও হীরাবতীর গার্হস্থ্যজীবনেও কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেনি বরং তাদের জীবন ছিল নির্ঝঞ্ঝাট। অর্থ বিত্তের অভাব থাকলেও মানসিক প্রশান্তির অভাব ছিল না। ফুল্লরার বিয়ের প্রাক্কালে তাদের স্বামী-স্ত্রীর আলাপচারিতায় প্রাগরসর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য নিয়ে বসবাস ছিল কালকেতু ও ফুল্লরার। কিন্তু তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়া ছিল খুব মধুর, সংযত ও শ্রদ্ধার। যদিও দেবী চণ্ডীর উপস্থিতিতে ফুল্লরা কিছু সময়ের জন্য বিভ্রান্ত হয়েছিলেন তবে পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পারেন। দাম্পত্য সুখ তথা গার্হস্থ্যজীবনের শান্তি স্থাপনায় ফুল্লরা স্বামীর সহযোগী হয়েছেন ; প্রতিদ্বন্দ্বী নয় সহধর্মিণী-রূপে গৃহস্থালির সমস্ত দায়িত্ব নিজ হাতে সামলিয়েছেন। শ্বশুর-শাশুড়ির জন্য মাসোহারা পাঠানোর মধ্য দিয়ে ফুল্লরার চরম কর্তব্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। নিজে বাজার সওদা করে রান্না করে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করার মধ্যে স্বামীর প্রতি যেমন তার প্রচণ্ড ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে তদ্রূপ কালকেতুর পায়ের আওয়াজ শুনে স্বামীর আগমন বার্তা উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে স্বামীর জন্য ফুল্লরার চরম ব্যাকুলতাও প্রকাশ পেয়েছে। হতদরিদ্র কালকেতু-ফুল্লরার দাম্পত্যজীবনের বোঝাপড়া ছিল শ্রদ্ধার, সহমর্মিতার ও সহযোগিতার। সুখে-দুঃখে তারা দু-জন দু-জনের পাশে থেকেছেন। যখন কালকেতু সম্বল জোগাড় করতে পারেননি তখন সখীর কাছ থেকে ধার করার পরামর্শ কালকেতুই ফুল্লরাকে দিয়েছেন। অভাবের যন্ত্রণায় ফুল্লরা কখনো কখনো অভিমান করে নিজের মৃত্যু কামনা করেছেন, অনেক সময় বিধাতাকেও অভিসম্পাত করেছেন কিন্তু স্বামীকে কখনো অভিসম্পাত করেননি। এখানেই ফুল্লার মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। অর্থ-বিত্ত দিয়ে ভালোবাসা পরিমাপ করা যায় না তা কালকেতু ও ফুল্লরার দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়। কালকেতু ছিলেন ফুল্লরার প্রাণ। দেবী চণ্ডীকে কেন্দ্র করে ফুল্লরা যখন

কালকেতুকে ক্ষণিকের জন্য সন্দেহ করে অভিযোগ করেছিলেন তখন কালকেতুও তার পৌরুষের জোর খাটাতে স্ত্রীকে শাসিয়ে ছিলেন বটে তবে খুব কম সময়ের মধ্যে উভয়ে তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। পরবর্তীতে দেবী প্রদত্ত ধনে ধনী হওয়ার পর কেনাকাটায়, বন কেটে নগর নির্মাণ, প্রাসাদ তৈরি প্রভৃতিতে রাজকীয় ছাপ পলিক্ষিত হলেও ঔদ্ধত্যপূর্ণ কোনো আচরণ কালকেতুর মধ্যে লক্ষ করা যায়নি। বরং কালকেতু হিন্দু-মুসলিম সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন তার নগরে বসতি স্থাপনের জন্য এবং নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কালকেতুর এ নমনীয়, ও কোমল স্বভাব প্রজাদেরকে আকৃষ্ট করেছে যা সামাজিক ইতিহাসের অনন্য উপকরণ। রাজ্যাভিষেকের পর দেবী চণ্ডীর প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে কালকেতু-ফুল্লরা-রূপী অভিশপ্ত নীলাম্বর-ছায়ার স্বর্গে প্রত্যাবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ফলে পুত্র পুষ্পকেতুর ওপর রাজ্যভার অর্পণ করে কালকেতু-ফুল্লরার ইহলোকের গার্হস্থ্যজীবনের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে। হত দরিদ্র সমাজের আর এক প্রতিনিধি হচ্ছে হা-অন্ন সমাজের নিরন্ন মানুষ বিঞ্চুহোড়-পদ্মিনী দম্পতি। বিঞ্চুহোড়ের পরিবারের হাহাকার বিশেষ করে বিঞ্চুহোড়ের স্ত্রী পদ্মিনীর জীবনাচরণ অনেককে কাঁদিয়েছে, আবার অনেকে তাকে পরিহাসও করেছেন। বিঞ্চুহোড় বনে-বাদাড়ে কাঠ কেটে, ঘুঁটে কুড়িয়ে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালান। লোকালয় ছেড়ে গ্রামের এককোণে লোকচক্ষুর বাইরে বিঞ্চুহোড়ের পরিবার খেয়ে না খেয়ে কোনো রকমে জীবন অতিবাহিত করে তবে পারিবারিক জীবনে কোনো কন্দল বা কলহ ছিল না তার। তবে বিঞ্চুহোড়ের পুত্র হরিহোড় যখন দেবী অন্নদার কৃপায় ফুলে-ফেঁপে বড় লোক হলেন তখন একবার নয় দুবার নয় চার-চার বার বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন। শুরু হলো চার সতিনের দ্বন্দ্ব। নিত্য কলহে দেবী অন্নদাও সেখানে টিকতে পারলেন না। অর্থ-বিত্ত যে পরিবারে সবসময় শান্তি আনে তেমনটি নয় বরং অর্থ ছাড়াও গার্হস্থ্যজীবনে সুখ-শান্তি বিরাজ করে তার জলন্ত উদাহরণ কালকেতু-ফুল্লরা ও বিঞ্চুহোড়-পদ্মিনী। কালুডোম ও লখ্যার পারিবারিক জীবন অপেক্ষা তারা যে প্রকৃত বীর, প্রকৃত যোদ্ধা মনিবের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়েছে। যদিও লাউসেন ধর্মঠাকুরের কৃপায় তাদের জীবন দান করেছেন। এমন অলৌকিকতার উদাহরণ *ধর্মমঙ্গলে* অনেক পাওয়া যায়। পতিতা নারী এবং কুটনি দাসীর আমদানি মধ্যযুগের কাব্যে অতি সাধারণ ঘটনা। কুটনি দাসী গার্হস্থ্যজীবনকে বিষিয়ে তুলতে এবং কলহ সৃষ্টিতে দারুণ পারদর্শী।

মঙ্গলকাব্যে অভিজাত সমাজে গার্হস্থ্যজীবনের যে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় সেখানে একদিকে রয়েছে সামন্তপ্রভুদের দাপট অন্যদিকে গার্হস্থ্যজীবনের নানা সংগতি ও অসংগতি নিয়ে কবিদের তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও কৌতূহলের সাক্ষ্য। মঙ্গলকাব্যে দেব-দেবীর আধিক্য ছাড়াও নিহিত থাকে সমাজ, পরিবার ও পারিবারিক জীবনের বিশ্বাস আদর্শ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, নায়কের শৌর্য, বীর্য, বীরত্ব, নারীর ধৈর্য, সতীত্ব, শোকোচ্ছাস, দুঃসাহসিক অভিযান, দাম্পত্যজীবন, সপত্নী বিদ্বেষ, সন্দেহ, কলহ, বিবাহযোগ্য পুত্র-কন্যার প্রতীক্ষা, অলৌকিকতা, কুলবধূর পতিনিন্দা, বারোমাস্যাসহ দেবী মাহাত্ম্যসূচক চৌতিশা। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই কবিরা তাঁদের কাব্যে মানবজীবনের এ-সকল পরিচয়কে অতি সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করেছেন। বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রাচীন মঙ্গলকাব্য *মনসামঙ্গলে* দেখা যায় কুপিতা দেবী মনসার রোষের শিকার চাঁদ সদাগরের পরিবার। চন্দ্রধরের পৌরুষ, দম্ভ, অহংকার, বীরত্ব মনসার বশ্যতা স্বীকার করেনি বিধায় দৈবী জিঘাংসার করাল থাবায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন চন্দ্রধর ও তার পরিবার। স্ত্রী সোনকা, ছয়পুত্র, ছয়পুত্রবধূ ও দাস-দাসী নিয়ে চন্দ্রধরের ছিল একান্নবর্তী সুখের পরিবার। সেই পরিবারে অশনিসংকেত হয়ে আসে দেবী মনসার রোষ। যে রোষের প্রতাপে ছারখার হয় চন্দ্রধরের সংসার। শুধু সংসার ছারখার হয়নি, মনসার রোষে চন্দ্রধরের গৃহগত শান্তিও হয়েছে বিনষ্ট। একসাথে ছয়পুত্রের মৃত্যু তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কালিদহে চন্দ্রধরের বাণিজ্যতরী ডুবিয়ে পদ্মা অর্থনৈতিকভাবেও তাকে বিপর্যস্ত করেছেন। সংসারের এ দুর্যোগের জন্য সোনকা চন্দ্রধরকেই দায়ী করেছেন ফলে তাদের দাম্পত্য জীবনেও সৃষ্টি হয়েছে দূরত্ব। পুত্র শোকে শোকাতুরা সোনকা অভিমানে স্বামীসঙ্গ পরিত্যাগ করে বনবাসী হতে চেয়েছেন। পরিশেষে সদ্য বিধবা পুত্রবধূদের একান্ত অনুরোধে পুনরায় স্বামীসঙ্গ লাভে সম্মত হয়েছেন। পারিবারিক এ উত্থান-পতন গার্হস্থ্যজীবনের অনিবার্য অংশ। মনসার কৃপায় সোনকা সপ্তমবার জননী হলেন

কিন্তু শর্ত ছিল বাসর রাতে তাকে হরণ করা হবে। একজন সন্তানহারা মা সন্তানের মুখ দেখার আনন্দে এ শর্ত মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু দূরদর্শী সোনকা বুঝতে পেরেছিলেন তার জীবনে আরও বেশি বিপদ অপেক্ষা করছে। এ আশঙ্কা সোনকাকে নিরন্তর ভাবায়। এ কারণেই তিনি পুত্রকে বিয়ে দিতে সম্মত ছিলেন না কিন্তু শারীরিক তাড়নায় লখিন্দর বিয়ের জন্য উদগ্রীব ছিলেন ; চন্দ্রধরও ছেলের বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন।

মনসামঙ্গলে সন্তান জন্মদানের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী পালনীয় আচার-পার্বণগুলো গতানুগতিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নিয়ম অনুযায়ী পালিত হয়েছে। গার্হস্থ্যজীবনকে সুপরিচালিত করতে একজন নারীর যে ধৈর্য ও বৈশিষ্ট্য থাকে তার প্রায় সবগুলো গুণ সোনকার মধ্যে ছিল বিধায় প্রায় ভঙ্গুর একটি পরিবার আবার মাথা উঁচু করে সগৌরবে স্বমহিমায় মহিমান্বিত হয়েছে। স্বামীর অবর্তমানে ছয়জন বিধবা পুত্রবধূকে আগলে রাখা এবং একই সাথে মাতৃ ও পিতৃস্নেহ দিয়ে সন্তানকে পিতার যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি করা খুব সহজসাধ্য কাজ ছিল না। সেই দায়িত্বটি খুব ভালোভাবেই সোনকা সামলেছিলেন। লখিন্দরকে জ্ঞানে-গুণে-পাণ্ডিত্যে এমনকি রাজনীতিতেও যোগ্য করে গড়ে তুলেছিলেন সোনকা।

মধ্যযুগে নারীদের প্রতি যে অবিচার করা হতো তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল নারীর সতীত্ব নিয়ে সন্দেহ। দূরদর্শী সোনকা এটি জানতেন সেজন্য চন্দ্রধর যখন দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য যাত্রায় যান তখন ছয় মাসের সন্তান-সম্ভবা সোনকা লোকাপবাদ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে স্বামীর নিকট থেকে গর্ভপত্র লিখে রেখেছিলেন। সোনকার এ আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। সোনকার জীবনে লোকাপবাদের প্রয়োজন হয়নি তার প্রিয় স্বামীই তাকে সন্দেহ করেছেন। দীর্ঘ বারো বছর পর নিজ বাড়িতে নিজ পুত্রকে দেখে চন্দ্রধর তার সতী সাধ্বী স্ত্রীকে সন্দেহ করেই ক্ষান্ত হননি বরং তাকে শারীরিক আঘাত পর্যন্ত করেছেন। পরবর্তীতে সোনকা গর্ভপত্র প্রদান করে কলঙ্কমুক্ত হয়েছেন। কিন্তু পতিব্রতা সোনকা চন্দ্রধরের দীর্ঘ প্রবাস জীবনে তাকে কোনো সন্দেহতো করেনইনি বরং চরম উৎকণ্ঠায় স্বামীর সুস্থ গৃহ-আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। এমনকি স্বামীর মৃত্যু সংবাদও বিশ্বাস করেননি এবং তার শ্রাদ্ধের আয়োজনে কোনো সম্মতি দেননি। অথচ যে স্বামী তাকে এতটা অবিশ্বাস ও সন্দেহ করেছেন সেই স্বামীর মনোস্কামনা রক্ষা করতে নিজের বোন মেনকাকে (মনসার ছদ্মবেশ) স্বামীর শয্যায় পাঠিয়েছেন নিজের দুঃখ বুকে চাপা দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে। দাম্পত্যজীবনে এ ধরনের সন্দেহ, কলহ কোনো বিশেষ কালের নয় বরং চিরকালের। দক্ষিণপাটন থেকে নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে চন্দ্রধর যখন চম্পকনগরে ফিরে এসেছেন তখন সোনকা কোনো অভিযোগ করেননি বরং পরম মমতায় স্বামীর পাশে থেকেছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন। পারিবারিক বিপর্যয়ে স্বামী-স্ত্রীর এ ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে গৃহগত শান্তি স্থাপনায় কবি চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এরপর সময়ের নিয়মে এগিয়েছে সোনকা-চন্দ্রধরের দাম্পত্যজীবন। লখিন্দর বড় হয়েছেন, তার বিয়ের পাত্রী খোঁজার ধুম লেগেছে ; অবশেষে উজানিনগরের সাহেবেনের মেয়ের সাথে লখিন্দরের বিয়ে স্থির হয়। অত্যন্ত রাজকীয়ভাবে বেদ-মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বেহুলা-লখিন্দরের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। বিয়েতে ব্রাহ্মণ্য রীতি অনুযায়ী সমস্ত নিয়ম-কানুন একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্র ও পুত্রবধূর মঙ্গলার্থে সোনকা পালন করেছেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি, ভবিতব্য অনুযায়ী চন্দ্রধরের পরিবার আবার দৈবী জিঘাংসার শিকার হয়। পুত্রের জীবনে নিরাপত্তার জন্য চন্দ্রধর লোহার বাসর ঘর নির্মাণ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু চন্দ্রধর এটা বুঝতে চাননি দেবতা-মানুষের দ্বন্দ্বে মানুষ কখনো জয়ী হতে পারে না। ফলত হলোও তাই কোনো নিরাপত্তাবলয়ই লখিন্দরকে রক্ষা করতে পারল না। লৌহ নির্মিত বাসরঘরে কালনাগিনীর ছোবলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন লখিন্দর। সপ্তম পুত্র লখিন্দরের মৃত্যু দুঃখিনী মায়ের অন্তরকে যেমন ভেঙে চুরমার করেছে তদ্রূপ সদ্য বিধবা বেহুলার মৃত স্বামীকে ফিরিয়ে আনার যে দুঃসাহসিক অভিযান সেটিও কাহিনিটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছে। পুত্রের মৃত্যুর জন্য শাশুড়ি বেহুলাকে অভিযুক্ত করলেও বেহুলা সেদিকে কর্ণপাত না করে স্বামীর প্রাণ কীভাবে ফিরিয়ে আনবেন এহেন বিপদেও ধীর স্থিরভাবে সেই বিষয়ে ভাবতে থাকেন। অবশেষে ধর্মীয় সংস্কার শ্বশুরকে মনে করিয়ে দিয়ে

(সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে কলার মাজুষে ভাসানোর কথা) নিজে শব সহযাত্রী হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। মাত্র একদিনের বৈবাহিক সম্পর্কের মূল্য দিতে গিয়ে বাঙালি নারীর প্রতিনিধি বেহুলা জীবনে যে কতটা ঝুঁকি নিতে পারেন তা অবর্ণনীয় ও দৃষ্টান্তযোগ্য। স্বামী, সন্তান ও সংসার বাঙালি নারীর জীবনে পরম প্রাপ্তি। এটাকে টিকিয়ে রাখতে তারা নিজের জীবন বাজি রাখে। ত্যাগের মহিমায় এক ব্যতিক্রমী চরিত্র বেহুলা। আত্মশক্তিতে কতটা বলীয়ান হলে একজন অনিন্দ্য সুন্দরী সদ্য বিধবা নারী বৈধব্যের বেশ না ধরে, সধবার বেশে মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনতে মর্ত্যলোক থেকে স্বর্গলোকে গমন করেন এবং নিশ্চিত বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হন বেহুলা তার অনন্য দৃষ্টান্ত। কবির বিশ্বাস মতে বেহুলার পক্ষে এ দুঃসাহসিক কাজ করা সম্ভব হয়েছে তার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, সতীত্ব এবং সিঁথির সিঁদুরের জোরে। বিপদসংকুল এ যাত্রায় বেহুলা কখনো প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কখনো সতীত্বের জোরে আবার কখনো অভিসম্পাত করে নিজেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বেহুলা দেবলোকে গিয়ে নৃত্য গীত পরিবেশন করে দেবতাদের সন্তুষ্ট করেন, বিশেষ করে মহাদেবকে বশীভূত করতে সক্ষম হন। ফলে মহাদেবের নির্দেশে মনসা সকল ক্রূরতা পরিহার করে লখিন্দরের জীবন দান করেন। পরে চন্দ্রধরকে দিয়ে মনসার পূজা দেবেন এ শর্তে ছয় ভাসুর, ধনজনসহ চৌদ্দডিঙা ফিরিয়ে আনেন। নিজের স্বামী, সংসার ও শ্বশুরকুলের মঙ্গলের জন্য বাঙালি নারীরা যে কতটা আত্মত্যাগ করতে পারে তারই দৃষ্টান্ত বেহুলা চরিত্র। বেহুলা কখনো জীবন বাজি রাখেন, কখনো হাতে অস্ত্র তুলে নেন, কখনো নর্তকীর বেশ ধরেন। বেহুলা হচ্ছেন সেই বাঙালি নারীর প্রতিনিধি যিনি আপন মহিমায় ভাস্বর। বেহুলা মধুকর ডিঙায় চড়ে বীরেরবেশে শ্বশুর বাড়ির ঘাটে উপস্থিত হন। এ সংবাদ শুনে আবেগে আপ্লুত হয়ে চন্দ্রধর নদীর ঘাটে উপস্থিত হয়ে অবগত হন যে, এর বিনিময়ে মনসার চরণে ফুল নিবেদন করতে হবে। শুনে তখনই বিমর্ষ বদনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন চাঁদ। শুরু হয় পিতৃস্নেহ এবং প্রবল প্রতাপের দ্বন্দ্ব। অবশেষে দেবীতুল্য পুত্রবধূ বেহুলার সম্মান-ভালোবাসার কাছে চন্দ্রধরের পিতৃস্নেহ পরাজিত হয় এবং তাৎক্ষণিক আকাশবার্তা শুনে চন্দ্রধর মনসার পূজা দিতে সম্মত হন। তবে চন্দ্রধরের এ পরাজয় কোনো দৈবশক্তির কাছে নয়—এ পরাজয় স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, নিষ্ঠা ও সাধনার সম্মিলিত মানবীশক্তির সংবেদনশীলতার কাছে মানবের আত্মসর্ম্পণ। *মনসামঙ্গল* কাব্যে বেহুলা কেবল চন্দ্রধরের পুত্রবধূ নন তিনি মর্ত্যলোকের শ্রদ্ধেয়া নারীশক্তিরও মূর্তপ্রতীক। তাই বেহুলার নারীশক্তি চন্দ্রধরের প্রতাপের সমগোত্রীয় বা তার চেয়েও বেশি যা অস্বীকার করার ধৃষ্টতা চন্দ্রধরের ছিল না। পুত্রবধূর দৃঢ় মনোবল, আত্মপ্রত্যয় ও কঠোর সাধনার কাছে চন্দ্রধরকে মাথা নত করতে হয়। গার্হস্থ্যজীবনের সুখ-শান্তি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে এবং চরম সংকট মুহূর্তে বিপদ মোকাবিলা করতে নারীশক্তি যে কতটা ঝুঁকি নিতে পারে বেহুলার আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে তা সহজেই অনুমান করা যায়। গার্হস্থ্যজীবনে নারীর আত্মত্যাগ, ধৈর্য, সহনশীলতা, উদারতা, উৎকণ্ঠা, দায়িত্ববোধসহ পারিবারিক আচার-পার্বণ, উৎসব, ঝগড়া-বিবাদ, নারীগণের পতিনিন্দা, লোকাচার, অলৌকিকতা প্রভৃতি নানা দিক *মনসামঙ্গল* কাব্যে প্রতিভাসিত হয়েছে যা সামাজিক ইতিহাসের অনন্য উপাদান। যে উপাদানগুলো ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি সেই পারিবারিক-সামাজিক ইতিহাসই কবির বদান্যতায় অসামান্য শিল্পরূপ পেয়েছে *মনসামঙ্গল* কাব্যে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অভিজাত সমাজের প্রতিনিধি ধনপতি সদাগরের পরিবার, উজানিনগরের রাজা বিক্রমকেশরী এবং গৌড়রাজ সালেবান। *চণ্ডীমঙ্গলের* বণিক খণ্ডের কাহিনি মূলত ধনপতির পরিবারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে বেশি। ধনপতি ধনী বণিক, শুধু ধনী নন ভোগীও বটে। কারণ মধ্যযুগের সামন্তপতিরা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী, তাইতো ধনপতি ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও আবার দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারেন অনায়াসে। তিনি পায়রা ওড়াতে ভালোবাসেন, ভালোবাসেন পাশা খেলতেও। ধনপতির দ্বিতীয় স্ত্রী খুল্লনা প্রথম স্ত্রী লহনার খুল্লতাত ভগিনী। প্রথমাবস্থায় মোটা বুদ্ধির অধিকারী লহনা খুল্লনাকে মেনে নিলেও পরবর্তীতে দাসী দুর্বলার প্ররোচনায় নিজের স্বামী সৌভাগ্য বিনষ্ট হবে মনে করে খুল্লনার ওপর চালান অমানুষিক অত্যাচার। সপত্নী বিদ্বেষের যে বীজ ধনপতি রোপণ করেছিলেন তাতে সার-ঔষধ দিয়ে

মোটা-তাজা করেছিল দাসী দুর্বলা। লহনা ছিলেন নিঃসন্তান। এ ক্ষোভ ধনপতির ছিল তবে তিনি এটাকে হাতিয়ার হিসেবে না নিয়ে স্বল্প বুদ্ধির লহনাকে সাতপলা সোনা এবং পাটের শাড়ি দিয়ে মন ভোলাতে পেরেছিলেন অনায়াসে এবং আদায় করে নিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি। এছাড়াও আরও একটু ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন ধনপতি, স্ত্রীকে বলেছিলেন রান্না করতে করতে তার চেহারা মলিন হয়ে গেছে তাই তার জন্য একজন দাসী এনে দিচ্ছেন। আর সহজ-সরল লহনা স্বামীর এই মিষ্টি কথায় গদগদ হয়ে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন বুঝতেই পারেননি নিজের কী সর্বনাশ তিনি করলেন। পরবর্তীতে যখন দাসী ও সখী নীলাবতীর মাধ্যমে নিজের সর্বনাশের কথা জানতে পারলেন তখন তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলেন এবং খুল্লনার ওপর চালালেন পীড়ন। সপত্নী বিদ্বেষের এ নজির বাংলা সাহিত্যে বিরল। স্বামীর জাল চিঠি প্রদর্শন করে লহনা খুল্লনাকে নীচ বেশ ধারণ করিয়ে অখাদ্যসহ বনে বনে ছাগল চরাতে বাধ্য করেন। এত অত্যাচারের পরও খুল্লনা কখনো তার স্বামীকে অবিশ্বাস করেননি বরং তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন জাল চিঠি তার স্বামীর লেখা নয় এবং তার স্বামী তাকে কখনোই এত কষ্ট দিতে পারেন না। স্বামীর প্রতি খুল্লনার এ বিশ্বাস তাদের দাম্পত্যজীবনকে করেছে মহান এবং এ জন্য বাংলা সাহিত্যে খুল্লনা আজও পতিব্রতা ও সতী নারী হিসেবে ভাস্বর হয়ে আছেন। দেবীচণ্ডীর মধ্যস্থতায় তাদের জীবনে আবার শান্তি ফিরে আসে। স্বপ্নে দেবী চণ্ডী লহনাকে ভর্ৎসনা করলে লহনা পূর্বের ন্যায় খুল্লনার সাথে আচরণ করতে থাকেন, অবসান হয় সকল ভুলের। খুল্লনার ওপর অত্যাচার হচ্ছে স্বপ্নে এমন দৃশ্য দেখার পর ধনপতিও গৌড় থেকে উজানিনগরে ফিরে এসে খুল্লনার ওপর অত্যাচারের কাহিনি অবগত হন এবং জাল চিঠি দেখে রাগে-অভিমানে লহনাকে ভর্ৎসনা করেন। এতে লহনা অভিমান করে বাবার বাড়ি যেতে উদ্যত হলে চতুর ধনপতি মিষ্টি কথায় স্ত্রীর অভিমান ভাঙান। সকল মান-অভিমান, সন্দেহ-ঈর্ষা, হিংসা-বিদ্বেষ কেটে গিয়ে ধনপতি দুই স্ত্রী নিয়ে সুখে সংসার যাপন করতে থাকেন। ধনপতি যখন গৌড়ে তখন তার পিতা গত হন ফলে উজানিনগরে এসে ধনপতি পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করেন। শ্রাদ্ধে আগত অতিথিগণ খাদ্যগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কারণ খুল্লনা এক বছর বনে বনে অরক্ষিত ছিলেন বলে উপস্থিত অতিথি তার চরিত্রে সন্দেহ করেন এবং চরিত্র শুদ্ধির জন্য খুল্লনাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে এমন বিধান দেন। মধ্যযুগের সমাজে নারীদের অবস্থান খুব মজবুত ছিল না বিধায় সামান্য দোষ-ক্রুটি পেলেই তাদের চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করা হতো এবং নারীকে অগ্নিপরীক্ষার মতো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হতো। সেকালের সমাজে নারীদের অবমাননায় চরিত্র নিয়ে সন্দেহ একটি রীতিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু খুল্লনা একদিক থেকে ভাগ্যবতী ছিলেন কারণ চন্দ্রধরের মতো ধনপতি তাকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস কোনোটিই করেননি বরং এ দুর্যোগে ধনপতি স্ত্রীর পাশে ছিলেন। সতী খুল্লনা সমাজের এ অনুশাসনকে উচিত জবাব দিতে অগ্নি পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তার সতীত্বের তেজ দেখে সবাই ধন্য ধন্য করতে থাকেন। অমাবস্যার অন্ধকার কেটে যখন ধনপতির আলয়ে আলো প্রবেশ করেছে তখনই রাজাজ্ঞা আসে বাণিজ্যযাত্রার। রাজাকে নানাভাবে বুঝিয়েও ধনপতি এ যাত্রা থেকে রেহাই পাননি। এবারের বাণিজ্যযাত্রায় খুল্লনার মন সায় দিচ্ছিল না কারণ তিনি অনেক অমঙ্গল চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিলেন। তাই স্বামীর মঙ্গলকামনায় যাত্রার প্রাক্কালে খুল্লনা দেবীচণ্ডীর পূজায় যখন রত ছিলেন সেই সময় লহনা স্বামীর চোখে খুল্লনাকে বিষ প্রতিপন্ন করতে খবরটি স্বামীকে প্রেরণ করেন। পরম শৈব ধনপতি পূজাস্থলে এসে চণ্ডীর ঘট পায়ে ঠেলে ফেলে দেন। শুরু হয় *মনসামঙ্গল* কাব্যের মতো দেবতা-মানুষে দ্বন্দ্ব। সমস্ত নিয়ম অগ্রাহ্য করে ধনপতি বাণিজ্য যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। যাত্রার প্রাক্কালে খুল্লনা ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাই ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাওয়ার মতো লোকাপবাদ থেকে রক্ষা পেতে খুল্লনা স্বামীর নিকট হতে গর্ভপত্র লিখে রাখেন। দেবী চণ্ডীকে অপমান করার খেসারত ধনপতিকে দিতে হয়। চণ্ডী সমুদ্রবক্ষে প্রচণ্ড ঝড়ের সৃষ্টি করে ধনপতির ছয় ডিঙা ডুবিয়ে দেন। একটি ডিঙা নিয়ে ধনপতি কোনো রকমে সিংহল পৌঁছেন। কিন্তু বিধি বাম। কেননা সমুদ্রবক্ষে তিনি যে কমলে-কামিনী দর্শন করেছিলেন সেটা সিংহলরাজকে দেখাতে না পারার এবং মিথ্যা বলার অভিযোগে কারাবন্দি হন ধনপতি। মধ্যযুগের সাহিত্যে মাঝে মাঝে

এমন অলৌকিকতার আবির্ভাব ঘটিয়ে কবি কাব্যে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছেন। এভাবেই কখনো কখনো বাস্তব থেকে মানুষের দৃষ্টি একেবারেই সরিয়ে নিয়েছেন কবিরা।

এদিকে উজানিনগরে স্বামীর অবর্তমানে দাস-দাসীসহ দুই সতিন মিলেমিশে জীবন-যাপন করছেন। এরই মধ্যে খুল্লনার জীবনে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ—ভূমিষ্ঠ হয় খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত। সুলক্ষণযুক্ত পুত্রের জন্মোত্তর আচার-পার্বণ অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে পালিত হয়। স্বামীর অবর্তমানে খুল্লনা যে কাজটি খুব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছিলেন তা হলো পুত্রকে যোগ্য করে মানুষ করা। সেই সময়ে একজন নারী নিজে সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে পুত্রকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। খুল্লনার সংসারে অর্থ-বিত্তের অভাব ছিল না তবে সংসারের সকল দায়িত্ব দুই সতিনের কাঁধে নেওয়া খুব সহজ সাধ্য ছিল না। মধ্যযুগের নারীর বড় অসুবিধা ছিল গৃহকর্তা বাইরে গেলে তাদের সাথে যোগাযোগের কোনো মাধ্যম ছিল না। সারাক্ষণ ভয়, শঙ্কা ও আতঙ্কের মধ্য দিয়ে তাদের সময় কাটাতে হতো। এমন শঙ্কা নিয়ে পুত্রকে শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞানে-গুণে পিতার উত্তরসূরি হিসেবে তৈরি করা বেশ কঠিন ছিল। মায়ের অত্যাধিক যত্ন ও আদর্শে শ্রীমন্ত খুব অল্প বয়সে সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শাস্ত্র নিয়ে গুরু-শিষ্যে তর্কে গুরু রেগে গিয়ে শ্রীমন্তকে জারজ বলে গালি দেন। গুরুর আচরণে দুঃখ পেয়ে শ্রীমন্ত প্রতিজ্ঞা করেন পিতৃ অন্বেষণ করে এ অপবাদ মোচন করবেন এবং মাকেও কলঙ্কমুক্ত করবেন। অনেক সময় অপমানও যে সম্মানের পরিপূরক সেটি শ্রীমন্তের কৃচ্ছ্র সাধনা থেকে বোঝা যায়। পিতৃ অন্বেষণে দায়িত্ববান পুত্র মায়ের আশীর্বাদ ও রাজার আদেশ নিয়ে সিংহল-যাত্রা করেন। পথে কোনো বিঘ্ন না ঘটলেও সিংহল বন্দরে শ্রীমন্তও তার পিতার মতো কমলে-কামিনী দর্শন করেন কিন্তু রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্বের প্রতিশ্রুতি পেয়েও সিংহলরাজকে সেই মূর্তি দেখাতে ব্যর্থ ফলে তার অবস্থাও পিতার মতোই হলো। এবার সিংহলরাজ এতটাই রেগে গেলেন যে তাকে মশানে দেন ; কিন্তু চণ্ডী যার সহায় তার আবার ভয় কিসের ? দেবীচণ্ডীর কৃপায় শ্রীমন্ত এ বিপদ থেকে রক্ষা পান এবং রাজা চণ্ডীর মাহাত্ম্য বুঝে নিজ কন্যা সুশীলাকে শ্রীমন্তের সাথে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু পিতৃদর্শন না করে শ্রীমন্ত বিয়েতে সম্মত নন। পিতার প্রতি পুত্রের যে দায়িত্ববোধ শ্রীমন্তের আচরণের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়েছে। সেই মুহূর্তে শ্রীমন্তের ধ্যান-জ্ঞান হচ্ছে পিতাকে খুঁজে বের করা এবং মাকে কুলটা অপবাদ থেকে মুক্ত করা। অতঃপর শ্রীমন্তের জীবনে এলো সেই মাহেন্দক্ষণ ; পরিচয় হলো পিতা-পুত্রের। শ্রীমন্ত তার মা কর্তৃক প্রদত্ত অভিজ্ঞানপত্র এবং একটি অঙ্গুরি ধনপতিকে দেখান। এরপর ধনপতির আর কোনো সন্দেহ রইল না যে শ্রীমন্তই তার পুত্র। চণ্ডীকে পূজা না দেওয়া এবং তাঁকে অবজ্ঞা করার ফলেই ধনপতির এ দুর্ভোগ। পরে চণ্ডীর পরম ভক্ত শ্রীমন্ত পিতাকে চণ্ডীর ভজনা করতে অনুরোধ করেন। দীর্ঘ বারো বছর পর এই প্রথম পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ। ধনপতি পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে উজানিনগর ফিরে আসেন। বণিক খণ্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধনপতিকে দিয়ে চণ্ডীর পূজা পাওয়া। শ্রীমন্তের অনুরোধে চণ্ডীর উদ্দেশ্য সফল হলো। লহনা ও খুল্লনা একই সাথে স্বামী, পুত্র ও পুত্রবধূকে পেয়ে দারুণ খুশি। এয়োগণকে সঙ্গে নিয়ে লহনা ও খুল্লনা পুত্রবধূকে বরণ করেন। সকল হিংসা বিদ্বেষ ভুলে লহনা ও খুল্লনা স্বামী সন্তান ও পুত্রবধূকে নিয়ে সুখে সংসার করছেন কিন্তু মর্ত্যলোক সুখের জায়গা নয় এখানে পদে পদে বাধা-বিপত্তি এবং ক্ষণে ক্ষণে জীবনে পরীক্ষা দিতে হয়। রাজা বিক্রমকেশরী শ্রীমন্তকে শর্ত দেন এদেশের মাটির ওপরে তাকে কমলে-কামিনী দর্শন করাতে হবে, না পারলে গর্দান আর যদি পারেন তবে রাজকন্যা জয়াবতীর পাণিগ্রহণ করতে হবে। এ শর্তে শ্রীমন্ত জয়ী হন। দ্বিতীয় বিয়ের পূর্বে শ্রীমন্তও, তার পিতার মতো মিষ্টি কথায় প্রথম স্ত্রীর অভিমান ভাঙিয়েছেন। শ্রীমন্ত সংশ্লিষ্ট কথকতাতেও পুত্রের দায়িত্ব-কর্তব্য অভিযাত্রিক মানসতা, পারিবারিক পুনর্মিলন প্রভৃতি প্রসঙ্গে সমকালীন গার্হস্থ্যজীবন-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই কবি গতানুগতিক অনুবর্তন উপেক্ষা করতে পারেননি।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে মূলত লাউসেনের বীরত্ব ও তার কেরামতির কাহিনি বর্ণিত হলেও মানব জীবনের নানা সংগতি ও অসংগতি, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহের চিত্রও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে রূপায়িত হয়েছে। যদিও পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ অন্যান্য কাব্যের তুলনায় কম। এ কাব্যে পারিবারিক

কলহের চেয়ে রাজনৈতিক উত্থান-পতনের চিত্র বেশি এবং সেই উত্থান-পতন লাউসেন কীভাবে ধর্মঠাকুরের সহায়তায় সমাধান করে মানুষের হৃদয়ে ধর্মঠাকুরের চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সে-কাহিনিই প্রাধান্য পেয়েছে। কাব্যের শুরুতে লাউসেন জননী রঞ্জাবতীর বিয়েতে তার ভ্রাতা মহামদের ঘোর আপত্তি থাকায় তার অসাক্ষাতে গৌড়েশ্বর ও তার পত্নী অনেকটা চুরি করে বিপত্নীক বয়স্ক কর্ণসেনের সাথে রঞ্জাবতীর বিয়ে দেন। স্নেহের ভগ্নিকে এমন অপাত্রে পাত্রস্থ করায় মহামদের অভিমান থাকতে পারে, দুঃখ ও কষ্টও থাকতে পারে তাই বলে এতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠা হয়ত মহামদের উচিত হয়নি। এতে মহামদের কোনো লাভও হয়নি। প্রথম দিকে মহামদের সম্পর্ক ছিল প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আর এর বলি রঞ্জাবতীর অত্যন্ত সাধনার ধন ছোট্ট সন্তান লাউসেন। যাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন তারই মামা মহামদ। মহামদ আর এক কংস মামা, ভাগ্নের অনিষ্ট সাধনই যার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। মহামদ ভাগ্নের এক একটি উত্থান ও অদম্য শক্তি দেখে আরও বেশি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং গৌড়রাজকে দিয়ে তার নানা ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেন। এর মধ্য দিয়ে মামা-ভাগ্নের যে বিরল সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যেও বিরল যেটা কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে মহামদের এ প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং ভ্রষ্টা নারী নয়ানী এবং সুরিক্ষার ছলনা যা সমাজ তথা পরিবারকে কলুষিত করেছে। এছাড়া *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া পারিবারিক সংকট তেমন নেই। বরং লাউসেনের চার স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহমত মিশ্রিত যে সুন্দর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা বাংলা সাহিত্যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। হাকন্দে তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করে লাউসেন রাজ্যে ফিরে এসে সকল ঘটনা শুনে আবার ধর্মঠাকুরের সাধনায় সকল মৃত ব্যক্তির প্রাণ দান করেন। এমন অলৌকিক অনেক ঘটনার উল্লেখ *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে আছে। এ কাব্যের মূল বিষয় ক্ষমার মধ্য দিয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বাংলা-সাহিত্যে প্রথম মানব ধর্মের বিজয় কেতন উত্তোলন করেন। ধর্মচেতনার গণ্ডি পেরিয়ে তিনিই প্রথম সাহিত্যকে মর্ত্যচেতনার ধূলি-ধূসর রাজপথে নিয়ে আসেন। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে দেবী অন্নদা শিব কর্তৃক স্বর্গে পূজা প্রাপ্তির পর মর্ত্যে পূজা পাওয়ার জন্য কুবেরের অনুচর বসুন্ধরকে হরিহোড় রূপে এবং কুবের পুত্র নলকুবেরকে ভবানন্দ মজুমদার রূপে পৃথিবীতে পাঠান। সবাই প্রাপ্তির প্রত্যাশায় অধীর, দেবদেবীও এ প্রত্যাশা থেকে বাদ যাননি। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে নরখণ্ডে উচ্চবিত্ত সমাজের হরিহোড় পরিবার, বিদ্যাসুন্দর কাহিনির বিদ্যা ও সুন্দরের পরিবার এবং মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যানে ভবানন্দ মজুমদারের পরিবারের পরিচয় রয়েছে। বাংলা দেশের যে অঞ্চলে কবি জীবন অতিবাহিত করতেন সেই অঞ্চল বার বার বর্গীদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে। কবি নিজেও বহুবার বর্ধমান মহারাজার কোপ দৃষ্টিতে পড়েন। একদিকে কবির ব্যক্তিজীবনের লাঞ্ছনা অন্যদিকে বর্গীদের আক্রমণে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা জীবনকে জর্জরিত করেছিল। তার প্রভাব কিছুটা হলেও *অন্নদামঙ্গলে* পড়েছিল। দুভিক্ষ-পীড়িত সমাজের নিরন্ন মানুষ বিষ্ণুহোড় এবং তার পুত্র হরিহোড়। দেবীর আশীর্বাদে হরিহোড় যা হাত দিয়ে স্পর্শ করেন তাই সোনা হয়। দেবীর মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে চতুর হরিহোড় মর্ত্যে দেবীর পূজা না করে নিজ গৃহে দেবীকে অচলা হয়ে থাকার প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন। অত্যন্ত লোভী হরিহোড় বুঝলেন না দেবী কারো একার নন। অতিরিক্ত লোভ তার পতনের মূল। মতিভ্রম ঘটে হরিহোড়ের আর সৃষ্টি হয় পারিবারিক অশান্তি। একবার নয়, দুবার নয় চার চার বার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন তিনি। বৃদ্ধকালে ঘরে আনেন চতুর্থ স্ত্রী সোহাগীকে। আর এটাই তার জীবনে কাল হলো কারণ সোহাগী অত্যন্ত মুখরা নারী। বহুবিবাহজনিত পারিবারিক অশান্তির বীজ সংসারে তিনি নিজ হাতে বপন করলেন। অশান্তির এ সংসারে দেবী অন্নদা পর্যন্ত টিকতে পারেননি। হরিহোড়ের পতনের মধ্য দিয়ে কবি আর একটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি নিঃশেষ হওয়া এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার উত্থান সংকেতিত হয়েছে। ভবানন্দ মজুমদার সম্পন্ন চাকরিজীবী। দুই স্ত্রী, তিন সন্তান, মাতা-পিতা ও দাস-দাসী নিয়ে ভবানন্দের একান্নবর্তী পরিবার। এ উপাখ্যানে যুদ্ধ বিগ্রহের প্রসঙ্গ আছে। প্রতাপাদিত্যকে দমনের জন্য মানসিংহের বাংলায় আগমন, ঝড়-বৃষ্টির কবলে পড়া, ভবানন্দ কর্তৃক তাদের প্রাণ রক্ষা, ভবানন্দসহ মানসিংহের দিল্লি প্রত্যাবর্তন, অন্নদার মাহাত্ম্য অনুধাবন করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের অন্নদার পূজার

অনুমতি প্রদান এগুলো অনেকটা ইতিহাস-সংশ্লিষ্ট ঘটনা। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা ছাপিয়ে এখানে পারিবারিক দ্বন্দ্ব হাস্য ও ব্যঙ্গের ছলে ভারতচন্দ্র প্রকাশ করেছেন। মধ্যযুগের নারীদের বড় অসুবিধা হতো স্বামী প্রবাসে থাকা অবস্থায় যোগাযোগ করতে না পারা। ফলে তারা খুব উৎকণ্ঠায় সময় অতিবাহিত করতেন। তাদের এ উৎকণ্ঠার অবসান হতো স্বামী বাড়িতে ফিরে এলে। ঘরে দুই নারী থাকলে স্বামীসঙ্গ নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হতো। আর দাসী সেখানে ইন্ধন জোগাত। এ দৃশ্য খুব হাস্য-রসের মধ্য দিয়ে কবি বর্ণনা করেছেন। ভবানন্দ দিল্লি থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তার দুই স্ত্রী চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখীর মধ্যে স্বামীকে পরিতুষ্ট করা নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ভারতচন্দ্র এর মধ্য দিয়ে বহুপত্নীবিশিষ্ট পরিবারের গৃহগত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। আর চতুর ভবানন্দ খুব ধীর-স্থিরভাবে কারো মনে কোনো দুঃখ বা ক্ষোভের উদ্রেক না করে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন। তবুও এর মধ্য দিয়ে গৃহস্বামীর কিছু বাড়তি সুবিধা থাকলেও পত্নীরা কখনো কখনো বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। ভবানন্দের পরিবারে গৃহশান্তি অতটা বিনষ্ট হয়নি গৃহকর্তার বিচক্ষণতার জন্য। চন্দ্রমুখী-পদ্মমুখীর মধ্যে কোনো বাগ্‌বিতণ্ডা বা ঝগড়া-বিবাদ হয়নি কারণ সম্ভ্রান্ত পরিবারের সমাজ জানের চেয়ে মানের দিকে বেশি নজর দেয়। ভবানন্দের দুই স্ত্রীর আচরণ ও কথাবার্তায় শ্লেষ ও ব্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে তবে ঝগড়ার অবতারনা হয়নি। মূলত ভবানন্দ মজুমদারের পারিবারিক আবহের মধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের বর্ণনা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মধ্যযুগের কাব্যপ্রবাহে আরও একটি বিষয় লক্ষ করা যায় সেটি হচ্ছে নারীগণের পতিনিন্দা। এ বিষয়টি প্রত্যেক কবি খুব গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। মধ্যযুগের সাধারণ পরিবারের কুলবধূরা দাম্পত্যজীবনে খুব বেশি সুখী ছিলেন না। আবার চাহিদা মতো স্বামীও তারা পাননি বিধায় যখন কোনো সুন্দর, সুশ্রী জামাই দেখেছেন তখনই তারা নিজের পতির সাথে ঐ সকল জামাইয়ের তুলনা করে নিজেদের দুঃখ-বেদনার কথা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া চৌতিশার প্রভাব দেখা যায় মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে। বিপন্ন নায়ক-নায়িকার বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য চৌত্রিশ অক্ষর যোগে দেবস্তুতিই হচ্ছে চৌতিশা। প্রধানত ক হতে হ পর্যন্ত চৌত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক চরণের আদিবর্ণরূপে ব্যবহার করে রচিত স্তবকগুচ্ছই চৌতিশা নামে পরিচিত। যেমন *চণ্ডীমঙ্গলে* কালকেতুর ও শ্রীমন্তের চৌতিশা, *ধর্মমঙ্গলে* কানড়ার চৌতিশা, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* রাধার চৌতিশা। তবে *অন্নদামঙ্গলে* ভারতচন্দ্র অ অক্ষর দিয়ে মশানে সুন্দরের চৌতিশা বর্ণনা করেছেন।

কবি ভারতচন্দ্র তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাহিনিতে দেহচেতনাকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন। কাব্যটিতে কুমারী নারীর ইন্দ্রিয়বিলাসের কথা ব্যক্ত হয়েছে। বিদ্যা বিদুষী, রুচিশীলা, স্বাধীনা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী। রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী বিদ্যার স্বাধীন ও রুচিশীল ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটলেও তার চরম স্বেচ্ছাচারিতা গৃহগত শান্তি বিনষ্ট হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, যদিও রাজা বীরসিংহ বিচক্ষণতার সাথে বিষয়টি সামলেছিলেন। সেই সময় একজন রাজকন্যার একজন যুবকের হাত ধরে গৃহত্যাগ করার সিদ্ধান্ত এবং এ সিদ্ধান্তে সাড়া দিয়ে যুবকের সুড়ঙ্গ দিয়ে বিদ্যার গৃহে হঠাৎ আর্বিভাব প্রেমের এক অভিনব ফাঁদ। এটাই শেষ নয়, গান্ধর্বশাস্ত্র মতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিদ্যার সন্তান সম্ভবা হওয়ার ঘটনা মধ্যযুগের সমাজ-পটভূমিতে বিদ্যা ও সুন্দরের চরম দুঃসাহসের পরিচায়ক। যদিও রাজা ধীর-স্থিরভাবে বিষয়টি পর্ববেক্ষণ করে সুন্দরের আসল পরিচয় পেয়ে আনন্দের সঙ্গে সুন্দরের হাতে বিদ্যাকে সমর্পণ করেন। সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অনৈতিক ঘটনার অবতারণা করে নৈতিক শিক্ষা দানের প্রয়াস এসব ঘটনায় লক্ষ করা যায়।

বাঙালি চিরকালই ভোজন রসিক। রকমারি খাবার খেতে বাঙালি খুব পছন্দ করে। মাছ, মাংস, ডিম এবং বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি এবং ডাল বাঙালির প্রিয় খাবারের মধ্যে অন্যতম। মধ্যযুগের কাহিনিকাব্যে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্য রচয়িতাগণ খাবারের যে তালিকা বর্ণনা করেছেন তার মধ্য দিয়ে কবিদের ভোজন রসিকতার পরিচয় মেলে। সেই সাথে রন্ধন প্রণালির উল্লেখ খাবারের স্বাদ বৃদ্ধিতে যেমন সহায়ক তেমনি পুষ্টিগুণের দিকটিও কবির দৃষ্টিতে নিবদ্ধ ছিল। খাদ্য গ্রহণে শ্রেণিগত পার্থক্য সব সময় সমাজে প্রকাশ পায়। অন্ত্যজ শ্রেণির খাবারে আমিষ তো দূরের কথা সামান্য লবণ ভাতও অনেক সময় জুটত না। তাদের খাবারে

থাকত শাক, ওল কচু পোড়া, লাউ দিয়ে মুসুরির সুপ, খুদ জাউ, আমানি এবং মাঝে মাঝে সজারুর শিকপোড়া। অভিজাত পরিবারে সাধারণত তিন ধরনের খাবারের বর্ণনা পাওয়া যায়। আমিষ, নিরামিষ, মিষ্টান্ন দ্রব্য ও পিঠা-পুলি। মধ্যযুগে খাদ্যগ্রহণ কালে দেখা যায় প্রথমে তারা শুক্তো বা তেতো জাতীয় খাবার দিয়ে খাদ্যগ্রহণ শুরু করতেন এবং শেষে চাটনি বা টক জাতীয় খাবার দিয়ে শেষ করতেন। এর মধ্যেও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছিল কারণ তেতো জাতীয় খাদ্য আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং চাটনি বা টকজাতীয় খাবার হজমশক্তি বাড়ায় এবং রক্তের ঘনত্ব কমায়।

কোনো দেশের আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতি সেই দেশের মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল হওয়ায় এখানকার পুরুষের পোশাক ছিল সাধারণত ধুতি, পাঞ্জাবি এবং চাদর বা উত্তরীয়। মুসলমান পুরুষের পোশাক ছিল তহবন, কুর্তা বা পাগড়ি। তবে হিন্দু-মুসলিম নারীদের পোশাকে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। উভয় সম্প্রদায়ের নারীর প্রধান পোশাক ছিল শাড়ি। উন্নত মানের বিভিন্ন ধরনের শাড়ি তখন পাওয়া যেত যা শুধু অভিজাত সম্প্রদায়ের গৃহবধূগণের ভাগ্যে জুটত। বিশেষ করে কার্পাস তুলা দিয়ে তৈরি অতি সূক্ষ্ম মসলিন শাড়ি ছিল জগৎ খ্যাত। মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাস ও সাহিত্যে মহিলাদের বস্ত্রসম্ভারের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম শাড়ি ছিল—লক্ষ্মীবিলাস, মেঘলাল, খিলবলি, উদয়তারা, আসমানতারা, মেঘডুমুর, ময়ূরপেখম নীলাম্বরী, অগ্নিপাট, পীতাম্বর, পাটেরশাড়ি। অভিজাত পরিবারের পুরুষেরা অনুষ্ঠান-পার্বণে উন্নত মানের রেশম ও গরদের পোশাক পরিধান করতেন। পরিসংখ্যানে দেখা যায় বস্ত্র পরিধানে মধ্যযুগে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ছিল চরমে। ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি চাঁদ সদাগর, সোনকা, লখিন্দর, ধনপতি, লহনা, খুল্লনা, ভবানন্দ মজুমদার, চন্দ্রমুখী, পদ্মমুখী, লাউসেন, কলিঙ্গা, কানড়ার পোশাক-পরিচ্ছদ আভিজাত্যের পরিচয় বহন করে। পক্ষান্তরে কালকেতু, ফুল্লরা, বিষ্ণুহোড় ও পদ্মিনীর পোশাক-পরিচ্ছদে প্রতিফলিত হয়েছে হত-দরিদ্রের চিত্র। সামান্য উদরান্নের চিন্তা এ সব জনগোষ্ঠীকে ব্যাকুল করে। ফলে লজ্জা নিবারণের জন্য তারা পরিধান করে হরিণের ছড়, গাছের পাতা ও ছেঁড়া কাপড় অথবা চটের মোটা কাপড় ও খুঞার বস্ত্র। পাদুকা ব্যবহারের প্রচলন তৎকালে নারী সমাজে একেবারেই ছিল না। তবে পুরুষেরা বিশেষ করে ব্রাহ্মণ পুরুষেরা চটিজুতো পরতেন এবং অন্যরা পরতেন খড়ম।

বস্ত্র যেমন মানব দেহের লজ্জা নিবারণ করে অলঙ্কার তেমনি করে দেহের সৌন্দর্য বর্ধন। মধ্যযুগে নারী পুরুষ উভয়ে অলঙ্কার পরিধান করতেন। অলঙ্কার নারীর চিরকালই খুব প্রিয়। একদিকে এটি যেমন তাদের দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে অন্যদিকে এটি তাদের সম্পদও। এ কারণেই বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল কবি নারীদেহের সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কার ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন। সাধারণত সামন্ত জমিদার, ধনিক-বণিক, রাজা-বাদশা তথা অভিজাত পরিবারের কর্তারা তাদের গৃহিণীদেরকে যে-সকল অলঙ্কারে ভূষিত করতেন সেগুলো সাধারণত হীরা-জহরত, মণি-মুক্তা খচিত থাকত। ভাগ্যবতী রমণীরা মস্তক থেকে শুরু করে পদাঙ্গুলি পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারে বিভূষিতা হতেন। নারীর দেহে গলায় যে-সকল অলঙ্কার শোভা পেত তার মধ্যে অন্যতম ছিল—মোতিহার, চন্দ্রহার, সীতাহার, মোহনমালা, গজমুকুতারহার, হাঁসুলি। কর্ণে শোভা পেত কর্ণফুল, কুণ্ডল, কানপাশা, ঝুমকো; নাকে নথ, বেউলি, নাকচাবি, বেসর, নাকমাছি এবং সিঁথিতে সিঁথেপাটি। হাতের অলঙ্কারের মধ্যে অন্যতম ছিল কঙ্কণ, বলয়, চুড়ি ও শাঁখা। (হিন্দু নারীরা এয়োস্থির চিহ্ন হিসেবে শাঁখা, পলা ও খাড়ু পরিধান করেন) এ ছাড়াও বাহুতে নারী-পুরুষ উভয়ে সোনার বাজু ও সোনার তার পরতেন। আঙুলে অঙ্গুরি এবং কোমরে কিঙ্কিণী, কোমরবিছা ও কোমরপেটি ব্যবহৃত হতো। মেয়েরা পায়ে নূপুর, পাসুলি ও মল দিতেন। দরিদ্র নারীর অলঙ্কার ছিল রূপা, তামা, পিতল ও কড়ি দিয়ে তৈরি। অলঙ্কার ব্যবহারের পরিচয় সূত্রে মধ্যযুগের মানুষের শ্রেণিবিন্যাস, পারিবারিক সংস্কৃতি, রুচি ও সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গার্হস্থ্যজীবনের এক ভিন্নমাত্রিক রূপের পরিচয় এর মধ্য থেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

বঙ্গ ললনাগণ সৌন্দর্যবিলাসী না হলেও সৌন্দর্যপিপাসু ছিলেন। নিজেদেরকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করতে তারা আন্তরিক। মধ্যযুগে অঙ্গচর্চায় প্রধানত প্রকৃতির বিশাল ভাণ্ডার হতে উপকরণ সংগ্রহ করা হতো। অভিজাত সমাজে অঙ্গ পরিচর্যায় চন্দন, আমলকী, গিলা, হরিদ্রা, পিঠালি এবং বিভিন্ন প্রকার তেল ব্যবহারের উল্লেখ আছে। নারীর সৌন্দর্যবর্ধনে কেশ পরিচর্যার গুরুত্ব অপরিসীম। মধ্যযুগে লম্বা কেশের খুব গুরুত্ব ছিল। এ জন্য তারা কেশবর্ধন এবং কেশ বিন্যাসের নানা পরিচর্যা করতেন। কেশ সুবিন্যস্ত এবং পরিপাটি করার জন্য উন্নতমানের চিরুনি ব্যবহারের উল্লেখ আছে কাব্যে। মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশেষ করে কাহিনিকাব্যে খোঁপা এবং বেণী বাঁধার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। এই খোঁপা এবং বেণীতে বিভিন্ন প্রকার ফুল এবং মণি-মুক্তা গুঁজে দেওয়ার উল্লেখও পাওয়া যায়। তখনকার মহিলারা খোঁপাকে সুবাসিত করার জন্য ধূপের ভাপ দিতেন। এরপর খোঁপায় তারা গুঁজে দিতেন সোনা, রূপা ও তামা দিয়ে তৈরি করা বিভিন্ন নকশা করা কাঁটা। কিন্তু দরিদ্রকান্তার শখ-আহ্লাদ বলে তখনও কিছু ছিল না এখনও কিছু নেই। এমনকি তাদের সন্তানদের ক্ষেত্রেও একই বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়। ধনী-দরিদ্রের এ বৈষম্য কালে কালে যুগে যুগে একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। দরিদ্রের প্রসাধনীর মধ্যে অন্যতম ছিল সামান্য শঙ্খগুড়ো, সিঁদুর এবং হরিদ্রা। মধ্যযুগে পোশাক-পরিচ্ছদ, বিছানাপত্র, কাঁথা পরিষ্কারকরণে ব্যবহৃত হতো ক্ষার, কলার বাকলের ছাল, চুন ও গোমূত্র।

সেকালে নগর-সভ্যতার চরম বিকাশ না ঘটলেও আমির-ওমরাহ, সামন্ত-জমিদার, রাজা-বাদশাহ, ধনিক-বণিক সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রা ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে কবি আবদুল হাকিমের *লালমতি সয়ফুলমুলক* কাব্যে বর্ণিত রাজপ্রাসাদের এবং *চণ্ডীমঙ্গলে* কালকেতু নির্মিত গুজরাট নগরের স্থাপত্য-নৈপুণ্যের কথা বলা যায়। ধনীর অট্টালিকার পাশে গরিবের কুঁড়েঘরের কথা সেকালের কবিগণ বর্ণনা করেছেন।

শয্যা-উপকরণ এবং বিলাস-উপকরণেও বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগে শয্যা-উপকরণ বিশেষ করে খাট-পালঙ্ক, লেপ-তোষক, মূল্যবান মশারি ব্যবহারের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে বিত্তবানরা সোনা-রূপার থালায় ভাত খেতেন। এটা অত্যধিক বিলাসিতার লক্ষণ। গ্রীষ্মের উত্তাপ হতে রক্ষা পেতে মধ্যযুগে হাত পাখা ব্যবহারের উল্লেখ আছে। বিত্তবানেরা হাত পাখার সাথে শ্বেতচামর ব্যবহার করতেন।

গার্হস্থ্যজীবনে প্রতিটি মানুষের মানসিক অবসাদ হতে মুক্তি এবং শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে অবসর ও বিনোদন একান্ত প্রয়োজন। স্বর্গের দেব-দেবীগণ মনের প্রশস্তির জন্য নর্তক-নর্তকী রাখেন। শ্রমজীবী মানুষের কাছে বিনোদন হলো পরবর্তী কাজের জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ। এদের জীবনে বিনোদন আসে সারাদিন কাজের পর সন্ধ্যায়। মধ্যযুগে শ্রমজীবীরা সাধারণত নাচ, গান, গল্প এবং রামায়ণ, পাঁচালি ও নামসংকীর্তন শুনে সময় কাটাতেন। আর পারিবারিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনন্দ উপভোগ করতেন অন্তঃপুরের নারীরা। পুরুষদের বিনোদনের মাধ্যম ছিল বিভিন্ন প্রকারের ক্রীড়া। পুরুষদের গৃহগত ক্রীড়ার মধ্যে অন্যতম ছিল পাশা, দাবা, জুয়া ও তাস। বিয়ের রাত্রে বর-বধূ মিলে পাশা খেলার উল্লেখ মধ্যযুগের সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া অশ্বচালনা, নৌকা বাইচ, মল্লযুদ্ধের বিবরণ আছে।

সামাজিক উৎসব-পার্বণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটে। মধ্যযুগে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তার অবকাশ ছিল না। লোকাচার, শাস্ত্রাচার, সংস্কারে তাদের বিশ্বাস ছিল প্রবল। উৎসবের প্রকৃতি অনুসারে মধ্যযুগের কবিগণ সামাজিক উৎসবকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। এক. জন্মপূর্ব অনুষ্ঠান, দুই. জন্মপরবর্তী অর্থাৎ শিশুর জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঘটে যাওয়া জীবনের সকল ঘটনা এ পর্বে বর্ণনা করা হয়। সামাজিকীকরণে প্রথম ও প্রধান শর্তই হলো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুন্দর সুস্থ ও নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করা এবং ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করা। একজন নারী গর্ভবতী হলে তার গর্ভস্থ সন্তানকে ঘিরে যে সব মঙ্গলাচার পালিত হয় সে অনুষ্ঠানগুলোই হচ্ছে জন্মপূর্ব অনুষ্ঠান। সুস্থ, সুন্দর ও সুলক্ষণযুক্ত মঙ্গলময় সন্তান কামনায় মঙ্গলকাব্যের কবিগণ কোনো কুলবধূ গর্ভবতী হলে তার অনাগত সন্তানের শুভকামনায় গর্ভবতীকে কেন্দ্র করে কিছু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আয়োজনের বর্ণনা করেছেন। সন্তানের

Dhaka University Institutional Repository

চারমাস গর্ভকালীন সময়ে সীমান্তোন্নয়ন, পাঁচমাসে পঞ্চামৃত, ছয়মাসে পরমান্ন ভোজন, সাতমাসে সাধভক্ষণ এবং নয়মাসে নববস্ত্র পরিধানের যে বিধান পণ্ডিতগণ দিয়ে থাকেন তার পশ্চাতে প্রায়োগিক যুক্তি ছিল কিন্তু উত্তরকালে তা গতানুগতিক আচারে পরিণত হয়েছে। অনুষ্ঠান আয়োজনেও শ্রেণিভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে এ সব আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গার্হস্থ্যজীবনে সম্প্রীতির-আনন্দের স্ফুরণ যে ঘটত, তার পরিচয় আলোচিত কাব্যসমূহে পরিলক্ষিত হয়েছে।

জন্মপরবর্তী অনুষ্ঠানের মধ্যে শিশুকে কেন্দ্র করে যেসব অনুষ্ঠান পালিত হয় তার মধ্যে জাতকর্ম অন্যতম। এটি আঁতুর ঘরের সংস্কার। শিশুর শরীরে যেন কোনো অশুভ শক্তির নজর না লাগে সেজন্য দেবী ষষ্ঠীর পূজা পালিত হয়। এ সময় অন্ন, বস্ত্র, মিষ্টি, অর্থদান ইত্যাদি সামর্থ্য অনুযায়ী সন্তান লাভের আনন্দে অনেকে করে থাকেন। এরপর শিশুর ছয় মাস বয়স হলে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানের আয়োজন সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ সামর্থ্য অনুসারে করে থাকেন।

এরপর আসে শিশুর শিক্ষাদানের প্রসঙ্গ। সাধারণত শিশুর বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হলে তাকে হাতেখড়ি দিয়ে গুরুগৃহে পাঠানো হতো অথবা অবস্থাসম্পন্ন ভূস্বামীরা গুরুকে গৃহে এনে শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। মধ্যযুগে নারীশিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে তবে বেহুলা, লহনা, খুল্লনা এবং লীলাবতী যৎ সামান্য লিখতে বা পড়তে পারতেন। তবে এরা গুরুগৃহে অথবা টোলে গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করেছেন কিনা তার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায়নি। অবশ্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যা বিদুষী ছিলেন।

গার্হস্থ্যজীবনকে সুন্দর, গতিশীল, স্বচ্ছন্দ ও মধুময় করার জন্য নারী-পুরুষের পরস্পর সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। এটি আদিম অরণ্যচারী গুহাবাসী সমাজেও দেখা গেছে। সভ্যতার প্রথম সোপান খাদ্য উৎপাদন বা কৃষিকাজের শুভ সূচনা কিন্তু নারীর হাত দিয়েই শুরু হয়েছিল। অর্থনৈতিক বা কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের সহযোগী হয়ে সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি বজায় রেখেছে যা চর্যাপদ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি প্রমাণিত।

একা পুরুষ বা একা নারী কখনও সংসার সৃষ্টি করতে বা গার্হস্থ্যজীবন পরিচালনা করতে পারেন না। এ জন্য প্রয়োজন হয় যুগল সৃষ্টি। আর সন্তান-সন্ততি সে বন্ধনকে করে আরও দৃঢ় এবং আনন্দময়। মধ্যযুগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে (বিকিকিনি কাজে) নিম্নবিত্ত অসচ্ছল এবং মধ্যবিত্ত সচ্ছল সমাজে নারীকে পুরুষের সহযোগী হতে দেখা গেছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* রাধা-সখী পরিবেষ্টিত হয়ে দধি-দুধ বিক্রি করেছেন মথুরার হাটে। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে হিরাবতী, নিদয়া ও ফুল্লরা হাটে বিকিকিনি করেছেন। তবে সামন্তসমাজে সচ্ছল কোনো গৃহবধূ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরাসরি সম্পৃক্ত না হলেও বিপদে আপদে স্বামীর সহযোগী হয়েছেন। *মনসামঙ্গল* ও *চণ্ডীমঙ্গলে* সোনকা ও খুল্লনা স্বামীর অবর্তমানে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব সামলে সন্তানকে যোগ্য করে গড়ে তুলেছেন। চন্দ্রধর দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য যাত্রায় গিয়ে মনসার রোষে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব, রিক্ত ও সর্বশ্রান্ত হয়ে যখন একজন অপরাধীর ন্যায় বাড়িতে প্রত্যাগমন করেন তখন সোনকা স্বামীর সকল দুঃখ-যন্ত্রণার ভাগীদার হয়েছেন। ধনপতিও সিংহলে বাণিজ্য যাত্রায় গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়ে দীর্ঘ বারো বছর কারাবরণের পর যখন পুত্র ও পুত্রবধূসহ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন তখন লহনা ও খুল্লনা স্বামীর ব্যথায় ব্যথিত হয়েছেন ; কোনো অনুযোগ, অভিযোগ করেননি। *ধর্মমঙ্গলে* লাউসেনের পত্নী কানড়া স্বামীর অবর্তমানে দেশের ক্রান্তিকালে বর্হিঃশত্রুর আক্রমণ হতে দেশকে তথা শ্বশুরকুলকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ পর্যন্ত করেছেন। এভাবে স্বামী, পুত্র-কন্যা ও পরিজন নিয়ে দুঃখ, যন্ত্রণা, অপ্রাপ্তি ও অশান্তি জয় করে সুখ ও শান্তির নীড় তৈরির নামই হচ্ছে সংসার আর এ সংসারকে ঘিরে গৃহগত যে জীবন মানুষ মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অতিবাহিত করে সেই জীবনই হচ্ছে গার্হস্থ্যজীবন। গার্হস্থ্যজীবনকে আরও সুশৃংখল, সুবিন্যস্ত, সুষম করতে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। গার্হস্থ্যজীবন পরিচালনার প্রথম ও প্রধান শর্তই হচ্ছে নারী-পুরুষ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি নৈতিক ও সুশৃংখলজীবন পরিচালনার মাধ্যমে সন্তান-সন্ততি জন্মদান ও তাদের প্রতিপালনের মাধ্যমে পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করা। বিবাহ শুধুই একটি অধিকার নয় বরং একটি নৈতিক ও পবিত্র সামাজিক দায়িত্ব। হিন্দুশাস্ত্রে গৃহিণীকে বাদ দিয়ে গৃহের অস্তিত্ব স্বীকৃতি পায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিবাহের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সন্তান জন্মদান এবং অবশ্যই পুত্র সন্তান জন্ম দিতে হবে তা না হলে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। যদি কোনো নারী পুত্র সন্তান জন্ম দিতে ব্যর্থ হতেন তবে তার ভাগ্যে জুটত সতীন। যদিও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পুত্র সন্তান জন্ম দানে ব্যর্থতা বা সফলতা কোনোটার ক্ষেত্রেই নারী দায়ী নন।

মধ্যযুগের সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। কন্যাকে সাধারণত তিন বছর হতে শুরু করে এগারো বছরের মধ্যে বিয়ে দিলে পুণ্য সঞ্চয় হয় বলে ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে উল্লেখ করেছেন। পুরুষের বিয়ের বয়স সব কাব্যে উল্লেখ না থাকলেও *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে কালকেতুকে এগারো বছর বয়সে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের একাধিক বিয়ে নিন্দনীয় ছিল না। বরং সামন্তরাজাদের বহুবিবাহ প্রথা ছিল অনেকটা আভিজাত্যের প্রতীক এবং স্বেচ্ছাচারের চরম নিদর্শন। অনেক পুরুষের ধারণা দুই নারী ছাড়া পতির আদর যত্ন হয় না।

সেই ঋগ্বেদের আমল থেকে সমাজে কন্যাপণের দৃষ্টান্ত প্রচলিত ছিল। বর্তমান সমাজে কন্যাপণের দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে তবে বরপণের অভিশাপ থেকে কন্যার পিতা মুক্ত নন। সাধারণত বলা হয়ে থাকে একজন নববধূর মান-মর্যাদা ও আদর-স্নেহ নির্ধারিত হতো তার বাবার বাড়ি হতে আনীত সম্পদ বা যৌতুকের ওপর। মধ্যযুগে আর একটি অভিশপ্ত প্রথা ছিল বর্ণভেদ। বিশেষ করে হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ প্রথার প্রচলন প্রকট আকারে ধারণ করায় সমবর্ণের পাত্র খুঁজে না পাওয়ায় অনেক মেয়েকে সারাজীবন বাপের বাড়িতে কাটাতে হতো অথবা কোনো মন্দিরে সেবাদাসী হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হতো। আইবুড়ো নাম ঘুচাবার জন্য অনেক সময় মাতা-পিতা তাদের আদরের কন্যাকে অনেক বয়স্ক পাত্রের হাতে তুলে দিতেন।

জীবনের শেষ পর্যায় হচ্ছে মৃত্যু। প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যু মানব জীবনের এক অমোঘ বিধান যা অনিবার্য। মৃতব্যক্তির শারীরিক পরিসমাপ্তি ঘটলেও আপন মানুষের স্মৃতিতে জাগরূক থাকে তার স্মৃতি। ধর্ম-বর্ণ অনুসারে দেহান্তরিত হওয়ার পর কিছু আচার ও প্রথা পালন করার বিধান সমাজে প্রচলিত আছে। প্রথমে আসে তার মৃতদেহ সৎকারের প্রসঙ্গ। হিন্দুদের চিতায় সর্ব গ্লানির মুক্তির সাথে যুক্ত হয়েছে শ্রীমদ্ভগবতগীতার 'বাসাংসি জীর্ণানী যথা বিহায়'-এর মতো দেহের নশ্বরতা ও আত্মার অবিনাশত্বের ধারণা। হিন্দুরা মৃতদেহ অনুগমনের সময় পথে খই, মুড়ি ও পয়সা ছিটান এ-বিশ্বাসে যে পরলোকে তার খাদ্য-বস্ত্রের অভাব যাতে না হয়। হিন্দুশাস্ত্রে মৃতদেহ চিতায় শোয়ানোর পর তার উত্তরাধিকারীগণ মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যদিয়ে সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করে মুখাগ্নি করেন। পোড়ানোর পর দেহের অবশিষ্টাংশ মাটিতে প্রোথিত করা হয় অথবা দেহভস্ম পবিত্র গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়। মৃতব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতির জন্য শ্রাদ্ধক্রিয়া করা হয়। পুত্র ও পৌত্ররা পিণ্ডদানের মধ্যদিয়ে পিতৃঋণ শোধ করেন। হিন্দু সমাজে জন্ম ও মৃত্যুজনিত অশৌচ কাটানোর জন্য নাপিত দিয়ে ক্ষৌরকর্ম করানোর উল্লেখ আছে। সুতরাং কোনো নবজাতক জন্মগ্রহণ করলে এবং কারো মৃত্যু ঘটলে নিজ নিজ শাস্ত্রে উল্লেখিত বিধানগুলিতে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এসব অনুষ্ঠান গার্হস্থ্যজীবন যাপনেরই অনিবার্য অংশ।

বাঙালি হিন্দু সমাজে নানা ধর্মীয় উৎসব ও ব্রত পালনের উল্লেখ মধ্যযুগের কাহিনিকাব্যে পরিলক্ষিত হয়। বক্ষ্যমাণ গবেষণা কর্মে যে-সকল কাব্যগ্রন্থ আলোচিত হয়েছে সেসব গ্রন্থের দেব-দেবীর উদ্দেশ্যই ছিল মর্ত্যে তাদের প্রতিষ্ঠা লাভ করা। কথায় আছে হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বণ। শিব, অন্নদা, চণ্ডী, মনসা, লক্ষ্মী, শীতলা, কালী এবং ধর্মঠাকুরের পূজা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে হিন্দু বাঙালিরা পালন করে থাকেন। একাদশী ব্রতের মাহাত্ম্য *মনসামঙ্গল* ও *শিবমঙ্গল* পাওয়া যায়। চড়ক পূজার উল্লেখ আছে *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে।

হিন্দু সমাজ যেমন স্মৃতি-সংহিতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তদ্রূপ মুসলিম সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় শরীয়ত ও হাদিসের নানা বিধান দ্বারা। মুসলমানরা পাঁচটি কর্মকে প্রধান বা ফরজ কাজ বলে মনে করেন—কলেমা, নামাজ,

Dhaka University Institutional Repository

রোজা, হজ, জাকাত। দৈনিক পাঁচবার নামাজ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। রমজান মাসে রোজা রাখা প্রতিদিন নামাজ পড়ার মতই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কারণে রোজা রাখতে না পারলে কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পরিশোধের ব্যবস্থা আছে। বাংলার মুসলিম সমাজে অধিকাংশ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয় চান্দ্রমাসের তারিখ অনুসারে। ইদ, শব-ই বরাত, মুহররম সবই চান্দ্রমাসকেন্দ্রিক। ইদ বছরে দু'বার পালিত হয়। ইদুল ফিতর এবং ইদুল আযহা। মুকুন্দরাম রচিত *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের কালকেতু উপাখ্যান অংশে মুসলিম গৃহস্থের ধর্মজীবন ও ধর্মাচারের পরিচয় বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাঙালির আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় বিধিবিধান পালনে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে খুব বেশি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। তবে সময়ের বিবর্তনে, আধুনিকতার প্রসারে, উপকরণাদির সহজলভ্যতায় অনুষ্ঠান আয়োজনে এবং উদযাপনের ধরনে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

মধ্যযুগে বাঙালি হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল বীভৎস সহমরণ প্রথা। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর চিতায় স্ত্রীর অনুমৃতা হওয়াকে তৎকালীন সমাজপতিরা গৌরবের কাজ বলে মনে করতেন। বক্ষ্যমাণ স গবেষণায় আলোচিত কাহিনিকাব্যে এই অমানবিক বীভৎস দৃশ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গলে* ছায়ার সহমরণ, মানিকরামের *ধর্মমঙ্গলে* রঞ্জার মা বিমলার সহমরণ এবং কর্ণসেনের চার পুত্রবধূর সহমরণ, *অন্নদামঙ্গলে* ভবানন্দ মজুমদারের দুইপত্নী চন্দ্রমুখী ও পদ্মমখীর সহমরণ পাঠককে বেদনাবিধুর করে। এসব ঘটনার বর্ণনায় মধ্যযুগের সমাজের ও পরিবারের এক ভিন্নমাত্রিক পরিচয় বিধৃত হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ গবেষণাকর্মে মধ্যযুগের বাংলা কাহিনিকাব্যে গার্হস্থ্যজীবন আলোচনায় মধ্যযুগের সুদীর্ঘকাল পরিসরে ঘটে যাওয়া মানব-জীবনে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সাথে সাথে গৃহগত জীবনের বিবর্তন কীভাবে গার্হস্থ্য-সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করেছে তা আলোচিত হয়েছে। মানব-জীবন উত্থান-পতনে ঘূর্ণ্যমান। পারিবারিক আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সন্দেহ-কলহ, সপত্নী বিদ্বেষ, মায়ে-ঝিয়ে দ্বন্দ্ব, শাশুড়ি-পুত্রবধূ, ননদ-ভ্রাতৃবধূর সম্পর্ক, পুত্র-মায়ের সম্পর্ক, পুত্র-পিতার সম্পর্ক বর্ণনা ছাড়াও পারিবারিক উৎসব-পার্বণ, জন্ম-মৃত্যু, সতীদাহ প্রথা, সংস্কার-কুসংস্কার, গঠন ও উন্নয়নমূলক কার্যাবলি বর্ণনার সাথে সাথে খাদ্য, ঘর-বাড়ি, তৈজসপত্র, প্রসাধনী, অলঙ্কার, বস্ত্রসম্ভার, চিত্ত বিনোদন, খেলা-ধুলা প্রভৃতির যে বর্ণনা কবিরা দিয়েছেন তা সামাজিক ইতিহাসেরও অপরিহার্য উপকরণ ও ঐতিহ্য। মধ্যযুগের গার্হস্থ্যজীবনের এ তথ্য ও উপকরণগুলো ভবিষ্যতে সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনের উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হবে। অত্যন্ত আশার কথা যে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় আধুনিক সৃষ্টিশীল লেখকগণের মধ্যে সাহিত্য রচনায় মধ্যযুগকে অবলম্বন করতে দেখা যাচ্ছে। এঁদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, সেলিনা হেসেন, মহাশ্বেতা দেবী, শওকত আলী প্রমুখ অন্যতম। এ সকল সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক মধ্যযুগের সৃষ্টিমূলক উপাদান সম্বন্বয়ে উপন্যাস, গল্প, কবিতা রচনা করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের বেহুলা ও ফুল্লরা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অরণ্য-বহ্নি, নাগিনী কন্যার কাহিনী উপন্যাসে এবং জীবনানন্দ দাশের অনেক কবিতায়, বেহুলা, চাঁদ সদাগর ও ফুল্লরা সহ মধ্যযুগের সাহিত্যশ্রয়ী চরিত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সেলিনা হোসেন চাঁদ সদাগর এবং কালকেতু ফুল্লরার ঘটনা অবলম্বন করে রচনা করেছেন *কালকেতু ও ফুল্লরা* এবং *চাঁদবেনে* উপন্যাস। মহাশ্বেতা দেবীর *কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্চির জীবন ও মৃত্যু* উপন্যাসে মধ্যযুগের অনার্যজীবন প্রতিভাসিত হয়েছে। শওকত আলীর *প্রদোষে প্রাকৃতজন* উপন্যাসটি তুর্কিদের আক্রমণ এবং সেন রাজাদের সময়ে বঙ্গদেশের প্রাকৃতজনদের কাহিনি নিয়ে রচিত। আলোচ্য গবেষণায় মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসের এসব তথ্য ও উপকরণ আধুনিক সাহিত্যে কীভাবে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছে তারও বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

একটি বীজকে মাটিতে বপন করলেই বিশাল বৃক্ষে পরিণত হতে পারে না এর জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিচর্যা এবং পর্যাপ্ত আলো, বাতাস ও পানি। তদ্রূপ একজন মানুষ সমাজে বাস করলেই সামাজিক হতে পারেন না, প্রয়োজন হয় গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অনুসন্ধিৎসা ও সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি। সাহিত্য মানব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি, জীবন ঘনিষ্ঠ সাহিত্যই প্রকৃত সাহিত্য। গভীরতর জীবনবোধ, সমাজ সচেতনতা এবং সৃজনীশক্তির সার্থক সমন্বয়েই শিল্পীমনের সার্থক প্রকাশ ঘটে। একজন সাহিত্যিক তার সাহিত্যকর্মের মধ্যেই বাস্তবজীবনের রূপকে চিত্রিত করেন।

শিল্পরসবেত্তাদের মতে শিল্পীর শিল্প রচনার প্রবণতা তাঁর একান্তই সহজাত। শিল্পীর স্বচ্ছ দর্পণেই প্রতিবিম্বিত হয় পরিবার, সমাজ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। শিল্পী সমাজ বহির্ভূত নন ; বরং রক্তে মাংসে গড়া সমাজেরই একজন মানুষ। তাই সমাজের সাথে শিল্পীর সম্পর্ক গভীরভাবে সংযুক্ত। বলা যায় শিল্পী ও সমাজ অভেদাত্মা। সুতরাং সমাজ বহির্ভূত শিল্প মূল্যহীন। একজন সমাজ সচেতন শিল্পীর বা সাহিত্যিকের শিল্পকর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে শিল্প বা সাহিত্য মানুষকে, মানুষের জীবন জিজ্ঞাসাকে, পরিবারকে, সমাজকে এবং সমাজ বিবর্তন ও পরিবর্তনকে তুলে ধরে সেই সাহিত্যই প্রকৃত সাহিত্য। অন্তহীন জীবন জিজ্ঞাসা, আধুনিকতা ও বাস্তবচেতনার সুসমন্বয়ে একজন সাহিত্যিক বা শিল্পীর জীবনবোধ হয় পরিশীলিত ও মার্জিত।

সমাজ স্বভাবতই পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তন সূচিত হয় সময়ের সাথে, রুচির সাথে, সর্বোপরি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে। মানুষের রুচি, গৃহগত ভাবনা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নির্ভরতা গার্হস্থ্যজীবনে দারুণ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সৃষ্টির শুরুতেই কিন্তু মানুষের গার্হস্থ্যজীবন ছিল না। প্রয়োজনের তাগিদে, চাহিদার পরিপূরণে, চিন্তার বৈচিত্র্যে, সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষ ধীরে ধীরে গৃহী হয়েছে। আদিম অরণ্যচারী সমাজে দেখা গেছে জনগণ একত্র বসবাস করেছে, একসাথে শিকারে গেছে, শিকারলব্ধ খাবার সবাই ভাগ করে খেয়েছে। তবে তাদেরকে গৃহস্থ বলা যায় না কারণ তাদের মধ্যে গার্হস্থ্যজীবনের নৈতিকতা ও পবিত্রতার কোনো সম্পর্ক ছিল না; ছিল না সন্তান-সন্ততির কোনো পরিচয়। গার্হস্থ্যজীবনের মূলভিত্তিই হচ্ছে গৃহী হয়ে এক বা একাধিক নারী-পুরুষ একটি নৈতিক ও পবিত্র সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে সন্তান জন্মদানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী তৈরি করা এবং তাদের লালন-পালনের মাধ্যমে প্রাগ্রসর একটি সমাজ বিনির্মাণ করা। তবে এ কথাও স্বীকার্য যে, সময়ের বিবর্তনে, চিন্তার বৈচিত্র্যে, উন্নততর জীবন-যাপনের প্রয়াসে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম অরণ্যচারী মানুষই কিন্তু কালের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে আজকের এ অবস্থানে এসে গৃহী হয়েছে। একজন গৃহস্থের দৈনন্দিন যাবতীয় যে কার্য-পদ্ধতি——সামাজিক, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও গৃহগত সমস্তই গার্হস্থ্যজীবনের অন্তর্ভুক্ত। মধ্যযুগের বাংলা কাহিনিকাব্যে বিধৃত গার্হস্থ্যজীবনের স্বরূপ বর্তমান গবেষণাকর্মে বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে।

মধ্যযুগের প্রথম সাহিত্য নিদর্শন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* সমাজের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাকে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে নিম্নমধ্যবিত্ত বা সচ্ছল সমাজ বলা যায়। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* রাধার পিতৃ ও শ্বশুরকুলের একটি পারিবারিক জীবন প্রত্যক্ষ করা যায় । অপরপক্ষে কৃষ্ণ এবং তার প্রতিবেশীদেরও একটি পারিবারিক জীবন ছিল। রাধা যিনি নিজেকে কাব্যের বহু স্থানে সম্ভ্রান্ত ঘরের কুলবধু বলে পরিচয় দিয়েছেন এবং সেই সম্ভ্রান্ত ঘরের কুলবধুই তার সংসারের মায়া, মমতা, নীতিবোধ, স্নেহ-প্রেম, ভালোবাসা উপেক্ষা করে গোপ বালকের প্রেমে হয়েছেন পাগল। স্বামীর বিশ্বাস, প্রেম, ভালোবাসা, সোহাগ ও আদর পরিত্যাগ করে কাব্যের শেষে রাধা কৃষ্ণের প্রেমে আত্মসমর্পণ করেছেন। এ নিষিদ্ধ সর্বনাশা প্রেম রাধাকে শেষ পর্যন্ত করেছে ঘরছাড়া, ছন্নছাড়া ও কলঙ্কিনী। পরিশেষে কাব্যটি পৌরাণিক কাহিনির অন্তরালে লৌকিক জগৎ, মানবিক রূপ ও গার্হস্থ্যজীবন পরিবেশনেই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

সেখ ফয়জুল্লা প্রণীত *গোরক্ষ-বিজয়ে* গোরক্ষনাথের পরম গুরু মীননাথ দেবী দুর্গার শাপে যোগভ্রষ্ট হয়ে কদলি নগরে ষোলশ কদলি রমণী নিয়ে কাম বিহারে মত্ত হয়ে এক অদ্ভুত সংসারাশ্রম পালন করেছেন এবং পরে শিষ্য কর্তৃক বহু কষ্টে ঐ সংসার থেকে বেরিয়ে আবার গুরু মীননাথের যোগতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। একজন যোগী হয়ে মীননাথের কদলি নগরে গিয়ে ষোলশ রমণী সম্ভোগে মত্ত থাকা প্রচলিত শাস্ত্র পরিপন্থি। *গোরক্ষ-বিজয়ে* আমরা সমাজ, সংসার ও পারিবারিক জীবনের একটা চিত্র পেয়েছি বটে তবে সে সংসারাশ্রম লোক সমাজ থেকে ভিন্ন ধারার। সেখানে ষোলশ কদলি নারী নিয়ে মীননাথের এক বিশাল সংসার ছিল, পুরুষের সংখ্যা কম থাকায় কদলি রাজ্যে তাঁর একক আধিপত্যও ছিল। জীবন ভোগের চরম সুবিধাও তিনি ভোগ করেছেন, বিন্দুনাথ নাম্নী এক পুত্র সন্তানের জনকও হয়েছেন। তবে কাব্যে তাঁর মায়ের উল্লেখ নেই কোথাও। এত কিছুর পরও মীননাথ যে পারিবারিক জীবন যাপন করতেন সে-জীবন সমাজ অনুমোদিত নয়। বস্তুত *গোরক্ষ-বিজয়ে* যোগতন্ত্রের অন্তরালে এক অদ্ভুত সংসার জীবনের চিত্র পরিলক্ষিত হয় যা স্বাভাবিক জীবনে দেখতে পাওয়া যায় না। এ বর্ণনা সাধারণের বাইরে এক অসাধারণ রূপকার্থিক জগতের চিত্র। সন্ন্যাসধর্ম ও গার্হস্থ্যধর্ম যে একই বৃত্তে বা ধারায় চলতে পারে না সেটিও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে এ-কাব্যে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম শাখা মঙ্গলকাব্য। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ছয়শত বছরে মঙ্গলকাব্যে আমরা দেখতে পাই দেব-দেবী তাঁদের মাহাত্ম্য প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠা ও ভক্তগণের মধ্যে মঙ্গল প্রতিষ্ঠার জন্যই যুগে যুগে মর্ত্যভূমিতে আর্বিভূত হয়েছেন। মাহাত্ম্য প্রচার ছাড়াও মঙ্গলকাব্যে স্থান পেয়েছে দেব-দেবীর জীবন যাত্রার ইতিহাস, ঘরসংসার, দ্বন্দ্ব ও প্রাধান্য লাভের চেষ্টা, অকারণে অভিশাপ প্রদান এবং মানুষকে দিয়ে জোর করে পূজা আদায়ের চেষ্টা ও অলৌকিকতা। মানুষের গার্হস্থ্যজীবনের বিশ্বাস, আদর্শ ও ব্যথা-বেদনার ভিত্তিতেই জনশ্রুতি অনুযায়ী মঙ্গলকাব্যের অবতারণা। মঙ্গলকাব্যে দেবতাকে উপলক্ষ্য করে মানবজীবনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ভারতীয় হিন্দু বাঙালির জীবনে শাস্ত্রীয় দর্শন মনুসংহিতার পরেই মঙ্গলকাব্যের স্থান। মঙ্গলকাব্য বাঙালির জীবন দর্শনের দর্পণ স্বরূপ। একজন শিশুর জন্মগ্রহণ থেকে তার বেড়ে ওঠা, তার জীবন যাপনের প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করে তাকে আবার মাতা-পিতা হয়ে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত প্রতিটি অধ্যায় মঙ্গলকাব্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। শিশুর জন্মগ্রহণের ক্ষেত্রে গর্ভবতী নারীর শারীরিক যন্ত্রণা ও অন্তর্বেদনাকে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ পরম মমতায় অনুভব করেছেন। সন্তান গর্ভে থাকাকালীন দশ মাস দশদিন নিখুঁত পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি দিয়ে গর্ভবতী মায়ের ভালো লাগা, খারাপ লাগা, শঙ্কা, ভয়, খাবারে রুচি-অরুচিসহ সমাজের সংস্কার-কুসংস্কার, সন্তান জন্ম গ্রহণের পর পালনীয় কিছু আচার অনুষ্ঠান অত্যন্ত যত্ন সহকারে বর্ণিত হয়েছে প্রতিটি কাব্যে। এ আচার-পার্বণগুলি শুধু অনুষ্ঠান নয় এগুলি বাঙালির জীবনদর্শন ও তাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের সঙ্গে জড়িত।

মধ্যযুগের বাংলা কাহিনিকাব্যে গার্হস্থ্যজীবন আলোচনায় স্থান পেয়েছে রাজনৈতিক উত্থান-পতন, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার বর্ণনা। এ ছাড়াও আলোচিত হয়েছে পারিবারিক ও সামাজিক আচার-পার্বণ, দ্বন্দ্ব-কলহ, হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা, সাম্য-অসাম্য, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখসহ নানা জাগতিক সমস্যা।

মধ্যযুগের বাংলায় খাদ্যগ্রহণের যে বর্ণনা আছে, সেখানে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান চরমে। ধনী বা সম্ভ্রান্ত পরিবারে যেখানে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না হচ্ছে সেখানে গরীবেরা সামান্য লবণ-ভাতও জোটাতে হিমশিম খাচ্ছে। এ ব্যবধান শুধু মধ্যযুগে ছিল তা নয় বর্তমান যুগেও পরিলক্ষিত হয়। বাঙালির নিত্য দিনের খাবার ছিল মাছ, ভাত, ডাল ও বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি। অনুষ্ঠান-পার্বণ উপলক্ষ্যে খাবারে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। খাবারের বৈচিত্র্যে মধ্যযুগের কবিদের ভোজন রসিকতার পরিচয় মেলে।

শ্রেণিভেদে খাবারের ন্যায় বস্ত্র ও অলঙ্কার ব্যবহারেও একই রকম পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো। হিন্দু-মুসলমান পুরুষের পোশাকে কিঞ্চিৎ পার্থক্য ছিল। তবে নারীদের পোশাকে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ক্রয় ক্ষমতার সামর্থ্যে সমাজে ধনী-দরিদ্রের শ্রেণিগত পার্থক্য ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে সম্পন্ন ঘরের নারী-পুরুষ মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন সেখানে দরিদ্র-নিম্নবিত্তের পোশাক ছিল হরিণের ছড়, খুঞার বস্ত্র এবং পদ্মপাতা। অলঙ্কার ব্যবহারে ধনী-দরিদ্রে চরম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ধনী বা অবস্থাসম্পন্ন মানুষ সোনার তৈরি অলঙ্কার পরতেন। এ সব অলঙ্কার হীরা, মাণিক্য দ্বারা মোড়া থাকত। গরীবের অলঙ্কারের মধ্যে ছিল কাচের চুড়ি, শাখা ও সিঁদুর।

বাসস্থানের ক্ষেত্রে রাজা-মহারাজা, সামন্ত জমিদার, ধনিক-বণিক সম্প্রদায়ের বাস গৃহ ছিল ইট-পাথরের তৈরি হর্ম্যপুরী অপরপক্ষে দরিদ্র সম্প্রদায়ের মাথা গুজবার মতো ঠাঁইও ছিল না। তারা বাস করতো কুঁড়ে ঘরে। বাংলাদেশ নদী-নালা, হাওড়-বাওড়ের দেশ। চলাচলের জন্য নৌকা ছিল প্রধান বাহন। বণিক সম্প্রদায় বাণিজ্য যাত্রায় বিভিন্ন আকৃতির নৌকা ব্যবহার করতেন। স্থলপথের যানবাহন ছিল হাতি, ঘোড়া, রথ ও চৌদোল। সাধারণ মানুষের বাহন ছিল গরুর গাড়ি।

সভ্রান্ত বাঙালি সমাজ শিক্ষানুরাগী ছিলো। যদিও মধ্যযুগে শিক্ষার পরিবেশ সুপ্রসন্ন ছিল না। শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল ধনিক-বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে। সামন্ত রাজারা গৃহে পণ্ডিত রেখে অথবা গুরুগৃহে টোলে নিয়ে তাদের সন্তানদের বিশেষ করে পুত্র সন্তাদের লেখা-পড়া করাতেন। নারী-শিক্ষা ছিল না বললেই চলে তবে খুব কম সংখ্যক মেয়ে লিখতে বা পড়তে পারতেন। অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনির বিদ্যা বিদুষী ছিলেন। তর্কশাস্ত্রে তাঁর সাথে অনেক বড় বড় পণ্ডিতও পেরে উঠতেন না। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মধ্যযুগের মানুষ দৈবজ্ঞের ওপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। ঝাড়-ফুক, জল পড়া, তেল পড়ার ওপর বিশ্বাস ছিল বেশি। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি তখনো শুরু হয়নি।

বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে উৎসব পার্বণের অন্ত নেই। পারিবারিক উৎসবের মধ্যে জন্ম, বিয়ে ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নানা রকম উৎসব পালনের উল্লেখ আছে। গার্হস্থ্যজীবনের প্রধান শর্ত নারী-পুরুষ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নৈতিক ও পবিত্র সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্মদান ও তাদের লালন-পালন করে প্রকৃত মানুষ হিসেবে প্রস্তত করা। মধ্যযুগে রাজকীয় বিবাহের বর্ণনা যেমন পাওয়া গেছে আবার চাকচিক্যহীন সাদামাটা বিবাহের বর্ণনাও আছে। পরিবারের কেউ মৃত্যুবরণ করলে স্ব-স্ব শাস্ত্র অনুযায়ী সৎকার করার ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। বর্তমান গবেষণায় বিভিন্ন কাব্যপাঠ ও বিশ্লেষণ সূত্রে বিভিন্ন পার্বণ ও পূজা-অনুষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গিয়েছে।

পার্বণিক অনুষ্ঠানের মধ্যে হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বণ তো আছেই এ ছাড়া প্রত্যেকের বাড়িতে গৃহদেবতার অর্চনা প্রচলিত ছিল, এখনো আছে। হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। এ ছাড়া লক্ষ্মী-সরস্বতী-শ্যামাপূজা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা, চড়কপূজা পালিত হতো এবং এখনো পালিত হয়। মধ্যযুগে অধিকাংশ হিন্দু দেব-দেবী পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্মাশ্রয়ী ছিলেন। যে উদ্দেশে বাংলা মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব সেই লৌকিক দেব-দেবী মনসা, চণ্ডী, শিব, শীতলা, অন্নদা, ষষ্ঠী ও ধর্মঠাকুরের প্রতি সাধারণ মানুষের প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা অতীতেও ছিল এখনো আছে। আলোচিত কাব্যসমূহে সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর প্রতিষ্ঠাই শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে মানুষের সমাজে তাঁদের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়েছে বলে, মানুষের ইতিহাস তথা তাদের পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি, আনন্দ-বেদনার কথাই সেখানে বড় হয়ে উঠেছে তাদের জীবনে।

পণপ্রথা, বহুবিবাহ, সপত্নীদ্বন্দ্ব গার্হস্থ্যজীবনে দারুণ ভাবে প্রভাব ফেলে। মঙ্গলকাব্যের বহুছত্রে এ যন্ত্রণার উল্লেখ আছে। পতিতাবৃত্তির উল্লেখও লক্ষণীয়। বিশেষ করে *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে সুরিক্ষা নটিনী বাজারের বারবণিতাকেও হার মানিয়েছে। নয়ানী লাউসেনের রূপের মোহে মোহাচ্ছন্ন হয়ে নিজের সন্তানকেও কূয়ায় নিক্ষেপ করতে এতটুকু বাধেনি। কালকেতু তার গুজরাটনগরে ‘জায়াজীনী’কে স্থান করে দিয়েছে।

নানা সংগতি-অসংগতি, সংস্কার-কুসংস্কার, ভালো-মন্দ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, হতাশা-ব্যর্থতা, পূর্ণতা-অপূর্ণতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই হচ্ছে জীবন। জীবন মসৃণ নয়। বাধা-বিঘ্ন মানুষকে ক্ষত-বিক্ষত করে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক সমস্যা অতিক্রম করে মানুষ এগিয়ে যায় জীবনের স্বাদ উপভোগের জন্য। কিন্তু একা জীবন উপভোগে তৃপ্তি নেই। এর জন্য প্রয়োজন যুগল সৃষ্টি। তারপর সন্তান-সন্ততি। স্বামী-স্ত্রী,

Dhaka University Institutional Repository

পিতৃ-মাতৃকুলের সদস্য নিয়ে একটি শান্তির নীড় তৈরি করাই হচ্ছে সংসার স্থাপন। আর এই সংসারের সকল সদস্যদের ভালো-মন্দ, দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, খাদ্য-খাবার, রান্না-বান্না, সাজ-সজ্জা, বসন-ভূষণ, শিক্ষা-দীক্ষা, পারিবারিক আচার-পার্বণ, ধর্ম-কর্ম, সামাজিক দায়িত্ব সবই গার্হস্থ্যজীবনের অংশ। এ সকল উপাদান সামাজিক ইতিহাসেরও অপরিহার্য তথ্য ও উপকরণ। আলোচ্য গবেষণায় আমাদের নির্বাচিত বাংলা কাহিনিকাব্যে বর্ণিত গার্হস্থ্যজীবনের সকল তথ্য ও উপকরণ সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। আমরা পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, কাব্যবিধৃত গার্হস্থ্যজীবনের তথ্য-উপকরণাদি আমাদের অলিখিত সামাজিক ইতিহাসের মহামূল্যবান উপকরণ তথা আকর। এই উপকরণ অবলম্বনে সৃষ্টিশীল কবি ও কথাসাহিত্যিকেরা তাঁদের কবিতা ও কথাসাহিত্যে জীবনকে নতুনভাবে প্রতিভাসিত করেছেন। ফলত এ প্রত্যাশা করা যায় যে, সুনির্দিষ্ট ইতিহাসবিদ আর সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকের স্বাতন্ত্রিক মননশীল ও সৃষ্টিশীল পরিচর্যায় বাংলার মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাস পুনর্সৃষ্টি হবে, উন্মোচিত হবে ইতিহাসের নতুনতর পাঠ।

Dhaka University Institutional Repository

ক. আকর গ্রন্থ

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত (১৪০৪) *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত (১৩২৪) সেখ ফয়জুল্লা-প্রণীত *গোরক্ষ-বিজয়*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, কলিকাতা

শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত (১৯৬২) কবি বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীবিজিতকুমার দত্ত ও শ্রীসুনন্দা দত্ত সম্পাদিত (১৯৬০) মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত *ধর্মমঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীযোগিলাল হালদার সম্পাদিত (১৯৫৭) রামেশ্বরের *শিব-সঙ্কীর্ত্তন* বা *শিবায়ন*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সুকুমার সেন সম্পাদিত (২০০৭) কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত *চণ্ডীমঙ্গল*, সাহিত্য অকাদেমি, কলিকাতা

খ. সহায়ক গ্রন্থ : বাংলা

অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় (২০০১) *ভারতের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) পুনঃমুদ্রণ, মৌলিক লাইব্রেরি, কলিকাতা -৭৩

অতুল সুর (নভেম্বর ১৯৭৬) *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

(অগ্রহায়ণ ১৪১৭) *ভারতে বিবাহের ইতিহাস*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা-০৯

(১৯৮৭) *বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়*, দ্বিতীয় সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা

অনাদিকুমার মহাপাত্র (জুলাই ১৯৯৮) *বিষয় সমাজতত্ত্ব*, পুনর্মুদ্রণ, ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন,কলিকাতা-০৯

অপূর্ব কুণ্ডু (১৯৯৮) *বাংলা ও বাঙালির দিনপঞ্জী*, প্রভা প্রকাশনী, কলিকাতা

অমিতা কুমারী (১৯৫৭) *বিচিত্র বিবাহ*, সিগনেট প্রেস, কলিকাতা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত (১৯৯২) বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

অম্লান দত্ত (১৯৭৩) *সমাজ ও ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা

অরবিন্দ পোদ্দার (অক্টোবর ২০০৫) *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*, চতুর্থ মুদ্রণ, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা-০৯

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৩) *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* , তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পর্ব, তৃতীয় সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি. কলকাতা-৭৩

(১৯৯৫) *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, খ্রীষ্টীয় দশম-বিংশ শতাব্দী, পুনর্মুদ্রিত, নতুন

Dhaka University Institutional Repository

সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি. কলকাতা-৭৩

(১৯৬৩) *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত* (উত্তর চৈতন্যযুগ ও অষ্টাদশ শতাব্দী) কলিকাতা, (৩য় মুদ্রণ)

(১৯৫৯) *ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য*

(১৯৫৭) ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য

আনিসুজ্জামান (ফেব্রুয়ারি ১৯৯১) *স্বরূপের সন্ধানে*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

(ফেব্রুয়ারি ২০০০) *বাঙালি নারী সাহিত্যে ও সমাজে*, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য প্রকাশ , ঢাকা

(অক্টোবর ১৯৬৪) *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১৯৭৪) *পাণ্ডুলিপি*, সম্পাদিত, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আবদুল করিম (জানুয়ারি ১৯৯৯) *বাংলার ইতিহাস* (সুলতানী আমল), প্রথম প্রকাশ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা

(জানুয়ারি ২০১৬) *বাংলার ইতিহাস* (মোগল আমল), প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা

আবুল আহসান চৌধুরী (জুন ১৯৯৭) *লোক সংস্কৃতির বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আশফাক হোসেন (জুলাই ২০১৮) *বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা* (প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত), পুনমুদ্রণ, জে. কে. প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা

আশরাফ সিদ্দিকী (১৯৭৮) *লোকায়ত বাংলা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আশুতোষ দাস সম্পাদিত (১৯৮০) তন্দ্রবিভূতির *মনসাপুরাণ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৬৪) *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, গ্রন্থপ্রকাশ, কলিকাতা

(সেপ্টেম্বর ২০০৯) *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, দ্বাদশ সংস্করণ, এ মুখার্জী আণ্ড কোং প্রা. লি. কলিকাতা-৭৩

আহমদ রফিক (১৩৬৬) *শিল্প, সংস্কৃতি-জীবন*, ঢাকা

আহমদ শরীফ (এপ্রিল ১৯৭৭) *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা

(নভেম্বর ২০০৮) *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (১ম খণ্ড), পুনর্মুদ্রণ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

(মে ২০০৮) *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), পুনর্মুদ্রণ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

(১৯৭৪) *জীবনে সমাজে সাহিত্য*, ঢাকা,

Dhaka University Institutional Repository

বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব, কলিকাতা : সাহিত্যলোক

(ফেব্রুয়ারি ২০১১) *বাঙালীর চিন্তা চেতনার বিবর্তনধারা*, আগামী প্রকাশনী কর্তৃক প্রথম প্রকাশ ঢাকা

(১৯৯৫) *সময়-সমাজ-মানুষ* (১ম খণ্ড) ঢাকা

(১৯৬৯) *সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা*, ঢাকা

(ফেব্রুয়ারি ২০১২) *সমাজ সংস্কৃতির স্বরূপ*, দ্বিতীয় প্রকাশ, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা

(২০০৬) দৌলত উজির বাহারাম খাঁ বিরচিত *লায়লী-মজনু* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

” (১৯৭৫) দোনাগাজীর *সয়ফুমুলক বদিউজ্জামাল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

এম. এ. রহিম (মার্চ ১৯৮২) *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

কঙ্কর সিংহ (জানুয়ারি ২০০৯) *ধর্ম ও নারী : প্রাচীন ভারত*, প্রথম প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,কলিকাতা-০৯

কনক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬১) *বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস*, কলিকাতা

কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় (এপ্রিল ২০০৯) *নারী শ্রেণী ও বর্ণ*, প্রথম মিত্রম্ সংস্করণ, মিত্রম্ কলিকাতা-৭৩

কে. এম. আশরাফ (জুলাই ১৯৯৪) *হিন্দুস্তানের জন-জীবন ও জীবন-চর্যা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, পার্ল পাবলিশার্স, কলিকাতা-০৬

কিরণচন্দ্র চৌধুরী (১৯৯৭) *ভারতের ইতিহাসকথা*, পুনর্মুদ্রণ, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রা. লি, কলিকাতা-০৯

(জুলাই ২০০১) *ভারতের ইতিহাসকথা*, দ্বিতীয় পত্র (১৭০৭ খ্রীঃ হইতে ১৯৫০ খ্রীঃ), ওরিয়েন্টাল বুক কোঃ প্রা. লি. কলিকাতা-০৯

কৃষ্ণদাস কবিরাজ (১৯৭৪) *শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত*

খগেন্দ্রনাথ সেন (১৯৯৮) *সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা*, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিমার্জিত সংস্করণ, বিদ্যা, কলিকাতা-৭৩

ক্ষেত্রগুপ্ত (মার্চ ২০১১) *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস*, পঞ্চদশ সংস্করণ, গ্রন্থনিলয়, কলিকাতা -০৯

(মাঘ ১৪১৩) *কবি মুকুন্দরাম*, চতুর্থ সংস্করণ, গ্রন্থনিলয়, কলিকাতা-০৯

গোপাল হালদার (মে ১৯৮৬) *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রথম খণ্ড (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) মুক্তধার, তৃতীয় প্রকাশ, ঢাকা

(একুশের বই মেলা ২০১১) *বাঙালি সংস্কৃতির রূপ*, মুক্তধারা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা

(এপ্রিল ১৯৭৪) *সংস্কৃতির রূপান্তর*, মুক্তধারা, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা

গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯) *বাংলা মঙ্গল কাব্যে শ্রমজীবী মানুষ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

গোলাপ মুরশিদ (জুলাই ২০১৪) *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, পুনর্মুদ্রণ

Dhaka University Institutional Repository

জয়া সেনগুপ্তা (ফেব্রুয়ারি ১৯৯০) *মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী*, প্রথম প্রকাশ, বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা

তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত সম্পাদিত (১৯৪২) নারায়ণদেবের *পদ্মাপুরাণ*, কলিকাতা বিশ্বদ্যিালয়

দীনেশচন্দ্র সেন (মার্চ ২০০৬) *বৃহৎ বঙ্গ*, তৃতীয় মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা -৭৩

(আগস্ট ১৯৮৬) *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, নবম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা-১৩

দেবেশকুমার আচার্য্য (২০১০) ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল কবি ও কাব্য*, চতুর্থ প্রকাশ, সাহিত্য সঙ্গী, কলিকাতা-০৯

নাজমুল করিম (এপ্রিল ১৯৯৭) *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ*, ষষ্ঠ সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

নীলকান্ত বেপারী (মে ২০০১) *কবি বিজয়গুপ্ত জীবন ও সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নীলিমা ইব্রাহিম (নভেম্বর ১৯৯০) *সাহিত্য সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(অক্টোবর ১৯৯৬) *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য পাঠের ভূমিকা*, চতুর্থ সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা

নীহাররঞ্জন রায় (মাঘ ১৪১৪) *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, ষষ্ঠ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৭৩

পীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত (১৯৬২) ঘনরাম চক্রবর্তীর *ধর্মমঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ফজলুর রশীদ খান (১৯৭৩) *সমাজ বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব*, প্রথম সংস্করণ, শিরীন পাবলিকেশন্স, ঢাকা

ফণীন্দ্রাথ দাস ও গিরিশচন্দ্র দাস সম্পাদিত (১৯৩৬) ষষ্ঠীবরের *পদ্মাপুরাণ*, শ্রীহট্ট

বাসুদেব রায় (এপ্রিল ২০০৪) *মনসামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বিনয় ঘোষ (ডিসেম্বর ২০০৬) *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, পঞ্চম সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা-৭৩

(জুলাই ১৯৭৬) *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, প্রথম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা- ১২

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১১) *বাংলা সাহিত্যে নারী* (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) প্রথম প্রকাশ, ধ্রুবপদ, ঢাকা

ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৯৯১) *বাংলাদেশের সাহিত্য গবেষণা ও অন্যান্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মমতাজুর রহমান তরফদার (জুন ২০০১) *হোসেন শাহী আমলে বাংলা* (১৪৯৪-১৫৩৮), বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(জুন ১৯৮১) *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (২০১৬) মহর্ষি-মনু-প্রণীত *মনুসংহিতা*, পুনর্মুদ্রণ,সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা-০৬

মুহম্মদ আবদুল জলিল (নভেম্বর ১৯৮৬) *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত	(১৪১৪) *কালকেতু উপাখ্যান*, সপ্তম সংস্করণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা
” ”	(১৪১৪) *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান*, সপ্তম সংস্করণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা
” ”	(২০১৪) বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, সপ্তম সংস্করণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা
মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া	(মে ১৯৯১) *শ্রীরায় বিনোদ : কবি ও কাব্য*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
” সম্পাদিত	(১৯৯৩) শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত *পদ্মাপুরাণ*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	(ফাল্গুন ১৩৭১) *বাংলা সাহিত্যের কথা* (দ্বিতীয় খণ্ড-মধ্যযুগ) প্রথম সংস্করণ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা
মোহাম্মদ হাননান	(১৯৯৪) *মনসামঙ্গলকাব্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত (১৯৪৯)	কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের *মনসামঙ্গল*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রঙ্গলাল সেন	(এপ্রিল ১৯৮৩) *সমাজবিজ্ঞান* (অনুদিত), মূল : স্যামুয়েল কোনিগ, সম্পাদনা : এ. কে. নাজমুল করিম, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, বইবিতান, ঢাকা
রমেশচন্দ্র মজুমদার	(জানুয়ারি ২০০৩) *বাংলা দেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ) ষষ্ঠ সংস্করণ, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স. প্রা. লি. কলিকাতা-১৩
রাজেন্দ্রকুমার গুপ্ত সঙ্কলিত	(২০১১) কবিবর বিজয়গুপ্ত প্রণীত *পদ্মাপুরাণ* বা *মনসামঙ্গল*, রাজেন্দ্র লাইব্রেরি, ১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, কলিকাতা-০১
রাজিয়া সুলতানা	(জুন ১৯৯৮) *সাহিত্য বীক্ষণ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
শঙ্করী প্রসাদ বসু	(জানুয়ারি ২০০০) *কবি ভারতচন্দ্র*, প্রথম দে’জ সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৭৩
শশিভূষণ দাসগুপ্ত	(শ্রাবণ ১৩৭০) *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে*, তৃতীয় সংস্করণ, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং. প্রা. লি. কলিকাতা-১২
শামীমা সুলতানা	(জুন ২০০৭) *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে চৌতিশা*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু প্রকাশিত	(১৯২১) মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তি প্রণীত *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইন্ডিয়ান প্রেস লি. এলাহাবাদ
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	(১৯৯৯) *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*, নব সংস্করণ, ওরিয়েন্ট বুক কো:, সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-০৭
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত	(১৯৭৪) কবি মুকুন্দরাম বিরচিত *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত — (১৯২৫) *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রকাশিত — (১৩১৮) ঘনরাম চক্রবর্ত্তী কবিরত্ন প্রণীত *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল*, তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো মেসিন, কলিকাতা

শ্রীনুটবিহারী রায় কর্তৃক প্রকাশিত — (১৩১০) রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিরচিত *শিবায়ন*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা

শ্রীভূদেব চৌধুরী — (আগস্ট ২০০৯) *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা* (প্রথম পর্যায়) পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং ,কলিকাতা ৭৩

শ্রীমন্তকুমার জানা — (জানুয়ারি ২০১১) *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, ওরিয়েন্টাল বুক কো. লি. কলিকাতা-০৯

সনৎ কুমার নস্কর — (১৯৯৫) *মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য আর্থ-সামাজিক পটভূমি ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার*, প্রথম প্রকাশ, রত্নাবলী, কলিকাতা-০৯

সনাতন গোস্বামী — (এপ্রিল ২০১০) ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* (প্রথম খণ্ড), সম্পাদিত, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-০৯

সিরাজ সালেকীন — (ফেব্রুয়ারি ২০১০) *ভারতীয় শাস্ত্রে নারী কথা*, প্রথম প্রকাশ, কথা প্রকাশ, ঢাকা

(ফেব্রুয়ারি ২০২০) *কবিতায় নৃগোষ্ঠী মূলত কেন্দ্র থেকে দেখা*, প্রথম প্রকাশ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

সিরাজুল ইসলাম — (জুলাই ২০১৩) *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, চয়নিকা, ঢাকা

সুকুমার সেন — (১৯৭৮) *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (ষোড়শ শতাব্দী), ষষ্ঠ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা-০৯

(১৯৭৫) *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী) তৃতীয় সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা-০৯

(১ বৈশাখ ১৪০১) *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড (১৮০১-১৮৮০) প্রথম আনন্দ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা-০৯

(পৌষ ১৪০০) *ইসলামি বাংলা সাহিত্য*, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা-০৯

" সম্পাদিত — (১৯৫৩) বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের *মনসাবিজয়*, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা

সুখময় মুখোপাধ্যায় — (১৯৯৬) *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল* (১৩৩৮-১৫৩৮) ভারতী বুক স্টল, কলিকাতা- ০৯

(এপ্রিল ২০০০) *বাংলার ইতিহাস* (১২০৪-১৫৭৬) খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কো. ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত	(১৯৫২) দ্বিজ মাধবের *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সুপর্ণা গুপ্ত	(নভেম্বর ২০০৯) *ইতিহাসে নারী : শিক্ষা*, পুনর্মুদ্রণ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা- ৭৩
সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ দাস সম্পাদিত	(১৯৬০) জগজ্জীবন ঘোষাল বিরচিত *মনসামঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সুশীল চৌধুরী	(এপ্রিল ২০১৮) *নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা-০৯
স্মৃতিকণা চক্রবর্তী	(জুন ২০১১) *মঙ্গলকাব্য : পুচ্ছগ্রাহিতা ও মৌলিকতা*, প্রথম প্রকাশ, জে এন ঘোষ এণ্ড সন্স, কলিকাতা- ৭৩
হিমাচল চক্রবর্তী	(১৯৯৫) *সমাজবিদ্যা তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা* (অনুদিত), মূল : টম বটোমর, দ্বিতীয় সংস্করণ, কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা-১২

গ. সহায়ক গ্রন্থ : ইংরেজি

Erma Bomberc	(1987) Family The Ties That Bind And Gag! New York
Haig Wolseley,	*Cambridge History of India*(vol. iv)- chapter-viii, Aurangzib-by Jadunath Sarkar. 1957
Irawati Karve	(1965) *Kinship Organizatio in India*
Irfan Habib Edior :	MEDIEVAL INDIA 1 Researches in the History of India 1200-1750 1st Edition 1992, Oxford University Press.
J.S.Stavorinus	*Voyages to the East Indies, Vol. 1*
Kingsley Davis	(1998) *Human Society ; California, USA*
R. M. Maciver and Charles H. Page	(1969) Society An Introductory Analysis, London
Samuel Koenig	(1969) *Sociology* *An Introduction to the Science of Society New York,*
T.B. Bottomore	(1986) *Sociology* *A guide to Problems and Literature,* India
William J. Goode	(1995) *The Family, Columbia University, USA,*

ঘ. অভিধান :

বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান	(২০০৯) বাংলা একাডেমী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ
বাংলা বানান-অভিধান	(২০০৮) বাংলা একাডেমী, জামিল চৌধুরী, তৃতীয় সংস্করণ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত)
বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান	(২০০৭) বাংলা একাডেমী, অষ্টম মুদ্রণ
সংসদ্ বাঙ্গলা অভিধান	(১৯৯৭) সাহিত্য সংসদ, একবিংশতিতম মুদ্রণ
বঙ্গীয় শব্দকোষ	(২০০১) হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, পঞ্চম মুদ্রণ
পৌরাণিক অভিধান	(১৪১২) সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত, নবম সংস্করণ